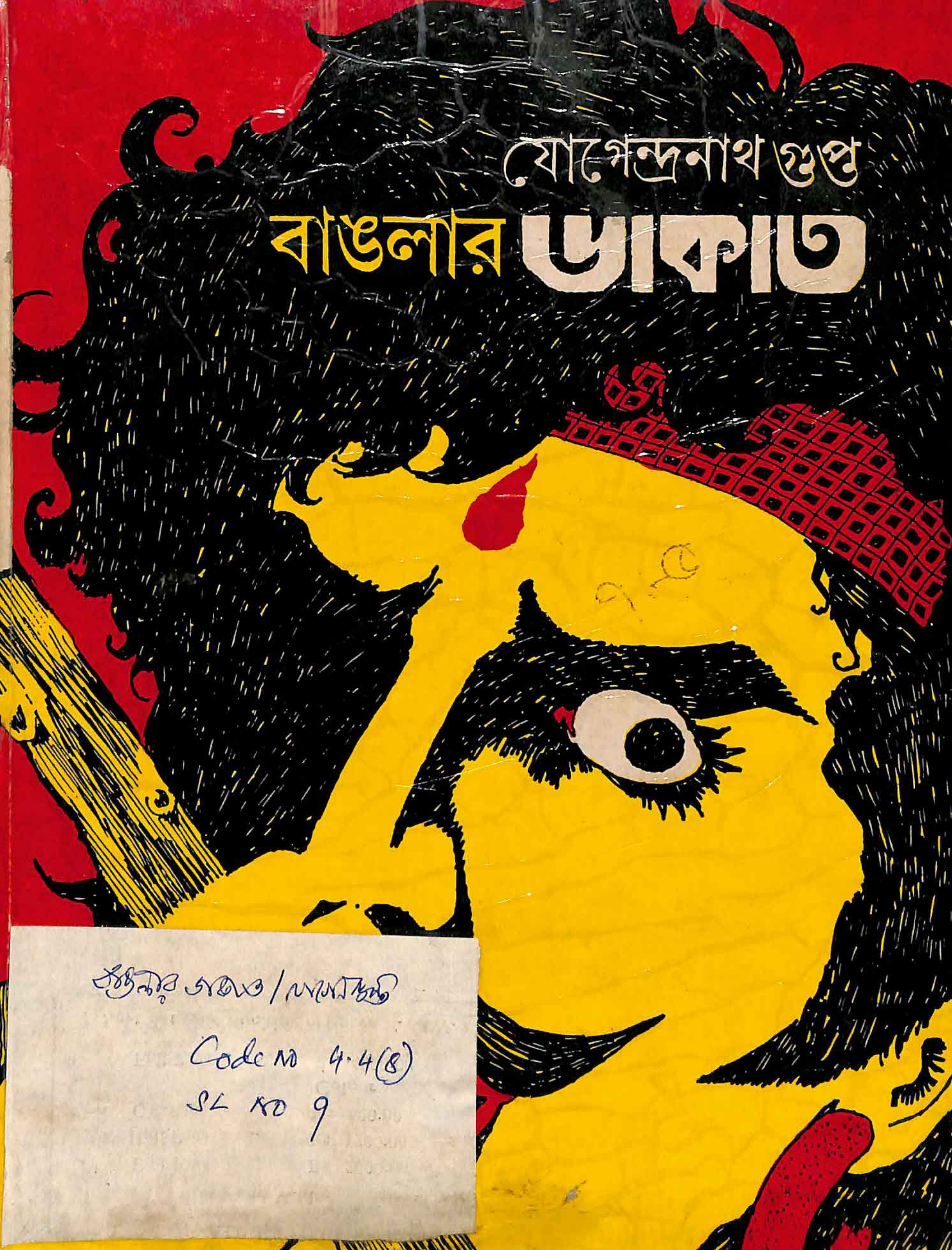
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার ডাকাত



বাঙলার ডাকাত / যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
Code No 4.4(8)
SL No 9

কাহিনী সংগ্রহের সূত্রঃ

'The vigorous administration of Mr. Blaquire, first as Magistrate of Nadia, and later as Superintendent (or Inspector General) of Police had the effect of practically ridding the districts of dacoits by the end of the first decade of the nineteenth century.'

—Bengal District Gazetteers, Nadia, Page-120

'........a very celebrated Brahmin dacoit named Ram Thakur who had lived in Calcutta for many years and committed dacoity in the neighbouring districts with perfect impunity.'

—Suppression of Dacoity, in Bengal Page-70

'The French settlement of Chandernagore is now swarming with dacoits driven from Calcutta, or the remnants of Mufassil gangs. From the French territory they sally out and commit depredations in neighbouring districts. They are perfectly safe because, having for the most part assumed false names. I can not call on the french authorities to deliver them up neither can any people follow them into the foreign territory to discover their places of concealment.'

—Suppression of Dacoity in Bengal, 1854

"আমি যখন মাদারীপুরে যাই, প্রথম বৎসর মাদারীপুরের খুন, জখম ইত্যাদি নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপনের কার্যে অতিবাহিত করি। (কবি নবীন চন্দ্র সেন তখন মাদারীপুর জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।) একদিন শিবচর থানার দারোগা আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার এলাকার একজন নমঃশূদ্র ডাকাত কুমড়া বিক্রয়ের ছলে বরিশাল যায়। সেই দল ফিরিয়া আসিয়াছে। এদিকে খবর আসিয়াছে যে, একজন ধনী মহাজন চরে সোনা কাপড় ইত্যাদি বিক্রয় করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আমি বলিলাম—ঐ দলের একজনকে ধরে নিয়ে এস। দারোগা লোকটিকে ধরিয়া আনিল। তাহার ভীষণ মূর্তি, স্থূল বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, চক্ষু দুইটি কোটরস্থ ও রক্তবর্ণ। শরীরের মাংসপেশী ফাটিয়া পড়িতেছে। তাহাকে দেখিলে ভয় হয়। সে ছুটিয়া আসিয়া হাকিমকে বলিল—"তুমি আমার ধর্মবাবা, আমাকে ছেড়ে দাও, সব বলব।' "

—(আমার জীবন—কবি নবীনচন্দ্র সেন)

[উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবিভক্ত বাঙলার কয়েকটি জেলায় ডাকাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন্ কোন্ জেলায় কতগুলি ডাকাতি হইয়াছিল আমরা তাহার একটি তালিকা দিলাম ; তাহা হইতে ডাকাতদের দৌরাত্ম্য যে কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখানে কেবল হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও যশোহর জেলার ডাকাতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।]

	খ্রীঃ ১৮৫৬	১৮৫৭	১৮৫৮	১৮৬০
হুগলী	৪১	৩০	২৭	২৫
মুর্শিদাবাদ	৬৫	৫০	২৯	২৫
বীরভূম	৩১	১৯	৫১	৩৩
যশোহর	৬২	—	—	—

ঐ সময়ে মধ্যবঙ্গেও ডাকাতি হইত বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কম।

[ইংরেজী ১৮৫৮ সালে ডাকাত দমনের নিমিত্ত পুলিশের ডাকাতিদমন বিভাগ খোলা হইয়াছিল। সেই সময়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দারোগা ডাকাতদের ধরিত। যাহাদের চেহারা বেশ বলিষ্ঠ তাহাদের দেখিলেই ডাকাত বলিয়া সন্দেহ করিয়া পুলিশেরা ধরিত এবং চালান দিত।

—লেখক কর্তৃক সংগৃহীত



যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

জন্ম ১৮৮২ মৃত্যু ১৯৬৪

১৮৮২ সালে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাংলাদেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে কিছু কাল অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থেকে পরবর্তী জীবনে নিজেকে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত করেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে বিক্রমপুরের ইতিহাস রচনা যোগেন্দ্রনাথের এক অসামান্য কীর্তি।

কেদারনাথ রায়, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বঙ্গের মহিলা কবি প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিশুভারতী নামক কোষগ্রন্থের সম্পাদনা তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। কৈশোরক মাসিক পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর গবেষণামূলক অবদান স্মরণীয়।

ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সরস গল্প রচনার ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম **পথিকৃৎ**। 'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবা ফুল, মুখে হা-রে-রে-রে পিলে চমকানো ডাক'—তারাই বাঙলার ডাকাত। বাঙলার ডাকাত—এই ক্লাসিক গ্রন্থটি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখনীপ্রসূত।

'বাঙলার ডাকাত'-এর কাহিনীগুলি একসময়ে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দলিলপত্র, কিংবদন্তী, ইতিবৃত্তর উপর ভিত্তি করে যোগেন্দ্রনাথ বাংলার এই দুর্ধর্ষ মানুষগুলির কাহিনী রচনা করেছিলেন। এই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী অতীত দিনের বাংলা তথা বাংলার সমাজচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাঙলার ডাকাত

অখন্ড সংস্করণ

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

West Bengal
Library
B. C. Road

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯



প্রকাশক : রবীন বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯
প্রথম অখণ্ড সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৮৮
প্রচ্ছদ : গৌতম রায়
মূল্য : ২৫ টাকা
মুদ্রাকর : ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও
১৮৫/১ বি, বি· বি· গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

14.1.2011
14428

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুনন্দা দাশগুপ্তা, এম· এ·
চিরায়ুষ্মতীষু,

তুই যখনরে ছোট ছিলি নিতি সাঁজের বেলা,
আমার একটি কাজ ছিল মা, তোরে গল্প বলা।
আষাঢ় মাসে বাদল দিনে মেঘের গরজনে,
বসতি তোরা ভাই বোনেরা মিলি ঘরের কোণে।
'বাবা একটা গল্প বলো' হুকুম করতি সবে,
আমি হতাম দিশেহারা পেতাম না কিছু ভেবে।
ছুটে এসে বলতি তখন আমায় আদর করি—
কেহ কোলে বসে আর কেহ বা গলায় ধরি।
'ডাকাতদের গল্প বলো যাদের হাতে হাতিয়ার,
হা-রে-রে-রে করে ছোটে কত বন নদীর পার।
তে-মহলা বাড়ী লোটে, নাইকো তাদের ডর,
কালিমাখা ঝাঁকড়া চুলেতে দেখায় ভয়ঙ্কর।
তাই তো আজ এনেছি ধরি 'বাঙলার ডাকাতে'
আশিসবাণী সাথে দিলাম তোরই কোমল হাতে।
— বাবা

প্রকাশকের নিবেদন

ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সরস গল্প রচনায় পথিকৃৎ যোগেন্দ্রনাথ অনেক বছর আগে শিশুসাথী পত্রিকায় ছোটদের জন্য ডাকাতের গল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন। সেই গল্পগুলি থেকে পনেরটি গল্প বেছে নিয়ে বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স বাঙলার ডাকাত-১ম খন্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খন্ডের ভূমিকায় লেখক লিখেছিলেন,

'প্রত্যেক দেশে সেই অতি আদি যুগ হইতেই ডাকাতের কাহিনী আমরা পাই। মহাকবি বাল্মীকিও ছিলেন নরঘাতক—পরে হইলেন ঋষি বাল্মীকি—রচনা করিলেন রামায়ণ—রামচরিত্রের পুণ্য অবদান। মহাভারতে পুরাণে ডাকাতের যে কত গল্প আছে, পড়িলেই জানিতে পারিবে। বৌদ্ধজাতকেও পাইবে অনেক দস্যু-ডাকাতের কথা। ইতিহাসে পাইবে বড় বড় দস্যুদের ইতিকথা, তাঁহারা ছিলেন নৃপতি ও সম্রাট। ইংলণ্ডের রবিন হুডের গল্প অনেকেই শুনিয়াছ।

বাংলাদেশে দস্যু-ডাকাতের অভাব সেকালেও ছিল না, একালেও নাই। বাংলার বড় বড় জমিদারদের পূর্বপুরুষ যে ডাকাত ছিলেন সে-কথার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। নূতন করিয়া তোমাদের কাছে আর কি বলিব সে-কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার লেখা অনেক উপন্যাসেই সে পরিচয় দিয়াছেন।

আমার এ 'বাঙলার ডাকাত'-এর গল্পগুলি বাংলা সরকারের দপ্তরখানার পুরানো কাগজপত্র, সেকালের সংবাদপত্র ও ইতিহাস হইতে সংগৃহীত, কাল্পনিক কোন গল্প নাই। সত্য যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিত সে-কথাই আমি বলিয়াছি। আমার লেখা যে-গল্প কয়টি এ বইতে আছে তাহার ভিতর অনেক রকমের ডাকাতের কাহিনীই পাইবে। জমিদার ডাকাতের কাহিনীও পাইবে, আবার ধর্মের নামে যে কত কি নৃশংস কাণ্ড ঘটিত তাহাও জানিতে পারিবে।

ডাকাতদের মধ্যেও ভালমন্দ দু-ই ছিল। এমন ডাকাতও ছিল যাহারা ধনীর টাকা লুটিয়া গরীবদের সাহায্যই করিত। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হইতে গরীব প্রজাদের রক্ষা করিবার জন্য যে প্রথম হাতিয়ার ধরিয়াছিল সে ছিল ডাকাত বিশ্বনাথবাবু।

সেদিন একখানি বিদেশী ছোটদের মাসিকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—ছেলেমেয়েরা কি রকম গল্প পড়িতে ভালবাসে ? শতকরা নব্বুইজন উত্তর দিয়াছিল—ডাকাতের গল্প, ভূতের গল্প, রূপকথা। তারপর ছিল সাহিত্য, বিজ্ঞান, জীবজন্তু, ভ্রমণ ও অন্যান্য কথা।

ছোটদের বিখ্যাত মাসিক 'শিশুসাথী'তে আমি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মাসে মাসে লিখিতেছি বাংলার ডাকাতের কথা—তাহারই কয়েকটি এখানে প্রকাশ করা হইল। আমি জানি তোমাদের গল্পগুলি ভালই লাগিবে।' ইতি— যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত *কলিকাতা, ২৮শে আষাঢ়, মহালয়া, ১৩৫৮*

এই প্রথম খণ্ডের ভূমিকা থেকেই আমরা ডাকাত কাহিনীগুলির সংগ্রহ সূত্র জানতে পারি—জানতে পারি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা। প্রথম খন্ড অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করায় প্রথম খণ্ডের কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খণ্ড। বাঙলার ডাকাত ২য় খণ্ডের ভূমিকাও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখনাপ্রসূত। যে ভূমিকায় ডাকাত কাহিনীগুলির জনপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'একমাসের জন্য কোন কারণে 'শিশুসাথী'-তে উহার প্রকাশ বন্ধ থাকিলে সম্পাদক মহাশয় তাগাদার পর তাগাদা দিয়া আমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন।'

বাঙলার ডাকাত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দীর্ঘকাল ধরে বাঙলার ছেলেমেয়েদের অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ করে রাখলেও অনিয়মিত প্রকাশের জন্য একালের ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকাত-কাহিনীগুলির রস অজানাই ছিল। আমাদের প্রকাশন বিভাগ দুটি খণ্ডই নতুন সাজে আবার প্রকাশ করে। বাঙলার ছেলেমেয়েরা হইহই করে ছুটে এল। দীর্ঘকাল পরে বাঙলার ডাকাত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের নতুন সংস্করণের চাহিদা দেখে খোঁজ পড়ল যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ডাকাত-কাহিনীগুলির। খোঁজাখুঁজি শুরু হল পুরনো পত্র-পত্রিকার। আয়োজন শুরু হল নতুন খন্ড প্রকাশের। এবারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন লেখকপুত্র সুধাংশু গুপ্ত। বস্তুত তাঁরই প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে বাঙলার ডাকাত ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখকপুত্র সুধাংশু গুপ্ত লিখেছিলেন, 'কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধব আমাকে অনেকদিন থেকে বলছিলেন যে, যোগেনদা'র তো আরও অনেক ডাকাতের গল্প আছে—ওগুলো সংগ্রহ করে তৃতীয় খন্ড প্রকাশ করুন না। প্রধানত এঁদের আগ্রহে এবং ছোটদের এ জাতীয় গল্প পাঠের উৎসাহে বাঙলার ডাকাত তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হল। আমি স্বর্গত পিতৃদেবের পুর্বোক্ত দু'খন্ডের মতো ইতস্তত ছড়ানো ছোটদের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি পুস্তকাকারে নির্বাচন করে দিয়েছি।

বস্তুত নতুন খণ্ড প্রকাশের সূত্রে যা গল্প পাওয়া যায় তাতে একটি নয়—দুটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থইপ্রকাশিত হতে পারে। তাই তৃতীয় খন্ডের অনতিবিলম্ব পরেই প্রকাশিত হয় চতুর্থ খণ্ড।

এই চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা লেখার দায়িত্ব পড়েছিল বর্তমান অখন্ড সংস্করণের ভূমিকা লেখকের উপরেই। 'বাঙলার ডাকাত'-এর কাহিনীগুলি সম্পর্কে নতুন করে তখন আর কিছুই বলার ছিল না। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতেই যোগেন্দ্রনাথ কাহিনীগুলির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের গল্পগুলি তারই ধারাবাহিক কাহিনী মাত্র। শুধু তাই-ই নয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন খণ্ডের প্রকাশিত সমালোচনার ফলে গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও গ্রন্থের বিষয়বস্তু আজ আর কারোর অজানা নয়।

অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশকের নিবেদনে আমি শুধুমাত্র প্রতিটি খণ্ডের ভূমিকার সংযোগ করেছি। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তবে তাঁর পুত্র সুধাংশু গুপ্তের সঙ্গে দীর্ঘকাল একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যতীত পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংকলনের ব্যাপারে লেখক পুত্রকে সাহায্য করেছেন ভূতপূর্ব শিশুসাথী পত্রিকার সম্পাদক দিনেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

আশাকরি 'বাঙলার ডাকাত' এর ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের মতোই অখণ্ড সংস্করণ সমাদর পাবে।

সূচীপত্র



১

তর্কপঞ্চাননের ডাকাত ধরা

॥ এক ॥

কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন বর্দ্ধমান জেলার মানকরের কাছাকাছি একটি গ্রামে বাস করিতেন। সেই গ্রামের নাম পলাশবাড়ি। সেখানে চাষা, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, বাগদী ও কায়স্থদের ছিল বাস। বেশ সমৃদ্ধ পল্লী ; হাটবাজার, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী সবই ছিল। হাটে ও বাজারে নানা জিনিসপত্রের আমদানি হইত। গ্রামের চারিদিক বেড়িয়া খাল—দূরে দামোদরের একটা বাঁক। তখন রেলগাড়ী ঐ দিকে যায় নাই। গ্রামের উত্তর ও পূর্বদিকে দিগন্ত-প্রসারিত বিশাল প্রান্তর।

কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন সে গ্রামের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। দেশ-বিদেশ হইতে তাঁহার যেমন নিমন্ত্রণ-পত্র আসিত, তেমনি ক্ষেত-খামার, দীঘি পুষ্করিণী, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, ও তালের বাগান বা তালের বনেরও তিনি ছিলেন অধিকারী। সেই বনের পাশে ছিল একটা বিরাট দীঘি। দীঘির নাম কৃষ্ণা দীঘি। কালীকান্তের পিতা কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি মহাশয় গ্রামের জলকষ্ট দেখিয়া একবার দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া যে-অর্থ ও তৈজসপত্র লাভ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় ব্যয় করিয়া এই দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। দীঘির গভীর কালো জল ছিল সুপেয়। গ্রামবাসী নারী-পুরুষ ছাড়াও দূর গ্রাম হইতে লোক আসিয়া এই দীঘির জল কলসী ভরিয়া লইয়া যাইত। দীঘিব নাম দেওয়া হইয়াছিল কৃষ্ণ দীঘি—লোকের মুখে মুখে হইয়াছে কৃষ্ণা দীঘি। এই দীঘির উত্তর-পাড়ে মাঠের ধারে একদল বাগদী বাস করিত। তর্কপঞ্চাননের বাড়ির উত্তরে যে মাঠ—সেই মাঠ যোজন-বিস্তৃত। সেই মাঠে প্রায়ই হইত ডাকাতি ও রাহাজানি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিশাল বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটি মাত্র তালগাছ ছিল। সেই তালগাছের কাছে ছিল আর একটি দীঘি। এই দীঘির নাম ছিল ডাকাতের দীঘি। ডাকাতেরা সেই পথে কোন গ্রামের যাত্রীকে পাইলে তাহাকে মারিয়া ঐ দীঘিতে ফেলিয়া দিত এবং তাহার সর্বস্ব লুঠিয়া নিত।

ঐ যে বাগদীদের কথা বলিলাম, তাহারাও ছিল ডাকাত। তারা গ্রামে কোন চুরি ডাকাতি বা রাহাজানি করিত না তর্কপঞ্চাননের ভয়ে। বাগদীদের সর্দার নিতাইকে তিনি প্রতিদিন সকালে হাঁক-ডাক দিয়া তাহার গতিবিধির সন্ধান লইতেন—কি রে নিতাই, বাড়ি ছিলি ত ?

নিতাই উত্তর দিত—হাঁ দেবতা।

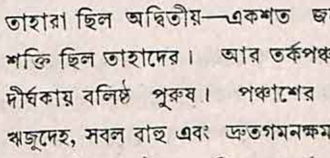
তর্কপঞ্চানন বলিতেন—ওরে চুরি ডাকাতি করে কারও পেট ভরে না! চাষবাস কর। আর ও সব করিস নে। একদিন ধ
পড়বি। এ কোম্পানীর আমল।

নিতাই করজোড়ে বলিত—আজ্ঞে, সে-সব জানি, বুঝিও ত
তবে শয়তানটা যে রাত দুপুরে জাগিয়ে তোলে!

তর্কপঞ্চানন নিতাইয়ের উত্তরে হাসিতেন মাত্র! এই নিত
কিন্তু মনে মনে ছিল তর্কপঞ্চাননের ভীষণ শত্রু।

পলাশবাড়ি হইতে চারি ক্রোশ দূরে ছিল থানা। থানার দারো
ছিলেন পূর্ববঙ্গের একজন নামকরা পুলিশ কর্মচারী। ডাকাতে
তাঁহার দাপটে ভয়ে ভয়ে থাকিত। তিনি সদরে লিখিয়া প্র
পঞ্চাশজন সেপাই-সান্ত্রী পুলিশ রাখিয়াছিলেন তাঁহার থানায়
তিনি প্রতিদিন একবার করিয়া ডাকাতদের ডাকাইয়া আনিয়া শাস
করিতেন। ডাকাতেরা জানিত ইহার মূলে আছেন স্বয়ং তর্কপঞ্চানন
মাঝে মাঝে দারোগা রামসদয় ভট্টাচার্য তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাড়িতে
আসিতেন এবং সব বিষয়ের সন্ধান লইতেন। এজন্য ডাকাতে
তর্কপঞ্চাননকে বড় ভাল চক্ষে দেখিত না।

লোকে বলিত তর্কপঞ্চাননের ঘড়া ঘড়া টাকা। ডাকাতেরা সুযো
খুঁজিত কখন তর্কপঞ্চানন বিদেশে শিষ্য-বাড়িতে যান। নিত
সর্দার বাইরের ডাকাতদের সে-সংবাদ দিত। কিন্তু কোন বা
সুযোগ পাওয়া যাইত না। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও তাহা জানিতে
এজন্য কোথাও যাইবার সময় সঙ্গে নিতেন চারিজন ছাত্র অ
কানাই ও বলাই নামে দুইজন গোয়ালা মল্ল। কানাই ও বল
ছিল বলিষ্ঠ জোয়ান মানুষ। লাঠি ধরিতে তলোয়ার খেলি
তাহারা ছিল অদ্বিতীয়—একশত জন ডাকাত-দস্যুকে ঠেকাই
শক্তি ছিল তাহাদের। আর তর্কপঞ্চানন মহাশয় নিজেও ছি
দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। পঞ্চাশের উপর বয়স হইলেও তাঁ
ঋজুদেহ, সবল বাহু এবং দ্রুতগমনক্ষম পদযুগল, দিব্য গৌরকা
চন্দনচর্চিত ললাট প্রভৃতি ও সতর্ক গতিবিধির জন্য কেহ তাঁহা
আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। তিনি যে শুধু শাস্ত্র-ব্যবস
করিতেন তাহা নহে—লাঠি ধরিতে এবং তরোয়াল খেলিতেও ছি
দক্ষ। কিন্তু গোপনে গোপনে ডাকাতদল পরামর্শ করিয়াছিল : য
আর বাঁচি, একদিন তর্কপঞ্চাননের বাড়িতে ডাকাতি করিতেই হইব
আশ্চর্যের বিষয় সেই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল নিতাই সর্দার।



॥ দুই ॥

সেবার তর্কপঞ্চানন মহাশয় নবদ্বীপ গিয়াছেন। নিতাই
বাড়িতে হইল ডাকাতদের বৈঠক। বৈঠকে স্থির হইল অমাব
রাত্রিতে তর্কপঞ্চাননের বাড়িতে হানা দিতে হইবে। ভিনগাঁ
ডাকাতেরাও সেই কথায় সায় দিল।

শ্রাবণ মাস। মাঝে মাঝে বজ্র-নিনাদ হইতেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঝম্‌ঝম্ শব্দ রাত্রিতে ঝড়-বাদল হইতেছে। এমন সময় ডাকাতেরা পূর্ব পরামর্শ মত তর্কপঞ্চাননের বাড়ি ঘিরিয়া ফেলিল। ডাকাতেরা ঝড়-বাদলের দিনে সুযোগ বুঝিয়া চুপি চুপি পা ফেলিয়া আসিলেও জল-কাদার জন্য তাহাদের পায়ের ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ হইতেছিল।

এদিকে পাকা ঘরের মধ্যে একখানা বড় তক্তপোষের উপর তর্কপঞ্চানন মহাশয় শুইয়া আছেন। মেজেতে তাঁহার স্ত্রী জগদম্বা দেবী বসিয়া গল্প করিতেছেন। ডাকাতেরা জানিতে পারে নাই যে, সে-দিন সন্ধ্যার আগে তর্কপঞ্চানন মহাশয় নবদ্বীপ হইতে বাড়ি ফিরিয়াছেন। কাজেই নিরাপদ মনে করিয়া সেই ভীষণ দুর্যোগের দিনে তাহারা ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল।

জগদম্বা বলিলেন—শুনছো? বাইরে মানুষ এসেছে।

তর্কপঞ্চানন উত্তর দিলেন—এ দুর্যোগে কি মানুষ বেরুতে পারে?

ব্রাহ্মণী বলিলেন—ঐ শোন শব্দ।

তর্কপঞ্চানন বলিলেন—ও শব্দ গরুর পায়ের।

গরুর চার পা, তার পা ফেলার শব্দ আর মানুষের পা ফেলার শব্দ কি বুঝতে পার না?—এই কথা বলিয়া জগদম্বা দেবী একটা হাঁড়ি উপুড় করিয়া তাহার ভিতর ঘরের প্রদীপটি লুকাইয়া রাখিলেন, তারপর তর্কপঞ্চাননকে বলিলেন—উঠে বসো। লাঠিটা আর সড়কিটা হাতে নাও।

এইবার তর্কপঞ্চানন মহাশয় বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণীর অনুমান অসত্য নয়। তিনি একটা জানালার পাশে আসিয়া উহা একটু ফাঁক করিয়া দেখিলেন—বাইরে অনেক লোক, সকলের হাতেই রকমারি হাতিয়ার। একবার বিদ্যুতের চমকানিতে দেখিতে পাইলেন—তাঁহার প্রজা নিতাই বাগদী দস্যুদের অগ্রণী হইয়া পথ দেখাইতেছে। বিকট চেহারা ডাকাতদের। মাথায় ঝাঁকড়া চুল বাহিয়া বৃষ্টির জল ঝরিয়া পড়িতেছে। সকলের হাতে লাঠি, সড়কি কিংবা তরোয়াল।

জগদম্বা দেখিতে পাইলেন, জানালার নিচে একদল লোক সিঁধ কাটিতেছে—ভিতর হইতে ঢালুভাবে ও পরিমাণে বৃহৎ; আর দুই চারিখানি ইট খসাইলেই পথ পরিষ্কার হয়। জগদম্বা দেবী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া চুপি চুপি স্বামীকে বলিলেন—একদিকে সিঁধেল চোর আর একদিকে ডাকাত। আর রক্ষে নেই। বল ত কি করি?

তর্কপঞ্চানন বলিলেন—'চুপ কর। দেখে নেব কেমন ডাকাত।'

এদিকে তিনি শক্ত করিয়া মালকোচা মারিয়া কাপড় পরিলেন পৈতাটা মালার মত করিয়া গলায় দিলেন এবং ব্রাহ্মণীকে বলিলেন: দেখ ব্রাহ্মণী, ভয় নেই। তুমি কাপড় কোমরে বেঁধে এস। যেমন সিঁধেল চোরেরা ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করবে, তেমনি ঐ পাঁঠা বলির খাঁড়া দিয়ে দিবে মায়ের নামে বলি। আমি সদর দরজায় আছি। জয় মা কালী!

ব্রাহ্মণী বলিলেন—কানাই-বলাইকে কি করে খবর দিই বল ত?

তর্কপঞ্চানন বলিলেন—দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি।

এদিকে ডাকাতেরা তিন-চারি জন আসিয়া সদর দরজায় হুড়মুড় করিয়া ধাক্কা দিতেছে—দরজা খোল, নইলে কেউ প্রাণে বাঁচবে না।

তর্কপঞ্চানন ভিতর হইতে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—নিতাই, তোরই একদিন কি আমারই একদিন—দাঁড়া, এক পা নড়বি না। আমি খুলে দিচ্ছি দরজা। এ-তল্লাটে কে এমন ডাকাত আছে যে তর্কপঞ্চাননের বাড়ি ডাকাতি করে? দেখি তোদের কার কয়টা মাথা।

নিতাই ত তর্কপঞ্চাননের হুঙ্কার শুনিয়া অস্থির।

উত্তর হইল একসঙ্গে ভীষণ হা-রে-রে-রে শব্দে। একদল ডাকাত 'জয় মা কালী' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। সে চেঁচানিতে কানাই ও বলাই সর্দার এবং ছাত্রের দলও সজাগ হইয়া বাড়ির দিকে ছুটিয়া আসিল। সেকালে গ্রামের লোকেরা দস্যু-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লাঠি খেলিতে, তরোয়াল চালাইতে এবং সর্বপ্রকার হাতিয়ার ধরিতে জানিত। নতুবা সেকালে গ্রামে বাস করা কঠিন ছিল।

একদিকে কানাই-বলাই, আর একদিকে ডাকাতের দল। বৃষ্টির ও ঝড়ের বেগ তখন অনেকটা কমিয়াছে। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়াছে।

দুড়ুম দুড়ুম রবে আরম্ভ হইল দালানের দরজায় ধাক্কা। নিতাই বাগদী চিৎকার করিয়া কহিল—ঠাকুর এবার তোমার মাথা নিয়ে তবে ছাড়ব। দেখি কে তোমায় বাঁচায়!

: বেইমান, তোর এত বড় সাহস! এত বড় নিমকহারাম তুই!—এই বলিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় নিজে দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন এবং উঠানে নামিয়াই বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন নিতাইয়ের উপর।



নিতাইয়ের মাথার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া এমন টান দিলেন এবং দমাদম্ করিয়া তাহার বুকে পিঠে অনবরত এমন ভাবে লাঠির আঘাত করিতে

লাগিলেন যে, নিতাই প্রথমটায় একেবারে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, পরে সে অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তর্কপঞ্চাননকে জড়াইয়া ধরিল। দুইজনে আরম্ভ হইল লাঠালাঠি জাপ্‌টাজাপ্‌টি।

ওদিকে কানাই ও বলাই লাফ দিয়া আসিল উঠানের উপর। ছাত্রদের ও কানাই-বলাইয়ের অদ্ভুত পরাক্রমে ডাকাতেরা প্রমাদ গণিল। বলাইয়ের ও কানাইয়ের লাঠির ঘায়ে কোন ডাকাতের পা ভাঙিল, কাহারও হাত ভাঙিল, কেহ পলাইয়া গেল। চারিদিকে ডাকাতদের এবং কানাই-বলাই ও শিষ্যদের চিৎকারে হৈ-হৈ কাণ্ড বাধিয়া গেল।

এদিকে অসাধারণ শক্তিশালী তর্কপঞ্চাননের আক্রমণে নিতাই বার বার করুণ কণ্ঠে বলিতেছিল—ঠাকুরমশাই, ছেড়ে দিন। আর ডাকাতি করব না।

কানাই ঠাকুরমহাশয়ের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। নিতাইয়ের দল নিতাইকে তর্কপঞ্চাননের কবল হইতে ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কানাই ও শিষ্যদের আক্রমণে তাহারা যে যেদিকে পারে পলাইতে আরম্ভ করিল।

অন্যদিকে জগদম্বা ঠাকরুণ, যেমন একটা চোর সিঁধের ভিতর দিয়া পা বাড়াইল, অমনি খড়্গ দিয়া দিলেন এক কোপ। তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্য চোরেরা তাহাকে ফেলিয়াই ভয়ে ভয়ে ছুটিয়া পলাইল।

বাহিরের গোলমাল শুনিয়া জগদম্বা দেবী প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন তর্কপঞ্চাননকে ডাকাতেরা আক্রমণ করিয়াছে। তখন তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—খাঁড়া হাতে করিয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিলেন এবং ডাকাতদের যাহাকে পাইলেন তাহাকেই আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই শক্তিশালিনী নারীকে আলুলায়িত কেশে ও বিস্রস্ত বেশে দেখাইতেছিল রণরঙ্গিনী কালিকার মত।

পরস্পর জাপ্‌টাজাপটি ও আঘাতের পর আঘাতে নিতাই ও তর্কপঞ্চানন উভয়ে অচৈতন্য-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রভাত হইলে গ্রামের লোকেরা দেখিল, কয়েকজন ডাকাত ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে। বাড়ির চারিদিক রক্তে রঞ্জিত। বাড়ির ভিতর একটা পা-কাটা চোর পড়িয়া আছে।

সকলে মিলিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে ধরাধরি করিয়া ঘরে লইয়া গেল এবং তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহারা নিতাই ও অন্যান্য ডাকাতদের শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বাহিরের ঘরে রাখিয়া দিল।

থানায় খবর দিলে রামসদয় দারোগা সদলবলে তর্কপঞ্চাননের বাড়ি আসিলেন। দারোগাবাবু সব দেখিয়া শুনিয়া ডাকাতদের চালান দিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। দারোগাবাবু তাঁহার মুখে সব কথা শুনিয়া কহিলেন : তর্কপঞ্চানন মহাশয়, আপনি শুধু পণ্ডিতই নন, রণ-পণ্ডিতও বটেন! ধন্য আপনি!

বিচারে চোর ও ডাকাতদের গুরুতর দণ্ড হইল। সেকালে সেই অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত তর্কপঞ্চাননের ডাকাত ধরার এই সত্য কাহিনী। এই ঘটনার পর ঐ গ্রামে আর ডাকাতি হয় নাই।



২

ডাকাত বাবা

॥ এক ॥

হুগলী জেলার ডুমুরদহ গ্রামের পাশে একটি খাল। প্রায় একশত বছর আগে খালটি যেমন ছিল প্রশস্ত, তেমনি উহাতে ছিল গভীর জল। এই খাল দিয়া সেকালে বড় বড় মহাজনী নৌকা ও বজরা চলাফেরা করিত। আর সে-সময়ে ডাকাত দল রাত্রি হইলেই ওই পথে ডাকাতি করিতে বাহির হইত। গঙ্গার বুক দিয়া ও ঐ খালের পথে যাত্রীদের যাতায়াত ছিল বিপজ্জনক। প্রায়ই ডাকাতি হইত। খালটির নাম ছিল কামারডেঙ্গির খাল। ডুমুরদহ হইতে এই খালের পারে পারে যে সব গ্রাম আছে, সে-সময়ে ঐ দিকে—কি জলপথে কি স্থল-পথে নির্বিঘ্নে যাতায়াতের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল।

পূজার সময় দুরাত্মা ডাকাতদের নিষ্ঠুরতা বাড়িয়া যাইত। প্রতিদিন নানা স্থানে শতশত নরহত্যা হইত। খাল ও গঙ্গার স্রোতে রক্তজবার মত রক্তের ধারা বহিত। এইসব ডাকাতদলে যে শুধু নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, পশ্চিম দেশীয় লোক, কৈবর্ত ও বাগদীরাই ছিল, তাহা নয়, ভদ্রলোকও থাকিতেন। ভাগীরথী তীরে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া, ডুমুরদহ এবং শান্তিপুর অঞ্চলেই বেশী ডাকাতি হইত। এমন কি জমিদারেরা ও ভদ্রসমাজে পদস্থ অর্থাৎ 'বাবু ভদ্রলোকরা'ও ডাকাতদলের সর্দার ছিলেন এবং ডাকাতদের সহিত অত্যাচারে যোগ দিতেন। রাত্রিতে কেহ ঐসব স্থান দিয়া বিশেষভাবে শান্তিপুরের ধার দিয়া যাইতে সাহস করিত না।

শান্তিপুরের বিখ্যাত ডাকাত ছিলেন দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষ। ইঁহারা ভদ্রসন্তান, ধনী, কিন্তু দুই ভাই-ই ছিলেন বিখ্যাত দস্যু। বাহিরে দুই ভাইয়ের ভদ্র ব্যবহার, শিষ্টাচার, আদর-আপ্যায়ন, অতিথি-সেবা ও ঠাকুর-সেবা দেখিয়া লোকে মনেও করতে পারিত না তাঁহারা নিষ্ঠুর, বর্বর ও অত্যাচারী ভীষণ দস্যু। দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষ দুইজনই ছিলেন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত পুরুষ। মাথায় সেকালের রীতি অনুযায়ী ছিল একরাশ ঝাঁকড়া চুল, গলায় সোনার মাদুলি, দুই বাহুতে সোনার বাজু, হাতে সোনার বালা। সাজসজ্জা ছিল সেকালের সম্ভ্রান্ত বিলাসী বাবুদের মত। দুই ভাইয়ের অত্যাচারে ঐ অঞ্চলের অর্থাৎ ভাগীরথীর দুই পারের অধিবাসীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

সেই যে কামারডেঙ্গির খালের কথা বলিয়াছি—সেই খাল দিয়া সেবার কোন এক জমিদার-বাড়ি ডাকাতি করিবার জন্য দুই ভাই চলিয়াছেন। প্রকাণ্ড বজরা। বজরা সুসজ্জিত। দূর হইতে দেখিলেই

লোকে চিনিতে পারিত—দেবী ঘোষের দল কাহারও সর্বনাশ করিতে চলিয়াছে। বজরার অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিত ছিপ নৌকা। সঙ্গী ডাকাতেরা হু-হু রবে ছিপ চালাইত।

বজরা কামারডেঙ্গির কাছে ভিড়ান হইল। ছিপ নৌকা খাল দিয়া চলিয়া গেল। ডাকাতি-শেষে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বজরায় উঠিবে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাঁশবনের আড়াল দিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। দুই ভাই বজরার ছাতে বসিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিতেছেন। অদূরে খালের মুখে ও কলনাদিনী গঙ্গায় জোয়ারের জল উচ্ছ্বসিত বেগে বহিয়া চলিয়াছে। খাল ও গঙ্গার সংযোগস্থলের কাছে একটি বাঁধান ঘাট। ঘাটের উপর ভাঙা একটা মন্দির। তাহার সম্মুখে বিরাট এক বটগাছ। বটের জট মাটিতে নামিয়া চারিদিকটা ঘোরালো করিয়া ফেলিয়াছে।

দেবী ঘোষ বজরার ছাত হইতে দেখিতে পাইলেন, একটি ষোল সতেরো বছরের মেয়ে বটের ছায়ায় ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে। বজরা হইতে ঘাট কাছাকাছি। বেশ স্পষ্ট সব দেখা যাইতেছে। দেবী ঘোষের কেমন কৌতূহল হইল। তিনি পারে নামিলেন এবং ধীরে ধীরে মেয়েটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন! কে গা তুমি এখানে বসে কাঁদছো? কি হয়েছে বল ত। কোন ভয় নেই, বল।

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেবী ঘোষ তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, মেয়েটি পরমা সুন্দরী। রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। সরলতা-মাখানো লাবণ্যময়ী এই কিশোরীর মুখ দেখিয়া দস্যু দেবী ঘোষের মনও যেন গলিয়া গেল। স্বাভাবিক কর্কশ স্বর একটু মোলায়েম করিয়া বলিলেন: তোমার কি কোন বিপদ হয়েছে? বল, কোন ভয় নেই, বল।

কিশোরী সহসা দেবী ঘোষের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল: বাবা, আমাকে আপনি রক্ষা করুন, আমাকে বাঁচান!

কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিতে লাগিল।

দেবী ঘোষ বলিলেন: তোমার কোন ভয় নেই। এসো, এই যে আমার বজরায় চল। আমি শুনব তোমার সব কথা। চল আমার সঙ্গে। কেঁদো না।

কিশোরী সচকিতভাবে ভয়ে ও বিস্ময়ে দেবী ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে বজরায় আসিল।

দেবীবাবু বলিলেন: এবার তুমি বল তোমার বিপদের কথা।



॥ দুই ॥

মেয়েটির নাম সুলোচনা। সুলোচনা বলিতে লাগিলেন—বাবা, পাশের গাঁয়ে আমার মামার বাড়ি। আমি কুলীনের মেয়ে। আমার বাবাও নেই মাও নেই। মামা-মামী আমাকে মানুষ করেছেন। মামা আমাকে আশি বছরের এক বুড়ো কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান এবং আজই বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। তাই আমি পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণে বোধ হয় আমাকে খোঁজার জন্য চারিদিকে লোক বেরিয়েছে।

নবীন ও দেবী হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন: বটে! হু, তারপর...বল:

সুলোচনা বলিতে লাগিল: সেই বামুনের চারটি বিয়ে। আমাকে কুলীনের হাতে বিয়ে না দিলে জাত যাবে, এজন্য মামা তাঁকে পাল্কী করে নিয়ে এসেছেন। আমার মার যা কিছু গয়না-গাঁটি টাকা-কড়ি ছিল, সব বেচে বুড়োর হাতে অনেক টাকা গুণে দিয়েছেন—সে প্রায় দু'তিন হাজার টাকা হবে। এই বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে আমার মরাই ভাল। তাই গঙ্গার জলে ডুবে মরতে এসেছিলাম।

: হুঁ। বলিয়া আবার দুই ভাই হুঙ্কার দিলেন—তারপর—

মেয়েটি একটু সলাজ হাসি হাসিয়া বলিল: বাবা!—

দেবী বলিলেন: বল। বাপের কাছে মেয়ের কি লজ্জা করা উচিত—বল, সব বল।

তখন মেয়েটি বলিতে লাগিল: মামার বাড়ি হ'তে দু' ক্রোশ দূরে বলরাম মুখুয্যের বাড়ি। মুখুয্যে মহাশয়ের ছোট ছেলে কলকাতা কলেজে পড়ে। সে মামার দূর-সম্পর্কে ভাই হয়। কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হবে, প্রায়ই আমাদের এখানে আসে। সে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তার বাবা ও আমার মামা এ-কথা জানতে পেরে আমার বিয়ে তাড়াতাড়ি দেবার জন্য এই বুড়ো বামুনকে নিয়ে এসেছে।

দেবী ঘোষ কহিলেন: বল ত মা, ছেলেটি কোথায় কোন গ্রামে আছে? জান সে গ্রাম?

সুলোচনা বলিল: হাঁ বাবা, জানি ওই খালের পারেই দু'ক্রোশ দূর হবে। গ্রামের নাম চৌগাছা।

: সে ছেলে তোমায় বিয়ে করতে কোন অমত করবে না ত?

সুলোচনা মাথা নিচু করিয়া বলিল: না বাবা!

দেবী ঘোষ সহর্ষে বলিলেন: উত্তম ...নবীন বাঁশী বাজাও।

নবীন বাঁশী বাজাইলেন। বাঁশী বাজাইবামাত্র একখানি ছিপ নৌকা তাড়াতাড়ি বজরার গায়ে আসিয়া লাগিল। ছিপ হইতে একটি বলিষ্ঠ যুবক বজরাতে উঠিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল; বলিল: কি আজ্ঞা?

দেবী ঘোষ কহিলেন: দেখ ব্রজনাথ! তুমি চৌগাছা গাঁয়ে যাবে। সে গাঁয়ে খালের পারে বলরাম মুখুয্যের বাড়ি। তারই ছোট ছেলে কৃষ্ণচন্দ্রকে এখুনি ধরে নিয়ে আসবে। পারবে?

: পারব। কেন পারব না কর্তা!

: কোন অত্যাচার করবে না।

: না, কর্তা!

দেবী ঘোষ সুলোচনার দিকে চাহিয়া কহিলেন: মা, তুমি লেখাপড়া জান? লিখতে পারবে চিঠি?

: হ্যাঁ বাবা!

: তবে কৃষ্ণচন্দ্রকে তোমার সব কথা লিখে জানাও। সে যেন এখুনি আমার লোকের সঙ্গে চলে আসে। কোন ভয় নেই। আচ্ছা, তার বাবা এখন কোথায় বলতে পার?

ঃ তিনি আমার মামার বাড়ি এসেছেন। ঘটকালি করে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছেন কিনা!

ঃ বেশ পত্র লেখ।

সুলোচনা পত্র লিখিয়া সব কথা কৃষ্ণচন্দ্রকে জানাইয়া দিল। এইবার দেবী ঘোষ কর্কশকণ্ঠে কহিলেন—দেখ মা, পুরুষেরা অনেক সময় মিথ্যে কথা বলে মেয়েদের ভুলায়। দেখ শেষটায় যদি ও গররাজি হয়···সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলেন।

সুলোচনা নির্ভীকভাবে কহিল ঃ বাবা, আপনার মেয়ে মিথ্যা কথা জানে না। উনি সত্যবাদী। পিছ-পা হবেন না।

দেবী ঘোষ কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—যদি না আসে, তবে তাকে জোর করে ধরে আনব?

সুলোচনা মৃদু হাসিয়া কহিল—তাই আনবেন?

ঃ ব্রজনাথ! তবে তুমি আর দেরী করো না। যাও সাবধানে কাজ করে আসবে। যদি আসতে না চায়, বাধা দেয় কোন মিথ্যা অজুহাত দেখায়, তবে তাকে জোর করে ধরে আনবে।

এই কথা বলিবার পর দুই ভাই দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষ হা-হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! সেকি বিকট হাসি! সে হাসিতে সুলোচনার বুক দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দেবী বলিলেন—দেখ মেয়ে, আজ রাত্রেই তোমার বিয়ে দেব। বর আসুক।

সুলোচনা হাসিল। ইহাদের ব্যবহারে সুলোচনা বুঝিতে পারে নাই যে, সে শান্তিপুরের বিখ্যাত ডাকাত দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষের বজরায় আসিয়াছে। সরলা কিশোরী মুক্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেমন করিয়া সে মামার বাড়ি হইতে কোন্ সুযোগে পালাইয়া আসিয়াছে, সব কথা বলিল।

দেবী ঘোষ পরম স্নেহের সহিত বলিলেন—ধন্যি মেয়ে তুমি! এমন সাহসই চাই। সাবাস্! বলিয়া পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন।

॥ তিন ॥

দেখিতে দেখিতে ব্রজনাথের ছিপ আসিয়া আবার বজরার পাশে ভিড়িল। সঙ্গে উঠিল কুড়ি বৎসরের একটি দীর্ঘকায় সুন্দর গৌরকান্তি যুবক। সেই শুভ্রকান্তি যুবকের গলার পৈতাটি ফুলের মালার মত শোভা পাইতেছিল। সে সুলোচনার পত্র পড়িয়া সব অবস্থা জানিয়া এক কাপড়ে চলিয়া আসিয়াছিল।

যুবক নৌকায় উঠিলে পর দেবী ও নবীন দুজনেই সুমিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন ঃ এস বাবাজি!

কৃষ্ণচন্দ্র নৌকায় উঠিয়া দেখিতে পাইল, সুলোচনা ঘোমটা দিয়া বজরার একটি ঘরে চুপচাপ বসিয়া আছে। দুজনেই দুইজনকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল! কৃষ্ণচন্দ্র নির্ভয় হইল।

দেবী ঘোষ হুকুম দিলেন ঃ বজরা শান্তিপুরের দিকে চালাও।

তখনই বজরা শান্তিপুরের দিকে চলিল। ডাকাত দুই ভাই এইবার দুইজনের কাছ হইতে সব কথা শুনিয়া লইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা মা, আজ রাত্রিতে কোন্ সময়ে তোমার বিয়ের লগ্ন ছিল?

ঃ আজ্ঞে, শেষ রাত্রিতে।

ঃ উত্তম।···ব্রজনাথ!

ঃ কি কর্তা!

ঃ তুমি তোমার ছিপ খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ে শান্তিপুর যাও। সেখানে গিয়ে বামুন, পুরুত, বাজনদার যৌতুকের জিনিসপত্র, অলংকার সব ঠিক করবে—আর আশেপাশের ছোট-বড় সকলকে নিমন্ত্রণ করবে। খুব ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবে। টাকার ভাবনা করো না। আমাদের নাম করো।

ব্রজনাথ তৎক্ষণাৎ 'যে আজ্ঞে' বলিয়া তাহার ছিপ নৌকা লইয়া রওনা হইয়া গেল।

সেদিন শেষরাত্রিতে দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষের বাড়ীতে নহবৎ বাজিল। শানাইয়ের সুরে সমস্ত বাড়ি ও পল্লী হইল উৎসব-মুখর। লোকজনের হৈ-হৈ রব। ভূরিভোজনে সকলে তৃপ্ত হইয়া গেল। মুখে মুখে ধন্য ধন্য রব। একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কার বিয়ে হলো ভাই?

উত্তর হইল ঃ দেবী ঘোষের মেয়ের।

সবিস্ময়ে বলিল সকলে—দেবী ঘোষের মেয়ে! আগে তো জানতুম না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে কেহই আর কোন কথা বলিল না। সকলেই একবাক্যে বলিল—যেমন কনে, তেমনি বর। যেন লক্ষ্মীনারায়ণ!

পরদিন দেবী ও নবীন মহা উৎসাহের সহিত বরকনেকে বিদায় করিলেন। জমিদারের মেয়ের মতো বিবিধ সাজসজ্জা ও যৌতুক-সামগ্রীতে দুইখানি বড় নৌকা ভরিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে লোক গেল, পাছে গ্রামের লোকজন ইহাদের অবহেলা করে।

বরকনের বিদায়ের সময় সত্য সত্যই অশ্রু-সজল নয়নে দেবী সুলোচনাকে বুকে টানিয়া লইয়া পরম স্নেহভরে বলিলেন ঃ জানিস্ আমি কে?

সুলোচনা সুমিষ্ঠ কণ্ঠে বলিল ঃ আমার বাবা! তাই মনে রাখব।

দেবী কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন ঃ বাবা, তোমাদের বিয়ে দিয়ে পরম শান্তি পেলাম। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন। জান আমি কে? আমাদের দুই ভাইয়ের পরিচয় জান?

কৃষ্ণচন্দ্র বলিল ঃ জানি। আপনি সুলোচনার বাবা, এই ত আপনার পরিচয়।

ঃ হা—হা—হা! পারলে না। আমরা দু'ভাই শান্তিপুরের দেবী ঘোষ আর নবীন ঘোষ, এ-বার বুঝলে?

সহসা বজ্রপাত হইলে যেমন মানুষ স্তম্ভিত হয়, তেমনি কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমটায় চমকিয়া উঠিয়াছিল; পরে নির্ভীককণ্ঠে সুলোচনাকে কহিল—এস এ-দিকে।

সুলোচনা পাশে আসিলে দুইজন নত হইয়া দেবী ঘোষকে ও

নবীনকে প্রণাম করিতে গেলে তাঁহারা দুই ভাই পিছাইয়া গেলেন, বলিলেন—এ কি? তোমরা বামুন! এই ত পুরস্কার পেলাম।

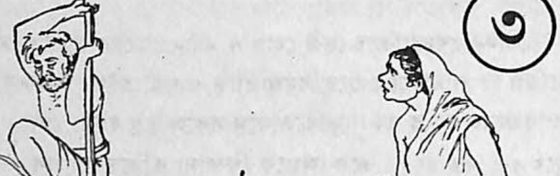
সুলোচনা কহিল—কে বলে আপনারা ডাকাত, আপনারা দেবতা! দেবতার কাছে কি জাত-বিচার আছে, বাবা?

কৃষ্ণচন্দ্র কহিলঃ আমরা কিন্তু বাবা ও কাকার সঙ্গে দেখা করতে আসব। মায়েদের দেখে যাব। কেমন?

দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—ওরে আসবি—আসবি! তোদের দেখলে আমাদের প্রাণ জুড়াবে। আসিস্। আমরা ভাল হব।

বলরাম মুখুয্যে বরবধূকে পরম সমাদরে গৃহে বরণ করিয়া লইলেন। তাহার কারণ বোধ হয়—যৌতুক-অলংকারের পরিমাণটা এবং ঘটনাটাও যে একটু বিচিত্র রকমের—তাহা চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিলেন।

দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষ ইহার পরে দস্যুবৃত্তি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।*



মহামায়া ঠাকরুণ ও চাঁদা ডাকাত

॥ এক ॥

সেকালে বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর গ্রামের রামধন বসু ছিলেন একজন ধনী ও সমৃদ্ধ লোক। তিনি বর্ধমান শহরে ওকালতি করিয়া প্রচুর টাকাকড়ি উপার্জন করিতেন। দেশেও ছিল তালুক-মুলুক। দুর্গাপুরে তাঁহার বাড়িও ছিল যেমন বড়, তেমনি সুরক্ষিত। বাড়িটি ছিল তিন-চারি মহলে বিভক্ত। সদর-বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ। তাহার সম্মুখের উঠানে খামার। খামারের পাশে বাগান। বাগান ও খামার এক সারি তিন চারিটি পাকা ছোট ছোট কুটিরের পশ্চাতে ছিল। অন্দর-বাড়ির উত্তর দিকে ছিল একখানি প্রকাণ্ড খড়ুয়া ঘর। পশ্চিমেও এইরূপ একখানি খড়ুয়া ঘর। সে-ঘরের পেছনে অনেকটা খালি জমি। তাহার পশ্চিম দিকে পাকা বাড়ি।

দক্ষিণ দিকের অর্ধেকটা জায়গা জুড়িয়া গোয়াল-বাড়ি ও গোলা-বাড়ি—তাহারই পাশে ঢেঁকিশালা ও রন্ধনশালা। উত্তরে প্রকাণ্ড খড়ুয়া ঘরের ছাঁচ ছিল খুব দীর্ঘ। সেই ছাঁচের নীচ দিয়া পশ্চিম সীমা পর্যন্ত ছিল লম্বা পাকা প্রাচীর। রামধন বসু মহাশয়ের মাতা মহামায়া বাড়িতে থাকিতেন। সেরেস্তার কর্মচারিরা বাহিরের দিকে দপ্তরখানায় কাজ করিতেন এবং নিজেরা রান্নাবান্না করিয়া বাহিরের কুঠুরিগুলিতে রাত্রি কাটাইতেন। দুইজন বাগদী বরকন্দাজ বাহিরের দিকে রাত্রিতে পাহারা দিত।

রামধনবাবু ছুটিছাটায় বাড়ি আসিতেন; পূজপার্বণ উপলক্ষে এক মাস—দেড় মাস বাড়ি থাকিতেন। সে-সময়ে গ্রামের লোকজন দিনরাত আসা যাওয়া করিত, বাড়ি গম্‌গম্ করিত। তারপর বাড়িঘর নীরব নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত। রামধনবাবু তাঁহার মাতাকে কোনমতেই কার্যস্থান বর্ধমান শহরে লইয়া যাইতে পারিতেন না। মা বলিতেন, দেশের লোকজন, ঠাকুরসেবা, গরীব-দুঃখী প্রজাদের ফেলে আমি কোনমতেই দেশ ছেড়ে যাব না। কাজেই রামধনবাবু নীরব থাকিতেন এবং একটু দীর্ঘদিনের ছুটি পাইলেই বাড়ি আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতেন।

রাত্রিকালে বাড়ির সকলে শুইয়া পড়িলে, মহামায়া ঠাকরুণ একাকিনী একটি প্রদীপ হাতে করিয়া অত বড় বাড়ির চারিদিক—গলিঘুঁজি, কোণ সব দেখিয়া সদর ও অন্দরের দরজা বন্ধ করিয়া নিজের ঘরটিতে আসিয়া শুইয়া থাকিতেন। শুইবার সময় মন্ত্র পড়িতেন। তাঁহার মন্ত্রের দুই-একটি চরণ এখানে তুলিয়া দিলামঃ

কপ্‌পোল কপ্‌পোল,
যদ্দূর যায় কপ্‌পোলের বায়,
চোর-চোট্টা না বাড়ায় পায়!
বাঁধলাম ঘর, বাঁধলাম বাড়ি,
কোন্ চোরা করবে চুরি!

তারপর হাততালি দিয়া শুইয়া পড়িতেন। সেকালে প্রাচীনদের মধ্যে এইরূপ সংস্কার ছিল, এই মন্ত্রে বাড়ি বন্ধ করিলে চোরের সাধ্য ছিল না, বাড়ির ত্রিসীমানায় পা বাড়ায়। এ-বিশ্বাসেই মহামায়া ঠাকরুণ চারিদিক ঘুরিয়া বাড়ি বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়িতেন। মন্ত্রের অর্থ কি? কপ্‌পোল আবার কি?



॥ দুই ॥

পৌষ মাস। একরাত্রে মহামায়া ঠাকরুণ দীপ হাতে করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এক ভাইয়ের দুইটি ছেলে শহর হইতে বাড়ি যাইবার পথে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছে। তাহারা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহামায়া ঠাকরুণ আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় উত্তরের সেই বড় ঘরের ছাঁচের নিকট শুনিতে পাইলেন নাক-ডাকার শব্দ! যেন ঘরের বাহিরে কাহার নাক ডাকিতেছে। বুনোরা যেমন বনে বাস করিতে করিতে বাঘকে ভয় করে না, তেমনি ঐ অঞ্চলের মেয়েরাও চোর-ডাকাতের আক্রমণকে বড় ভয় করিত না। তিনি নাক-ডাকার শব্দে আশ্চর্য হইয়া কাহারা কোথায় নাক ডাকিতেছে, তাহার খোঁজে বাহির হইলেন।

মহামায়া ঠাকরুণ ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসিকা। তিনি ধারে ধারে গিয়ে দেখেন, ডাকাত মহাশয় চালের একটা বাতা ধরিয়া ঐ

* সেকালের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে ও গভর্নমেণ্ট রিপোর্টে শান্তিপুরের দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষের নাম আছে। কথিত আছে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে দেবী ও নবীন ডাকাতি দমন বিভাগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রশেখর রায়ের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন। লিখিত ঘটনাটি সত্য।

বড় ঘরের উচ্চ দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়া, পাকা প্রাচীরের উপর ঘোড়-সোয়ারের মত এক-পা বাহিরে এক-পা ভিতরে এইভাবে বসিয়া পরম সুখে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে! আর তাহারই নাক-ডাকার শব্দে বাড়ির চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ির বাহিরে গোঁসাইদাস বাগদী চৌকি দিতেছিল; একবার ভাবিলেন, তাহাকে ডাক দেন—কিন্তু ঠাকরুণের ছিল দুর্দান্ত সাহস। তিনি কি করিলেন জান? প্রদীপটি মাটিতে রাখিয়া দুই হাত দিয়া ডাকাতের ঝুলানো পা-খানি ধরিয়া এক টান মারিলেন। ভাবিয়াছিলেন—ডাকাতটাকে বাড়ির মধ্যে টানিয়া ফেলিয়া পরে চিৎকার করিবেন; তখন সকলে আসিয়া পড়িবে, দস্যু আর পলাইতে পারিবে না। কিন্তু ডাকাতটি জোয়ান মানুষ, সে খুব শক্ত করিয়া চালের বাতা ধরিয়া ছিল, কাজেই একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাকে টানিয়া নামানো সহজ ছিল না।

এদিকে ডাকাতমশাই টানের চোটে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল মহা বিপদ! সে তাড়াতাড়ি মহামায়া ঠাকরুণের হাত হইতে পা ছাড়াইয়া প্রাচীরের ওপর মজবুত ভাবে বসিয়া বলিল—এ কি গিন্নিমা! ধন্নি মেয়ে তুমি! তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?

মহামায়া ঠাকরুণ গর্জিয়া বলিলেন—কে?—চাঁদা! ডাকাতি করবার আর জায়গা পাস্ নি? এই তোর কাজ? তোকে এত খাবার দিই, বছরে দু'খানা করে কাপড় দিই, তুই বেটা নেমকহারামি করে ডাকাতি করতে এসেছিস আমার বাড়ি।

চাঁদা ডাকাত কহিল—সে কি কখন হয়! না মা, চৌকী দিতে দিতে বড় ঘুম পেল, তাই এখানে বসে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম।

: বটে রে! অন্দর-বাড়ির পাঁচিল তোমার শোবার খাট!

সে উত্তর দিল—ঘুমের ঘোরে পথ ভুলে এখানে উঠে পড়েছি—আর এমন কাজ হবে না।

গোঁসাই বাগদীর কানে বাড়ির ভিতরকার এই কথা আসিয়া পৌঁছিলে, সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হয়েছে মা?

মহামায়া ঠাকরুণ ইঙ্গিতে চাঁদা ডাকাতকে দেখাইয়া দিলেন। গোঁসাইদাস যেমন লাঠি উঁচু করিয়াছে, অমনি চাঁদা প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। গোঁসাইদাস আস্ফালন করিয়া কহিল—মা যদি টানাটানি না করে চুপি চুপি আমাকে ডেকে আনতেন তবে বেটার চৌকী দেওয়াটা দেখিয়ে দিতাম।



॥ তিন ॥

এদিকে হইয়াছে আর এক ব্যাপার। চাঁদার দল ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে গিয়া সিঁধ কাটিতে শুরু করিয়াছিল। গোঁসাইদাস ও মহামায়া ঠাকরুণ বাড়ির ভিতরে আসিয়াই শুনিতে পাইলেন ঠক্-ঠক্ শব্দ। গোঁসাইদাস চুপি চুপি বলিল—চলুন ঘরের ভিতর যাই।

দুইজন চুপিচুপি ঘরের ভিতর গিয়া জানালার নিকট উঁকি মারিয়া দেখিলেন, জানালার নীচ দিয়া সিঁধ কাটিয়াছে—ভিতর হইতে ঢালু ভাবে, আকারেও বেশ বড়। আর দুই চারখানি ইঁট খসাইলেই পথ পরিষ্কার হয়।

মহামায়া ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি পাশের ঘর হইতে মশাল লইয়া আসিলেন এবং যে উনানে গরম জল হইত তাহা জ্বালিলেন। বড় এক কলসী জল শীঘ্র গরম করিয়া আনিলেন এবং আর এক কলসী বসাইয়া রাখিলেন। জল একেবারে আগুনের মত গরম হইয়াছে। এদিকে সিঁধও এপার-ওপার হইয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মহামায়া ঠাকরুণের ভাইপোরা ত ভয়ে অস্থির। সেই শীতের রাতেও তাহারা ভয়ে ঘামিতেছিল।

ওদিকে চোর যেমনি সিধ দিয়া মাথা গলাইয়াছে, অমনি গোঁসাই-দাস ও মহামায়া ঠাকরুণ হুড়-হুড় করিয়া গরম জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। অমনি বাহির হইতে বাপ্ রে! বাপ্ রে! মরলুম রে? বলিয়া শব্দ উঠিল।

চাঁদা সর্দার কখন কোন্ ফাঁকে যে আসিয়া দলে জুটিয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। সে সগর্জনে শাসাইয়া বলিল—আচ্ছা, এবার রক্ষা পেলে গিন্নিমা, মজা দেখতে পাবে—বলিয়া চলিয়া গেল।

সেকালে চোর-ডাকাতের অপেক্ষাও গ্রামের লোকেরা পুলিশকে বেশী ভয় করিত। সতর্ক থাকিলে, কিংবা টাকা-গহনা মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিলে চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত, কিন্তু দারোগা-জমাদার আসিলে আর রক্ষা ছিল না। তাহাদের লোভ ছিল অত্যন্ত বেশী। চোর-ডাকাত ধরা দূরে থাকুক, বরং উল্টা তাহারা গৃহস্থকে নিপীড়ন করিত। এইজন্য কোম্পানী এমন কঠোর নিয়ম করিয়াছিল যে, যে দারোগা তাহার এলাকার চোর-ডাকাত ধরিতে পারিবে না, তাহাকে কাঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে এবং চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইবে।

মহামায়া ঠাকরুণ শেষটায় চাঁদা ডাকাতকে পুলিশের কাছে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার কঠোর দণ্ড হইয়াছিল।

মহামায়া ঠাকরুণের বীরত্বের কথা সেই অঞ্চলে খুবই প্রচারিত হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে বলিত ডাকাত-ধরা গিন্নিমা।



॥ এক ॥

পাল্কী চলিয়াছে।

বেহারারা চিৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে। অদ্ভুত তাহাদের শব্দ—ডাইনে খানা, হুঁ হুঁ! হুঁসিয়ার ভাই, হুঁ হুঁ! সামনে ঢিবি, হুঁ হুঁ! চোট লেগেছে, হুঁ হুঁ! হোঁচট সামাল, হুঁ হুঁ।

এইরূপে একঘেয়ে চিৎকার করিয়া চলিয়াছে পাল্কীবাহকেরা পাল্কী

লইয়া মাঠের পথে। পাল্কীর মধ্যে যিনি মহিলা তিনি ধনী ঘরের গৃহিণী। চলিয়াছেন বাপের বাড়ি। সঙ্গে দুইটি ছেলে। আর প্রহরীস্বরূপ যাইতেছে একজন লাঠিয়াল, তাহার নাম তিলক সর্দার। তিলক সর্দার মস্ত বড় জোয়ান। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। হাতে লোহা-বাঁধান মোটা লাঠি।

নদীয়া জেলার নিশ্চিন্তপুর। ক্ষুদ্র হইলেও ভদ্রপল্লী। কৃষ্ণনগর হইতে অনেকটা দূর। ছেলে দুটিকে লইয়া চলিয়াছেন মহিলা পিত্রালয়ে। মামা-বাড়ি যাইবার আনন্দে দুই ভাই মহা ফূর্তিতে যাইতেছে। তাহারাও একখানা শিবিকাতে চড়িয়াছে। তাহাদের বাসপল্লী হইতে মাতামহ বাড়ি প্রায় ষোল ক্রোশ উত্তর দিকে অবস্থিত। খুব সকালে রওনা হইয়া যাইতেছেন। পথে কোথাও রান্নাবান্না হয় নাই। মা ছাড়া, ছেলেরা, পাল্কীবাহকেরা এবং তিলক সর্দার—সকলেই বৌবেড়িয়া আসিয়া দই, চিড়া, গুড় খাইয়া দিব্যি ফলার করিয়াছে। বৌবেড়িয়া গ্রামের পর নিশ্চিন্তপুর, তখনও দুই ক্রোশ।

শীতকাল। কৃষ্ণপক্ষ। মেঠো পথ। ধানক্ষেতে কিছুমাত্র ফসল নাই—গোড়া কাটা মাত্র। কোথাও কোথাও ছোলা, কৃষ্ণমুগ, তিসি, তামাক প্রভৃতি কতক আছে, কতক গৃহস্থেরা লইয়া গিয়াছে। দূরে দূরে মাঝে মাঝে খামার, উঁচু উঁচু আঝাড়া ধানের গাদা। অন্ধকার—চারিদিকে কালো হইয়া গিয়াছে। চোখে কিছু দেখা যায় না। বিরাট প্রান্তর নীরব নিস্তব্ধ। কোন শব্দ নাই। সেই প্রান্তরের ভিতর চলিয়াছে এই যাত্রীদল। শুধু শোনা যাইতেছিল পাল্কী-বেহারাদের হুঁ হুঁ হোঁচট, সামাল ইত্যাদি শব্দ।

দুই ভাই শিবিকাতে আছে। দোলায় দোলায় ঘুমাইতেছে, জাগিতেছে। মেজ ভাই মাঠ ও অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইয়াছে; ছোট ভাইকে ঘুমাইতে দিতেছে না। কথা না বলিলে তাহার ভয় ভাঙ্গে না। মাঝে মাঝে সে সর্দার দাদা কোথায় বলিয়া চেঁচাইতেছে।

তিলক সর্দার আগে আগে চলিয়াছে। হাতে তাহার গুলবাঁধা লাঠি। সে মেজ ভাইয়ের ডাক শুনে নাই। মা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, বেহারাদের বলিলেন—আর ত বেশী দূর নেই, ছেলেদের আমার পাল্কীতে তুলে দাও।

তাহারা বলিল—তা হয় না মা! সারাদিন পথ চলে এসেছি। পারব না মা! ষোল ক্রোশ পথ—কম ত নয়।

মা বলিলেন—তবে সর্দারকে ডেকে দাও। সর্দার আসিলে মা তাহাকেও বলিলেন—ছেলেদের আমার পাল্কীতে তুলে দাও। অন্ধকার রাত্রি। তেপান্তরের মাঠ। ওরা ভয় পেয়েছে।

সর্দার পাল্কীর দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল—কোন ভয় করবেন না মা, আমি দাদাবাবুদের পাল্কীর কাছে আছি। এই ত এসে পড়লাম। আর ত সবে এক কোশ হবে—

বাহকেরা বালক দুইজনের পাল্কী মায়ের পাল্কীর কাছে লইয়া গেল। পাল্কী চলিতে লাগিল। অন্ধকার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। শোনা যাইতেছে মাঝে মাঝে কিচিমিচি শব্দ, খামারের গায়ে গায়ে ইঁদুর বা কোন ছোট জন্তু-জানোয়ারের রব।



॥ দুই ॥

হুক্কা হুয়া—হুকু হুকু হুকু—হুয়া হুকা!...

পাল্কী যখন দুই-তিনটি ধানের গাদা ভরা একটা খামারের কাছ দিয়া চলিয়াছে, এমন সময় চারিদিক হইতে শোনা গেল ভয়ঙ্কর এই হুকু হুয়া হুকু হুকু শব্দ!

এই শব্দ মাঠে মাঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বালকদের মধ্যে যে বড়—মেজ ভাই, সে ত ভয়ে একেবারে ঘামিতে লাগিল।

আবার আরম্ভ হইল ঘন-ঘন সেই শব্দ! একি অদ্ভুত আওয়াজ!

একটি ডাক, আর একটি ডাক, এই ভাবে ডাকের পর ডাক চলিতে লাগিল। এ যে শিয়ালের ডাক নয়, তাহা বালকেরাও বুঝিতে পারিল। তিলক সর্দার তাহার গায়ের কাপড়খানি বালকদের পাল্কীর মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মালকোচা মারিয়া কাপড় পরিল। তারপর বালকদের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ভয় কিসের দাদা? আমি ত রয়েছি। কিছু ভয় করো না!

বেহারাদের বলিল—চল্, কোন ভয় করিস্ নে। যেমন যাচ্ছিলি তেমনি যা। আমি রয়েছি। চল্ এগিয়ে চল্—

বেহারারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। তাহারা একবার এদিকে আবার ওদিকে এইভাবে চলিতেছিল হুঁ হুঁ শব্দ করিতে করিতে। মা বলিলেন—ওরে ছেলেদের আমার পাল্কীতে তুলে দে।

সেই অন্ধকার রাত্রে, মাঠের মাঝখানে একটা ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। বালকেরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া দিয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল।

এমন সময় যমদূতের মত ভীষণাকৃতি, মুখে কালিমাখা চার-পাঁচজন ডাকাত তীরবেগে ছুটিয়া আসিল। তিলক সর্দার ডাকাতদের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তোরা কে? ওরে বেটারা, তোরা কে?

উত্তর হইল—'তোর বাবা! তুই কে বল্ না!'

: হাঁ বাবা! তোদের চৌদ্দপুরুষের বাবা আমি। তফাৎ থাক্—কাছে আসিস্‌নে, এলে তোদের আর রক্ষে থাকবে না

কথা শেষ না হইতেই দুইজন ডাকাত লাঠি লইয়া আসিয়া তিলক সর্দারকে আক্রমণ করিল। বালকেরা কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের মা পাগলিনীর মত কি হলো রে বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। সে এক সঙ্কটময় অবস্থা। বেহারাগণ পাল্কী ফেলিয়া

দূরে পালাইয়াছে। পাল্কীর একদিকে দুইজন, অন্যদিকে তিনজন ডাকাত তিলক সর্দারকে আক্রমণ করিয়াছে। ছেলে দুইজন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতেও পাল্কীর দরজা ফাঁক করিয়া দেখিতেছিল, তিলক সর্দারের সঙ্গে ডাকাতদের লড়াই।

হারে রে রে—! কি তাহাদের বিকট চিৎকার! দূরপল্লী হইতেও সেই ধ্বনি বিকট রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

তিলক সর্দার নিমেষের মধ্যে অত্যাশ্চর্য কৌশলে আপনার হাতের লাঠিখানা বোঁ-বোঁ বন-বন মাথার উপর দিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে হঠাৎ লাঠিখানা নামাইয়া ডাকাতদের একজনের পায়ে ও আর একজনের মাথায় এমন জোরে আঘাত করিল যে, প্রথম দস্যু ওরে বাপ্‌রে গেলাম রে বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দস্যুর মাথায় পড়িয়াছিল লাঠির ঘা; সে নিঃশব্দে মাটিতে পড়িয়া রহিল—নড়িতেও পারিতেছিল না।



।।তিন।।

এইবার একসঙ্গে বাকী তিনজন ডাকাত আসিয়া সর্দারের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কি ভয়ঙ্কর মূর্তি হইয়াছে তিলক সর্দারের! চোখ দুইটি যেন জ্বলন্ত কয়লা—দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। আরম্ভ হইল লাঠিতে লাঠিতে ঠক্‌ ঠক্‌ ঠকা ঠক্—ঠট্‌, ঠট্‌, ঠট্‌, শব্দ। একবার সে দশ হাত পিছু হটিতেছে—আবার লাফাইয়া উঠিতেছে চারি হাত উঁচুতে। লাঠিখেলার কি ভঙ্গী! আঘাতে বাধা দিবার কি অপূর্ব ক্ষমতা। একবার এক দস্যুকে এক ঘা.—আবার পলক মধ্যে দূরে সরিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। এইভাবে সে যে কেবল দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধই করিল, তাহা নহে, তাহাদের ব্যতিব্যস্তও করিয়া তুলিল। একটা দস্যু দৌড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। তিলক সর্দার লাফাইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া প্রবলবেগে একটা ঝাঁকুনি দিল; তাহার গোড়ালিতে দিল একটা লাঠির ঘা এবং তারপর লাথি মারিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিল। লোকটা হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ভয়ে জোড়হাতে সর্দারের পায়ে পড়িবার ভঙ্গী করিল।

ওদিকে যে-দুইজন দস্যু মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা যেমনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, অমনি সর্দার তাহাদের একজনের চুলের গোছা ধরিয়া অপর জনের পেটে দিল লাঠির আঘাত।

ডাকাতের মধ্যে দুইজন মরিল, একজন প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া ভয়ে ভয়ে পলাইল। দুইজন তিলক সর্দারের পায়ে শরণ লইল। এই ভাবে দস্যুদল হইতে সকলে রক্ষা পাইল।

তিলক সর্দার আহত ডাকাতদের লাঠিগুলি কাড়িয়া লইয়া বলিল—'যা বেটারা, এমন কাজ আর কখনো করিসনে। এই লাস এখান হতে দূরে ফেলগে যা। নইলে তোরাও দারোগার হাতে পড়ে প্রাণ হারাবি; যা বেটারা!'—এই কথা বলিয়া তাহাদের চপেটাঘাত করিয়া বিদায় দিল। তারপর দস্যুদের লাঠিগুলি পাল্কীতে তুলিয়া রাখিয়া সে বেহারাদের ডাকিতে আরম্ভ করিল।

বেহারারা কি সহজে আসিতে চায়! অনেক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির পর বারোজন বেহারা পাল্কীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—'সর্দার, কি করব বল? তোমার মতন যদি আমাদের হাতে অমন গুলবাঁধা লাঠি থাকত, তা'হলে দেখতে বেটাদের পিটিয়ে লাস করে ফেলতাম। কি করব—হায়! হায়!'

তিলক সর্দার হাসিয়া কহিল—'সে ত ঠিকই বলছিস্। তোরা কি কম জোয়ান। নে এখন পাল্কী দু'খানা কাঁধে তোল। তাদের জন্য তিন-চার গাছ লাঠি কেড়ে রেখে দিয়েছি। এখন আর ভয় কি রে।'

তখন বাহকদের মধ্যে লাঠি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। একজন বলে, আমি এটা নেব। অপরে বলে—আমার হাতে থাকুক। বলা বাহুল্য তিলক সর্দারের ধমকে সব গোলমাল মিটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সকলে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তপুর গিয়া পৌঁছিলেন। ডাকাতদের আক্রমণ ও তিলক সর্দারের বীরত্বের কথা শুনিয়া সেই বাড়ির সকলে তিলক সর্দারকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।



৫

রবিনসন সাহেব এবং ডাকাত সোনকর ও মোহন্তরাম

।। এক ।।

রঙপুর জেলার পরগনা বৈকুণ্ঠপুর। বৈকুণ্ঠপুরে সেই সময়ে গভীর অরণ্য ছিল। সে-ভীষণ অরণ্যে হাতী, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ময়াল সাপ, হরিণ, বুনো মহিষ এইসব নানা জানোয়ার বাস করিত।

সেই বৈকুণ্ঠপুরের গভীর অরণ্যে যেমন হিংস্র পশুদের বাস ছিল। তেমনি ডাকাতদেরও প্রধান আড্ডা ছিল। বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার যখন নাবালক ছিলেন, তখন ম্যাক্‌ডোয়াল নামে এক সাহেব ছিলেন তাঁহার অভিভাবক এবং ম্যানেজার। সে-সময়ে তিনি একবার জঙ্গল পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বনের আশে-পাশে জমিদারের যে সকল প্রজা চাষ-আবাদ করিত তাহারা বাধা দেওয়ায় সেই কাজ অগ্রসর হইতে পারে নাই। ঐ অরণ্যের একদিকে ছিল ভুটান রাজ্য, অন্যদিকে নেপাল এবং দক্ষিণ দিকের মাঝামাঝি একটি ভুটিয়া পল্লী। এই গভীর অরণ্যের সর্বত্র ছিল ডাকাতদের আড্ডা। পথ নাই, ঘাট নাই, কোথায় কোন্ নিভৃত স্থানে ডাকাতেরা বাস করে তাহার সন্ধান মিলিত না। তখন কোম্পানীর আমল।

কোম্পানীর সঙ্গে কতবার যে ডাকাতদের লড়াই হইয়াছে, তাহার অবধি নাই। ঐ পর্যন্ত ডাকাতেরা কেহ ধরা পড়ে নাই। আবার অন্যদিকে বিদ্রোহী প্রজারাও অনেক সময় ডাকাতদের সঙ্গে গিয়া মিশিত এবং সেখানে আশ্রয় পাইত। ১৮০৭-৮১ খ্রীস্টাব্দে ডাকাতি এমন বাড়িয়া গেল যে কোম্পানী কোন রকমেই জমিদার ও প্রজাদের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেছিল না।

সেই সময়ে সোনকর ও মোহন্তরাম এই দুইজন ডাকাতের ভয়ে যেমন জমিদার, তালুকদার ও সাধারণ প্রজাদের আতঙ্ক ছিল, তেমনি কোম্পানীর নিযুক্ত দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতিও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। সোনকর ও মোহন্তরাম দুই ভাই। তাহাদের বাড়ি কোথায়, তাহারা কোন্ দেশের লোক, তাহা জানা নাই। দুই ভাই এমন কৌশলী ছিল যে, তাহাদের ধরা বড় সহজ ছিল না। তাহারা ডাকাতি করিয়া কখনও নেপালে, কখনও ভুটানে কখনও বা বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিত।

তখনকার দিনে গ্রাম কিরূপ ছিল জান? বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে যে-যেমন সুবিধা পাইত, তেমন ভাবে ঘর-বাড়ি তৈয়ারি করিয়া বাস করিত। একসঙ্গে মিশিয়া পাশাপাশি ঘর-বাড়ি তৈয়ারী করিয়া কেহ থাকিত না, বিপদের সময় কেহ কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিত না। আর পুলিশ বা ফৌজের ব্যবস্থাও তেমন ছিল না। কোম্পানীর রাজ্যে ছিল অরাজকতা। জমিদারের উপর নিজ নিজ এলাকার ডাকাত ধরিবার ভার ছিল। তাঁহারা কিন্তু অনেকেই ডাকাতের সঙ্গে যোগ দিতেন, আবার কেহ কেহ কোম্পানীর সহযোগিতাও করিতেন। কোম্পানীর আমলে ছোটখাট চুরি বিশেষ ছিল না, ছিল ডাকাতি। ডাকাতেরা সকলে দুঃসাহসী এবং অস্ত্র-চালনায় দক্ষ ছিল। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ম্যাকডোয়াল সাহেব বৈকুণ্ঠ-পুরের জঙ্গলের ডাকাতদের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। ইতিহাসে সে-কাহিনী আছে।

একদিকে যেমন দেশীয় ডাকাতেরা মানুষের ধন-প্রাণ নষ্ট করিত, অপরদিকে তেমনি নেপাল ও ভুটান হইতে দস্যুরা সমতল ভূমিতে আসিয়া লুঠপাট করিয়া যাইত।



॥ দুই ॥

এইবার সোনকর ও মোহন্তরামের কথা শোন।

একবার সোনকর তাহাদের দলের অনেক ডাকাত লইয়া বৈকুণ্ঠ-পুরের জমিদার-বাড়ি আক্রমণ করিল। তাহারা মশাল জ্বালিয়া হল্লা করিয়া হা-রে-রে-রে শব্দে এমনভাবে জমিদার-বাড়ির ওপর আসিয়া পড়িল যে, ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিয়া জমিদারের সেপাই, বরকন্দাজ, লাঠিয়ালেরা পারিল না। সোনকর ডাকাতি করিয়া নেপালে পলাইয়া গেল। কোম্পানীর ফৌজ নেপালের দিকে ছুটিল। নেপালের রাজা বলিলেন—একি অন্যায় জুলুম! তোমাদের এলাকায় হলো ডাকাতি, সেজন্য আমার সঙ্গে করবে লড়াই! বহুৎ আচ্ছা!

নেপালের রাজার সেপাইদের সঙ্গে একশত ডাকাত আসিয়া যোগ দিল। নেপালের সীমান্তে চলিল লড়াই। শেষে কোম্পানী আপস করিল, একজন দারোগাকে প্রতিভূ রাখিয়া। ডাকাতের দল কিরূপ দুঃসাহসী ও লড়াই করিতে দক্ষ ছিল, তাহা বুঝিতে পারিলে।

এখন রবিনসন্ সাহেবের কথা বলিতেছি।

রবিনসন্ সাহেব বোদা থানার একটি পল্লীতে বাস করিতেন। সাহেব ছিলেন একজন নীলকর। সাহেবের বয়স ছিল অল্প; তিনি যেমন ছিলেন শিকারী তেমনি ছিলেন দুঃসাহসী। তাঁহার বাংলোর কাছে লোকজনও ছিল অনেক। ডাকাতির কথা উঠলেই সাহেব বলিতেন—ডরো মৎ, হামারা কুঠিমে ডাকু কভি নেহি আয়েঙ্গে।

সাহেবের এই গৌরব একদিন ভাঙ্গিল। মোহন্তরাম একদিন দুপুররাত্রে সত্তরজন সাহসী সঙ্গী লইয়া আসিয়া সাহেবের কুঠি চড়াও করিল। সাহেব ও বরকন্দাজেরা তখনও জানিতে পারে নাই যে, মোহন্তরাম কুঠি আক্রমণ করিতে আসিয়াছে।

মোহন্তরাম সেই সুযোগ উপেক্ষা করিল না। তাহার ইঙ্গিতমাত্র ঢাল, তলোয়ার ও বল্লম লইয়া সত্তরজন ডাকাত কুঠি চড়াও করিল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক ডাকাতের হাতে মশাল জ্বলিয়া উঠিল এবং ভীষণ হা-রে-রে-রে শব্দে নীরব পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল।

সাহেব ত্রস্তব্যস্ত হইয়া ঘুম হইতে উঠিলেন এবং জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, ভীষণদর্শন সব ডাকাত কুঠি আক্রমণ করিয়াছে। কি যে করিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি বাঁশী বাজাইলেন, অমনি বরকন্দাজেরা ও সেপাইরা ছুটিয়া আসিল। সাহেবও বন্দুক লইয়া শয্যা হইতে নামিলেন। গুড়ুম গুড়ুম বন্দুক চলিল। ডাকাতেরা তৎক্ষণাৎ বরকন্দাজদের দিকে বল্লম ছুঁড়িল এবং তলোয়ার লইয়া লড়াই শুরু করিয়া দিল।

মোহন্তরাম সাহেবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বাঘের মত লাফ দিয়া সাহেবকে পেছন হইতে জাপটাইয়া ধরিয়া তাঁহার বন্দুকটি কাড়িয়া লইল। এইভাবে মুহূর্তমধ্যে তাঁহাকে একেবারে নিরস্ত্র করিয়া তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ সাতশত টাকা, সোনার ঘড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র যাহা হাতের কাছে পাইল তাহা লইয়া বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের দিকে দ্রুতপদে পলায়ন করিল। বৈকুণ্ঠপুরের গভীর জঙ্গলে কোথায় যে তাহারা আশ্রয় লইল, সে সন্ধান মিলিল না।

রবিনসন্ সাহেবের গুলিতে তিনজন ডাকাত হত হয়; তাহা ছাড়া তাহাদের দলের অন্যান্য লোকদের খোঁজ মিলিল না। সাহেবের জ্ঞান হইলে পর, তিনি তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হার্টওয়েল সাহেবকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই যে, এত বড় সাহসী ও দুর্দান্ত দস্যু আমার চোখে কখনও পড়ে নাই। ডাকাতেরা যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি তাহাদের আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর! তাহাদের প্রত্যেকের মুখ ছিল কালি-মাখানো। আমাকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল,

তাহাতে আমার সাধ্য ছিল না যে, তাহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি।

রবিনসনের কুঠিতে মোহন্তরামের দুঃসাহসিক ডাকাতির পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলেন না।

কয়েক বৎসর পরে মোহন্তরাম ধরা পড়িয়াছিল। যে জমাদার, বরকন্দাজ ও পুলিশের সাহায্যে মোহন্তরাম ধরা পড়িয়াছিল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বহু টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

মোহন্তরামের বীরত্ব, সাহস, তলোয়ার ও বন্দুক চালানোর দক্ষতা এবং নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। মোহন্তরাম ধরা পড়িবার পর বৈকুণ্ঠপুরের ডাকাতির প্রকোপটা কিছু কমিয়াছিল।



৬



বীরাঙ্গনা অন্নদা দেবী ও ডাকাতদল

॥ এক ॥

সত্তর বৎসর আগের ঘটনা।

চাণক্যের কাছে একটি গ্রাম, নাম রঙপুর। রঙপুর গ্রামে একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়। বৈকুণ্ঠবাবুর একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহের উৎসব। সেইজন্য বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কয়েক ক্রোশ দূরে সেই আত্মীয়ের বাড়ি গিয়াছিলেন। জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়ি চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা। দ্বারে দ্বারবান ও কয়েকজন প্রহরী বাড়িতে পাহারা আছে। কাজেই বৈকুণ্ঠবাবু নিশ্চিন্তমনে বিবাহ-বাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে রহিলেন শুধ্ জ্ঞাতি-ভ্রাতৃবধূ অন্নদা দেবী এবং আরও কয়েকজন মহিলা। অন্নদা দেবীর বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর।

অমাবস্যা। রাত্রি দ্বিপ্রহর। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। গ্রামের লোকজন সব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে কুকুর বা শিয়ালের ডাক শুনা যাইতেছে।

আষাঢ় মাস। আকাশে মেঘ করিয়াছে। বৃষ্টি আসন্ন। গ্রামের এক প্রান্ত দিয়া একটি খাল আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূরে একটি ছোট নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। সেই খালের দুই পাশে ঘন বাঁশবন, আমবাগান এবং নানা গাছপালা। এই খালের ভিতর দিয়া তিনখানি সরু ছিপ নৌকা অতি দ্রুত চলিয়াছে। প্রত্যেক নৌকায় দশ-বারো জন লোক, সঙ্গে নানা হাতিয়ার—লাঠিসোটা, তলোয়ার, বর্শা, বল্লম, ঢাল। প্রত্যেকের মুখ কালো ও লাল রঙে অদ্ভুত ভাবে চিত্রিত। তাহারা অতি সন্তর্পণে নৌকা বাহিয়া বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ির পাশে যেখানে বাঁশবন ও বিরাট আমবাগান গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে আসিয়া নৌকা বাঁধিল। এই দলের সর্দারের নাম ছিল—গদাধর দাস। গদাধর ছিল জাতিতে বাগ্দী; ভয়ঙ্কর শক্তিশালী পুরুষ। দলের লোকেরাও ছিল সেইরূপ সাহসী ও বলিষ্ঠ। ইহাদের অত্যাচারে ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোক ভয়ে ভয়ে থাকিত, কখন কাহার বাড়িতে ডাকাতি করিতে আসে তাহার কোন স্থিরতা ছিল না।

গদাধর ও তাহার দলবল বাড়ির উচ্চ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদের একদল লোক প্রথমেই প্রহরারত দ্বারবান ও প্রহরীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাদের শক্ত করিয়া দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ডাকাতেরা তাহাদের মশাল জ্বালিয়া হা-রে-রে-রে শব্দ করিতে করিতে দরজা, কপাট ও জানালা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ শব্দে দামামা বাজাইয়া তাহারা গ্রামবাসীদের ভীত ও আতঙ্কিত করিয়া লুঠতরাজ করিতে লাগিয়া গেল। তাহাদের ভীষণ চীৎকারে ও হল্লাতে ঘরবাড়ি যেন কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে অন্নদা দেবী রাত্রির প্রথম ভাগে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। দস্যুদের বিকট চীৎকারে তিনি জাগিয়া দেখিতে পাইলেন, ডাকাতেরা বাড়িতে শুধু নয়, দালানের ভিতরে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে।



॥ দুই ॥

অন্নদা দেবী বলিষ্ঠকায়া এবং সাহসী মহিলা ছিলেন। তিনি মুহূর্ত কাল বিলম্ব করিলেন না। বাড়ির অন্যান্য মহিলাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের আদেশ দিলেন—তোমরা ছাদে গিয়ে ছাদের উপর থেকে ডাকাতদের লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে থাক।

বাড়ির পরিচারিকা এবং অন্য তিন-চারিজন মহিলা তৎক্ষণাৎ ছাদে গিয়া ছাদের উপর হইতে ডাকাতদের লক্ষ্য করিয়া ইঁট-পাটকেল ও হাতের কাছে যে যাহা পাইলেন তাহাই ছুঁড়িতে লাগিলেন। ডাকাতদের মশালের আলোতে চারিদিক আলোকিত হইয়াছিল। কাজেই মহিলাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। কাহারও মাথায়, কাহারও বুকে, কাহারও পিঠে বৃষ্টির ধারার মত ইঁট-পাটকেল পড়িতে লাগিল। তখন দস্যুদের মধ্যে একটা শোরগোল পড়িয়া গেল! কে কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। কেহ মশাল নিবাইল, কেহ পলাইতে লাগিল। তাহারা হঠাৎ কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিল না—কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। তাহারা হতভম্ব হইয়া ভাবিতে লাগিল, খালি বাড়িতে কোথা হইতে কে বা কাহারা তাহাদিগকে এমন ভাবে আক্রমণ করিল।

এদিকে অন্নদা দেবী কি করিলেন,—সে কথাই বলিতেছি।

অন্নদা দেবী তাঁহার কেশ এলাইয়া দিলেন—তাঁহার দীঘ ও মেঘের মত কালো কেশ পিঠে এলাইয়া পড়িল। তিনি কপালে পরিলেন বড় করিয়া সিন্দুরের টিপ—সারামুখে ও সর্বাঙ্গে মাখিলেন কালি, কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত টানিয়া পরিলেন এবং খড়্গ হাতে লইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া কালীমূর্তির মত নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে—অনড় অটল।

ডাকাতেরা ঘরের পর ঘরের জিনিসপত্র ভাঙিয়া চুরিয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে অন্নদা দেবী যে ঘরের মধ্যে ওইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দেখিল ভীমা ভয়ঙ্করী কালীমা দাঁড়াইয়া আছেন!

গদাধর সর্দার শ্যামা মার এইরূপ প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল—সে হাতের তলোয়ার এক পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পাগলের মত বলিতে লাগিল—

"কালী কালী কালী—
হা-হা হো-হো হা-হা-হা হো-হো-হো
আয় রে ভাই সব বল শ্যামা-মায়ের জয়,
আরে বল্ রে তোরা শ্যামা-মায়ের জয়—
জয় জয় জয়—শ্যামা-মায়ের জয়!
আরে বল্ রে সবে শ্যামা-মায়ের
হো! হো! হো! হো!"

গদাধরের সর্বশরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কণ্ঠ তাহার জড়াইয়া আসিতেছে। সে দেখিতে পাইল যেন কালীমায়ের কাছে ডাকিনী-যোগিনী প্রেতিনীরা সব বিকট মুখব্যাদন করিয়া হা-হা-হা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভয়ে হায় হায় করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহার সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিল—'ভাই সব, আর রক্ষা নেই, মা আমাদের ওপর রাগ করেছেন,—না-না সব লুঠের জিনিস ফেলে রাখ। যেখানে কালীমা দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে কি ডাকাতি করা চলে? তোমরা সব মাকে প্রণাম কর। ডাকিনী-যোগিনীরাই আমাদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়েছে। বল সবে কালী-কালী-কালী—'

সদারের আদেশে ডাকাতেরা সকলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিল; তারপর তাহারা লুণ্ঠিত জিনিসপত্র ফেলিয়া রাখিয়া সকলে ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল। নীরবে গিয়া সকলে নৌকায় চড়িল এবং নৌকা চালাইয়া পলায়ন করিল।

ঐরূপ নিষ্পলক নেত্রে খড়্গ হস্তে দাঁড়াইয়া অন্নদা দেবীর শরীর অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তবু শুধু অসাধারণ মনের জোরে সাহস করিয়া তিনি এইরূপ ভাবে দীর্ঘ কাল দাঁড়াইয়াছিলেন। এখন তাঁহার শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি মূর্ছিতা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলা বৈকুণ্ঠবাবু লোকমুখে ডাকাতির সংবাদ পাইয়া সত্বর বাড়ি চলিয়া আসিলেন। বাড়ি আসিয়া যখন দেখিলেন ও শুনিলেন যে অন্নদা দেবী এইভাবে ডাকাতদের হাত হইতে বাড়ি রক্ষা করিয়াছেন, সামান্য সূচসূতাটি পর্যন্ত লুণ্ঠিত হয় নাই, তখন তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ অন্নদা দেবীর কাছে আসিয়া বলিলেন, মা তুমি ধন্য, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কাছে পুরুষেরাও হার মানে! তুমি আমাদের মানসম্ভ্রম সব রক্ষা করেছ। সত্য সত্যই দেবী কালীমা তোমার দেহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, নতুবা কি এমন হয়!

এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল—১২৯৪ সালে। সেকালের সমুদয় সংবাদপত্রে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলাদেশের অন্নদা দেবীর এই কাহিনী বাঙালী মেয়েদের মনে বিপদে এইরূপ সাহস ও শক্তি সঞ্চার করিবে বলিয়া মনে করি। গভর্নমেণ্টও এই বীরাঙ্গনাকে তাঁহার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।



॥ এক ॥

কমলাকান্ত সার্বভৌম বিক্রমপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নিবাস ছিল কাঠাদিয়া গ্রামে। তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভার কথা দেশে-বিদেশে বিখ্যাত ছিল। প্রতি বৎসর পূজার সময় বড়লোকদের বাড়ি ও শিষ্যবাড়ি বার্ষিকী আদায় এবং শিষ্যদের মন্ত্রদান ও দর্শনদান ছিল তাঁহার ধরা-বাঁধা কর্তব্য। একখানি বড় নৌকা ভাড়া করিতেন, চারিজন দাঁড়ী, দুইজন দক্ষ মাঝি—আর সঙ্গে থাকিত বিশ্বস্ত দুইজন ভৃত্য এবং দুই-চারিজন শিষ্য। নৌকাতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দুই-ই চলিত। সে-সময়ে এইরূপ নৌকা-ভ্রমণ করিতে লোকে ভালবাসিত, বিশেষতঃ অধ্যাপকদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে এই রীতিই ছিল প্রচলিত যে দেশ বৎসরের প্রায় ছয় মাস কাল বর্ষার জলে ডুবিয়া থাকে, সেই দেশে যানবাহনের মধ্যে নৌকাই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

পণ্ডিত মহাশয়ের এইরূপ নৌকাযাত্রার একটা বিশেষত্ব ছিল। মাঝিদের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে নৌকা ভিড়াইবে আহার ও বিশ্রামের জন্য। এই ব্যবস্থা সকলেরই ভাল লাগিত। কেননা খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম বেশ স্বচ্ছন্দে হইত। এইভাবে প্রায় দুই-তিন মাস কাল পণ্ডিত মহাশয়ের নৌকা-ভ্রমণ হইত; ইহাতে তাঁহার সমাদর লাভ, অর্থ লাভ এবং প্রচুর পরিমাণে বিবিধ সামগ্রী—খাদ্য ও বসনভূষণ লাভ হইত।

সেইবার পূজার পূর্বে বরিশাল জেলার শিষ্য ও জমিদার বাড়ি বেড়াইয়া পণ্ডিত মহাশয় দেশে ফিরিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন একটা বড় খালের মধ্য দিয়া নৌকা চলিয়াছে।

আশ্বিন মাস। বিকালবেলা। আকাশে মেঘ করিয়াছে। খুব জোরে হাওয়া-বহিতেছে। দুইপাশের বাঁশের ঝোপ, নারিকেল গাছ আর কাঁঠাল গাছ দোলাদুলি করিতেছে। চওড়া খালের বুকে ঢেউ উঠিতেছে পড়িতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মাঝিরা বলিল—ঠাকুরমশাই, গ্রামটায় এসে ঝড় পেলাম, বড় বিপদের কথা।

সার্বভৌম মহাশয়—বলিলেন—কেন রে?

ঃ আজ্ঞে ও খালের দু'ধারের গ্রামের লোকেরা সবাই ডাকাত!

পণ্ডিত মহাশয় খানিকক্ষণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—সবই মা জগদম্বার ইচ্ছা!

এমন সময় আরম্ভ হইল ভীষণ ঝড় ও প্রবল বৃষ্টি—যেন দুইটা দৈত্য লড়াই শুরু করিয়াছে। পাকা মাঝি নৌকাটা ঘুরাইয়া একটা ছোট খালের ভিতর লইয়া গেল! সেখানে ঝড়ের ঝাপ্‌টা অনেকটা কম। বৃষ্টি সমান ভাবেই পড়িতেছিল। এইভাবে খানিক দূরে গিয়া দেখা গেল, একজন বর্ধিষ্ণু লোকের বাড়ি। সেই বাড়ির পাশ দিয়া খালটা বাঁকিয়া গিয়াছে মাঠের দিকে। মাঝিরা বলিল—ঠাকুরমশাই আঁধার রাত, অজানা পথ। খালটা কোথায় গিয়া কোন্ নদীতে পড়িয়াছে— সেও বলতে পারি না। এ বেশ বড়লোকের বাড়ি আজ রাতের মত এখানেই নৌকা বাঁধি—কাল সকালে নৌকা ছাড়লেই হবে।

ঐ সময় ঝড়টাও কমিয়াছিল। আকাশের মেঘগুলিও হাল্কা হইয়াছিল এবং বৃষ্টিধারার প্রকোপও তেমন ছিল না। বাড়ির লোকদের জন্য যে ইঁটের ঘাটলা বাঁধান ছিল, তাহার অল্প দূরে মাঝিরা কাছি দিয়া—আগে ও পাছে লগি গাড়িয়া বেশ শক্ত করিয়া নৌকা বাঁধিল। এইবার তাহারা একটু নিশ্চিন্ত মনে তামাকু সাজিয়া খাইতে শুরু করিল। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি ও ঝড় একেবারে থামিয়া গেল। আকাশে বিচ্ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া দেখা দিল পঞ্চমী তিথিতে স্বল্পায়ু চাঁদের বঙ্কিম রেখা।

শিষ্যেরা বলিল—গুরুদেব, বেশ বড়লোকের বাড়ি। একবার খোঁজ নিয়ে আসি, তারপর বাড়ির কর্তার কাছে দৈব-দুর্দৈবের কথা বলে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করি।

—উত্তম। তবে কি জান, এ কার বাড়ি, কোন্ গ্রাম, লোক কেমন—সবই ত অজানা; কাজেই সহাসা রান্না-বান্না বা খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তবে বাড়ি যে হিন্দুর তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, কেননা চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা গড়ার আয়োজন চলছে!

শিষ্যেরা বলিল—আজ্ঞে ঠিক।

সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন—উতলা হতে নাই। এই ত ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল! এখন নিশ্চয়ই বাড়ির লোকেরা বাইরে আসবে, ঘাটের দিকেও হয়ত আসবে, তখনই, সব বোঝা যাবে। আর কিছুকাল ধৈর্য ধর।

মাঝিরা কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। তাহারা রান্না-বান্নার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিল।

এমন সময় দেখা গেল, একজন ভদ্রলোক নৌকার দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে লণ্ঠন হস্তে দুইজন লোক।

ক্রমে তাঁহারা নৌকার নিকট আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইলেন। ঘাটের পাশে নৌকা বাঁধা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ নৌকা কার?

একজন শিষ্য বলিল—সার্বভৌম মহাশয়ের।

ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—কোন্ সার্বভৌম?

—আজ্ঞে বিক্রমপুরের পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্বভৌম।

—বুঝেছি। বুঝি বার্ষিকী আদায় করতে বেরিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এমন সময় সার্বভৌম মহাশয় নৌকার সম্মুখে আসিতেই একজন শিষ্য বলিল—এই যে আমাদের গুরুদেব সার্বভৌম মহাশয়।

ভদ্রলোক সিঁড়ির দু'ধাপ নামিয়া আসিলেন এবং দুই হাত জোড় করিয়া কহিলেন—পরম সৌভাগ্য আমার, আজ আপনার এখানে আগমন। প্রণাম হই। নৌকোয় কেন, ওপরে আসুন। আমার বাড়িতে যদি এসেছেন তবে পায়ের ধূলো দিন।

সার্বভৌম মহাশয় বাড়ির কর্তার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—পরম সৌভাগ্য বলতে হবে, তবে আপনার আশ্রয়ে এই ঝড়-তুফানের মধ্যে এসে পড়েছি। এখন রাতটা আপনার এখানে নিরাপদে কাটিয়ে গেলেই জগদম্বাকে ধন্যবাদ দেব।



14.1.2011
14428

—সে কি পণ্ডিতমশাই! অতিথি-অভ্যাগত গৃহস্থের পরম আদরের। আর দেরী করবেন না, আপনি সশিষ্য ওপরে আসুন। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে সব ঠিক করে দিচ্ছি। সঙ্গের লোকদের উঠে আসতে বলুন। মাঝিরা বরং নৌকোয় যেমন থাকে তেমন থাক।

তারপর হঠাৎ সার্বভৌম মহাশয়ের দিকে চাহিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—জিনিসপত্রের জন্য ভয় করছেন? করবেন না, কোন ভয় নেই। আমার লোক থাকবে নৌকো পাহারা দিতে। আপনি সঙ্গীদের নিয়ে ওপরে চলে আসুন।

ভদ্রলোকের অনুরোধে সশিষ্য পণ্ডিত মহাশয় তীরে উঠিলেন। উঠিবামাত্রই ভদ্রলোক সার্বভৌম মহাশয়ের পদধূলি লইয়া বলিলেন: আমার নাম হরগোবিন্দ দাস। আপনার আশ্রিত বলেই মনে করবেন।

হরগোবিন্দের হাঁকডাকে বৈঠকখানা ঘরে ফরাশ পাতা হইল। আলো জ্বলিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই হরগোবিন্দ বাড়ির ভিতর হইতে বিরাট সিধা পাঠাইলেন। ছাত্র ও সঙ্গের ভৃত্যেরা মহা আনন্দে রান্না-বান্নার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।



॥ দুই ॥

পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্বভৌম মহাশয় পরম নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতেছেন। শিষ্যেরা রন্ধনে ব্যাপৃত। বাড়ির কর্তা মাঝে মাঝে আসিয়া খোঁজখবর লইতেছেন আবার বাড়ির ভিতর যাইতেছেন।

ঠাকুর মহাশয়ের একজন ভৃত্য রন্ধনের কি একটা প্রয়োজনে বাড়ির ভিতর গিয়াছে। বাড়ির মধ্যে পশ্চিম ভিটায় একটা প্রকাণ্ড ঘর। ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। সেই ঘরের পাশ দিয়াই অন্দর মহলের দিকে যাইতে হয়। সেখানে ভাঁড়ার ঘরে একজন ভাঁড়ারি। সে প্রয়োজন মত জিনিসপত্র যোগাইতেছে।

ভৃত্যটি শুনিতে পাইল বাড়ির কর্তার কণ্ঠস্বর—বাড়ি বসেই দাও মিলল রে—কালু! অনেক তৈজসপত্র টাকাকড়ি নিয়ে পণ্ডিত বাড়ি ফিরছে।

কালু উত্তর করিল—বামুন যে দাসমশাই!

—রেখে দে তোর বামুন!...গর্জিয়া উঠিল আর একটা লোক।

হরগোবিন্দ বলিলেন —চুপ চুপ, আস্তে আস্তে কথা কও। অনেক শিষ্য-যজমান আছে এখানে। কোন রকমে ফাঁস হলে ঘোর বিপদে পড়তে হবে।

তখন তাহারা কি ভাবে খাওয়া-দাওয়ার পর পণ্ডিত ও তাহার সঙ্গীদের মারিয়া ফেলা হইবে সে-বিষয়ে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন পরামর্শ করিল। সার্বভৌম মহাশয়ের লোকটি সে-সব কথা আর শুনিতে পাইল না।

ভাঁড়ারির কাছ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া সে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আসিয়া কহিল—ঠাকুরমশাই গো!...

সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

—কি রে, কি হয়েছে বল না?

—ও ঠাকুরমশাই কি হবে?

—কিসের কি হবে?

—আজ্ঞে ঠাকুরমশাই গো—এ-যে ডাকাতের বাড়ি! আমাদের সব কেটে লুঠপাট করে নেবে—কি হবে ঠাকুরমশাই!

কথাটা সকলের কানে গেল। শিষ্যদের রন্ধনের উৎসাহ হ্রাস পাইল। ভয়ে সকলেই কাঁপিতেছিল।

পণ্ডিত সার্বভৌম মহাশয় নির্ভীক ভাবে কহিলেন—সাবধান, কেউ গোল করো না। তোমরা নিজ নিজ কাজ কর। জয় মা তারা!—বলিয়া একটা হুঙ্কার দিয়া সেই ভৃত্যটিকে বলিলেন—আচ্ছা, তুই বাড়ির সেই কর্তাবাবুটিকে একবার এখানে ডেকে আনতে পারিস?

—আজ্ঞে, ভয় করে যে!

: কোন ভয় নেই! বেশ সাহস করে—জোর গলায় ডাকবি,—বলবি, সার্বভৌম মহাশয় আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।

তবু সে যেতে চায় না দেখিয়া, সার্বভৌম মহাশয় একজন শিষ্যকে বলিলেন—ওহে কৃষ্ণানন্দ, যাও ত ওর সঙ্গে। ডেকে নিয়ে এস হরগোবিন্দকে, কিছু ভয় করো না।

তাহারা বাড়ির ভিতর যাইতেই দেখিল একটা ঘরের দরজা খোলা। আলো জ্বলিতেছে। সে-আলোতে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, নানা অস্ত্রশস্ত্র। শিষ্য কৃষ্ণানন্দ বেশ সাহসী ছিল; ডাকিল—কর্তামশাই, একবার এদিকে আসুন, পণ্ডিতমশাই একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

হরগোবিন্দ দাস বলিলেন—আচ্ছা, আপনারা যান। আমি এখুনি আসছি।

দাসমহাশয় আসিতেই সার্বভৌম মহাশয় গভীর কণ্ঠে বলিলেন—আসুন, স্বাগতম্।

হরগোবিন্দ সার্বভৌমের তেজঃপুঞ্জ দেহ, উজ্জ্বল নয়ন এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরে গম্ভীর কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন; বিনীত ভাবে বলিলেন—আমাকে আপনি কি আদেশ করবেন?

—না না আদেশ নয়! আপনার সঙ্গে একটু শাস্ত্রালাপ করব।

—আজ্ঞে আমি অধম, শাস্ত্রের কি জানি?

—জানেন না! সে কি রকম কথা? নইলে এ আতিথেয়তা, এত ভোগের আয়োজন কিসের জন্য? অতিথি-সেবা পরম ধর্ম এই মনে করেই করেছেন; আমরা বিদেশী, আমাদের হনন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ত আর আশ্রয় দেন নি।

: আজ্ঞে এ কি কথা! এ কি বলছেন আপনি!

—না-না, কিছু না। আপনি বাড়ির কর্তা, আশ্রয়দাতা। আপনার দর্শন পাই না, তাই আপনাকে ডেকেছি; কেননা আপনার বাড়ির কাউকেও আমি দেখতে পাই না।

—আজ্ঞে সকলেই কাজে ব্যস্ত আছে কিনা!

—কি কাজ এই রাত্রিতে শুনতে পারি কি?—বলিয়াই, জয় মা দুর্গা ভবভয়-তারিণী!...বলিয়া এক বিরাট হুঙ্কার দিলেন।

ভয়াল নিস্তব্ধ নিশীথে সে ভৈরব হুঙ্কার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হরগোবিন্দ শিহরিয়া উঠিলেন।

সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন—আপনি বেশ বলিষ্ঠ লোক।

—আজ্ঞে না।

—লাঠি সড়কি তলোয়ার খেলতে পারেন? নিশ্চয়ই পারেন। পারেন আমাদের হত্যা করে সব লুঠ করে নিতে? পারেন? বলুন?

হরগোবিন্দ নীরব রহিলেন।

—আচ্ছা বলুন ত কে একজন আছেন, যাঁর কাছে সকলকেই হার মানতে হয়? বলুন ত তিনি কে?

—আজ্ঞে...

—জানেন তবু বলবেন না। সে আর কেউ নয়, মৃত্যু!

হরগোবিন্দ শিহরিয়া উঠিলেন।

—আপনি ভদ্রসন্তান, শুনলাম আপনি নরঘাতক দস্যু, আপনি ডাকাত! বলুন সত্য কিনা?

সার্বভৌম মহাশয় এমন দৃঢ়কণ্ঠে কথা কয়টি বলিলেন যে হরগোবিন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

—শোন হরগোবিন্দ, আমি জানতে পেরেছি, তুমি আমার এই সামান্য তৈজসপত্রের ও অর্থের লোভে আমাদের সকলকে হত্যার আয়োজন করেছ; বল সত্য কিনা?

—আজ্ঞে। এ কি কথা! এ কি কথা!

—তবে কি এ মিথ্যা কথা? বেশ ত, এই যদি তোমার অভিপ্রায়, আমি তোমাকে সব বিলিয়ে দিচ্ছি!...কৃষ্ণানন্দ, রামনাথ, শোন—তোমরা হরগোবিন্দকে আমার যা কিছু আছে, সব দিয়ে দাও; সব কিছু ভৃত্যদের নৌকো থেকে আনতে বল।...তারপর হরগোবিন্দের দিকে চাহিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন—চল তোমার হত্যাগৃহে। ডাক তোমার দলের সব লোকদের, আমাকে হত্যা করুক।.. তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—দেখ, তুমি কি ভেবেছ, তুমি অমর হয়ে এসেছ?

এই কথা বলিয়াই হরগোবিন্দের হাত ধরিয়া কহিলেন—চল, এস সকলে—হরগোবিন্দ আমাদের আশ্রয় দিয়ে হত্যা করবে এস, এস!

সার্বভৌম মহাশয়ের আদেশে শিষ্য, ভৃত্য প্রভৃতি সকলে হরগোবিন্দের অনুসরণ করিয়া সেই ভীষণ হত্যাগৃহে অগ্রসর হইল। হরগোবিন্দ বিহ্বলচিত্তে সঙ্গে চলিলেন।

সার্বভৌম মহাশয় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরে যমদূতের মত দস্যুদল প্রস্তুত হইয়াই ছিল—তাঁহাদের আক্রমণ করিবার জন্য। এইভাবে হরগোবিন্দের সহিত তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া দস্যুদল বিস্মিত হইল।

—সর্দার, কি হুকুম? হরগোবিন্দ কাতর কণ্ঠে বলিলেন—হুকুম আর নেই রে ভাই! হাতিয়ার ছাড়। গুরুদেবকে প্রণাম কর।

হরগোবিন্দ ও তাঁহার অনুচরগণ কি যেন মন্ত্রকুহকে পরিচালিত হইয়া কমলাকান্ত সার্বভৌমের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

তিনি হরগোবিন্দকে বুকে টানিয়া লইলেন; বলিলেন—ভাই, দস্যুতা বা ডাকাতি কি মানুষের ধর্ম। অর্থ কয়দিনের জন্য? জীবন কয়দিনের জন্য? সর্বমঙ্গলদায়িনী বিশ্বমাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর।

কি ভাবে কি হইয়া গেল দস্যুদল বুঝিতে পারিল না। সারারাত্রি ধর্মালোচনা হইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাতে নূতন আলোকে প্রদীপ্ত হইল সেই দস্যু-ভবন। হরগোবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গী ডাকাতদল সার্বভৌম মহাশয়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

কমলাকান্ত সার্বভৌমের সেই দস্যু-শিষ্যগণের বংশধরেরা আজিও গুরুবংশের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত এবং অনেকেই শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া খ্যাতিমান হইয়া আছে।

যেমন পাণ্ডিত্যে তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার নিমিত্ত সার্বভৌম মহাশয়ের নাম এখনও শুধু বিক্রমপুরে নয়, সারা বাংলাদেশের গৌরবস্বরূপ হইয়া আছে।

এ-কাহিনী অনেকেই জানেন। নিরস্ত্র একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ দুর্দান্ত দস্যুর কবলে পড়িয়াও যে-ভাবে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? তোমরা কি বল?



৮

ডাকাত চিত্রেশ্বর ও দেবী চিত্রেশ্বরী

॥ এক ॥

চিৎপুর রোড।

কলিকাতার একটি রাজপথ। ট্রাম চলে, গাড়ি চলে। লোকজনের কত ভিড়। সেদিন সে-পথে যাইতে যাইতে পথটি যেন আমার কানে কানে কহিল—ওগো! আমি চিরদিন এমন ছিলাম না।

—তবে কেমন ছিলে?

—সে-কথার খোঁজ তোমরা কর।

আমি নীরব রহিলাম। পথ পড়িয়া রহিল আপন স্থানে। তাহার বুকের ওপর দিয়া চলিল ঘড়-ঘড় রবে সব গাড়ি।

সত্য কথাই বলিয়াছে—চিৎপুরের পথ। এবার বলিতেছি তাহার কথা। কলিকাতার পুরনো কথা একটু বলি তবে।

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি—তাহা পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগের কথা। তখন ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ইংরেজ এদেশে বাণিজ্য করে, বড় বড় শহর ও মোকামে কুঠি তৈয়ারী করে, জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি করে। মুসলমান দেশের রাজা। মোগল সম্রাট দিল্লীর তক্তে। ক্রমশঃ তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে। সুবে বাংলার নবাবী মসনদে চলিতেছে গোলমাল—সরফরাজকে হারাইয়া দিয়া আলিবর্দী খাঁ নবাব হইয়া বসিয়াছেন। চারিদিকে অরাজকতা ও গোলমাল।

কলিকাতা এতবড় শহররূপে কোনদিন গড়িয়া উঠিবে, এমন কল্পনাও সেই সময়ে কেহ করে নাই। তখন সেখানে ছিল তিনখানা মাত্র গ্রাম—সুতানটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর। সেই সময় এই তিনটি গ্রাম ছিল বনে-জঙ্গলে ভরা। চিৎপুর খালের কাছে, ভাগীরথী নদীর কিনারা হইতে একটি রাস্তা সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া সুতানটি, বড়বাজার, কলিকাতা, গোবিন্দপুরের খাল, চৌরঙ্গী পার হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল আদিগঙ্গার পাড়ে কালীঘাটের মন্দির পর্যন্ত। এ-পথের নাম ছিল তীর্থযাত্রীর পথ—ইংরেজরা নাম দিয়াছিল পিল্‌গ্রিম রোড (Pilgrim Road)। উহাকে পথ বলা চলে না। যদি সেকালে—দুই শত বছর আগে পিছাইয়া যাওয়ার আমাদের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে চিৎপুর হইতে বাহির হইয়া দেখিতাম ভীষণ বন—সুন্দরীবনের সারি। আর কত যে সব বড় বড় গাছ ছিল, তাহাদের কতই বা নাম করিব! বেতঝোপ, কাশবন, ছোট-বড় খাল, বিল, পচা ডোবা, পানাপুকুর, জলা, বাগান, হোগলা

বন, বাঁশের ঝাড়—তাহার মধ্য দিয়া পায়ে চলার মত পথ। আর এই বনের মধ্যে ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে দস্যু-ডাকাতদের আড্ডা। তারপর আবার সুন্দরবনের বাঘ, ভালুক শূকরদের ছিল বাসস্থান—আর ছিল ছোট-বড় নানা জাতীয় বিষাক্ত সাপ। আর যে-সব ছোট-বড় খাল ও জলাভূমি ছিল, জোয়ার-ভাটায় সেখানে জমিত কাদা। কাদায় পথ ঢাকিয়া ফেলিত, সময় সময় পথ চলিতে একটু অসাবধান হইলে হাঁটু অবধি কাদার ভিতর ডুবিয়া যাইত। এই যে বলে, জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ,—সত্যি ছিল তাই। আর একটি পথ ছিল এখন যেখানে লালদীঘি সেখান হইতে পূবের দিকে লবণ জলের হ্রদ বা সল্ট ওয়াটার লেক (Salt Water Lake) পর্যন্ত। সেকালের কলিকাতার অনেক কথাই বলিলাম। এইবার গল্প বলিতেছি।

কলিকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে তখন দুইটি প্রাচীন কালীমন্দির ছিল। সেই মন্দির এখনও আছে। প্রথমটি চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দেবীর। এই দেবী যে কোন্ কালে কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরের চারিদিকে ছিল নিবিড় বন। বনের মধ্যে ছিল দেবীর মন্দির। অনেকদিন হইতেই লোকে বলে—চিত্রেশ্বর বা চিতে নামে ডাকাত-দলপতির দ্বারা স্থাপিত বলিয়া ইনি চিত্রেশ্বরী নামে পরিচিতা। অপরটি কালীঘাটের কালী-মন্দির। যাত্রীরা চিত্রেশ্বরী দেবী দর্শন করিয়া—দল বাঁধিয়া যাইত কালীঘাটে কালী-দর্শনে। আগে যে চিৎপুরের পথের কথা বলিয়াছি, সেই পথ দিয়া। সময় সময় যাত্রীদের কেহ কেহ সাপ বা বাঘের মুখে প্রাণ দিত, কেহ বা ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারাইত। ডাকাতেরা লুঠতরাজ করিয়া যাত্রীদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইত; তারপর তাহাদের হত্যা করিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিত কিংবা খালের জলে ভাসাইয়া দিত।

সেকালের এই তিনটি গ্রাম শুধু নয়—গঙ্গার দুই পারে যত গ্রাম ছিল, সেই সকল গ্রামের লোকেরা চিতে ডাকাতের নামে ভয় পাইত। তাহার নাম এখনও আমরা ভুলি নাই। কিংবদন্তী এই যে, চিতে ডাকাতের নাম হইতেই বর্তমান চিৎপুর রোডের নাম হইয়াছে। চিতে ডাকাতের ভাল নাম ছিল চিত্রেশ্বর—সেজন্য অনেকে বলিত চিত্রপুর, কেহ কেহ বলিত চিৎপুর। শেষটা চিৎপুর নামই চলিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য! আমাদের কলিকাতার ইতিহাসে চিতে ডাকাতের নাম অমর হইয়া আছে।

প্রতিদিন কালীমায়ের কাছে নরবলি দিয়া চিত্রেশ্বর ডাকাতি করিতে যাইত। সে ছিল মস্ত বড় এক দলের সর্দার। তাহার দলে প্রায় পাঁচশত ডাকাত ছিল। তাহাদের কেহ ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে, কেহ ছিল লেঠেল, কেহ ছিল তলোয়ারি, কেহ ছিল ধানুকী—তীর ছুঁড়িয়া মারিতে দক্ষ। নদীর বুকে ছিল অসংখ্য জলদস্যু তাহার অনুগত। হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান পর্যন্ত ছিল চিতে ডাকাতের দলের লোকদের আড্ডা।

চিতে ডাকাতের দলে ছিল নানা দেশের নানা জাতির লোক। কেহ ছিল বিহারী, কেহ ছিল উড়িয়া, কেহ বেদে, কেহ মুসলমান। বেদে ডাকাতদের বলা হইত শিকারী।

চিতে ডাকাত এমন একটি দল চারিদিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং শহরে ও পল্লীর নানা স্থানে এমন সব ঘাঁটি তৈয়ারী করিয়াছিল যে, তাহার দলকে ধরা ছিল বড় কঠিন। যদি ধরা পড়ার সম্ভাবনা ঘটিত অমনি চন্দননগর, হুগলী ও বর্ধমানের কোন দূর পল্লীগ্রামে গিয়া তাহারা লুকাইয়া থাকিত। কাহার সাধ্য ধরে?

চিতে ডাকাত ছিল অসাধারণ সাহসী। সে কিন্তু তাহার আড্ডা ছাড়িয়া কোথাও পলায়ন করিত না। সে চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরে নিজের মন্ত্রে মায়ের পূজা করিত, সে কোন্ মন্ত্র কে-ই বা জানে! তমলুকের বর্গভীমা, কালীঘাটের কালী, প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী মূর্তির ন্যায় চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী ছিলেন ভীষণা মূর্তি।

চিতে ডাকাতের দল ডাকাতিতে বাহির হইবার পূর্বে মায়ের মন্দিরে পূজা দিত। সে পূজার অর্ঘ্য ছিল নরবলি। চিত্রেশ্বর পূজা করিবার পর মায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিত। তারপর ভক্তিভরে জবা পুষ্প ও অন্যান্য পুষ্প, বিল্বপত্র প্রভৃতি দিয়া অপেক্ষা করিত। যদি সে পুষ্পাঞ্জলি মায়ের পদে স্থির থাকিত, তবে মাতার সম্মতি-সূচক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া দলের লোককে জলে ও স্থলে লুণ্ঠন করিতে পাঠাইত।

পূর্বে চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দির একেবারে গঙ্গার ওপর অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

॥ দুই ॥

সে-দিন ছিল অমাবস্যা, শনিবার। গভীর অরণ্যের মধ্যে চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে ডাকাতের দল মিলিত হইয়াছিল।

মায়ের পূজার সময় উপস্থিত হইল। গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। পাতাটি পর্যন্ত নড়িতেছে না। মাঝে মাঝে বন্য ব্যাঘ্রের চিৎকার শোনা যাইতেছে। পুরোহিত ছিল দুইজন—একজন কাপালিক ব্রাহ্মণ, আর নিজে চিত্রেশ্বর। চারিদিকে তান্ত্রিকদের পূজার আয়োজন, নরকপালে কারণ; শব নাই, শব না হইলে ত পূজা হইতে পারে না। ভীমা ভৈরবী চিত্রেশ্বরী চণ্ডিকা দেবীর পূজার আয়োজন সব ঠিক; কিন্তু শব কই? শবারূঢ়া মুক্তকেশী মুণ্ডমালা বিভূষণা খড়্গমুণ্ডধরা দেবী যেন বলি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন, রক্ত চাই। তান্ত্রিক পুরোহিত দেহে ও ললাটে রক্তচন্দনাদি লিপ্ত করিয়া মহাশঙ্খের মালা জপ করিতেছিলেন। এক দীর্ঘকায় সুন্দর যুবক চলিয়াছিল সেই পথে কালীক্ষেত্র কালীঘাটে। সে দলভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সুযোগ পাইয়া ডাকাত দল তাহাকে ধরিয়া আনিল। 'জয় মা কালী! জয় মা কালী!'—বলিয়া উন্মত্ত দস্যুর দল হল্লা করিয়া উঠিল।

সেই ভীষণা কালীমূর্তি দেখিয়া যুবক শিহরিয়া উঠিল। চারিদিকে ভীষণ শ্মশান, মানুষের অস্থি-কঙ্কাল দেখিয়া যুবক সভয়ে কহিল—আমি ব্রাহ্মণ। আমাকে প্রাণে মেরো না। আমাকে ছেড়ে দাও

আমি বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

যুবকের কথা শুনিয়া চিতে ডাকাত চিৎকার করিয়া কহিল—ভয় নাই! কে শোনে কাহার কথা! দস্যুদল তাহাকে ধরিয়া যূপকাষ্ঠের দিকে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ যুবক দেখিল, তাহার প্রাণরক্ষার আর কোন আশা নাই। সে ছিল শক্তিশালী পুরুষ—পাগলের মত চিৎকার করিতে লাগিল—আমাকে বাঁচাও।…রক্ষা কর। এই কথা বলিতে বলিতে মদমত্ত ডাকাতদের হাত ছাড়াইয়া যেমন কয়েক হাত দূরে আসিয়াছে—ডাকাতেরাও তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে। এমন সময় সেখানে মশাল জ্বালাইয়া প্রায় একশত যাত্রী বাড়ি যাইবার পথে আসিয়া পড়িল, তাহারা কালীঘাটে মায়ের পূজা দিয়া বেলা থাকিতেই রওনা হইয়াছিল; কিন্তু গভীর বনে পথ হারাইয়া চিত্রেশ্বরী দেবীর কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ যুবক সেই লোকদের পাইয়া রক্ষা পাইল।

সেদিন চিত্রেশ্বরী দেবীর আশীর্বাদ মিলিল না—পূজা হইল না, বলিও বাদ গেল। চিতে ডাকাতের মন ভাবী বিপদের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।



॥ তিন ॥

চিতে ডাকাত এতদূর দুঃসাহসী ছিল যে, কোম্পানীর মালবোঝাই যে-সব নৌকা কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ যাইত এবং মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা, হুগলী, গোবিন্দপুর আসিত সেগুলি অনবরত লুঠিয়া লইত। তখন গোবিন্দপুর তুলা ও সূতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সূতা বোঝাই নৌকা গিয়াছে মুর্শিদাবাদের দিকে—নৌকা লুঠ হইল, মাঝিমাল্লারা প্রাণ দিল। কি করিয়া এমন ভাবে ডাকাতি হয়, বোঝা কঠিন হইয়া পড়িল। পর্তুগীজ বোম্বেটের দলও হার মানিতে লাগিল। সেকালে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার জলপথে ও স্থলপথে এমন ধারা ডাকাতি হইত প্রতিনিয়ত। আবার হিজলী হইতে ছোট ছোট নৌকায় যে লবণ আমদানি হইত, চিতে ডাকাতের একদল তাহাও লুঠ করিত। এইজন্য ঐ কালে সাধারণ লোক যাতায়াত করিতে সাহসই পাইত না—ব্যবসায়ীরাও দল বাঁধিয়া সতর্কভাবে চলাফেরা করিত।

দুর্দান্ত দস্যু চিতে ডাকাতের ভয়ে কোম্পানীর পর্যন্ত টনক নড়িয়াছিল। বড়লোকদের বাড়ি লুণ্ঠন করিতে, টাকাকড়ি কাড়িয়া লইতে তাহার এতটুকু কুণ্ঠা ছিল না। কে তাহাকে ধরিবে? তাহার জনবল, বনের অজ্ঞাত স্থানে বাস—এ সকলও ছিল তাহার পক্ষে অনুকূল। কাজেই চিতে ডাকাত নির্ভয়ে ডাকাতি করিত, তাহাকে কেহই দমন করিতে পারিতেছিল না।

সে-সময়ে চিৎপুরে একঘর সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বাস করিতেন। চক্রপাণি দত্ত নামে সেই পরিবারের একজন নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী, তেমনি ছিলেন বীর; ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। চক্রপাণি থাকিতেন বিদেশে; কেহ বলেন গৌড়ে, কেহ বলেন মুর্শিদাবাদে। একবার চক্রপাণি বিদেশ হইতে নিজ পরিবার-পরিজন লইয়া নিজ গ্রামে চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী দেবীর পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় চিতে ডাকাতের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ বাধে। চক্রপাণির বীরত্বে, সাহসিকতা ও রণ-নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া গ্রামের ও আশেপাশের লোকেরা তাঁহাকে সাহায্য করিল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, যেমন করিয়াই হউক চিতে ডাকাতকে দমন করিবেন। তিনি কোম্পানীর কর্মচারী ও নবাব সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিতে ডাকাতকে ধরিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি গোপনে গভীর অরণ্যের মধ্যে কোম্পানীর ও নবাবের সৈন্য ও ফৌজ লইয়া চিত্রেশ্বর ডাকাতকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

লোকের মনে ধারণা ছিল যে, চিত্রেশ্বর ডাকাত যদি দেবী চিত্রেশ্বরী পূজা সমাপন করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত, তবে জাগ্রত দেবীর বরাভয়ে সে অসাধ্য সাধন করিতে পারিত; কাহারও সাধ্য থাকিত না তাহাকে দমন করে।

সেদিন দেবীর বলি কি ভাবে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে; তাহাতে চিতে ডাকাতের মনে হইয়াছিল, মা বুঝি তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, নহিলে এইরূপ হইবে কেন? অবশেষে কিন্তু তাহাই হইল।

ব্রাহ্মণ যুবক সরিয়া পড়িবার পরে গভীর রাত্রিতে চিতে ডাকাত পূজায় বসিয়াছে। ডাকাতেরা সতর্ক পাহারা দিতেছে। এমন সময়ে কোম্পানীর ও নবাবের ফৌজ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কোন দিক দিয়াই ডাকাতদল পলাইতে পারিল না। সৈন্যেরা চারিদিক দিয়া দেবীর মন্দির ও অরণ্য অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। লোকের ধারণা এই যে, চিতে ডাকাত যদি বলি দিয়া দেবীপূজা সম্পন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে সৈন্যদিগকে হারাইয়া দিতে পারিত! কিন্তু তাহা সে পারিল না। প্রাণভয়ে পলাইতে গিয়া ধৃত হইল এবং সেকালের বিধান অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

পরবর্তী কালের বিখ্যাত রঘু ডাকাতের পূর্বপুরুষ ছিল চিত্রেশ্বর ডাকাত। তাহার স্থাপিত মূর্তি ও মন্দির সেখানেই পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে সেই মূর্তি আবার আবিষ্কৃত হইয়া পূজিত হইতেছে।

---

* চিৎপুর ও চিত্রেশ্বরী দেবী সম্বন্ধে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের Calcutta Review Volume III-এর ৪৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—It was then written Chittrapour, and was noted for the temple of Chittresaree Dabee or the Goddess of Chittru, known among Europeans as the temple of Kali at Chitpore. According to popular and uncontradicted tradition, this was the spot where the largest number of human sacrifices was offered to Goddess in Bengal before the establishment of the British Government.

বর্তমানে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া রূপান্তরিত অবস্থায় চিত্রেশ্বরী দেবী ৯নং গান ফাউণ্ডারী রোডে প্রতিষ্ঠিতা আছেন।



৯ ডাকাতের যীশুভজা

॥ এক ॥

কোম্পানীর মুলুক।

কলিকাতা শহরে ও আশেপাশের পল্লীতে ডাকাতের দৌরাত্ম্যে অনেক ভদ্রসন্তান বাসস্থান ছাড়িতেছেন। নিরুপায়! অরাজকতা পূর্ণমাত্রায়। দিনের বেলাও কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে দস্যুদলের অত্যাচার চলে।

সেই সময়ে বাঁশবেড়িয়া থানার একটি পল্লীর নিভৃত স্থানে এক কালীমন্দির ছিল। চারিদিকে গভীর বন। সেই বনের প্রবেশপথ দূর বাঁশবেড়িয়ার একটি রাজপথ হইতে বাহির হইয়াছে। দুইধারে এত ঘন বাঁশের ঝাড়, লতাগুল্ম, বেতবন যে, সদর রাস্তা হইতে কাহার সাধ্য বুঝিবে—সেখানে কোন মন্দির আছে।

ঐ কালীর নাম সিদ্ধেশ্বরী। ভাঙ্গাচোরা মন্দির। মন্দিরের উপর এক বিরাট বটগাছ,—দৈত্যের মত মন্দিরের চুড়া যেন হাতে পায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছে। নিকটে প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির জল বেশ পরিষ্কার, টলমল করে। দীঘির চারি পাড়ে ভাঙা ইঁটের স্তূপ। লোকে বলে, এক সময়ে, এই দীঘি, পুকুর মন্দির-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বাংলার প্রাচীন রাজধানী সপ্তগ্রামের অন্তর্ভূত ছিল। এখন পড়িয়া আছে সব ধ্বংসের স্মৃতি।

ডাকাতেরা এইরূপ নীরব নির্জন স্থানে মিলিত হইয়াছিল মায়ের পূজা দিতে—নরবলি দিয়া। বলি শেষ হইয়াছে। রক্তে চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে। একপাশে মাথাটা পড়িয়া আছে, অন্যপাশে সারাটা দেহ। কি ভীষণ—কি শোচনীয় সে-দৃশ্য!

গভীর রজনী। চারিদিক নিস্তব্ধ। ডাকাতেরা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে। এই দলের সর্দার ছিল গোপাল মুখুয্যে। ষষ্ঠী ধুপী, দীনু ধুপী, ঠাকুরদাস বাগদী, সদানন্দ, ভৈরব, রাজু বৈরাগী, গঙ্গারাম বাগদী, কার্তিক কলু—ইহারা এই দলে ছিল।

ডাকাতদের আজ বড় আনন্দ। মায়ের আজ পূজা মিলিয়াছে—মা নরবলি গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাহারা পরামর্শ করিতেছে, জেলার কোন্ অঞ্চলে ডাকাতি করিতে যাইবে। তাহাদের সঙ্গে ধেনো মদ, মাছ, মাংস, ফল, ফুল সব পূজোপকরণ। দলের সর্দার গোপাল মুখুয্যে পূজাশেষে ডাকাতি করিবার অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া দেবীর নির্মাল্যসহ এক-একজনের হাতে দিতেছিল। কাহারও হাতে সিঁধকাঠি কাহারও হাতে তরোয়াল, কাহারও হাতে ঢাল, বর্শা—এইভাবে নানা যন্ত্রপাতি ও আশীর্বাদী পুষ্প দেওয়া হইল।

তারপর সকলে বসিল ভোজে। সে এক অদ্ভূত রকমের ভোজ। একসঙ্গে গোলাকার হইয়া বসিয়া পূজায় প্রদত্ত মদ-মাংস সকলে পেট ভরিয়া খাইয়া "জয় মা সিদ্ধেশ্বরী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর আরম্ভ হইল ডাকাতি করিবার উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরা। সকলে মালকোচা মারিয়া কাপড় পরিল, সারা গায়ে তৈল মাখিল, চোখে পরিল ভূষি কালির অঞ্জন, মাথায় পরিল পাগড়ি, কালো মুখোশে ঢাকিল মুখ। তারপর 'হা-রে-রে-রে' শব্দ করিয়া ও 'জয় মা সিদ্ধেশ্বরী' বলিয়া তাহারা চলিল ডাকাতি করিতে।

গঙ্গার ঘাটে তাহাদের নৌকা বাঁধা ছিল। সেই নৌকায় করিয়া দল বাঁধিয়া তাহারা চলিল বারাসতের মাজিরগ্রামে ডাকাতি করিতে। থানা কদমগাছি। সে-গ্রামে ছিলেন একজন ধনী মোদক। বিরাট তাঁহার বাড়ি; চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের বাহিরে ফলের বাগান—বনজঙ্গল।

কেহ চড়িল গাছে, কেহ সিঁধ কাঠি দিয়া দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঘরের দরজার হুড়কা ভাঙ্গিয়া সকলে ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। বাহিরের একটা ঘরে একজন মুহুরী ছিলেন। তিনি হঠাৎ জাগিয়া বাহির হইতে দেখিলেন মশালের আলো ও লোকজন। দলে অনেক ডাকাত—প্রায় পঞ্চাশ জন ডাকাত একত্র হইয়া লুটতরাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাড়ির কর্তা বৃদ্ধ হরিদাস মোদক ডাকাতের সর্দারের হাতে চাবি তুলিয়া দিয়াছেন; করুণকণ্ঠে বলিতেছেন—তোমরা সব নাও—শুধু আমার বাড়ির শিশু, মেয়ে ও বৌ-ঝির ওপর অত্যাচার করো না।

ডাকাতেরা কিন্তু তবুও তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িল না; হাত-পা বাঁধিয়া প্রহারে জর্জরিত করিল সেই বৃদ্ধ মোদককে। আরম্ভ হইল হৈ-হল্লা ও লুঠপাট।



॥ দুই ॥

মুহুরী মহাশয় কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বাগদীপাড়া ও ডোমপাড়ায় গিয়া মোদক মহাশয়ের বাড়ির ডাকাতির কথা বলিয়া আসিলেন। সহসা ডোম ও বাগদীরা দলে দলে লাঠি, বর্শা, তরোয়াল দা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র হাতে করিয়া হৈ-হৈ শব্দ করিতে করিতে মোদক মহাশয়ের বাড়িতে আসিয়া চারিদিক ঘিরিয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিল।

ডাকাতেরা বুঝিতে পারিল গ্রামের লোকেরা সংবাদ পাইয়াছে। তখন তাঁহারাও বাহিরে যাইবার জন্য ছুটাছুটি শুরু করিল। যে-দিকে যায় সে-দিক থেকেই তাহারা বাধা পায়। যখনি দেওয়াল টপকাইয়া বাহিরে যায় অমনি বাগদী ও ডোমেরা তাহাদের আক্রমণ করে। ধ্বস্তাধস্তি ও চীৎকারে চারিদিক হইতে আরও লোকজন আসিয়া

ডাকাত ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। অসীম সাহসী কয়েকজন ডাকাত কোন রকমে কৌশলে পথ করিয়া পলাইল।

এদিকে মুহুরী রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। থানার দারোগা তৎক্ষণাৎ একদল সিপাহী লইয়া ছুটিলেন। না ছুটিয়া উপায় ছিল না! তখন ওয়াকফ্ সাহেব ডাকাতি দমনের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। থানায় থানায় তাঁহার পরোয়ানা ছিল—যে থানাদার ডাকাত ধরিতে পারিবে তাহাকে সরকার পুরস্কার ত দিবেনই, কাজেরও উন্নতি করিয়া দিবেন। যে দারোগা ডাকাতির খবর পাইয়াও ডাকাত ধরিবার ব্যবস্থা করিবে না, তাহাকে পদচ্যুত করা হইবে।

সেই সময় কদমগাছি থানার দারোগা ছিলেন একজন জবরদস্ত লোক। তিনি মুহুরীকে সঙ্গে করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে। সূর্য উঠিয়াছে। ডাকাতের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সমানে লড়াই চলিয়াছে। উভয় পক্ষই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। দারোগা বংশী দত্ত ফৌজ দিয়া চারিদিক ঘিরিলেন এবং বন্দুক চালাইয়া কয়েকজন ডাকাতকে আহত করিলেন। ডাকাতদের মধ্যে পাঁচ-ছয়জন ব্যতীত সকলেই ধরা পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে মোদক মহাশয়ের আর্থিক ক্ষতি অল্পই হইয়াছিল। তিনি কোন রকমে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

কদমগাছির ডাকাতির বিচারে ডাকাতদের প্রায় সকলেরই কোন-না-কোন রকম সাজা হইয়াছিল। ডাকাতদেব দুইজনের প্রতি নরহত্যা ও বিবিধ ডাকাতির জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।



॥ তিন ॥

সেকালে কোম্পানীর বিধান ছিল—দুর্দান্ত ডাকাতদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা।

যে দুইজন ডাকাতের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল তাহাদের কালীর প্রতি বিশ্বাস হ্রাস পাইল। মা সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিয়া তাহারা ডাকাতি করিতে বাহির হইয়াছিল, শেষটায় মা সিদ্ধেশ্বরী রক্ষা তো করিলেনই না, বরং তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল।

একজন রোমান ক্যাথলিক দেশী খৃস্টানেরও সেই সময়ে নরহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ফাঁসির পূর্বদিন একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী আসিয়া তাহার জন্য যীশুখৃস্টের নিকট মৃত্যুকালীন প্রার্থনা করিতেছিলেন।

তাহা দেখিয়া ডাকাত দুইজন মনে করিল, কালী যখন তাহাদের রক্ষা করিলেন না, তখন এমন কালীর নাম মুখে লইবে না। মৃত্যুর পরেও যে সিদ্ধেশ্বরী তাহাদের স্বর্গে লইয়া যাইবেন, এই বিশ্বাসও তাহাদের লোপ পাইল। কাজেই তাহারা পাদ্রীকে অনুরোধ করিল, আপনি আমাদের খৃস্টান করুন।

পাদ্রী তাহাই করিলেন। বাংলা করিয়া যীশুর নিকট প্রার্থনা-বাণী ডাকাত দুইজনকে শুনাইলেন—পরপারে যাহাতে তাহারা অক্ষয় শান্তি লাভ করিতে পারে।

এই দুইজন ডাকাতের ফাঁসী হইবার পর খুব ধূমধামের সহিত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের সৎকার করিয়াছিলেন।*



১০ বিশ্বনাথ ডাকাত

॥ এক ॥

গঙ্গার পশ্চিম তীরে রিষড়া গ্রাম। একশত বৎসর আগে গ্রামখানি ছিল জন-বিরল—ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। গঙ্গার পাড় ছিল পাহাড়ের মত উঁচু। সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া লোকেরা গঙ্গাস্নানে আসিত, যাইত—নৌকায় করিয়া নানাদিকে যাতায়াত করিত। সেই সময়ে রিষড়া গ্রামে বাস করিত এক দুর্দান্ত ডাকাত, তাহার নাম ছিল বিশ্বনাথ ডোম।

বিশ্বনাথ ডোম দেখিতে ছিল দীর্ঘকায়—হাড়ে-মাসে জড়িত সবল পুরুষ; ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। লাটি-তরোয়াল চালাইতে এবং বর্শা ছুঁড়িতে সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। মাথায় ছিল কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল—বাহুতে ছিল সোনার বাজু, দুই হাতের কর-প্রকোষ্ঠে সোনার বালা, গলায় সোনার হার। সমুদয় হুগলী, বর্ধমান, নবদ্বীপ ও কলিকাতার অধিবাসীরা তাহার নামে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। বিশ্বনাথের সুগম্ভীর কর্কশ কণ্ঠস্বর, মদ্যপানের জন্য জবাফুলের মত রক্তচক্ষু, হা-রে-রে চীৎকার ও নিত্য নূতন উপদ্রবের জন্য তাহাকে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয় করিত। বিশ্বনাথ ডোমের একটা গুণ ছিল যে, সে দীন-দরিদ্রের উপর কখনও কোন অত্যাচার-উৎপীড়ন করিত না, এজন্য দরিদ্রেরা তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। অনেক সময় দীন-দরিদ্রদের সে গোপনে সাহায্যও করিত।

---

* These men at last, out of pure revenge upon Kalee died in the faith of the Virgin Mary and the Catholics who after their execution made a grand funeral for them, as these persons, they said, embraced the Catholic faith and renounced their casts *from conviction.* (History, Literature and Religion of the Hindoos,—Page 112)

নবদ্বীপের কাছাকাছি একটি গ্রামে ওলাউঠার অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছে। সে গ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের এক ধনী গোয়ালার বাড়ি বিশ্বনাথের দল আক্রমণ করিয়া অনেক টাকাকড়ি লুটিয়া লইয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় ঐ ছোট গ্রামের ভিতর দিয়া আসিতে হয়। বিশ্বনাথ দেখিল সে-গ্রাম একরূপ জনশূন্য, ঘরে ঘরে হাহাকার। লোক মড়কে মরিতেছে, সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। শহরের ডাক্তারদের টাকা দিয়া আনিবার ক্ষমতা নাই—বিনা চিকিৎসায় সব লোক মরিতেছে। এক বাড়িতে খুব কান্নাকাটি চলিতেছে—এক বুড়ীর একমাত্র সম্বল একটি নাতির ওলাউঠা হইয়াছে। শহরের ডাক্তারবাবু সেই গ্রামের পথ দিয়া পাল্কী চড়িয়া যাইতেছেন চৌধুরী জমিদারের বাড়িতে চিকিৎসা করিতে। বুড়ী গিয়া তাহার পাল্কীর সামনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—ডাক্তারবাবু আমার বাড়ি এসে আমার নাতিকে একবার দেখে যান।



ডাক্তার বিরক্ত হইয়া গর্জন করিয়া বলিলেন, যা যা আমার সময় নেই, টাকা দিতে পারবি? দশ টাকা দিতে হবে। পারবি দিতে? তবে আগে টাকা নিয়ে আয়। বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—টাকা ত নেই ডাক্তারবাবু, একটু দয়া করুন।

ডাক্তার মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন—অমনি হয় না।—তারপর পাল্কীর বেহারাদের বললেন—ওরে পাল্কী তোল্। বেহারারা পাল্কী তুলিতেই বুড়ী কাঁদিয়া মাটিতে আছড়াইয়া পড়িল—বাবু, বাবু!

ওদিকে বুড়ীর কুঁড়েঘরের ভিতর হইতে করুণ চীৎকার শুনা যাইতেছিল—দিদিমা! উঃ জল! জল!

এমন সময় সেই পথ দিয়া বিশ্বনাথ সদলবলে গঙ্গার দিকে তাহাদের নৌকায় ও ছিপে ফিরিতেছিল। সে বুড়ীর করুণ মিনতি ও ডাক্তারের কথা শুনিতে পাইয়াছিল। বিশ্বনাথ অমনি দলের লোকদের হুকুম করিল—ডাক্তারের পাল্কী ধর! যেতে দিবি নি!

আদেশ প্রতিপালিত হইল। ডাক্তারের কাছে আসিয়া বিশ্বনাথ চীৎকার করিয়া বলিল—নাম্ ডাক্তার! যদি বুড়ীর নাতিকে ভাল করে দিতে না পারিস তাহলে তোকে মেরে তোর লাশ ভাসিয়ে দেব নদীর জলে—আর বুড়ীর নাতি ভাল হলে তোকে পঞ্চাশ টাকা দেব।

ডাক্তার কি যেন বলিতেছিলেন; বিশ্বনাথ তাঁহার সম্মুখে সজোরে লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া বলিল—সাবধান! জানিস আমি কে?

ডাক্তার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পাল্কীতে থাকিয়াই বলিলেন—জানি না ত!

বিশ্বনাথ গম্ভীরস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল—তবে শোন, আমার নাম বিশ্বনাথ ডোম, বাড়ি আমার রিষড়া। আমি বিশ্বনাথ ডাকাত।

ডাক্তার নির্বাক! তখনই তিনি ভয়ে ভয়ে তাঁহার ঔষধের বাক্সটি লইয়া বুড়ীর নাতির চিকিৎসা করিতে বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেকালে ডাক্তার ছিল সুদুর্লভ!

বিশ্বনাথ তাহার দলের কয়েকজন লোককে মোতায়েন রাখিয়া বলিল—তোরা এখানে পাহারা থাক। বুড়ীর নাতির ভালমন্দ যাই হোক না কেন, ছুটে গিয়ে আমায় খবর দিবি। আমি লোকজন এনে গ্রামের শবগুলির সংকারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেল।

বুড়ীর বরাত ভাল! তাহার নাতি আরোগ্য লাভ করিল। বিশ্বনাথ ডাক্তারকে প্রতিশ্রুতি মত টাকা দিল এবং বলিল—এ-গ্রামের যারা এখন রোগে ভুগচে তাদের তুই ভাল করে দিয়ে তবে যেতে পারবি। টাকার জন্য ভাবিস নি! জমিদার বেটা যে টাকা দিত তার দশগুণ টাকা দেব।

ডাক্তার আর কি করেন। প্রাণের ভয়ে এবং ডাকাত হইলেও লোকটি যে সত্যবাদী সে প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া তাহার আদেশ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃতজ্ঞ বুড়ী বলিল—ও বাবা, তুমি কে? তুমি কি দেবতা?

বিশ্বনাথ ধমক দিয়া কহিল—আমি দেবতার যম—বিশ্বনাথ ডোম। রিষড়ার ডাকাত বিশ্বনাথ।

বুড়ী ত বিশ্বনাথের নাম শুনিয়া ভয়ে 'ওরে বাবা' বলিয়া মূর্চ্ছা যায় আর কি! বিশ্বনাথ তাহাকে অভয় দিয়া বলিল—কোন ভয় নেই মা, কখনও বিপদে পড়লে, মনে রাখিস্ তোর এই ডাকাত ছেলেকে।

গরীবের প্রতি তাহার এই ধরনের সদয় ব্যবহারের জন্য অনেকে আবার তাকে ভালবাসিত।



॥ দুই ॥

বিশ্বনাথ ডাকাত কিন্তু অবশেষে একদিন ধরা পড়িল। একবার সে একজন ধনী জমিদারের বাড়ি ডাকাতি করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। হুগলী জেলার এক বিখ্যাত গ্রামের জমিদারের বাড়ি। এই জমিদার ছিলেন প্রজাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচারী ও দুর্দান্ত। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তাঁহার খুবই সম্প্রীতি। সেই সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও নীলের নিজ আবাদ ছিল, অর্থাৎ প্রজাদের দাদন দিয়া নীলের চাষ করাইতেন। তিনি নীলখালাসীদের পাঠাইয়া নিজ আবাদ সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করাইতেন। নিড়ানির সময় অর্থাৎ নীল-

গাছগুলির ছোট অবস্থায় ক্ষেতের জঙ্গল দূর করিবার সময় দাদন-দেওয়া চাষীদের সামান্য ত্রুটি হইলে আমিন ও নায়েবের দ্বারা তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করাইতেন। জমিদার ছিলেন খুবই ধনী। তাঁহার বাড়িতে সর্বদা ভোজপুরী দারোয়ান পাহারা দিত। বিশ্বনাথ ডোমের দলের লোকেরা ঐ জমিদার বাড়িতে ডাকাতি করিতে অনুরোধ করিল! বিশ্বনাথ রাজী হইল এবং সেকালের ডাকাতদের মত জমিদারবাবুকে পূর্বেই পত্র দিল যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার বাড়িতে বিশ্বনাথ ডাকাতি করিতে যাইবে।

জমিদারবাবুও এই চিঠি পাইয়া শ্রীরামপুরে লোক পাঠাইলেন। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সমুদয় অবস্থা জানাইয়া তাহাকে ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিবার অনুরোধ জানাইলেন।

বকল্যাণ্ড সাহেব নামে একজন নতুন সিভিলিয়ান তখন শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া সিপাহী-সান্ত্রী, দারোগা-কনস্টেবল প্রভৃতি সহ সেই জমিদার-বাড়ি যাইবার পথঘাট—জলপথ ও স্থলপথ আগুলিয়া রহিলেন। বিশ্বনাথ এই সংবাদ পাইয়াও এক জঙ্গলের মধ্য দিয়া গোপনে তাহার দলের প্রায় দুইশত লোক লইয়া সেই জমিদার-বাড়ি ডাকাতি করিতে চলিল।

বকল্যাণ্ড সাহেব এই সংবাদ পাওয়া মাত্র কোমরে তরোয়াল ঝুলাইয়া ও বন্দুক লইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া সদলবলে গ্রামের দিকে চলিলেন, জলপথে ও স্থলপথে ডাকাতের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

অল্প দূরে একটা গ্রামের প্রান্তে দুই দলের সাক্ষাৎ হইল। দুই পক্ষে হাতাহাতি, মারামারি—বর্শা, মুগুর, তরোয়াল ও লাঠিতে লাঠিতে লড়াই চলিল। অবশেষে কোম্পানীর ফৌজের কাছে ডাকাতেরা হার মানিল এবং বকল্যাণ্ড সাহেবের হাতে বিশ্বনাথ ডোম ধরা পড়িল। তাহার দলের লোকেরা অনেকে পলাইল, অনেকে ধরা পড়িল। পলায়নপর ডাকাতদের পিছু পিছু সিপাহী ছুটিল।

বিশ্বনাথ ডোম ধরা পড়ায় চারদিকে একটা আনন্দের সারা পড়িয়া গেল। সে যে কত নরহত্যা করিয়াছিল, কত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি লুঠতরাজ করিয়াছিল তাহার সীমা-সংখ্যা ছিল না। তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইলে হুগলী জেলে একদিন তাঁহার ফাঁসী হইল।



॥ তিন ॥

বকল্যাণ্ড সাহেব বিশ্বনাথকে ধরিবার পর 'সমাচার দর্পণ' পত্রে বকল্যাণ্ড সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে বিশ্বনাথ ডোমের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা এবং সে যে কি ভয়ানক ডাকাত ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই পত্রখানি প্রকাশ করিলাম।

সত্যপরায়ণ শ্রীযুত প্রকাশক মহোদয়েষু—

নিম্নস্থিত কতিপয় পংক্তি সংশোধন পূর্বক দর্পণে স্থানার্পণে পরম বাধিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত বকল্যাণ্ড সাহেব,

অখণ্ড প্রচণ্ড মার্তণ্ডবৎ দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত দেশহিতৈষী সদ্‌গুণ-রাশি বিপুল সাহসী দস্যুদ্বেষী অনুগতপোষী সুবিজ্ঞ সুচতুর শ্রীযুক্ত জাইণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহোদয় শ্রীরামপুর সহরে উদয় হওনান্তর আমরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মুক্তকণ্ঠে অনবরত ধন্য ধন্য করিতেছি এবং ভবদীয় গুণকীর্তনে অস্মাদাদির রসনা নিরন্তর ব্যগ্র হইয়া পলার্দ্ধ জন্যও বিশ্রামের বাধ্য হইতে বাঞ্ছিত নহে, যদ্ধেতু বিশ্বজন নিঃস্বকারী দস্যুদলাধিকারী রিষড়া নিবাসী বিশ্বনাথ ডোম সদা সহচরগণসহ মদ্যাদি পানে নিয়তো মত্ত মনে দেশবিদেশ বিজয়ী ও বিখ্যাতরূপে নিঃশঙ্কে ছিল। যাহার নাম ও গভীর ধ্বনি শ্রবণে এবং ঘূর্ণিত বিশালাক্ষির বিকট কটাক্ষ দর্শনে প্রজাগণের প্রাণ ধারণের প্রত্যাশা ছিল না, অপিচ যাহার গমনে ধরা অধরা কম্পিত-কলেবরা ও যাহার বাক্যালাপে মহাপ্রলয় সম প্রবল পবন মধ্যে মধ্যে বেগে পতিত হইয়া হা বিশ্বনাথ বাক্য প্রয়োগ করত বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের কৃপায় অদ্য প্রাণ রক্ষা হইল এইরূপ জ্ঞান না করিয়াছে বরং প্রতি দিবাবসানে পরমেশ্বর সদনে ইত্যাদি প্রার্থনা করিত যে বিশ্বনাথের কৃপায় আমরা কি কল্য প্রাতে আত্মীয়গণের মুখ সন্দর্শন করিতে পাইব এতদ্রূপ আক্ষেপোক্তিতে সর্বদা স্বজন সহিত সর্ব শর্বরী জাগরণে কালযাপন করিত অধুনা কথিত দস্যু শ্রীযুতের সুবিচার পারাবারে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হওয়াতে প্রজাগণ অহরহ গমনে ভোজনে শয়নে স্বপনে শ্রীযুতের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিশান্তে নিরাতঙ্কে নিদ্রাগতে প্রাতে শয্যা ত্যাজ্য করিয়া ঐ কথা ভিন্ন কাহারো মুখে শ্রবণ হয় না যে শ্রীযুত অনুগ্রহপূর্বক বিশ্বনাথকে চিররুদ্ধ রাখিলে এতদ্দেশীয় প্রজাগণ সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে শক্ত হয়। কিমধিক নিবেদনাধীন। শ্রীকেদারনাথ হালদার। শ্রীরামপুর, ১১ই জুলাই ১৮৫১ সাল।"



১১ গর্দানমারির মাঠ—অট্টহাস মন্দির

॥ এক ॥

বর্ধমান জেলায় অট্টহাসের মন্দির।

ইটের ক্ষুদ্র ঘর। চারিদিকে গভীর বন।

ডাকাতের কালী; পাষাণ-নির্মিতা মূর্তি—ভীষণ-দর্শনা।

যেই সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে লোকজনের বসতি দূরে ছিল। ভয়েও কেহ সেদিকে—সেই বনমধ্যস্থ মন্দিরের দিকে পা বাড়াইত না। তেপান্তরের মাঠের এক পাশের বিভীষিকাময় অরণ্যের মধ্যে মন্দির। সম্মুখে বিরাট দীঘি। দীঘির পাড়ে তালগাছের সারি এবং অন্যান্য বড় বড় বুনো গাছ আকাশ ছুঁইয়া আছে।

অট্টহাসের পাষাণী কালী জাগ্রতা দেবী।

লোকের বাসনা পূর্ণ করেন তিনি—বিশেষতঃ ডাকাতদের। মার কাছে নরবলি দিয়া তবে তাহারা ডাকাতি করিতে যায়। দূর দুরান্তর হইতে স্ত্রীলোকেরা আসে সন্তান-কামনায়। পূজা দিয়া মায়ের আশীর্বাদ লইয়া বাড়ি ফিরে। কামনা তাহাদের পূর্ণ হয়।

গর্দানমারির মাঠ দিয়া মায়ের মন্দিরে যাইবার পথ। সেই পথে যে যায় সে আর গর্দান লইয়া ফিরে না। শত শত লোকের গর্দান গিয়াছে ঐ মাঠে। লোকে তাই সেই তেপান্তরের মাঠের নাম দিয়াছে গর্দানমারির মাঠ। এই মাঠের আশে-পাশে ডাকাতের দল নানা ছোট ছোট দলে, মাঠে ঢুকিবার পথে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিত ও দূরের যাত্রীদের ভুলাইয়া লইয়া যাইত আশ্রয় দিবার আছিলায়।

বেহারী বাগ্‌দী ছিল গর্দানমারির মাঠের এক দুর্দান্ত ডাকাত। সে ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে। অদ্ভুত ছিল তাহার শক্তি। তাহার ঠ্যাঙ্গার আঘাতে অনেকে প্রাণ দিয়াছে। তাহার দলে ছিল অনেক লোক—দেশের লোক, বেশীর ভাগ ডুমুরদহ, চন্দননগর, সোমড়া, হালিশহরের লোক। দলে আরও ছিল বিহারী, হিন্দু ও মুসলমান।

অট্টহাসের মন্দিরে নিঃসন্তান মাতারা যেমন মায়ের কাছে সন্তানের কামনা করিত, তেমনি ছোট ছোট ছেলেদের চুলও মানত থাকিত। দেবীর কাছে চুল দিতে লোকেরা আসিত। মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। দূর-দূরান্ত হইতেও যাত্রীরা আসিত পূজা দিতে, আবার দিনশেষের পূর্বেই ভয়সঙ্কুল পথে তাড়াতাড়ি শহরে পৌঁছিবার জন্য ছুটিত।

গর্দানমারির মাঠের নাম শুনিলে লোকে শিহরিয়া উঠিত। প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে দূরের গ্রামের লোকেরা শুনিতে পাইত ঢাক-ঢোলের গভীর বাজনা। লোকেরা বুঝিত মা অট্টহাস আজ নরবলি গ্রহণ করিলেন। কেহ সাহস করিয়া সেই সময়ে মন্দিরের দিকে যাইত না। একটা করুণ চীৎকার—হাহাকার ধ্বনি আর ডাকাতদের মুখের চীৎকার—'জয় মা কালী' রব ধ্বনিত হইত আকাশে-বাতাসে।



॥ দুই ॥

নিরেল নামক গ্রামে ছিল একটি চটি। দোকানদারেরা সেখানে যাত্রীদের খাবার জন্য চাল, ডাল, তেল, লঙ্কা, আলু, তরি-তরকারী, কাঠ ও হাঁড়ি-কলসী রাখিত। যাত্রীরা মায়ের মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া রান্না-বান্না করিয়া খাইত। চটির পাশেই ছিল পুলিশের ফাঁড়ি। সেজন্য লোকে এস্থানটিকে অনেক নিরাপদ মনে করিত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু স্থানটি নিরাপদ ছিল না। ফাঁড়িদার,, গ্রামের চৌকিদার সকলেই ছিল ডাকাতদের সাথী।

নিরেল গ্রামের এক প্রান্তে ছিল বেহারী বাগদীর বাড়ি। সন্ধ্যার পরে বেহারী বাগদীর বাড়ির একটি ঘরের বারান্দায় ডাকাতেরা বসিয়াছে। সম্মুখে তাড়ির হাঁড়ি। তাড়ি খাইয়া সকলে বিভোর!

বেহারী বলিল—কোন শিকার ত জুটছে না রে কালী।

কালী অট্টহাস্য করিয়া কহিল—সর্দার, মা যে রক্ত চান। মাকে একটা নরবলি না দিলে চলবে কেন?

অন্যান্য ডাকাতেরাও বলিল—ঠিক কথা সর্দার। কালই ত অমবস্যা আর মঙ্গলবার। একটা নরবলি দিয়া মাকে খুশি কর।

বেহারী সর্দার বিরক্ত হইয়া কহিল—বললেই ত হয় না রে! নরবলির মানুষ পাই কোথা?

কালী ছিল যমের দোসর। ভীষণ তাহার আকৃতি। এমন কুৎসিত চেহারা, বলিষ্ঠ দেহ, রাক্ষসের মত বড় মুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু বড় দেখা যায় না। তাহাকে দেখিলে অতি বড় শক্তিশালী লোকও ভয় পাইত! সেই কালী বলিল—সে ভার আমায় দাও।

বেহারী আনন্দে চীৎকার করিয়া কহিল—ধন্যি তুই মায়ের বেটা! তা হলে যা—আমরা মায়ের মন্দিরে গিয়ে জমায়েৎ হব।

কালী তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে তাহার মাথার বাবরি চুল দুলাইয়া রাত্রির গভীর অন্ধকারে অরণ্যের পথ ধরিল।

সত্য সত্যই কালীর অসাধ্য কাজ কিছু ছিল না। সে খানিক দূরে গিয়া দেখিল বনের পথে একদল যাত্রী চলিয়াছে দেবী অট্টহাসের মন্দিরের দিকে। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোক পাঁচ-ছয়জন, একজন বৃদ্ধ পুরুষ, আর একটি বারো-তেরো বৎসরের অতি সুশ্রী বালক, তাহার মাতার একমাত্র সন্তান। মা দেবী-দর্শনে একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে অট্টহাস মন্দিরে গ্রামবাসীদের সাথে। সকলে গল্প-গুজব করিতে করিতে চলিয়াছে। বৃদ্ধ চলিয়াছেন সকলের আগে পথপ্রদর্শক রূপে, তাঁহার পিছনে স্ত্রীলোকের দল। মায়ের পাশে চলিয়াছে ছেলে। সকলের পশ্চাতে ভৃত্য। তাহার হাতে একটি লণ্ঠন।

কালী এই দলের একটু দূরে দূরে পথ চলিতেছিল এই যাত্রী-দলকে লক্ষ্য করিয়া। কোন সুযোগে সে বালকটিকে চুরি করিয়া লইবে—এই ছিল তাহার মনের বাসনা। কিন্তু বুদ্ধিমান সে। ফাঁড়িদারের এলাকার মধ্যে এমন একটা ভয়ানক কাজ করিলে, কখন কি বিপদে পড়িতে হয়,—সে ভয় যে তাহার একেবারে ছিল না, তাহা নয়।

ক্রমে প্রভাত হইল। দলের লোকেরা নিরেলের চটিতে আশ্রয় লইল এবং তারপর আবার পথ চলা শুরু করিল। কালী এইবার বেহারী সর্দারের বাড়ি আসিয়া বলিল—সর্দার, ভয় নেই, বলি প্রস্তুত। মা কালী আপনার বলি আপনি জুটিয়েছেন। আমি মায়ের বলি আনব, তোমরা সব পূজার আয়োজন করে এই দলের সঙ্গে ভিড়ে যাও।

বেহারী রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—বেশ তাই হবে। দেখিস, শেষটায় যদি বলি যোগাড় করতে না পারিস্ তবে মার অভিশাপে আমাদের নির্বংশ হতে হবে।

কালী কহিল—কি যে বল সর্দার। কালী যে কাজে হাত দেয় তার একটা ফয়সালা না করে ফিরে না।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একদল যাত্রী চলিয়াছে মন্দিরের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল বাজিতেছে। মহোৎসবে মাতিয়া ভক্তদল ছুটিয়া চলিয়াছে। অল্প কিছুকাল পরেই অন্যান্য পূর্বাগত দলের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল।

পূর্বের যাত্রীর দলও এমন একটি বিরাট দলকে পাইয়া মনের আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে দেবীর মন্দিরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে এমন সময়ে সকলে অট্টহাস মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিল।

যাত্রীদল যাত্রীদের নির্দিষ্ট আবাসে গিয়া আশ্রয় লইল। পরদিন মধ্যাহ্নে হইবে মায়ের পূজা। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। যাত্রীরা নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়িল। কাহার মনে কোন বিপদের আশঙ্কা হয় নাই, বরং ঐ নবাগত যাত্রীদলের বৃদ্ধটির সঙ্গে তাহাদের আলাপ জমিয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ বলিলেন—সঞ্জয় ছেলেটি গ্রাম সুবাদে তাঁহার নাতি। সংসারে এক মা ছাড়া কেহ নাই। সামান্য ধানী জমি আছে। ধান পায়। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলে। চরকা কাটিয়াও কিছু কিছু আয় হয়।

এই ভাবে গল্প-গুজবের পর শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। মাতাও পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। নিশীথ রাত্রে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল, শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। মশালের উজ্জ্বল আলোক ও ভীষণ চিৎকারে যাত্রীদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মা জাগিল। বৃদ্ধ জাগিলেন। দলের সকলে জাগিল। মাতা কাদম্বিনী দেখিল পুত্র তাহার কাছে নাই, তবে সে গেল কোথায়? পাগলের মত ঘুরিয়া সে মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিল, ভীমদর্শন, লাঠি হাতে একজন লোক প্রাঙ্গণে উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে, আর 'জয় কালী, জয় কালী' রবে চিৎকার করিতেছে।

কোথায়? আমার ছেলে কোথায়? চিৎকার করিয়া উঠিল ব্যথিতা মাতা।

বেহারী সর্দার গর্জন করিয়া কহিল—ওই দেখ তোর ছেলেকে পুরুতঠাকুর স্নান করিয়ে নিয়ে আসছেন; মার কাছে তাকে আমরা বলি দেব। পথ ছাড়।

কাদম্বিনী দেখিল তাহার পুত্রের কপালে সিন্দূর ও রক্তচন্দনের ফোঁটা। তাঁহার পরিধানে লাল কাপড় ও লাল উত্তরীয়। গলায় জবাফুলের মালা। সে ভয়ে কাঁপিতেছে।

মা সবিস্ময়ে সেই সব দেখিল, দেখিয়া ছুটিয়া গেল পুত্রের দিকে। দস্যুদল তাহাকে বাধা দিল। বৃদ্ধ যাত্রীটি শক্তিহীন, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—রক্ষা কর তোমরা এই দুঃখিনী মায়ের একমাত্র ছেলেকে! ওরে বলি যদি দিতে হয়, আমায় বলি দে।

বৃদ্ধের কাতরোক্তি কে শুনিবে? ডাকাতেরা বৃদ্ধকে বাঁধিয়া মন্দিরের বারান্দায় ফেলিয়া রাখিল। সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে লাগিল—মা বাঁচাও—দেবী অট্টহাস আমাদের রক্ষা কর।

এদিকে পুরোহিত মন্ত্র পড়িলেন। দীর্ঘ খড়্গখানিতে সিন্দুর ও রক্তচন্দন লেপিয়া দিলেন। বলির জন্য আনীত বালককে মন্ত্রপূত করিয়া—বলিদানের জন্য আনিয়া যূপকাষ্ঠের মধ্যে বন্দী করিলেন।

ঢাক-ঢোল দ্বিগুণ বেগে বাজিল। ধূপ-ধূনায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। হতভাগিনী মাতা সবলে ডাকাতদের বাহুবন্ধন ছিন্ন করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিল এবং যূপকাষ্ঠে বন্দী পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—মা জগজ্জননী, তুই দয়া করে আমার ছেলেকে ভিক্ষা দে। আমাকে বলি নে—আমার রক্ত নে। দয়াময়ী, দয়া কর! দয়া কর!

পুরোহিত স্তম্ভিত! কালী সর্দারের হাত নড়িতেছে না। তাহার হাতের খড়্গ কে যেন জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সবল দুই হস্তে ধৃত খড়্গ তাহার হাতে স্থির হইয়া আছে, সে নাড়িতেও পারিতেছে না। ডাকাতদের রীতি আছে, স্ত্রীলোকের গায়ে তাহারা কখনও হাত তোলে না—স্ত্রীবধ ডাকাতদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

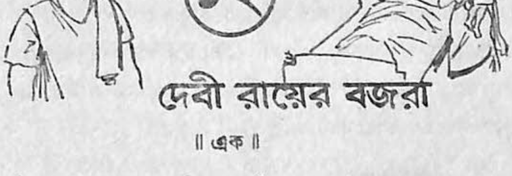
সহসা এক উজ্জ্বল আলোকে অট্টহাসের মন্দির আলোকিত হইয়া উঠিল। ডাকাতেরা সবিস্ময়ে দেখিল দেবী অট্টহাস হা-হা-হা অট্টহাস্যে চারিদিকে ভীতির সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং সেই যূপকাষ্ঠ-নিবদ্ধ ছেলেকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ডাকাতের দল স্তব্ধ হইয়া রহিল—সকলে নির্বাক্, নিস্পন্দ।

ডাকাতেরা সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কোথায় রহিল ঢাক, কোথায় রহিল ঢোল।

প্রভাতের আলো যখন চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া দিল, তখন সেই যাত্রীদল যেন জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। বৃদ্ধ যাত্রী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন মাতার আলিঙ্গনাবদ্ধ পুত্র শান্তিতে ঘুমাইয়া আছে! বৃদ্ধ ভক্তিভরে দেবীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন; মা-মা রবে কাঁদিতে লাগিলেন।

এই আশ্চর্য ঘটনার কথা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেদিন হইতে দেবী অট্টহাসের মন্দিরে নরবলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাকাতের দলও সেই মন্দিরে আর পূজা দিতে যাইত না। জগন্মাতার পূজা একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। মন্দির একরূপ পরিত্যক্ত হইল এবং কাল-ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে তাহা ঢাকিয়া ফেলিল।

অলৌকিক এই কাহিনী ঐ অঞ্চলের সর্বত্র প্রচলিত আছে।*



দেবী রায়ের বজরা

॥ এক ॥

দেবী রায়ের বজরা চলিয়াছে ভৈরব নদীর বুকের উপর দিয়া বল্লভপুর গ্রামের দিকে।

শ্রাবণ মাস। বর্ষার প্লাবনে ভৈরব নদের উচ্ছ্বসিত জল দুই কূল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে সেই দুর্বার জলস্রোত কোন কোন গ্রামের উঁচু সীমা ছাপাইয়া উঠিয়াছে পল্লী-গৃহস্থের আঙ্গিনায়, ঘরের আনাচে-কানাচে। চারিদিকে জল—কলকল ছলছল করিতেছে। গৃহপালিত পশুরা বড় দুর্দশাগ্রস্ত। মাঠ-ঘাট জলে ভরা। আবার

---

* আমি গর্দানমারির মাঠ দেখিয়াছি। অট্টহাসের মন্দিরের পাষাণমূর্তি বর্তমানে অপহৃতা। অট্টহাসের মন্দির দাঁয়হাট হইতে ১৭ মাইল দূরে। নিরোল স্টেশন হইতেও যাওয়া যায়।

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণে গ্রামবাসীরা বিপন্ন। এমনি দিনে দেবী রায়ের বজরা চলিয়াছে—গ্রাম ও বন্দরের পাশ দিয়া। বজরা বেশ বড়। ধবধবে সাদা তাহার রঙ। সম্মুখের দিকটা মকরমুখো। দেবী রায় এ বজরায় চড়িয়া ডাকাতি করেন। উত্তরবঙ্গে, নিম্নবঙ্গে দেবী রায়ের নাম জানে না এমন লোক বড় ছিল না। মহাজন, গৃহস্থ, যে ঐ বজরা দেখিত অমনি ভয়ে পালাইত। যদি শুনিত দেবী রায়ের বজরা আসিতেছে, তবে লোকে বাড়িঘর ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইত।

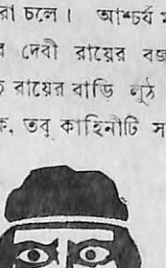
কোম্পানীর আমল। দেবী রায়ের নৃশংস অত্যাচারে দেশ হাহাকার করে। অরাজকতা নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলে সর্বত্র। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কোন কিছুতেই সেই পীড়ন বাধা পায় না। দুঃখীর দুঃখ কেহ বোঝে না। তেমনি কালের ডাকাত দেবী রায়।

দেবী রায় জমিদার। উত্তরবঙ্গে তাঁহার জমিদারী। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার জন্ম। প্রাসাদতুল্য তাঁহার বাড়ি। লোকজন, বৈভব, ধনরত্ন কিছুরই অভাব নাই। পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত অতিথি-শালা আছে, দেবালয় আছে, বড় বড় দীঘি আছে—এক কথায় সেকালের জমিদারের ভোগবিলাসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সবই তাঁহার আছে, কিন্তু নাই শুধু মনুষ্যত্ব।

দেবী রায়ের অভাব নাই। ধন মান সবই আছে, তবু তিনি ডাকাতি করেন। জ্যোতিষী ভাল দিন দেখিয়া দেয়, পুরোহিত আশীর্বাদ করে—তারপর সকলের আগে ছোটে ছিপ, নৌকার সারি ও দুর্দান্ত নিষ্ঠুর দস্যুদল। লক্ষ্য ঠিক থাকে কোথায় কোন্ তালুকদার বা জমিদার-বাড়ি আক্রমণ করিবেন দেবী রায়। বর্ষাকালই ছিল তাঁহার ডাকাতি করিবার সময়।

দেবী রায় সুপুরুষ—দিব্য-দেহ গৌরকান্তি বলিষ্ঠ পুরুষ। অদ্ভুত বলশালী তিনি। রণ-পা চড়িতে, ঘোড়া ছুটাইতে, সাঁতরাইতে, বর্শা-তলোয়ার ধরিতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। পড়াশুনাও ছিল সেকালের অনুপাতে অতি চমৎকার। দেবী রায় ছিলেন মেধাবী, শাস্ত্রজ্ঞ ও শস্ত্র-কৌশলী, তবু তিনি ছিলেন ডাকাত। বর্ষাকালে তাঁহার বজরা চলে। আশ্চর্য মানুষের চরিত্র।

এইবার দেবী রায়ের বজরা চলিয়াছে তাঁহার আপন কনিষ্ঠ সহোদর যদু রায়ের বাড়ি লুঠ করিতে! শুনিতে যদিও অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক, তবু কাহিনীটি সত্য!



॥ দুই ॥

আগের কথাটা বলিতেছি। দেবী রায় ও যদু রায়ের পিতা জমিদার দুর্গাকান্তও ডাকাত ছিলেন। সেকালের অধিকাংশ জমিদারের ব্যবসাই ছিল ডাকাতি। বাংলার জমিদারদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে একথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

বিচক্ষণ দুর্গাকান্ত দেখিলেন—দেবী রায় ও যদু রায় দুই ভাইয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেবী রায় শক্তিশালী, দাম্ভিক ও নিষ্ঠুর। সুশ্রী ও সুদর্শন হইলে কি হইবে, তাঁহার মন চঞ্চল ও বিদ্বেষপূর্ণ। আর যদু রায় শান্ত প্রকৃতির, অধ্যয়নানুরাগী, সাধু, সরল যুবক। এ-পরিবারের মানুষ বলিয়াই তাঁহাকে মনে হয় না। এজন্য দুর্গাকান্ত উভয়কে পৃথক ভাবে রাখাই ভাল মনে করিলেন।

তিনি দেবী রায়কে দিলেন উত্তরবঙ্গের জমিদারী আর যদু রায়কে দিলেন দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনের জঙ্গলসহ তাঁহার বল্লভপুর কাছারির অন্তর্গত জমিদারী। কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক থাকিবে না। যে যাহার ইচ্ছামত থাকিবে। দুর্গাকান্তের জীবিতকালেই এই ব্যবস্থা হইল। তিনি নিজে যদু রায়কে সপরিবারে স্থানান্তরিত করিলেন ভৈরব নদের তীরবর্তী বল্লভপুরে। দুর্গাকান্ত ভাবিলেন—ইহাতে ভবিষ্যতে শান্তি হইবে। সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া একদিন তিনি দেবী রায়কে বলিলেন—দেবী, অনেক পাপ করেছি, অনেক দস্যুতা-ডাকাতি, নর-হত্যা করেছি, এখন পরপারের ডাক এসেছে। তোমরা দু'ভাই দূরে দূরে রইলে, কোন কলহের কারণ রইল না। যদু তোমার ছোট ভাই। কথায় বলে—মায়ের পেটের ভাই। তাকে তুমি দেখবে।

দেবী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—কাজটা কি ভাল করে গেলেন বাবা?

পিতা উত্তর দিলেন—অন্যায় কিসের?

দু'ভাই কি মিলেমিশে একত্রে জমিদারী করতে পারতাম না?

দুর্গাকান্ত রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন—না, তুমি পারতে না। আমার ওপর কথা বলো না। আমি দুর্গাকান্ত রায়, না ভেবে-চিন্তে কিছু করিও না। একথা মনে রেখো, যদি ভবিষ্যতে যদুর ওপর কোন অন্যায় করো, তবে ধ্বংস হয়ে যাবে সব। যদু নিরীহ নির্বিরোধী। তুমি বড় ভাই, তোমার কর্তব্য হবে তাকে রক্ষা করা।

দেবী রায় নীরব রহিলেন। যদু রায় তখন বল্লভপুরে বাস করিতেছেন। কিছুদিন পরে দুর্গাকান্তের পরলোকের ডাক আসিল।

দেবী রায় হইলেন স্বাধীন—হইলেন অত্যাচারী জমিদার—দুর্দান্ত ডাকাত। রক্তে তাঁহার আনন্দ—নরহত্যায় তাঁহার উল্লাস।



॥ তিন ॥

বল্লভপুরে যদু রায় বাস করেন ভৈরবের তীরে—দক্ষিণ বাংলায়। যদু রায়ের দেবদ্বিজে ভক্তি। দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরের চূড়া আকাশ ছুঁইয়া রৌদ্রালোকে করে ঝলমল! শ্যাম-সায়রের তীরে যদু রায়ের প্রাসাদ। চকমিলান বাড়ি। শ্যাম-সায়রের জল হইতে সোপান-বাঁধান ঘাটে। বাড়িতে অতিথিশালা আছে, অতিথি-অভ্যাগত নিত্য আসে। সুন্দরবনে বিস্তৃত জমিদারী। বিশ্বস্ত নায়েব কর্মচারীরা কাজ করে। অত্যাচার নাই, অবিচার নাই। যদু রায়ের জমিদারী শান্তিপূর্ণ। কিন্তু শান্তির মধ্যে দেখা দিল অশান্তি।

একদিন যদু রায় পাইলেন এক চিঠি তাঁহার দাদা দেবী রায়ের কাছ

হইতে। চিঠির উপরে রক্ত-চিহ্ন দিয়া খড়্গ আঁকা। চিঠিতে লেখা ছিল—

পরম কল্যাণবর দীর্ঘজীবেষু—আমি তোমার দাদা দেবী রায় জানাইতেছি যে, বহুকাল তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নাই। শ্রাবণের অমাবস্যা তিথিতে তোমাকে আশীর্বাদ করিতে বল্লভপুর আসিব দলবলসহ। অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও।

আশীর্বাদক—শ্রীদেবী রায়চৌধুরী শর্মা।

যদু রায় যখন ঐ চিঠি পাইলেন, তখন তিনি পীড়িত—শয্যাশায়ী। জীবনসংশয় ব্যাধি। কঠোর তপ ও পূজাপার্বণে, উপবাস ও ধর্ম সাধনায় তাঁহার শরীর একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাধারণতঃ বিছানায়ই পড়িয়া থাকিতেন। কবিরাজ বলিয়াছেন—শিবেরও অসাধ্য আরোগ্য করা এই ব্যাধি।

এই চিঠি পাইয়া যদু রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেওয়ানকে ডাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—'দাদা আসবেন ভালকথা, তবে রক্ত-চিহ্ন কেন?' তারপর ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া বলিলেন—'তবে কি তিনি আসবেন আমার বাড়ি লুঠ করতে?'

রক্তে আঁকা খড়্গ ছিল দেবী রায়ের ডাকাতি করার সংকেত। বলা বাহুল্য যদু রায় একথা জানিতেন।

দেওয়ান চুপ করিয়া রহিল।

স্ত্রী সাবিত্রী দেবী বলিলেন—'আমাদের রায় বংশের একমাত্র ছেলে শচীদুলাল। তিনি কি চান এ-বংশ লোপ করতে? ঠাকুর তাঁকে সুবুদ্ধি দাও।'

সাবিত্রী দেবী স্বামীর বিছানায় তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন।

কথাটা প্রচার হইলে বল্লভপুরের ঘরে ঘরে একটা আতঙ্কের



সৃষ্টি হইল। কোথায় মহানন্দা নদীর তীরে দেবী রায়ের জমিদারী, আর কোথায় তাঁহার জমিদারী হইতে বহুদূরে ভৈরব নদের পারে দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনের কাছাকাছি বল্লভপুর গ্রাম! কি প্রয়োজন ছিল দেবী রায়ের এতদূরে হানা দিবার?

হাঁ প্রয়োজন ছিল,—দেবী রায়ের জিঘাংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য। দেবী রায় নিঃসন্তান। দেবী রায়ের স্ত্রী জগদ্ধাত্রী দেবী ছিলেন উত্তর বঙ্গেরই এক বিশিষ্ট জমিদারের কন্যা—রূপে গুণে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না দেবী রায়ের। তাহা হইলে হইবে কি! মানুষ যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় বিভোর হয়, তখন তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। দেবী রায়েরও তাহাই হইল।

জগদ্ধাত্রী দেবী স্বামীকে প্রশ্ন করিলেন—'তোমার কি কোন অভাব হয়েছে।'

দেবী রায় গর্জন করিয়া উত্তর দিলেন—এ-প্রশ্ন কেন?

কেন? যদু ছোট ভাই তোমার, সে কতদূরে থাকে, তোমাদের বংশের একটি মাত্র ছেলে শচীদুলাল। আমাদের ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। সে-ই ত হবে সমস্ত বিষয়ের মালিক, তবে কিসের জন্য চললে তাদের উৎপীড়ন করতে? কোনদিন কোন অন্যায় ত করেনি ঠাকুরপো। কি চাও তুমি? যেয়ো না, এমন কাজ ক'রো না—ক'রো না! বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন জগদ্ধাত্রী দেবী।

দেবী রায় হাসিলেন। সে কি বিকট হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ! তারপর সেদিন নিশীথ রাত্রিতে নির্জন বনপ্রান্তে মহানন্দার তীরে মহিষমর্দিনী মায়ের পূজা হইল। হইল নরবলি। সেই বিচ্ছিন্নমুণ্ড হইতে নির্গলিত রুধিরধারা লইয়া রক্তের তিলক পরাইয়া দিলেন দেবী রায়ের ললাটে তাঁহার পুরোহিত। ভাই চলিলেন ভাইয়ের বাড়িতে ডাকাতি করিতে। এমনি ছিল সে কাল।



॥ চার ॥

যাহার বিরুদ্ধে এত আয়োজন—সেখানে কোন উত্তেজনাই ছিল না। রাজ্যের সর্দারেরা, লেঠেলেরা পাইকেরা হাজারে হাজারে বল্লভপুরে আসিল; দেওয়ানের কাছে বলিল—হুকুম নিয়ে আসুন মহারাজার কাছ থেকে, দেখি, দেখি কেমন করে, আমাদের গাঁ লুঠ করতে পারেন দেবী রায়?

দেওয়ান যদু রায়কে বলিলেন—প্রজারা চায় দেবী রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, সমানভাবে লড়াই করতে। আপনি হুকুম দিলে তারা প্রস্তুত থাকবে—বজরা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে—আর তাঁর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসবে আপনার কাছে! হুকুম দিন আপনি। হুকুম দিন।

শিহরিয়া উঠিলেন যদু রায়। ধমক দিলেন দেওয়ানকে—আপনি শুনলেন নীরবে তাদের এ-কথা! তাদের শান্ত করুন। বড় ভাই আসছেন ছোট ভাইকে আশীর্বাদ করতে—সেখানে কি লাঠালাঠি দাঙ্গা-হাঙ্গামা রক্তারক্তি সাজে?

দেওয়ান নীরবে ফিরে গেলেন। নীরব হইল বল্লভপুর। যেমন শান্ত স্তব্ধ শান্তিপূর্ণ ছিল নগর তেমনি পূর্বের মত রহিল স্তব্ধ শান্ত ঝড়ের আগে যেমন প্রকৃতি থাকে স্তব্ধ শান্ত নিঝুম।

যদু রায় ক্ষীণকণ্ঠে স্ত্রীকে কহিলেন—শোন সাবিত্রী! ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই কি ভাল? আমি ত পরপারের যাত্রী। শোননি কি যমপুরীর শঙ্খধ্বনি যে বেজে উঠেছে!

সাবিত্রী ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আট বছরের শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—ওগো! আমার শচীদুলালের কি হবে! যদি

তাকে—আর বলা হইল না। শিহরিয়া উঠিলেন জননী ; ভয়ে আতঙ্কে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

যদু রায় নির্বাক্।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাছের গায়ে গায়ে দীঘির কালো জলে নামিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। স্তব্ধ নির্জন জমিদার-বাড়ি। প্রতিদিনকার মত কাত্যায়নীর মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা-কাঁসর বাজিল, আরতি হইল। বিষ্ণুমন্দিরে শোনা গেল কীর্তন, খোল-করতাল-মৃদঙ্গের সুগম্ভীর পবিত্র ধ্বনি। দেবদেবীর জয়ধ্বনিতে ভরিল আকাশ-বাতাস।

॥ পাঁচ ॥

অমাবস্যা রজনী। আকাশ ঘন গভীর কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা। ভৈরয়ের দুর্বার স্রোত তীরের মত বেগে ছুটিয়াছে ? সেই স্রোতে বজরা আসিয়া বল্লভপুরে পৌছিয়াছে। দস্যুদল প্রস্তুত হইয়া আছে। শুধু দেবী রায়ের আদেশের অপেক্ষা !

দেবী রায় ভাবিতেছিলেন—কি করিবেন, কি ভাবে আক্রমণ করিবেন। তিনি দেখিলেন—বজরার দুইদিকে মশাল জ্বলিয়াছে। পথে ঘাটে চলিয়াছে মশালের সারি। কদলী বৃক্ষ ও আম্রপল্লব সহ পূর্ণকুম্ভ রহিয়াছে প্রতি গৃহদ্বারে। দেখিলেন শান্ত নীরব পল্লী। প্রতিদিনকার মত বল্লভপুরবাসী শান্তিতে ঘুমাইতেছে।

এমন সময়, একজন বরকন্দাজ আসিয়া দেবী রায়কে বলিল—'মহারাজ ! ছোট কর্তার দেওয়ানজী আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

দেবী রায় গড়্গড়ার নল হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন—'নিয়ে এস তাঁকে'।

দেওয়ান রামদুলাল প্রণাম করিলেন দেবী রায়কে, তারপর কহিলেন—'মহারাজ ! আমার একটি নিবেদন আছে।'

তাকিয়া সরাইয়া ঋজুভাবে বসিয়া দেবী রায় বলিলেন—'বল কি কথা।'

'আমার মনিব রোগশয্যায় পড়ে আছেন। আসবার শক্তি নেই, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন, মহারাজকে রাজবাড়িতে নিয়া যাবার জন্য। আপনি মনে কিছু করবেন না। দয়া করে যদি'—

দেবী রায় একবারই ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, প্রথমটায় সন্দেহ হইল কোন ষড়যন্ত্র নয় ত, তারপর মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন—'চল !··· আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর।'

বজরার পাশের কক্ষে যাইয়া দেবী রায় বেশ পরিবর্তন করিলেন, ঢাকাই জরিপাড়ে ধুতি, মসলিনের স্বর্ণখচিত ফতুয়া, মাথায় জরির টুপি, পায়ে জরির জুতা। হাতে লইলেন খাপবদ্ধ দীর্ঘ তরবারি—তাহার নিত্যসঙ্গী।

এমন সময় একজন পাইক আসিয়া বলিল—'সর্দার এনায়েৎ আলি খাঁ, ভৈরব সর্দার কি সঙ্গে যাবে ?'

গম্ভীরকণ্ঠে দেবী রায় বলিলেন—'না না, কাকেও যেতে হবে না। আমি একাই যাব !'

দেওয়ান আগে আগে চলিলেন। দুই পাশ হইতে বাজিয়া উঠিল শঙ্খ, নাকাড়া, দামামা। এইরূপ যে হইবে দেবী রায় তাহা আশা করেন নাই। দেবী রায় বিস্মিত হইলেন।

রাজবাড়ির নিকটে পৌছিলে তোরণে-তোরণে বাজিয়া উঠিল নহবতের ধ্বনি। সানাইয়ের বিষণ্ণ করুণ-সুর—যেন একটা আসন্ন-বিপদের সঙ্কেত-ধ্বনি জাগাইতেছিল সারা আকাশে।

দেওয়ান কহিলেন—'হুজুর, প্রভু যদু রায়ের শয়নকক্ষে চলুন।' দেবী রায় চিন্তাকুল মনে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিলেন দেওয়ানের সঙ্গে সঙ্গে। বিরাট শয়নকক্ষ। প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর যদু রায় শুইয়া আছেন। রোগক্লিষ্ট দেহ শীর্ণ—কঙ্কালমাত্র সার। বক্ষঃস্থল ধুক্-ধুক্ করিতেছে মাত্র।

দেবী রায় প্রবেশ করা মাত্র সাবিত্রী, পুত্র শচীদুলালকে লইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। দেবী রায়ের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইতেছিল না। এ কোন মৃত্যু-পুরী ! কোথায় আসিলেন তিনি, স্বপ্ন নয় ত !

দেবী ডাকিলেন—'যদু, যদু, ভাই আমার ! তুই কোথা ?'

অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর আসিল—'এই যে আমি দাদা ! তুমি আমাকে পায়ের ধূলো দাও। আশীর্বাদ করো, শান্তিতে মরি। আমায় ক্ষমা করো। আমার যে উঠবার শক্তিও নেই।'

সহসা ঝনাৎ করিয়া দেবী রায়ের হাতের তলোয়ারখানি মেঝেতে পড়িয়া গেল। ঘরের প্রদীপের উজ্জ্বল দীপ্তি যেন ধীরে ধীরে অপসারিত হইল।

দেবী রায় উদ্বেলিত কণ্ঠে কহিলেন—'যদু, তোর এই অবস্থা। কেন আমাকে জানাস্ নি ? কেন তুই আমাকে সংবাদ দিস্ নি ? ওরে আমি যে তোর···'

দাদা !—দুই চোখ দিয়া যদু রায়ের ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল ! তাঁহার কথা বাহির হইতেছিল না।

সাবিত্রী দেবীকে উদ্দেশ করিয়া দেবী রায় বলিলে—'বৌমা, কেন এ খবর দাও নি আমাকে ? কেন—কেন ? এর উত্তর আমায় দাও বৌমা !'

সাবিত্রী দেবী নীরব।

—'দাদা, তুমি—তুমি ত চিঠি দিয়ে জানিয়েছ তুমি আসবে আমায় দেখতে—আশীর্বাদ করতে। এই ত এসেছ। আর ভাবনা নেই। তোমার আসার আশায় ত এতদিন বেঁচে আছি দাদা !'

আস্তে আস্তে এই কয়টি কথা বলিয়া যদু রায় একবার দম লইলেন, তারপর সাবিত্রী দেবীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—'এসো এসো, সাবিত্রী !···এসো, এসো দুলাল, আমার শচীদুলাল ! জ্যেঠামশাইকে প্রণাম কর।'

তারপর সাবিত্রীর হাতখানি ও শচীদুলালের হাতখানি ধরিয়া মৃত্যুপথযাত্রী যদু রায় বলিলেন—'তোমার হাতে এদের সঁপে দিয়ে গেলাম দাদা ! আমায় বিদায় দাও—পায়ের ধূলো।'

সে কি ক্ষীণ স্বর ! সহসা এক ঝলক রক্ত উঠিল যদু রায়ের মুখ দিয়া। নিমিষে সব ফুরাইয়া গেল।

দেবী রায় ছোট ভাইয়ের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'ভাই, আমার ভাই ? যদু—আমার ভাই —আমার ছোট ভাই —কোথায় গেলি রে।'

সে কি করুণ আর্তনাদ!

কক্ষের সমস্ত প্রদীপ নিমেষে নিবিয়া গেল।



খোকাবাবুর ডাকাত ধরা

॥ এক ॥

গঙ্গার পাড়ে শিবপুর গ্রামে ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ভৈরববাবু খুব বড়লোক। কলিকাতার অনেক দোকান ও বিদেশে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। পৈতৃক জমিদারীও আছে। ভৈরববাবু নিজে বৃদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রেরা সব ব্যবসায়-বাণিজ্য দেখাশুনা করে। পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, দাস-দাসী ও আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরপুর। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের বাড়ি, সর্বদা লোকজনে সরগরম থাকে।

পুরনো ধরনের সেকেলে বাড়ি। মস্ত বড় বাড়ির চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। বাড়ির পেছনে রান্নাঘরের গা ঘেঁসিয়া বাগান। বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তালগাছও যেমন আছে, তেমনি আছে বড় বড় বাঁশের ঝাড়। তাহারই পাশে সব্জী-বাগান। আর খিড়কির পুকুর। বাড়ির সম্মুখে পূজামণ্ডপের অল্প দূরে প্রকাণ্ড দীঘি—কালো জল ঢেউ খেলিয়া বেড়ায়। দীঘির এপার-ওপার দেখা যায় না। বাড়িতে বার মাসে তের পার্বণ হয়। দোল, দুর্গোৎসব, নানা ব্রত ত আছেই, তা'ছাড়া বিবাহ ও অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উৎসব প্রায় প্রতি মাসেই হয়। বড় বড় পরিবারে যেরূপ হইবার কথা, সেইরূপ হইয়া থাকে। পাড়ার লোকেরা ভৈরববাবুর বাড়িতে তাস-পাশা খেলিতে আসেন।

বাড়ির ভিতরে একেবারে পশ্চাৎদিকে অন্দরমহল। ঐ পরিবারের ছোট-বড় সকল মহিলাই পর্দানসীন। বাহিরে কেহ বড় একটা বাহির হন না। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, যেমন গঙ্গাস্নান, কালীঘাটে কালীদর্শন বা অন্য কোনও দেববিগ্রহ-দর্শন, তীর্থযাত্রা—সেই সময়েও পাল্কীতে চড়িয়াই চোপদার, বরকন্দাজ সহ যাওয়া-আসা করেন। ছাদের উপর সন্ধ্যায় মেয়েদের আসর বসে।

ভৈরববাবুর ধন-সম্পদের কথা এ তল্লাটে জন প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। একদিন ভৈরববাবু বৈঠকখানায় বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছেন, পাশে দুই-চারিজন বৃদ্ধ সঙ্গী ছাড়া কেহ নাই। এমন সময় একজন লোক তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়া পলকমধ্যে সরিয়া পড়িল।

চিঠিখানি পড়িয়া ভৈরববাবু ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা ভৈরববাবুর মুখের এইরূপ বিকট ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাঁড়ুয্যেমশাই, কি খবর ? মীরাটের পত্র কি ?—কোন দুঃসংবাদ নয় ত ?

মীরাটে ভৈরববাবুর পুত্র সৈন্য-বিভাগে কাজ করেন।

বাঁড়ুয্যেমহাশয় সেই চিঠিখানা বন্ধুদের পড়িতে দিলেন। চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত, তাহাতে লেখা ছিল—

'ভৈরববাবু, আজ রাত্রি ১২টার পর তোমার বাড়িতে আমরা ডাকাতি করিতে যাইব। সাবধান! প্রস্তুত থাকিও।' এইমাত্র সংবাদ। কাহারও নাম ছিল না; লেখাও অস্পষ্ট।

বন্ধুরা ভৈরববাবুকে বলিলেন—থানায় সংবাদ দিন এবং দারোগা পুলিশকে জানাইয়া শ্যামবাজারে যে আপনার মধ্যম জামাতার বাড়ি আছে, সেখানে মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাকড়ি নিয়া চলিয়া যান।

ভৈরববাবুর কাছে এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে হইল এবং তিনি পরিজনসহ কলিকাতা চলিয়া গেলেন। বাড়িতে একটি শোরগোল পড়িয়া গেল—বাক্স-পেটারা খোলা, লোহার সিন্দুক খোলা, সব গুছান-গাছান, কম কথা ত নয়—কোন্‌টা নিলে ভাল হয়, কোন্‌টা ডাকাতেরা লইয়া গেলেও ক্ষতির কারণ নাই, এই সব নানা হৈ-চৈ-এর পর গাড়িতে ও পাল্কীতে চড়িয়া বাড়ির সব পুরুষ এবং মহিলারা চলিয়া গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ে—কলিকাতায় জামাতার বাড়িতে। জামাতাও ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোক।

বাড়ি একেবারে খালি হইয়া গেল। দরজা-কপাট বন্ধ, যেন একটা নির্জন পুরী। বাহিরের সদর দরজায় দুইজন মাত্র প্রহরী রহিল।



॥ দুই ॥

সকলে নিরাপদে কলিকাতা পৌঁছিলেন। তখন দেখা গেল, তাড়াহুড়ার ফলে ভৈরববাবুর ছোট বৌমা ও তাহার তিন বৎসরের ছেলে বাবলুকে আনা হয় নাই। বাড়ির কর্তা, কর্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনেরা প্রত্যেকেই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিবার সময় মনে ভাবিয়াছিলেন, ছোট বধূ বুঝি অন্য গাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন।

ভৈরববাবু কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, কেহ বা আবার সন্ধান লইতে যায়! সকলেরই প্রাণ ভয়ে দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল।

বাবলু ও ছোট বৌ কমলা সেই নির্বান্ধব-পুরীতেই রহিয়া গেলেন। কমলা ছিলেন আঁতুড়ে।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় ডাকাতেরা সদলবলে ভৈরববাবুর বাড়ি

আসিয়া হানা দিল। হাওড়ার ডাকাতদলের কেনু সাঁতরা নামে একজন লোকের মারফত ভৈরববাবুর বাড়ির বিস্তারিত সংবাদ পাইয়া বিখ্যাত ডাকাত সদানন্দ ঠাকুর ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। সেই দলে রাম ঠাকুর, গোপাল মুখার্জি, যদু ডোম, হরিনারায়ণ কৈবর্ত, নবীন গোয়ালা, গোবিন্দ চুনারী, জ্ঞান ঠাকুর, ঠাকুরদাস বাগদী, কালা কৈবর্ত প্রভৃতি সব দুর্দান্ত দস্যু ছিল।

বাবলুর মা বাবলুকে পাশের ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়া নিজে অন্য এক ঘরে নবজাত শিশুকে লইয়া শুইয়াছিলেন।

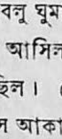
ডাকাতেরা মশাল জ্বালিয়া হল্লা করিয়া এঘর-ওঘরের জিনিসপত্র টানাটানি করিয়া ফেলিয়া যাহা কিছু পাইতেছিল, তাহাই লুঠ করিতেছিল। ভৈরববাবুর ন্যায় সম্পদশালী ধনী গৃহস্থের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ত আর বাড়িশুদ্ধ সব জিনিসপত্র টানা-হ্যাঁচড়া করিয়া নেওয়া সম্ভবপর ছিল না, কাজেই ডাকাতদের ভাগ্যে মাল আশানুরূপ না হইলেও বড় কম জোটে নাই।

ডাকাতেরা ছুটাছুটি করিতেছিল, মাঝে মাঝে হা-রে-রে-রে শব্দে চারিদিক সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। কেননা তাহারা এ-বাড়ি লুঠ করিয়া যতটা লাভবান হইবে আশা করিয়াছিল, তাহা না পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়া আরও উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিল—যাকে বলে মারমুখো।

যে ঘরে বাবলু ঘুমাইয়া ছিল, এইবার ডাকাতেরা হল্লা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল সেই ঘরে। তাহাদের চিৎকারে বাবলুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। এতগুলি বীভৎস আকারের লোক, হাতে তলোয়ার, মশাল, কালিমাখা মুখ দেখিয়া বাবলু—মা-মা, দাদু-দাদু করিয়া কাঁদিতেছিল।

বাবলুকে দেখিয়া একজন ডাকাত তলোয়ার লইয়া ছুটিয়া আসিল। সরল শিশুকে কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া যেমন তলোয়ার তুলিয়াছে, এমন সময় হরিয়া নামক চাকর বাবলুর কাছে আসিল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিল—কেঁদো না, লক্ষ্মীটি আমার!

বাবলু হরিয়াকে দেখিয়া নির্ভয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। হরিয়া তাহার হাতে সন্দেশ দিল এবং ছড়া বলিয়া আদর করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আবার ডাকাতদলের সহিত গিয়া মিশিল। বাবলুও নিশ্চিন্তমনে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।



॥ তিন ॥

পরের দিন। ভোরের আলো সবে মাত্র উঁকি মারিয়াছে! এমন সময় বাবলু মা পাগলের মত বাবলুর বিছানার পাশে আসিয়া দেখিলেন—বাবলুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। সে নিশ্চিন্তমনে বিছানার পাশে আধখানি সন্দেশ হাতে লইয়া বসিয়া আছে। মাকে দেখিয়া সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মা তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া বলিলেন—বাবলু। কাল কি হয়েছিল বাবা! বলতে পার?

বাবলু মাথা নাড়িয়া বলিল—হুঁ পারি। মছাল! মছাল! ভূত কালো কালো, বল-বল দা—অনেক অনেক লোক—তলোয়ার দিয়ে একটা লোক আমাকে কাটতে চাইল, হরিয়া দাদা আমাকে কোলে করে ছন্দেশ দিল, ঘুম পাড়ালো, ঘুমিয়ে পড়লাম। ছন্দেশ খাওয়া বড় মজা, না-মা? দাদু কোথায়?

বাবলুর দাদামশাই ভৈরববাবু সপরিবারে উৎকণ্ঠিত-মনে বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রবধূ ও প্রিয় নাতি বাবলু নিরাপদে আছে। তখন তিনি ভগবানের অসীম দয়া স্মরণ করিয়া বার-বার ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। ডাকাতেরা প্রহরী দুইজনকে হাত-পা বাঁধিয়া একটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল!

দারোগা পুলিশ আসিল। খোকাবাবু হরিয়াকে দেখাইয়া বলিল—হরিয়া দাদা—মছাল—তলোয়ার।

হরিয়া পরের দিনও নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই হউক বা যে কারণেই হউক নিয়মিত ভাবে কাজ করিতেছিল। বাবলুর আধ-আধ কথা হইতেই দারোগা বুঝিতে পারিল যে, হরিয়া ডাকাতদের সহায়তা করিয়াছিল। কাজেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

ধরা পড়িয়া হরিয়া দোষ স্বীকার করিল। সে-ই যে ডাকাতদের মারফতে ভৈরববাবুকে চিঠি পাঠাইয়াছিল, সে-কথাও স্বীকার করিল এবং সঙ্গী ডাকাতদের নাম বলিয়া দিল। দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়িল।

বাড়িতে ও গ্রামের লোকের কাছে বাবলুর আদরের সীমা রহিল না। সকলে তাহাকে আদর করিয়া বলিত—ডাকাত-ধরা বাবলু! সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে পড়িত সন্দেশ ও রসগোল্লা।



॥ এক ॥

রঘু ডাকাতের নামে লোকে এক সময়ে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইত। রঘু ডাকাতের বাড়ি কোথায় ছিল, কেহ ঠিকভাবে বলিতে পারিত না। কেহ বলিত নদীয়া জেলায়, কেহ বলিত হুগলী, কেহ বলিত চন্দননগর। সে কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকিত না বলিয়া নানা জনে নানা স্থানে তাহার বাড়ি নির্দেশ করিত। রঘুর এভাবে থাকিবার প্রধান কারণ ছিল ধরা পড়িবার ভয়। কে জানে কোন্ সুযোগে পুলিশ আসিয়া ধরিয়া ফেলে। এজন্য সে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার পেছনে গোয়েন্দা ও পুলিশ লাগিয়াই ছিল।

গভর্ণমেণ্ট সে-সময়ে রঘু ডাকাতকে ধরিবার জন্য অনেক টাকা

পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখন সরকার ডাকাতদের দমন করিবার জন্য একটি দপ্তরও খুলিয়াছিলেন। বাংলার সর্বত্র—কি জলপথে কি স্থলপথে সর্বত্র ছিল ডাকাতদের অসাধারণ প্রভাব। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, বারাসত চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, চন্দননগর, কলিকাতা সর্বত্রই ডাকাতির জন্য কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র—কেহই শান্তিতে বাস করিতে পারিত না।

রঘু ডাকাতের সম্বন্ধে নানারূপ গল্পগুজব প্রচলিত ছিল। সে-ও তাহার দলের লোকেরা রণ-পা করিয়া রাত্রিতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূর কাহারও বাড়িতে ডাকাতি করিয়া আবার নির্বিঘ্নে সেই রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিত। সেকালে নদীয়া, হুগলি, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার অনেক স্থানই ছিল বন-জঙ্গলে ভরা।

রঘু ডাকাত একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল দস্যু ছিল, তাহার হাতে সর্বদা একখানা দীর্ঘ লাঠি থাকিত। তাহার দলের ডাকাতেরা লাঠি তলোয়ার, ঢাল, বল্লম ও সড়কি নিয়া ডাকাতি করিতে ছিল দক্ষ। শিকারী নামে একদল লোক রঘু ডাকাতের দলে ছিল।

কৃষ্ণনগরের একজন রাজা লক্ষ্ণৌ হইতে শিকারীদের এ-দেশে আনেন। তখন কৃষ্ণনগরের চারিদিকে ছিল গভীর বন-জঙ্গল। সেই বন-জঙ্গলে নানা জাতীয় হিংস্র জন্তুর বাস ছিল। রাজা প্রথমে তাহাদের ঐ সব বন্যজন্তু শিকার করিবার জন্য এদেশে আনাইয়া বসতি দিয়াছিলেন। সেই অবধি শিকারীরা কৃষ্ণনগরের চারিদিকে বাস করিত। উহাদের জীবিকা-নির্বাহের উপায় ছিল পশুশিকার ও ডাকাতি। শিকারীদের বংশবৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া গেল।

ডাকাতের দলের সকলেই ছিল কালীর উপাসক। কি হিন্দু দস্যু কি মুসলমান দস্যু—সকলেই কালীর পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। এই সব ডাকাতকে ধরা বড় সহজ ছিল না। এদিকে পুলিশ ফৌজ তাড়া করিলে তাহারা চন্দননগরে পালাইয়া যাইত। ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে গিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিত। রঘু ডাকাতের উপদ্রব বিশেষ করিয়া নৈহাটি থানা ও বারাসতের কদমগাছি থানা এবং হুগলী, চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

সেই সময়ে নৈহাটি থানায় দুর্গাচরণ চক্রবর্তী এবং কদমগাছি থানায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে দুইজন নামকরা দারোগা ছিলেন। তাঁহাদের উপর কর্তৃপক্ষের আদেশ ছিল—যেমন করিয়া পার রঘু ডাকাতকে ধরিতে হইবে। রঘু ডাকাত সম্বন্ধে নানা সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। দুর্গাচরণ নানা-রূপ চেষ্টা করিয়াও রঘু ডাকাতকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। একবার দারোগা দুর্গাচরণ একখানি চিঠি পাইলেন।

আপনার সঙ্গে আমার শীঘ্রই দেখা হবে—প্রস্তুত থাকিবেন।
ইতি— সেবক—রঘু



॥ দুই ॥

এখানে রঘুর মহত্ত্বের একটি গল্প বলিয়া লইতেছি।

চূর্ণী নদীর তীরে ছোট একটি গ্রাম। সেখানকার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ। বিবাহ বাড়িতে লোকজন হৈ-হৈ করিতেছে। বর ও বরযাত্রী দল আসিয়া নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল, লগ্ন সমাগত; কিন্তু বরকর্তা বলিতেছেন—আমার পণের সব টাকা না পেলে কোন রকমেই বরকে নিয়ে আসব না।

সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য-মর্যাদা পাইলে বর বিবাহ করিত না। কুলীনের ছেলের মেয়ের অভাব কি? এক লগ্নে ত দশটা বিবাহ সে করিতে পারে। কাজেই বরকর্তা নির্বিকার।

বিবাহ-বাড়ির আলো যেন এক নিমিষেই মলিন হইয়া গেল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি—হাতে একটা লম্বা লাঠি, চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর বসিয়া ব্রাহ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল—পেন্নাম হই ঠাকুর, কাঁদছো কেন!

ঠাকুর বলিলেন—কে তুমি?

হা—হা—হা—আমি যেই হই না কেন, বল না ঠাকুর, এত কাঁদছো কেন?—বলিয়া লোকটা অট্টহাস্য করিল। ব্রাহ্মণ তখন সবিস্তারে সব কথা বলিলেন এবং জানাইলেন—বর ও বরযাত্রী চূর্ণীর ঘাটে এসে নৌকা বেঁধেছে। টাকা না পেলে বিয়ে করতে আসবে না। কি হবে বল? তাই বাড়িসুদ্ধ সকলের এত কান্নাকাটি শুনতে পাচ্ছ। আমি গরীব মানুষ,—এত টাকা কোথায় পাব?

—এই কথা ঠাকুর! চুপ কর। মা ঠাকুরুণদের চুপ করতে বলো। বিয়ের আয়োজন করো, বরযাত্রীদের আর কন্যাযাত্রীদের খাবার ব্যবস্থা করো। হাঁ—কত টাকা দিতে হবে?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—পাঁচশো এক টাকা।

—বেশ! কোন গোল করো না ঠাকুর। আমি বর ও বরযাত্রী নিয়ে আসছি। টাকার জন্য ভেবো না, সে হয়ে যাবে।…

ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলেন। চূর্ণী নদীর পারে কয়েকখানি নৌকায় বর ও বরযাত্রীর দল জটলা পাকাইতেছিলেন—এত বড় অপমান তাঁহারা সইবে না। বরকর্তা বলিতেছিলেন—চল বাড়ি ফিরে যাই।

অনেকেই তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে সায় দিতেছিলেন, এবং অন্যান্য জায়গার মেয়েদের কথাও হইতেছিল যেখানে বেশী পণ মিলিবে!

এমন সময় সেই নিবিড় বন-জঙ্গলপূর্ণ পথে দেখা গেল কতকগুলি মশালের আলো এবং শোনা গেল লোকজনের গোলমাল। বরকর্তা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, নৌকার বাহিরে পাটাতনের ওপর বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন—এমন সময় হৈ-হৈ করিতে করিতে বন-জঙ্গল কাঁপাইয়া লোকগুলি নৌকায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং সেই দলের একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি বলিল—ঠাকুরমশাই, তুমি যেই হও, তোমার বর ও বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে বাড়ি চল। বিয়ের সব আয়োজন হয়েছে।

কে একজন কর্কশস্বরে বলল—কে তুমি হুকুম করতে এসেছো?

—সে কথা পরে হবে। ভালয় ভালয় চলো—বিয়ের সভায় টাকাকড়ি বুঝ-প্রবোধ করে নিও। এখানেই দিতে হবে—বরকর্তা বলিলেন।

—দেখ ঠাকুর সাবধান! যদি ভালয় ভালয় না চলো, তবে নৌকাশুদ্ধ পারে টেনে তুলব।

—কী এত বড় আস্পর্ধা? কে তুমি?—আমি রঘু ডাকাত।

নৌকার সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। কেহ আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া কন্যার পিতার বাড়িতে চলিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, সর্বনাশ! রঘু ডাকাত!

রঘু কন্যাকর্তাকে ডাকিয়া গোপনে বরপণের সব টাকা দিয়া বলিল—আমি এখানেই আছি। ভয় নেই। সকলকে খাইয়ে বিয়ের ব্যবস্থা কর। ব্রাহ্মণ আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—কে তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু?

রঘু কহিল—চুপ কর ঠাকুর, আমি রঘু ডাকাত।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—রঘু, তুমি বিয়ে দিয়ে যেয়ো! মা কালী তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। তুমি আমার···

—চুপ!...ঠাকুর আর কোন কথা বলিলেন না।

নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষের আদর-আপ্যায়নে তৃপ্তি লাভ করিয়া পরদিন নিজ দেশে চলিয়া গেলেন।

রঘুর এমনই ছিল মহত্ত্ব!



॥ তিন ॥

দুর্গাচরণবাবু একদিন থানায় বসিয়া গড়গড়া টানিতেছেন এবং ডাকাতি নিবারণের পথ খুঁজিতেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কড়া হুকুম—ডাকাত ধরা চাই-ই চাই। এমন সময় দেখিলেন, একজন জেলে খুব বড় দুইটি রুইমাছ মাথায় করিয়া থানার দিকে আসিতেছে।

জেলে সেই বৃহৎ মৎস্য দুইটি থানার বারান্দায় নামাইয়া রাখিয়া কাপড়ের খুট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিল এবং নমস্কার করিয়া চিঠিটা দুর্গাচরণবাবুর হাতে দিল। চিঠিতে লেখা ছিল—'দারোগাবাবু, পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে আমার পুষ্করিণীতে মাছ ধরেছিলাম। আপনি আসতে পারবেন না জানিয়েছেন, তাই দুটি মাছ আপনার জন্য লোক মারফৎ পাঠালাম। লোকটি আমার বিশ্বস্ত প্রজা।'

সুখসাগরের জমিদারের সঙ্গে দারোগাবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল। কাজেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যে লোকটি মাছ আনিয়াছিল, তাহাকে দুইটি টাকা দিয়া বিদায় করিলেন এবং বলিলেন, তোমার বাবুকে বলো, আমি মাছ পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আমি দু'চার দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।—এই বলিয়া দারোগাবাবু প্রচুর জলপান দিয়া ছেলেটাকে বিদায় দিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে দুর্গাচরণবাবু আর একখানা চিঠি পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল—দারোগাবাবু, আমি বলেছিলাম, একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করে আসব! সেদিন দেখা করে এসেছি। মাছ কেমন খেলেন? সেবক—রঘু ডাকাত।

দুর্গাচরণবাবু হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিলেন—এমন করে আমাকে ফাঁকি। বেটা হাতের কাছ থেকে ফসকে গেল।



॥ চার ॥

গঙ্গার পারে নৈহাটির কাছে এক পল্লীতে একজন ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একটি বাগানবাড়ি ছিল। তাহার নাম ছিল বিনোদবাবু। বিনোদবাবু এই বাগানবাড়িতে প্রায়ই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। গঙ্গার পারেই ছিল বাগান-বাড়িটি! নীচ দিয়া গঙ্গা কুলকুল স্বরে বহিয়া যাইত। আম, কাঁঠাল লিচু, নারিকেল এই সব বড় বড় গাছ বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বিনোদবাবু ধনী জমিদার মানুষ, বড় শখ করিয়া এই বাগান-বাড়িটি তৈরি করিয়াছিলেন! প্রায়ই তিনি এখানে আসিতেন।

একবার বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ-আলোচনা কথা প্রসঙ্গে রঘু ডাকাতের কথা উঠিল। বিনোদবাবু বলিলেন—শুনেছি রঘু অতি দুঃসাহসিক ডাকাত। তবে এ-কথা জেনো ভাই, তার সাধ্য হবে না আমার এখানে আসে। আর এক বন্ধু বলিলেন—বল কি? রঘুর অসাধ্য কাজ কিছুই নেই, বড়াই করো না। দুই তিন মাস পরে বিনোদবাবু একটি চিঠি পাইলেন। চিঠির মর্ম এই—আমি শীঘ্রই একদিন আপনার বাগান বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

—রঘু ডাকাত।

বিনোদবাবু ত চিঠি পাইয়া অবাক! তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে ভাবেই হোক রঘু ডাকাতের কানে তাঁহার সদম্ভ উক্তিটা পৌঁছিয়াছে তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা পুলিশের উপরওয়ালাদের নিকট এবং নৈহাটি থানার দারোগাকে চিঠির মর্ম জানাইয়া পত্র দিলেন। শীঘ্রই একদল পুলিশ ও দারোগা আসিয়া বাড়ির চারদিক ঘেরাও করিয়া পাহারা রহিল। বিনোদবাবুও বন্ধু-বান্ধবদের সহিত প্রস্তুত রহিলেন ডাকাতের প্রতীক্ষায়।

একদিন সকালবেলা একজন ভদ্রলোক বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি একটা বড় রকমের দামী ফিটন গাড়ি চড়িয়া আসিয়াছেন। দারোয়ান সসম্ভ্রমে ভদ্রলোককে বিনোদবাবুর নিকট লইয়া আসিল। তখন বিনোদবাবু দারোগা দুর্গাচরণবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোকেদের সঙ্গে রঘুর সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন।

ভদ্রলোক বিনোদবাবুর ঘরে আসিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ফরাশের একপাশে বসিলেন। নবাগত ভদ্রলোক দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় বাবরি চুল, ঢাকাই মসলিনের ফতুয়া গায়ে, সেই পাতলা মসলিনের ফতুয়ার ভিতর হইতে সোনার হার দেখা যাইতেছে। বলিষ্ঠ তাঁহার শরীর, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

বিনোদবাবু বললেন—আপনার কি প্রয়োজনে আসা বলুন।

—আজ্ঞে, ত্রিবেণীর কাছে আপনার যে ছোট তালুক আছে, শুনেছি আপনি সেটি পত্তনি দেবেন, আমাকে দিলে বড় উপকার হয়। আমি সেজন্যেই আপনার দরবারে এসেছি।

—মশায়ের নাম··· ! ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি সুখচর।

জমার বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্কের পর বার্ষিক জমা স্থির হইয়া গেল। ভদ্রলোক আগাম বায়না স্বরূপ একশো টাকা দিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিনোদবাবু টাকা লইয়া সেরেস্তার কর্মচারী মারফৎ যথারীতি রসিদ দিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে ভুলিলেন না। এই ভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বিনোদবাবু গর্ব করিয়া তাঁহার বন্ধুদের বলিতে লাগিলেন—কোথায় হে তোমাদের রঘু ডাকাত আমার এখানে আসবে—হা! হা।

তাঁহারা বলিলেন—ভাই, এখনও সময় যায়নি। সাবধানে থেকো

সত্যই সময় যায় নাই। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে একখানি ছিপ নৌকা চুপি চুপি আসিয়া বিনোদবাবুর বাগান-বাড়ির গায়ে ভিড়িল বাগানের প্রাচীরের গায়ে সারি সারি বড় বড় আম, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ। কতকগুলি গাছ একেবারে বাগানের মধ্যস্থ বাড়ির গা ঘেঁসিয়াই ছিল।

ছিপ হইতে একদল লোক ধীরে ধীরে দেওয়াল বাহিয়া গাছের উপর উঠিল এবং চুপি চুপি গাছ হইতে মাটিতে নামিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িল। একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি তাহাদের সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

খিড়কির দরজা দিয়া একে একে সকলে উঠিল। তাহারা দেখিল, নিচে দারোয়ানরা সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাবুর শোবার ঘরের পাশে উপরের দরবার-ঘরটির দেওয়ালে দারোয়ানরা তাহাদের তলোয়ারগুলি ঝুলাইয়া রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। ঘরের দরজার সামনের প্রজ্বলিত লণ্ঠনগুলি নিবাইয়া দিয়া ঐ লোকগুলি ঝুলানো তলোয়ার-গুলি হাতে লইয়া দারোয়ানদের অস্ত্রহীন করিল।

এইবার ডাকাতের দল বাড়ির সব ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তন্নতন্ন করিয়া মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাকড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। কপাট ভাঙার শব্দে দারোয়ানরা জাগিয়া দেখিল, ডাকাতের দল লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেছে। তখন একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—কিন্তু তাহাদের অস্ত্র কোথায়!

ডাকাতেরা তাহাদেরই অস্ত্রশস্ত্র নিয়া তাহাদেরই আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। ডাকাতেরা প্রস্থান করিবার আগে সেই দীর্ঘকায় দস্যু অতি সন্তর্পণে বিনোদবাবুর শয়নকক্ষে ঢুকিয়া তাঁহার হাত পা ও মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। বিনোদবাবু ভয়ে ও বিস্ময়ে গোঁ-গোঁ করিতে লাগিলেন। পুলিশ ও দারোগা সপ্তাহকাল বিনোদবাবুর বাড়ি পাহারা দিয়া অবশেষে নিশ্চিন্ত মনে কয়েক দিন আগে ফিরিয়া গিয়াছিল।

কিছুদিন পরে বিনোদবাবু আর একখানি পত্র পাইলেন :

'আপনি আমাকে তালুকের পত্তনি দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। আপনার সঙ্গে আবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। আপনার কোন ক্ষতি আমি করিনি, আপনার যাহা কিছু ছিল তাহা নির্বিঘ্নে নিয়ে এসেছি। সে-টাকা কড়ি আমি গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। আপনি আমার জমিদার। বাকী টাকা পাঠিয়ে দেব—লেখাপড়া কবে শেষ করবেন? এখন বোধ হয় সেদিনকার সেই ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছেন।' ইতি—

শ্রীরঘু ডাকাত।

বিনোদবাবু চিঠিখানি পড়িয়া বন্ধুদিগের বলিলেন—ভাই, সত্যই রঘু ডাকাত অসাধারণ লোক। তবে সে আমার প্রজা হয়েছে। —বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দারোগা দুর্গাচরণবাবুও চিঠি পাইলেন—দারোগাবাবু, দু'বার আপনার সঙ্গে দেখা হলো—ধরতে পারলেন না ত।' ইতি—

রঘু ডাকাত।

রঘু ডাকাত এমনি ছিল দুঃসাহসিক। রঘু ডাকাতের পরিণাম কি হইয়াছিল জানি না। এ-বিষয়ে সরকারী কাগজপত্রে সন্ধান মিলে না। সে এমন জনপ্রিয় দস্যু ছিল যে গরীব-দুঃখীরা তাহার সন্ধান জানিলেও কেহই বলিয়া দিত না।



১৫

ডাড়ু, ডাড়ুভাই, টুমি ডাকাট

॥ এক ॥

জমিদার রাঘব রায় উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত জমিদার। তাঁহার বিপুল সম্পত্তি, বড় বড় দালান-কোঠা। বারো মাসে তের পার্বণ হয় তাঁহার বাড়িতে। চলন-বিলের কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি। অসাধারণ তাঁহার প্রতাপ, সকলেই জানে রাঘব রায় জমিদার হইলেও ডাকাত দলের সর্দার। দিনের বেলায় কাজকর্ম করেন, জমিদারী দেখেন, দান-খয়রাত করেন। গরীব-দুঃখী অন্ন পায়, বস্ত্র পায়। অতিথিশালায় অতিথি আসে, সমাদর পায়। কিন্তু রাত্রিতে তাঁহার ভীষণ মূর্তি। কখনও নিজে দলবলসহ বাহির হন ডাকাতি করিতে, কখনও বা তাঁহার হুকুমে অন্য সর্দারেরা ডাকাতি করে। লুঠ করে, মানুষ মারে—চলন বিলের গভীর জলে ফেলে দেয় সেই মৃতদেহ।

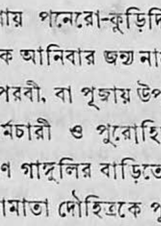
রাঘব রায়ের একমাত্র কন্যা সর্বাণী। বিবাহ হইয়াছিল দূর বাখরগঞ্জ জেলায়—পূবের জমিদার-বাড়িতে। প্রতি বৎসর পূজার সময় বাড়িতে খুব ধুমধাম হয়। দুই-তিন মাস থাকিয়া আবার কন্যা-জামাতা নিজেদের বাড়িতে ফিরিয়া যান—সতর্কতার সঙ্গে লোকজন ও জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়া তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বৈবাহিকও ক্ষমতাশালী জমিদার। তাঁহার লোকজনের অভাব নাই। বৈবাহিক রাঘব রায়ের লোকের উপরই নির্ভর করেন না—নিজের মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তিনি অনেক লাঠিয়ালও সঙ্গে দেন পুত্র ও পুত্রবধূর নিরাপদ যাত্রার জন্য। সেকালে প্রতিদিনই ডাকাতি রাহাজানি হইত। কন্যার শ্বশুরের নাম ছিল শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী। শ্যামাচরণ ছিলেন শ্যামামায়ের ভক্ত, তান্ত্রিক।

শ্যামাচরণের বাড়িতে নিত্য জয়কালীর মন্দিরে ছাগবলি হইত। লোকে বলে বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষে অতি গোপনে গভীর রাত্রিতে নরবলিও হইত। সেকালের অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন ডাকাত। শ্যামাচরণও ছিলেন রাঘব রায়ের মত দস্যু ডাকাতের পালনকর্তা। পুত্র কালীপদ ছিলেন বিপরীতধর্মী। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষিত। সংস্কৃতশাস্ত্রে ছিল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। বাড়িতে যেমন অধ্যয়ন ও পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে ভালবাসিতেন তেমনি কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গী হইত তাঁহার পুঁথিপত্র। কালীপদের এক সতীর্থ ছিলেন—তাঁহারই বয়সী বলরাম তর্কভূষণ। দু'জনেই সমাজ বা সংসারের কোন ধার ধারিতেন না, অধ্যয়ন, সৎচিন্তা, সদনুষ্ঠানেই ব্রতী ছিলেন। শ্যামাচরণ উগ্রপ্রকৃতির হইলেও—গোপনে ডাকাতি করিলেও—পুত্রের জ্ঞান বুদ্ধি ও মধুর ব্যবহারে, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য পুত্রের গুণানুরাগী ছিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার চরিত্রের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। তিনি অনেক সময় জীবনের অনেক কথা ভাবিতেন।

বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও সর্ববিষয়ে বিচক্ষণ কালীপদ শারীরিক শক্তিতেও ছিলেন অসাধারণ। সেকালের প্রথানুসারে ব্যায়াম কুস্তি লাঠি ও তলোয়ার চালাইতেও ছিল তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব।

সেইবার পূজা পড়িয়াছিল আশ্বিন মাসের শেষ। বর্ষা তখনও শেষ হয় নাই নদীর জল সবেমাত্র কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। পূজার প্রায় পনেরো-কুড়িদিন পূর্বে রাঘব রায় জামাতা, কন্যা ও দৌহিত্রকে আনিবার জন্য নানারূপ মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার, বিবিধ ফল ও মিষ্টান্ন 'পরবী' বা পূজায় উপহার কৌলীন্য মর্যাদাস্বরূপ পাঠাইলেন। বিজ্ঞ কর্মচারী ও পুরোহিত শক্তিশালী রক্ষকসহ এই সব লইয়া শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির বাড়িতে চলিল। সঙ্গে পুরোহিত ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা, জামাতা দৌহিত্রকে পূজা উপলক্ষে তাঁহার বাড়িতে পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিলেন। শ্যামাচরণ পত্রপাঠ সম্মতি দিলেন এবং সঙ্গে লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ দিলেন তাহাদের পাহারা দেওয়ার জন্য।

কালীপদের অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন বন্ধু সতীর্থ বলরাম তর্কভূষণ। পত্নী সর্বাণী ও তিন বছরের শিশু পুত্র মাণিকলালসহ কালীপদ রওনা হইল। মাণিকলাল দাদু ও দিদাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না! দাদু ও দিদা চোখের জল ফেলিয়া প্রিয় নাতিকে মাতা-পিতার সঙ্গে যাইতে দিলেন।



॥ দুই ॥

নদীপথে নৌকা চলিয়াছে। নদীর জলের কি সুন্দর শোভা। শরতের নীল আকাশ নির্মল ও সুন্দর। সাদা মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দুইদিকের গ্রামের শোভা অতি সুন্দর। ধানের ক্ষেত বাতাসে দুলিতেছে। সবুজ গাছের সারি গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। বধূরা ঘাটে ঘাটে জল নিতেছে। ছোট-বড় নৌকা নদীর বুক দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মায়ের কোলে বসিয়া মানিক সব দেখে আর হাসে, আমোদ করে, এটা কি ওটা কি বলিয়া মা-বাবাকে প্রশ্ন করে। মা হাসেন, উত্তর দেন, ছড়া বলেন। পাখীদের নাম শেখান, ওটা গাংচিল, ওটা পানকৌড়ি, ওটা বক, ওটা শালিক, ওটা মাছরাঙ্গা।

মানিক মাঝে মাঝে বলে, দাদু কই? দিদা কই?

লোকজনেরা নদীর ধারে কোন হাটের বা বন্দরের কাছে নৌকা ভিড়ায়, রান্না করিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আবার নৌকা ছাড়ে।

দশদিন নিরাপদে কাটিয়া গিয়াছে, আর চারদিন পরেই চলন বিলে পড়িবে। এ-পথেই ভয় বেশী। চলন বিল পার হইলেই হয়। চলন বিলের চারিদিকে দস্যু ডাকাতের ভয়। ঐ-অঞ্চলের জমিদারেরাও প্রায় সকলেই ডাকাত। নিষ্ঠুর নির্দয় তাঁহারা। দয়ামায়া নাই। এজন্য নৌকা-যাত্রীরা—কোন হাটের কাছে বা বৃহৎ বন্দরের কাছে নৌকা বাঁধিয়া রাখে, তারপর বেলা হইলে একসঙ্গে নৌকা ছাড়ে। চলন বিল, সামান্য বিল নয়, যেন একটা সাগর। জল থৈ-থৈ করে। ঢেউ উঠে, জোর বাতাসে ঢেউয়ের বুকে পড়িয়া রোজ কত নৌকা ডোবে।

চলন বিলের মধ্যে নৌকা আসিলে খোকাকে সর্বাণী শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া রাখিল এবং ধীরে ধীরে স্বামীকে বলিল—আমাদের সব নৌকা পাশাপাশি রাখতে বলো। চলন বিলে ডাকাতের বড় ভয়।

কালীপদ হাসিয়া বলিলেন—ভয় কি সর্বাণী? আমাদের আক্রমণ করে লুঠ করবে এমন দস্যু—এ অঞ্চলে জন্মায় নি। আমরাও লাঠি ধরতে জানি।

সর্বাণী বলিল—আমিও এ দেশের মেয়ে। জান ত এ দেশের জমিদার তালুকদার সকলেই ডাকাত।

সর্বাণীর বাবা যে ডাকাত তাহাও তাহার অজানা ছিল না। তাই সে বলিল—সকলে যেন সতর্ক থাকে। সব সময়ে যেন হাতিয়ার হাতে রাখে। কখন কি বিপদ ঘটে কে বলতে পারে?

ঘটিলও তাহাই। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। নিবিড় অন্ধকার। ঘন কৃষ্ণ মেঘে সারা আকাশ দখল করিয়া আছে। জোরে ঝড়ো হাওয়া বহিতেছে। জোর বাতাসে নৌকাগুলি বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে একটা দ্বীপের মত জায়গায় আসিয়া পড়িল। চলন বিলের মধ্যে সেকালে এমন অনেক ছোট বড় ডাঙ্গা ছিল। এক জায়গায় দুইটি দ্বিপের মধ্য দিয়া জলস্রোত বেগে বহিয়া চলিয়াছে সেখান দিয়া নৌকাগুলি যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি চারিদিক হইতে কয়েকখানি ছিপ নৌকা আসিয়া ঐ নৌকা কয়-খানিকে ঘিরিয়া ফেলিল। সেই ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেও ছিপ নৌকার আরোহীরা মশাল জ্বালিল। 'হা-রে-রে-রে' শব্দে সে অঞ্চল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কি তাদের ভীষণ চেহারা—যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

এই দলের সর্দার ছিলেন স্বয়ং রাঘব রায়। রাঘব রায় তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর দুলাল সর্দারকে হুকুম দিলেন—দুলাল, নৌকো কয়খানা ধরে ফেল ত। তারপর নৌকার ওপর লাফিয়ে পড়ে লুঠ কর। কুচপরোয়া নেই। আমার হুকুম।

আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকারোহীরা চিৎকার করিয়া বলিল—এ রাঘব রায়ের জামাই মেয়ের নৌকা—তাঁরা রাঘব রায়ের বাড়ি যাবেন। এ নৌকোতে জামাতা কালীপদ ও মেয়ে সর্বাণী আছেন। আমরাও রায় মহাশয়ের লোক।

তুলাল বলিল—হুজুর, এ আপনার মেয়ে-জামাই-এর নৌকা যে। আমাদের লোকও আছে। একবার খোঁজ করলে হয়।

রাঘব রায় গর্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন—চুপ রও। কে আমার মেয়ে, কে আমার জামাই। সব-বেটাই বিপদে পড়লে মেয়ে-জামাই হয়। আমার হুকুম—লুঠ কর। লুঠ কর। মেরে কেটে লাশ ফেলে দে বিলের জলে। হা! হা! হা! মেয়ে জামাই! মেয়ে জামাই !!

প্রবল বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দের মধ্যেও রাঘব রায়ের বিকট হাস্যের হা—হা শব্দ ধ্বনিয়া উঠিতেছিল!

তুলাল প্রভুর আদেশে একদল ডাকাতসহ নৌকায় লাফাইয়া পড়িল। আরম্ভ হইল তুই পক্ষে লড়াই। ওদিকে কিন্তু তখনও একদল লোক বলিতেছিল—সর্দার, আমরা রায় মহাশয়ের লোক।

কিন্তু কে শোনে কাহার কথা! তখন নিরুপায় হইয়া উহারাও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

কালীপদ নির্ভীক ভাবে লাঠি ধরিলেন। সঙ্গের লোকজনেরা লাঠি তলোয়ার ধরিল। যতটা সহজে রাঘব রায় নৌকা লুঠ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। রীতিমত লড়াই শুরু হইল। আরম্ভ হইল ঝাঁপাঝাঁপি লাঠালাঠি! তুলাল কিছুতেই পারিতেছিল না। ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলরাম ছিলেন সুকৌশলী লাঠিয়াল—তাঁহার হুকুমে কালীপদ ও সর্বাণীর নৌকার চারিদিকে ব্যূহ রচনা হইয়াছিল। কাজেই রাঘব রায়ের দল মাঝের নৌকাখানিকে সহজে আক্রমণ করিতে পারিতেছিলেন না। উভয়পক্ষে তুমুল লড়াই বাঁধিয়া গেল। লাঠিতে লাঠিতে, তলোয়ার ও বর্মের ঝন্‌ঝন্ ঠকাঠক্ শব্দ সেই নিস্তব্ধ রাত্রিকেও শব্দ-মুখর করিয়া তুলিল। বিলের জলের সেই কলকল্লোল আকাশে ভীষণ মেঘের গর্জন—আর এই ডাকাতদলের আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার জন্য অপর পক্ষের প্রয়াস—কি ভীষণ সংঘটন!

তুলাল পিছু হটিতে লাগিল। সে দেখিল এই নৌকারোহীরা তুর্বল নহে, হয়ত সত্য সত্যই জামাইবাবু ও দিদিমণি চলিয়াছেন রাঘব রায়ের বাড়ি। কতকগুলি লোকও সে-কথা বারবার বলিতেছে। কে জানে কি হইবে ইহার পরিণাম। তুলাল মৃত্কণ্ঠে কহিল—হুজুর। বোধ হয় সত্যই জামাইবাবু আর দিদিমণি যাচ্ছেন আপনার ওখানে।

চুপ রও —এই কথা বলিয়া রাঘব রায় নিজে লাফাইয়া পড়িলেন—কন্যা ও জামাতার নৌকার উপর। তখন মশালের উজ্জ্বল দীপ্তিতে দেখিলেন এক অপূর্ব দেবী মূর্তি!

রাঘব রায়ের হাতের তলোয়ার হাতেই রহিল। মশাল স্তিমিত হইল আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘমালা দূরে সরিয়া গিয়াছিল, সে ফাঁকের মধ্য দিয়া গুটিকতক তারা উঁকি মারিতেছিল। ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছিল।

॥ তিন ॥

বীরাঙ্গনা বেশে সর্বাণী নৌকার সম্মুখে তলোয়ার হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্বাণীর চুল এলাইয়া পড়িয়াছে। পুরুষের মত মালকোচা দিয়া সর্বাণী শাড়ী পরিয়াছে। অপূর্ব সে বেশ! সর্বালঙ্কারভূষিতা সর্বাণীর তুই চক্ষুতে যেন আগুন জ্বলিতেছিল! সে বীরদর্পে কহিল—কে তুই দস্যু? জানিস্ আমি কে?

কোন উত্তর আসিল না।

উভয় পক্ষের লাঠিয়াল ও ডাকাতেরা নীরব—মন্ত্রমুগ্ধ!

আমি রাঘব রায়ের কন্যা সর্বাণী!—শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির পুত্রবধূ!

দেখি কেমন ডাকাত তুমি!

জড়িত কণ্ঠে রাঘব রায় কহিলেন—না, না, মিথ্যা কথা! আমার মেয়ে? তাই ত!

—মিথ্যা তবে এগিয়ে এস! ধর তলোয়ার।

রাঘব রায় তলোয়ার ধরিলেন? তাঁহার মনে দ্বিধা জাগিয়াছিল। এদিকে নৌকা যে স্রোতের বেগে দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই।

রাঘব রায়ের সঙ্গে সর্বাণীর তলোয়ারে তলোয়ারে লড়াই অরম্ভ হইল। পিতা ও কন্যাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। উপযুক্তশিক্ষা সর্বাণীর। রাঘব রায়ের মত নিপুণ ও সুদক্ষ তলোয়ার-খেলোয়াড়েরও হাত কাঁপিতেছিল! সহসা সর্বাণীর একটা আঘাতে রাঘব রায়ের হাতের তলোয়ার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনি উন্মত্তের মত চিৎকার করিয়া উঠিলেন—কে—কে—তুই? তুই—কে—সর্বাণী মা আমার?

সর্বাণী গর্জিয়া উঠিল—হাঁ আমি সর্বাণী। তুমি কি আমার পিতা? বাবা তুমি তা'হলে ডাকাত, তুমি দস্যু—এ কি! আর একটু হলে—

সর্বনাশ হ'ত! বলিলেন রাঘব রায়।

রাঘব রায় থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। নৌকা কখন যে তাঁহার নিজ বাড়ির ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তাহা জানিতে পারেন নাই। তখন তাঁহার ও সর্বাণীর মুখে একটি কথাও নাই। তখনও সর্বাণীর হাতে তলোয়ার।

প্রভাত হইয়াছে! শরৎ-শেষের তরুণ অরুণের উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক ঝলমল করিতে লাগিল।

মাণিকলাল অবস্থার পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিল। সে রাঘব রায়ের দিকে ফিরিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া বলিল—ডাডু, ডাডুভাই, টুমি ডাকাট।

কালীপদ শ্বশুরের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়াছিলেন; আপন লোকজনদের লক্ষ্য করিয়া ভৈরবকণ্ঠে বলিলেন—নৌকা ফিরাও।

নৌকা ফিরিল। বাবা-মায়ের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে মাণিকলাল বলিল—মা, তোমার বাবা—ডাডুভাই ডাকাট। কেমন মজা, ডাডুভাই ডাকাট!



বীরাঙ্গনা দয়াময়ী

এক

কেন না জানে বাংলার বীর সন্তান সীতারামের নাম ? তিনি অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সীতারাম ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার কথা তোমরা ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। এখানে সীতারামের কথা আমরা বলিব না, বলিব তাঁহার মায়ের কথা—বীরাঙ্গনা দয়াময়ীর বীরত্বের কাহিনী।

যশোহর জেলার মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করিতেন উদয়নারায়ণ রায়। রায়মহাশয় ছিলেন জমিদার। তাঁহার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত বহু অর্থ ছিল। নিজের চেষ্টা ও যত্নবলে তিনি বহু জমিজমা করিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামপুর গ্রামের এক প্রান্তে ছিল তাঁহার বাড়ী। চারিদিক বনজঙ্গলে ঘেরা গভীর বাঁশবন, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, দেবদারু, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি নানা জাতীয় গাছে ঢাকা। এক দীঘির পাড়ে ছিল উদয়নারায়ণের প্রকাণ্ড বাড়ী। সেইটি ছিল বৃহৎ চক্‌মিলান বাড়ী। লোকজন সদাসর্বদা ঘিস্‌ঘিস্ করিত। আত্মীয়-স্বজন-পরিবৃত শক্তিশালী উদয়নারায়ণকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। অসাধারণ বুদ্ধিমান যোদ্ধা এবং সাহসী ছিলেন উদয়নারায়ণ। লাঠি খেলিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, তলোয়ার ধরিতে তাঁহার সমকক্ষ বীর বড় একটা দেখা যাইত না। তাঁহার হাঁক-ডাকে দশখানি গ্রামের লোক তাঁহাকে মাতব্বর বলিয়া মানিত। এই বীর উদয়নারায়ণের পত্নীর নাম দয়াময়ী। তাঁহার কথাই আজ বলিব। উদয়নারায়ণ রায় ছিলেন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। চোর-দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশী। তখন চলিত কথা ছিল, 'যার লাঠি তার মাটি'। প্রত্যেক জমিদার-বাড়ীতে থাকিত বরকন্দাজ। যে-কোন ধনী ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীঘর রক্ষার জন্য বাড়ীতে বরকন্দাজ রাখিতেন এবং তাহাদের লাঠির জোরে জমি দখল করিতেন, দস্যু-ডাকাত দমন করিতেন। লাঠির ঘায়ে তরবারি টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। লাঠি চালনায় দক্ষ বীরের হাতে পড়িলে বন্দুক ও সঙ্গীন পর্যন্ত যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি সেকালের বাংলার আব্রু-পরদা রাখিত, ধন রাখিত, জন রাখিত, সবার মান রাখিত। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। একথা সেকালে ছিল সত্য। একালেও একদিন লাঠির প্রতাপ বড় কম ছিল না।

সেকালে পুরুষদের মত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও লাঠি ধরিতে, তলোয়ার চালাইতে, বর্শা ছুঁড়িয়া মারিতে শিক্ষা করিতেন। না করিয়া উপায়ও ছিল না। কখন ডাকাত পড়ে, কখন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা গ্রাম লুঠ করে, তাহার ত ঠিক ছিল না। এজন্য লোকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিত এবং সতর্ক থাকিত—সকলে লড়িত। তখনকার দিনে মধুমতী শ্যামপুরের প্রান্তবাহিনী নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইত। সেই নদীর স্রোতে উজান ও ভাটি বুঝিয়া দস্যুরা এক এক গ্রামে আসিয়া পড়িত এবং লুঠতরাজ আর রাহাজানি করিয়া পলাইত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করিয়া বিক্রয় করিত। এই দস্যু-ডাকাতেরা ছিল ফিরিঙ্গী হারমাদের দল। কাজেই সেকালের তালুকদার ও জমিদারেরা আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন ভাবী বিপদের আশংকায়।



দুই

সেকালে রহিম খাঁ পাঠান যশোহর জেলার একজন বিখ্যাত দস্যু ছিল। তাহার দলে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল, হিন্দুস্থানী, ভোজপুরী ফিরিঙ্গী, সব জাতির এবং সব দেশের লোক ছিল। রহিম খাঁ দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং রণনিপুণ ব্যক্তি ছিল। সে ছিল আফগান সৈনিক, নবাবের ফৌজ ; কিন্তু গোপনে দস্যুবৃত্তি করিত। একথা জানাজানি হইলে তাহাকে নবাব-সরকার হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। রহিম তাহাতে দমিল না। সে পুনরায় আরম্ভ করিল দস্যুবৃত্তি। দলে লোক জুটিল। নিবিড় বনে নানা স্থানে নানা জেলায় ছিল তাহাদের আড্ডা। এখনও দিনাজপুরে, রংপুরে, ভাওয়ালের নিবিড় জঙ্গলে, ময়মনসিংহের নানা স্থানের বনভূমিতে তাহাদের ভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই সব ডাকাত-দলের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার ছিল এই যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিভেদ বা দলাদলি ছিল না। হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। সকলেই ছিল মা ভবানীর উপাসক। মা কালী ছিলেন তাহাদের আরাধ্যা দেবী। নরবলি দিয়া মায়ের পূজা করা ডাকাতির প্রথা ছিল। তোমাদের কাছে আগেও সেকথা বলিয়াছি। এই যে রহিম খাঁর কথা বলিলাম—এই খাঁ সাহেব উদয়নারায়ণকে দেখিতে পারিত না। তাহার কারণ ছিল—উদয়নারায়ণ কয়েকবার রহিম খাঁর দলকে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। পাঠান রহিম খাঁ প্রতিশোধের সন্ধান করিতেছিল। উদয়নারায়ণের ভয়ে সে শ্যামপুরের আশেপাশের গাঁয়ে ডাকাতি করিতে পারে নাই।

একবার উদয়নারায়ণ দূর গাঁয়ে তাঁহার কাছারি বাড়ী গিয়াছেন খাজনা ও অন্যান্য বিষয়ের খোঁজখবর করিতে। বাড়ীতে অল্পসংখ্যক

বরকন্দাজ আর শিশু পুত্রকন্যা লইয়া রহিলেন পত্নী দয়াময়ী। এ সংবাদ রহিম খাঁর দলের অজানা ছিল না। তাহারা জানিতে পারিল —উদয়নারায়ণের দেশে ফিরিতে প্রায় দুই-তিন মাস বিলম্ব হইবে। মহা-উৎসাহে মাতিয়া উঠিল দস্যুদল। এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়!



তিন

সেইদিন কৃষ্ণা চতুর্দশী। রাত্রি গভীর অন্ধকার। শ্যামপুর পল্লী নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকিতেছে। কুকুরেরা কোন গৃহস্থ-বাড়ীর ঢেঁকিশাল হইতে ঘেউ-ঘেউ শব্দ করিতেছে। কোন গৃহস্থের ঘরে বেড়ার ফাঁক হইতে প্রদীপের ক্ষীণ-রশ্মি দেখা যাইতেছে। চারদিকের বনজঙ্গল, শিমূল, সপ্তপর্ণ, বট অশ্বত্থ সব গাছ দৈত্যদানোর মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দস্যুদল একটা খালের ধার দিয়া চলিল উদয়নারায়ণের বাড়ী। বাড়ীর চারিদিকে বেড়িয়া গভীর পরিখা। জল থৈ-থৈ করিতেছে। পরিখার পরে বাড়ীর চারিদিক বেড়িয়া প্রাচীর। শুধু সম্মুখের দিক্ দিয়া একটা প্রকাণ্ড পথ বাড়ীর তোরণ পর্যন্ত গিয়াছে। সেই পথের দুইধারে আম ও বকুল গাছের সারি। সদর দরজার দুই ধারে কাছারি-বাড়ী, বরকন্দাজদের থাকিবার ঘর।

রহিম খাঁ নিজে তাহার দলের সাহসী ও দুর্ধর্ষ ডাকাতদের লইয়া উদয়নারায়ণের বাড়ী ডাকাতি করিতে চলিল। সঙ্গে সে ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকা আনিয়াছিল। তাহা দিয়া তাহারা পরিখা পার হইল এবং প্রাচীর বাহিয়া, কেহ বা গাছে উঠিয়া দেওয়াল টপকাইয়া, বাড়ীর ভিতরকার মন্দিরের চুড়া ধরিয়া দলে দলে চারিদিক হইতে বাড়ীর ভিতরে নামিতে লাগিল, দরজা কপাট ভাঙ্গিতে শুরু করিল। তাহারা একসঙ্গে শত শত মশাল জ্বালিল। জয় মা কালী রবে নিস্তব্ধ গ্রামের বনজঙ্গল, প্রান্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল। হা-রে-রে-রে রবে বিকট চীৎকার আরম্ভ হইল। অপরদিকে সদর দেউড়িতে দেখা দিল আর একদল ডাকাত। তাহাদের সঙ্গে আরম্ভ হইল হাতাহাতি লড়াই। চারিদিকের গোলমাল, হৈ-চৈ ও ভীষণ চীৎকারে দয়াময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শিশু সীতারামকে লইয়া পরিচারিকাসহ শুইয়াছিলেন। জাগিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন দস্যুরা বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে—অন্দরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ভীষণ তাহাদের মূর্তি! কাহারও এক হাতে মশাল, অন্য হাতে বল্লম, কাহারও হাতে তলোয়ার।

ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন—শিশুদের রক্ষা কর। আমি ডাকাত তাড়াইব—নয় মরিব। কি এত বড় আস্পর্ধা—আমাদের বাড়ী লুঠ করিবে রহিম খাঁ পাঠান! অসহ্য।

দয়াময়ী শক্ত করিয়া কাঁচুলি পরিলেন, পুরুষের মত কাপড় পরিলেন—তারপর এক হাতে সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ তরবারি আর অন্য হাতে বল্লম লইয়া চলিলেন ডাকাত তাড়াইতে!

পরিচারিকা চীৎকার করিয়া উঠিল—মা—মা—এমন দুঃসাহসের কাজ করিবেন না। চলুন খিড়কির দরজা দিয়ে পালাই।

দয়াময়ী গর্জিয়া উঠিলেন—পালাব? কার ভয়ে বল্ ত? কখনো নয়—কখনো নয়!

আর একটিও কথা না বলিয়া চলিলেন তিনি ডাকাতদের অন্দর-মহল হইতে তাড়াইয়া দিতে।

যেই পথে তিনি নীচে নামিতেছিলেন, সেই পথে সিঁড়ি দিয়া ডাকাতেরা উপরে উঠিতেছিল। সেই পথেই দেখা হইল দস্যুদের সঙ্গে। স্তিমিত আলোকে এই রণরঙ্গিনী নারীকে দেখিয়া দস্যুরা চমকাইয়া উঠিল—দুই পা পিছাইয়া গেল। দয়াময়ী সেই মুহূর্তে বর্শা ছুড়িয়া মারিলেন এক ডাকাতকে লক্ষ্য করিয়া। বর্শা ডাকাতের বুকে বসিল—হতভাগ্য দস্যু উঃ আঃ করিতে করিতে প্রাণ হারাইল। অপর দস্যুরা ভয়ে দৌড়িয়া পলাইল। তর তর করিয়া দয়াময়ী নীচে ছুটিয়া চলিলেন সদব দেউড়ির দিকে। সেখানে রহিম খাঁর সহিত বরকন্দাজদের লড়াই চলিতেছিল ভীষণভাবে। এমনি সময়ে সেখানে আসিয়া বল্লম হস্তে দাঁড়াইলেন তেজস্বিনী মহিমময়ী নির্ভীকা বীরাঙ্গনা দয়াময়ী। সে কি অপূর্ব মূর্তি।

বরকন্দাজদের সর্দার রঘুনাথ তাঁহাকে দেখিয়া নতমস্তকে প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল—মা, আপনি! আপনি কেন?

দৃপ্তকণ্ঠে দয়াময়ী জবাব দিলেন—হাঁ বাবা, আমি। কর্তা নেই বলে কি ডাকাতের আক্রমণে ভয় পাব? ভাল করে লড়াই কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে থেকে লড়ব।

দলে দলে গ্রামের লোক রায়বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছে শুনিয়া আসিয়া যোগ দিল ডাকাত তাড়াইতে। দয়াময়ী আরম্ভ করিলেন লড়াই! তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামের লোকের মধ্যে মহা-উৎসাহের সঞ্চার হইল! মধ্যস্থলে তাঁহাকে রাখিয়া তাহারা মহা-বীরত্বের সহিত ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রহিম খাঁর দলের লোকেরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছিল। ডাকাতরা দয়াময়ীর তলোয়ারের ঘায়ে একে একে প্রাণ দিতে লাগিল। একদিকে রঘুনাথ সর্দার আর অপরদিকে দয়াময়ী। এই দুই জনের অসাধারণ বীরত্ব ও শৌর্যের নিকট ডাকাতেরা হার মানিতেছিল। কি অপূর্ব তাঁহাদের লড়াই-শিক্ষা!

রহিম সর্দার গর্জিয়া উঠিল—কি, একটা জেনানার কাছে হার মানব? এই বলিয়া সে কয়েকজন সাহসী পাঠানকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের চত্বরের দিকে ছুটিয়া আসিল। সে তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল দীর্ঘ তলোয়ার হাতে—ভীষণ দৈত্যের মত তাহার আকৃতি! সে বলিল—ঘিরে ধরে ফেল জেনানাকে। এগিয়ে যাও।

এদিকে এক নিমেষে রহিমের বুকে বিদ্ধ হইল দয়াময়ীর নিক্ষিপ্ত বল্লম। যেমনি সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, অমনি তরবারির এক আঘাতে দয়াময়ী তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর পূর্বে

'ইয়া আল্লা! এই একটিমাত্র শব্দ রহিমের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। তারপর সব শেষ! রঘুনাথ সর্দার অবাক্ বিস্ময়ে দেখিল দয়াময়ীর বীরঙ্গনা মূর্তি। সর্বাঙ্গে রুধির-ধারা। বস্ত্র রুধির-লিপ্ত, কেশ মুক্ত, নয়নদ্বয় হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে অগ্নিকণা। হাতে রুধিরলিপ্ত শাণিত তরবারি। কালান্তক যম সদৃশ রহিম খাঁর এইরূপ মৃত্যুতে ডাকাতের দল পলাইতে লাগিল। কেহ কেহ ধরা পড়িল—অনেকে পলাইয়া বাঁচিল।

সীতারাম ছিলেন এমন বীরাঙ্গনার পুত্র। এমন মা না হইলে কি অমন ছেলে হয়? প্রতিষ্ঠা করিতে পারে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য?



(১৭) গোপী ডাকাতের কাহিনী

এক

নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার একমাত্র ছেলে অমিয়রঞ্জন এবং একজন গ্রামবাসী আত্মীয়। অমিয়রঞ্জন যুবক—কলেজে পড়ে। দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, পরম সুন্দর উৎসাহী তরুণ সে। নীলকান্তবাবু বরিশালের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। সেখানে বাসাবাড়ী আছে। লোকজন আত্মীয়-স্বজনের অভাব নাই। তাহারাও পূজার ছুটিতে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বাড়ী যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পুত্র অমিয় ও আত্মীয়টি ছাড়া পুরাতন ভৃত্য হরচন্দ্রও আছে। হরচন্দ্র বলিষ্ঠকায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। এক সময়ে সে ছিল লাঠিয়াল—ডাকাতি করিত। বরিশালের কোন এক জমিদারের কাছে থাকিত। জমি দখল করিতে, চর দখল করিতে, সে ছিল দক্ষ সর্দার। একবার সে এক খুনের মোকদ্দমায় পড়ে। নীলকান্ত বাবুর চেষ্টায় সে খালাস হইয়া আসে। সেদিন হইতে সে ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন সে নিরীহ ভাল মানুষ। গলায় তুলসীর মালা। এক বৈষ্ণব বাবাজীর কাছে সে দীক্ষা লইয়াছে। দিবারাত্রি 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করে। তবে মফঃস্বলে যাইতে হইলে হরচন্দ্র বহুকালের পুরোন একখানা বাঁশের লাঠি আর একটা বর্শা ও খাঁড়া লইতে ভোলে না।

নীলকান্তবাবুর বাড়ী বিক্রমপুরে। কুলীন ব্রাহ্মণ। বয়স ষাটের কাছে। মাথার চুলগুলি পাকা! গোফঁ দাড়ি নাই। উন্নত নাসা, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, সাহসী ও সজ্জন। প্রতি বৎসর কাছারি ছুটি হইলে বাড়ী যান। শ্যামাপূজা পর্যন্ত বাড়ীতে থাকেন; তারপর কাছারি খুলিলে বরিশাল ফিরিয়া আসেন।

নীলকান্ত বাবু তিন-কামরাওয়ালা বড় একখানা পানসী নৌকায় বাড়ী যাইতেছেন। পানসীর সঙ্গে আছে দুইখানি ভাওয়ালি নৌকা। তাহাতে পূজার সম্ভার। অমিয় নৌকার ছাতে বসিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতেছে। শরতের উচ্ছল নদীর সাদা জল ছোট ছোট ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে। নীলকান্ত বাবু নৌকার ভিতরের কোঠায় বসিয়া দেশগামী আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। হরচন্দ্র ভাওয়ালি নৌকায় পূজার বিবিধ উপকরণ ও অন্যান্য জিনিসের তদ্বির করিতেছে। সঙ্গের পাচকেরা রান্নার আয়োজন করিতেছে। জোয়ারের স্রোতে নৌকা আপনা হইতেই বেগে চলিতেছে।

এইভাবে তাঁহাদের নৌকা রাত্রি দুপুরের সময় আসিয়া পড়িল দুইটি নদীর সঙ্গমস্থলে। পাশে বড় বড় কয়েকটি গ্রাম। মাঝিরা বলিল, বাবু! এ অঞ্চলটা একেবারে ভাল নয়। প্রায় প্রতিদিনই ডাকাতি হয়। বিশেষতঃ এসময়ে মাল-বোঝাই নৌকা এবং পূজার সময় দেশগামী যাত্রী-নৌকার উপর ডাকাতি ও রাহাজানি হয়ে থাকে। আপনারা সকলে সতর্কভাবে জেগে থাকবেন।

নৌকা স্রোতের টানে তর-তর করিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে, মাঝি চুপ করিয়া হাল ধরিয়া আছে। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো নদীর এবং জলে দূর পল্লীর গাছপালার উপর পড়িয়া কত সুন্দর দেখাইতেছিল। জোছনা যেন হাসিতেছিল। মাঝে মাঝে চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকাইতেছিল। এমন সময় কয়েকখানি ছিপ নৌকা আসিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের পানসী ও অন্য নৌকা দুইখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং "হা-রে-রে-রে" করিয়া বিকট চীৎকারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পানসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাঝি-মাল্লারা এবং হরচন্দ্র ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কে শোনে কাহার চীৎকার? কে আসিবে এই দুর্গম স্থানে নদীর বুকে তাহাদের রক্ষা করিতে? ছিপ নৌকাগুলির পাশে একখানি অপেক্ষাকৃত বড় নৌকা আসিল। সেই নৌকার উপর হইতে একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—হারু, কি দেখছ? নৌকা লুঠ কর।

নীলকান্ত বাবু নৌকার সম্মুখে আসিয়া করুণকণ্ঠে বলিলেন—

আপনি কে জানি না। আপনি যে হউন, আমি বরিশালের উকীল নীলকান্ত মুখুয্যে। পূজোতে বাড়ী যাচ্ছি, মায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতে। সঙ্গে আছে মায়ের পূজার দ্রব্যসম্ভার।

হারু সর্দার নীলকান্ত বাবুর সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্তি দেখিয়া কহিল—ইনি যে ব্রাহ্মণ! কর্তা, এঁর গায়ে হাত তুলবো কি করে?

বড় নৌকা হইতে আরোহী চীৎকার করিয়া বলিল—তুই না পারিস্ হারু, আমিই এ বেটাকে নিকাশ করবো। এই কথা বলিয়া লোকটি একটা তলোয়ার হাতে ক্রুদ্ধ মহিষের মত নীলকান্ত বাবুর নৌকায় লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

সেই সময় অমিয় আসিয়া তাহার পিতাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৌকার কক্ষটিতে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া দিল। তারপর সেই ভীষণাকৃতি ক্রুদ্ধ ডাকাতের কাছে আসিয়া বলিল—আপনি ডাকাত হন, দস্যু হন,—আপনি মানুষ ত বটেন। আমাকে কেটে ফেলুন, আমার বাবার গায়ে হাত তুলবেন না।

এই কথা বলিয়া অমিয় ডাকাতের সম্মুখে আসিয়া নির্ভীকভাবে দাঁড়াইল। দস্যুও যেন একটু বিচলিত হইল। নীলকান্ত বাবু তড়িৎগতিতে পুত্রের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে দুই বাহুর দ্বারা সবলে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—দেখুন,

আপনি ডাকাত হন, দস্যু হন, যাই হন না কেন, আপনি ত মানুষ। পিতার কাছে পুত্রের নিধন আর পুত্রের কাছে পিতৃহত্যার দৃশ্য কত বড় শোচনীয়, তা বুঝবার মত শক্তি আপনার আছে। বরং আপনি আমাদের নৌকায় যা কিছু আছে সব লুটে নিন, আমরা জগজ্জননীর পায়ে ফুল আর বেলপাতা দিয়েই অঞ্জলি দিব।

ধীর স্থির ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন কথা কয়টি নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়। তারপর পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন—এই আমার একমাত্র বংশধর। একে রক্ষা করুন, এর প্রাণ ভিক্ষা দিন। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন নীলকান্ত বাবু।

এমন সময় হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়া এক ঝলক হাস্যমুখী জোছনা আসিয়া পড়িল নীলকান্তবাবু ও তাঁহার পুত্রের মুখের উপর।

চমকিয়া উঠিল দস্যুসর্দার; জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম কি বলুন ত? আমার নাম নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়। ভয়কাতর-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন নীলকান্ত বাবু।

হঠাৎ মুখুয্যে মহাশয়ের পানসী হইতে দস্যুসর্দার লাফাইয়া পড়িল নিজের নৌকায়, হুকুম দিল ভৈরব-রবে—শোন হারু, রাত্রি-শেষে এইসব নৌকা নিয়ে যাবি আমার বাড়ীর ঘাটে। সাবধান, কারু গায়ে হাত দিবি নে, কোন অনিষ্ট করবি নে, সারারাত নৌকায় দিবি পাহারা। তারপর সকালবেলা আমাকে দরবারে খবর দিবি। এঁদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করবি।

ধীরে ধীরে নৌকা তিনখানি তীরের দিকে নেওয়া হল। ডাকাত-সর্দার তাহার নৌকায় উঠিয়া চলিয়া গেল।

হারু সর্দার বিস্মিত হইল তাহার মনিবের এইরূপ হুকুমে। কোন দিন ত এমন হয় না। ছিপ নৌকাগুলি, পানসী ও অন্য দুইখানি নৌকা পাহারা দিয়া নদীর স্রোতের মুখে অগ্রসর হইল।

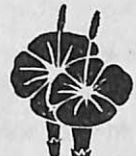


॥ দুই ॥

একশো বছর আগে ডাকাত গোপী বাড়ুয্যের নাম ছিল কুখ্যাত। এমন কোন কুকার্য ছিল না, যা তিনি করেন নাই।

অথচ গোপীবাবু ছিলেন জমিদার। বারমাসে করিতেন পূজা-পার্বণ,—দীনদরিদ্র সকলে পাইত মায়ের প্রসাদ। কোন অভাব না থাকিলেও তিনি ডাকাতি করিতেন—একদিনও ডাকাতি না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কাহার পরিবার-পরিজন নদী খালে আসা-যাওয়া করিতেছে, সেই সংবাদ তাঁহার কাছে দিত তাঁহার দলের লোকেরা। সেই অনুসারে প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে বাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা শ্মশানবাসিনী দেবী জয়কালীর পূজা দিয়া বাহির হইতেন ডাকাতি করিতে। প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে জাঁকজমকে করিতেন দেবীর পূজা—মাঝে মাঝে হইত নরবলি।

সেদিন সংবাদ পাইয়াছিলেন বরিশালের একজন উকীল এই পথে যাইবেন বাড়ীতে। সঙ্গে আছে তৈজসপত্র ও অনেক টাকাকড়ি। তাই দলবল সঙ্গে করিয়া উকীলের নৌকা লুঠ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে নৌকা লুঠ না করিয়া গোপীবাবু ফিরিয়া আসিলেন—তাহা হইল এক রহস্যময় আশ্চর্যের বিষয়।



॥ তিন ॥

গোপীবাবুর সংসারে স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা শরৎসুন্দরীর বয়স প্রায় ষোল বৎসর—অপূর্ব সুন্দরী সে। যেমন রূপ, তেমন গুণ। সাংসারিক কাজকর্মে সেকালের নানা শিল্পকার্যে দক্ষ, ভক্তিমতী মেয়েটিকে দেখিয়া তাহার ব্যবহারে লোকে মনে করিত—কেমন করিয়া মরুর বুকে প্রবাহিত হইল স্বর্গ-মন্দাকিনী? পাষাণের বুক দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল সুধা-প্রস্রবণ? ছেলে দেবকীরঞ্জন কলেজে পড়ে কলিকাতায়। ভাল ছেলে, প্রকৃতি সুন্দর। সে বাড়ীতে আসিলে পড়াইত শরৎকে। তাহাদের চরিত্রের সহিত পিতার চরিত্রের কোন ঐক্য ছিল না। পিতার দস্যুবৃত্তির কথা তাহারা শুনিয়াছিল, এজন্য সকলে বিষণ্ণ মনে থাকিত। তাহারা দেখিত তাহাদের মা দিন দিন শীর্ণা ও বিবর্ণা হইয়া যাইতেছেন। তিনি সর্বদা বিষণ্ণমনে থাকিতেন, যেন একখানি বিষাদের প্রতিমা। গোপীবাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী ছিলেন সাধ্বী সতী, পুণ্যবতী—কোনরূপ সংসারিক ব্যাপারের ধার ধারিতেন না। পাপকার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য স্বামীকে বহুবার অনুরোধ করিয়াও তিনি কৃতকার্য হন নাই—তাই সর্বদা তিনি নিজের মৃত্যু কামনা করিতেন।

সেদিন নৌকা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গোপীবাবু নিজের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে গোপীবাবু গেলেন নীচের দপ্তরখানায়। নিস্তারিণী স্বামীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু একটি কথাও বলিলেন না।

॥ চার ॥



প্রকাণ্ড প্রাসাদ। নদীর তীর হইতে প্রশস্ত পথ বাড়ী পর্যন্ত আসিয়াছে। বিরাট চকমিলান অট্টালিকা। বাহিরে কাছারি, দপ্তরখানা। ভিতরে ত্রিতল দালান। নীচে উপরে ছোট বড় প্রায় ত্রিশটা ঘর। নীচের তলে কাছারিবাড়ীর কাছে বিরাট আঙ্গিনা। পথের দুইদিকে শিবের মন্দির, বিরাট দীঘি। প্রতিদিনকার মত গোপীবাবু নীচে আসিয়া নিজে হারু সর্দার ও কাছারির পাইক বরকন্দাজসহ নদীর পারে গেলেন বাঁধান ঘাটের কাছে। ঘাটের

দুইপাশে দুইটি বিরাট বকুলগাছ। ঝুরঝুর করিয়া বকুলফুল ঝরিতেছে। গোপীবাবু আসিয়া দেখিলেন, নীলকান্ত বাবু ও তাঁহার পুত্র অমিয়-রঞ্জন নৌকার সম্মুখের পাটাতনে বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন।

গোপীবাবু নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—মুখুয্যেমশায়, আপনাকে আমার বাড়ীতে একটু পায়ের ধূলো দিতে হবে। আপনার ছেলেসহ অস্থন।

নীলকান্তবাবু বলিলেন—আপনার যদি আমাদের প্রতি দয়া হয়ে থাকে, তবে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। পূজো নিকটবর্তী।

গোপীবাবু কহিলেন—'সে হবে, আস্থন। আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, কোন অনিষ্ট হবে না আপনার। আস্থন।'

নীলকান্তবাবু একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, পুত্রও পিতার মুখের দিকে চাহিল। তারপর দুইজনে হারু সর্দারকে সঙ্গে লইয়া গোপীবাবুর সঙ্গে চলিলেন বাড়ীর দিকে।

গোপীবাবু বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নীলাকান্ত বাবুকে বলিলেন—ভাই, তোমার সঙ্গে আমার নিভৃতে একটু কথা বলবার আছে। তারপর অমিয়র দিকে চাহিয়া কহিলেন—বাবা, আমি আমার ছেলে দেবকীকে ডেকে দিচ্ছি, তুমি তার সঙ্গে কথা বলো।

পিতার আহ্বানে পুত্র আসিল। প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক দেবকীরঞ্জন অতি স্থপুরুষ গৌরকান্তি অমিয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। উভয়ের পুত্রের পরস্পরের পরিচয় হইতে বেশীক্ষণ দেরী হইল না। দেবকী বলিল—চল ভাই, আমার মার কাছে গিয়ে গল্প করি।

অমিয় ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু দেবকী তাহাকে কোন অবসর দিল না! তার হাত ধরিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

এদিকে গোপীবাবু নীলকান্তবাবুকে লইয়া বাড়ীর এক অতি নিভৃত কক্ষে আসিলেন। বিরাট স্থসজ্জিত ঘর। ছাদের নীচে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিতেছে। বড় বড় আলমারিতে সারি সারি বই সাজানো। গোপীবাবু বলিলেন—এই আমার পড়বার ঘর—লাইব্রেরী। তারপর একটি দেরাজ হইতে একখানি ছবি বাহির করিয়া বলিলেন,—চিনতে পার?

সেই আঁধার কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। নীলকান্ত ছবি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন—উচ্চস্বরে কহিলেন—"এ যে গোপীনাথ আর আমার ফটো! কে তুমি, কে তুমি।"

আমি গোপীনাথ—এই কথা বলিয়াই গোপীবাবু নীলকান্ত বাবুর পা দুইখানি জড়াইয়া কহিলেন—নীলু, আমায় ক্ষমা কর, আমায় রক্ষা কর। আমি হতভাগা তোমার এক সময়ের প্রিয়বন্ধু গোপীনাথ। তুমি আমাকে একবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে,—আর আমি পাষণ্ড আমি অপদার্থ, তোমাকে ও তোমার পুত্রকে হত্যা করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিচ্ছিলাম। আমায় ক্ষমা কর, রক্ষা কর, আবার আমাকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার কর। নতুবা তোমায় ছেড়ে দেবো না।

নীলকান্ত বাবু বিচলিত হইয়া পড়িলেন! গোপীবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—গোপী, তুই কেমন করে এমন হলি? তুই যে ছিলি বড় ভালো। তুই কি সেই গোপী?

হাঁরে নীলু, আমি সেই গোপী। তারপর গোপীনাথ বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তাঁহার জীবনের কলঙ্ককাহিনী বলিতে লাগিলেন। কহিলেন—আমার পিতা, পিতামহ সকলেই ছিলেন ডাকাত। ডাকাতি করে, নরহত্যা করে, তাঁরা করে গেছেন এই বিশাল বাড়িঘর ও ধনসম্পত্তি। আমার রক্তের ধারার মধ্যেও প্রবাহিত হচ্ছে সেই রক্তের ধারা। তাই আমি আজ নরঘাতক দস্যু, ডাকাত, পরস্বাপহারী দুর্বৃত্ত পাষণ্ড। আমাকে আবার ফিরিয়ে নে সেই ছাত্রজীবনের মাঝখানে—পরিয়ে দে তোর রক্ষাকবচ, আমাকে সরল মনে মানুষ হতে দে। আমার শান্তি নেই। পুত্রকন্যা আমায় ঘৃণা করে। স্ত্রী চিন্তায় চিন্তায় মৃতপ্রায়—শয্যাশায়িনী! দিনরাত হৃদয় পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—তবু ডাকাতি করি। আমার ভাগ্যি, তুই এসেছিস! আমাকে বাঁচা ভাই।

নীলকান্ত দরদভরা-কণ্ঠে কহিলেন—আমি যে ক্ষুদ্র মানুষ। ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা কর ভাই। তিনিই তোর প্রাণে শান্তি দেবেন।

সেদিন গোপীনাথ করিলেন বাড়ীতে বিরাট আনন্দ-ভোজের আয়োজন। সকলে বিস্মিত হইল—এমন ত কোনদিন হয় না।



॥ পাঁচ ॥

অমিয় ও দেবকী উপরের ঘরে উপস্থিত হইল। তাহারা দুইজনে নিস্তারিণী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি অমিয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন—এস বাবা, এস। এই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

কন্যা শরৎসুন্দরী একপাশে ফুটন্ত শেফালীর মত বসিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া মা কহিলেন তোর নূতন দাদাকে প্রণাম কর শরৎ।

লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া আসিয়া শরৎ প্রণাম করিল অমিয়কে। অমিয় লজ্জায় মাথা নত করিল। শরতের মুখের দিকেও চাহিতে পারিতেছিল না। নিস্তারিণী দেবী অপলকে একবার অমিয়র দিকে আবার শরতের দিকে চাহিতেছিলেন।

পরদিন সকালে নীলকান্ত ও অমিয়কে বিদায় দিলেন গোপীবাবু। নানারূপ ফল, তৈজসপত্র, বিরাট পূজোপকরণ তাঁহাদের সঙ্গে দিয়া হারু সর্দার ও অন্য কয়েকজন সাহসী সর্দারকে হুকুম দিলেন তাঁহাদের নিরাপদে বাড়ী পৌছাইয়া দিবার জন্য। সেদিন হইতে গোপীবাবুর মধ্যে দেখা দিল একটা পরিবর্তন। কেহ লক্ষ্য করিল, কেহ করিল না।

পূজা শেষ হইল। ওদিকে বিক্রমপুরের নিজ বাসগ্রাম হইতে নীলকান্তবাবু বরিশাল ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ-আয়োজন করি-তেছেন এমন সময়ে একদিন তাঁহার বাড়ীর ঘাটে আসিয়া ভিড়িল এক বিরাট বজরা, তাহাতে ছিল অনেক দ্রব্যসম্ভার। স্বয়ং দেবকীরঞ্জন আসিয়াছে ওই সব লইয়া, সঙ্গে আছে তাহাদের প্রিয় সর্দার হারু।

দেবকীরঞ্জন নীলকান্ত বাবুকে প্রণাম করিয়া একখানি পত্র দিল। তাহাতে লেখা ছিল—

ভাই নীলু, ছাত্রজীবনে তোমাকে যে নামে সম্বোধন করিতাম, দীর্ঘকাল পরে এই নরাধম আবার তোমাকে সেই প্রিয় নামে সম্বোধন করিল। আমার রক্ত-কলঙ্কিত হস্তের এই পত্র তোমাকে পাঠাইলাম,

ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিও। জান ত ভাই, ছেলেবেলা ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশন হলে ধর্মাযাজকের মুখে শুনিয়াছিলাম—'পাপকে ঘৃণা করো, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করো না।' কাজেই আমাকে ঘৃণা করিও না। আমি তোমাকে এ চিঠি লিখিতে সাহসী হইতাম না যদি না আমার গৃহিণী আমাকে উৎসাহিত করিতেন! পুত্রকেও পাঠাইলেন তিনি উদ্যোগী হইয়া! পিতার প্রতি বিরূপ হইতে পার, কিন্তু নির্দোষ পুত্রের প্রতি বিরূপ হইও না। আমার ও আমার স্ত্রীর শত শত মিনতি, তুমি বরিশাল যাইবার পথে শ্রীমান্ অমিয়কে সহ একদিনের জন্য আমার বাড়ীতে অতিথি হিসাবে থাকিয়া যাইও।

ইতি,

—অধম গোপী

নীলকান্তবাবু স্ত্রী-পুত্রসহ আত্মীয়-স্বজনের মত লইয়া নৌকা-যোগে বরিশাল যাত্রা করিলেন।



।। ছয়।।

—কাটি গ্রামে জমিদারের বাড়ীর ঘাটে নৌকা ভিড়িল। অমনি নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। পরম উৎসাহের সহিত তাঁহাদের বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন গোপীবাবু। তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর গোপীবাবু একখানি চরমপত্র বা উইল দিলেন নীলকান্ত বাবুর হাতে। নীলকান্তবাবু উহা পড়িয়া অবাক্ হইলেন।

গোপীবাবু উইলে লিখিয়াছেন—'আমার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি আমার পুত্র শ্রীমান দেবকীরঞ্জনকে এবং আমার জামাতা শ্রীমান্ অমিয়রঞ্জন ও কন্যা শরৎসুন্দরীকে দান করিলাম। আর ইহাদের অভিভাবকত্ব—এস্টেটের সর্ববিধ কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিলাম আমার বন্ধু ও আত্মীয় শ্রীযুত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় উকীলের হস্তে।' উইলখানা, পড়ার পর নীলকান্তবাবু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন—এ কি করেছ গোপী ?

গোপীবাবু বলিলেন—ঠিক কথা ভাই! আমি আর সংসারে থাকবো না। শেষজীবনটা স্বামী ও স্ত্রী কাশীবাসেই যাপন করবো। কিছু অন্যায় করি নি। তোমার ছেলেকে আমি চাই। আর তোমার কন্যাটিকেও দিতে হবে আমাকে।

নীলকান্তবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, গোপীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে সম্মত হইলেন। এক শুভদিনে দেবকীরঞ্জনের সহিত নীলকান্তবাবুর কন্যা মানদার এবং অমিয়রঞ্জনের সহিত শরৎসুন্দরীর বিবাহ লইয়া গেল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত দুই পরিবারের মধ্যে মিলনসেতু গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সত্য সত্যই সমুদয় ধন-সম্পত্তি দান করিয়া এক শুভদিনে দুর্বৃত্ত ডাকাত গোপীনাথ দেশ ত্যাগ করিল।

নীলকান্তবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন জমিদারীর সর্ববিধ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং উইলের অন্য শর্ত অনুসারে গোপীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহার্থ মাসিক মাসোহারা পাঠাইতেন।

সময়ে দুই পরিবার বড় তরফে ও ছোট তরফে পরিণত হইল। পরবর্তী কালে এই দুই হিস্যার ভূস্বামীরা দেশের ও দশের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথ উচ্চবিদ্যালয়, নিস্তারিণী দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা প্রভৃতিব অস্তিত্ব সেদিনও বিদ্যমান ছিল। এখনও দুই পরিবারের বংশধরেরা জীবিত আছেন। জমিদারী নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখনও আছে মহত্ত্ব ও বদান্যতা।

১৮



ডাকাতের খাল

এক

বর্ধমান জেলায় ডাকাতের খাল।

কাটোয়ার অনেকটা দূরে গঙ্গা হইতে এ খাল বাহির হইয়া গ্রামের ভিতর গিয়াছে। এই খাল বেশ চওড়া ছিল—অন্ততঃ গঙ্গার মুখের কাছাকাছি, তার পর ক্রমশঃ সরু হইয়া কোথাও মাঠ, কোথাও বিল, কোথাও চাষীদের ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে দূর প্রান্তে!

দুই পাশে বড় ছোট, সব রকমের গ্রামই আছে। কোন গ্রামে বেশ ধনী জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ীর বাস। তাঁহাদের বড় বড় পাকাবাড়ী তালগাছের আড়ালে, আম-কাঁঠালের ঘেরা বনে শোভা পায়, আবার খালের পারে চাষী, বাগ্দী নানা জাতির লোকেরাও বাস করে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি—তাহা ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের কথা। পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে চলিয়াছে অরাজকতা। নামে শাসক নবাব—কিন্তু শাসন করে ইংরেজ কোম্পানী। তাহারা চায় টাকা, শোষণ করে রক্তচোষা বাদুড়ের মত প্রজার রক্ত। প্রজার টাকা নাই, খাদ্য নাই, তবু দেয় টাকা। নবাবী ফৌজের সৈনিকরা ফৌজ হইতে বিদায় হইয়াছে। তাহারা বেকার—অথচ খাওয়া চাই। তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়,—দল বাঁধিয়া করে ডাকাতি। সঙ্গে তাহাদের জুটিয়াছে —ঠেঙ্গাড়ে, ঠগী আর অপর ডাকাত দল। এই দলের লোকেরা এখান দিয়া গঙ্গার স্রোত ধরিয়া গ্রামে ঢোকে জোয়ারের সাথে আবার ভাটার টানে গঙ্গার বুকে আসিয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন পথে। দেশে শাসন নাই, কেহ কাহাকেও দেখে না—দস্যুদল নির্ভীক ভাবে ডাকাতি করে।

এজন্য ঐ খালের নাম ডাকাতের খাল। ডাকাতের খালের এক পাশে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে বাস করেন নিতাই বণিক। খুব ধনী, জাতিতে তন্তুবায়, সূতার ও তূলার কারবারে অনেক টাকা

সঞ্চয় করিয়াছেন। লোকে বলে কোটি টাকা। কলিকাতাতে আড়ত আছে, কাশিমবাজারেও আছে। যে গাঁয়ে নিতাইয়ের বাড়ী, সেই গাঁয়ের নাম পলসোনা। সেখানে অনেক সোনার-বেনে এবং গন্ধবেনেরও বাস। সকলেই চাষবাস ও ব্যবসা করিয়া টাকা-কড়ি করিয়াছেন।

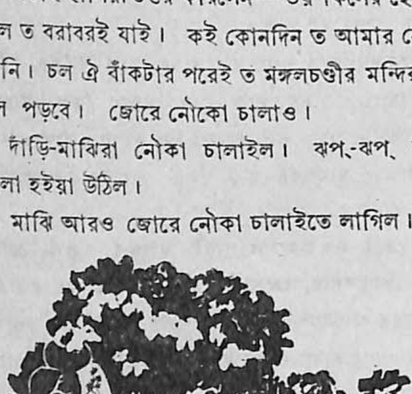
লোকে নিতাই বণিককে বলিত নিতাইবাবু। নিতাই লোকটি ছিলেন পরোপকারী। গাঁয়ের দুঃখী-দরিদ্রদের সাহায্য করিতেন; গোলার ধান বিলি করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। সেবার পূজার সময় নিতাই বাড়ী চলিয়াছেন ডাকাতের খাল দিয়া। তাঁহার আদেশে তাঁহার নিজের নৌকাখানি আগে আগে চলিয়াছে, মাঝিকে বলিয়াছেন পথে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দিয়া যাইবেন। পেছনে রহিয়াছে নৌকা বোঝাই নানা জিনিসপত্র পূজার জন্য, দরিদ্রদের দানের জন্য—ধুতি, চাদর, গামছা, মণ্ডা, মিঠাই প্রচুর পরিমাণে।

মাঝি বলিল—পথটা ভাল নয় কর্তা। এ যে ডাকাতের খাল। কোথায় কোন্ বিপদ ঘটে, যদি নৌকো ঘিরে ফেলে। এগিয়ে যাওয়া কি ভাল হবে?

নিতাই হাসিয়া উত্তর করিলেন—'ভয় কিসের হে রামকানাই? এ খালে ত বরাবরই যাই। কই কোনদিন ত আমার নৌকোয় ডাকাতি হয় নি। চল ঐ বাঁকটার পরেই ত মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির। সঙ্গীরাও সব এসে পড়বে। জোরে নৌকো চালাও।

দাঁড়ি-মাঝিরা নৌকা চালাইল। ঝপ্-ঝপ্ শব্দে খালের জল উতলা হইয়া উঠিল।

মাঝি আরও জোরে নৌকা চালাইতে লাগিল।



॥ দুই॥

মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির। ঘন গাছপালায় ঢাকা নিবিড় বনের মধ্য দিয়া অতি সংকীর্ণ পথ! সেই পথে যাওয়া যায় মন্দিরের কাছে। গ্রামটিও বনভূমি। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের পাশে ভগ্ন জীর্ণ প্রাচীরে ঘেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা ভাঙ্গা মন্দির। মন্দির দক্ষিণমুখো। কাঠের ভাঙ্গা সিংহাসনের উপর দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। সিংহাসনের সম্মুখে একটি প্রস্তরের মূর্তি—নাম কপিলেশ্বর। লোকে বলে উজানিতে মঙ্গলচণ্ডী দেবী। তন্ত্রের মতে এই মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মন্দির একটি পীঠস্থান। মন্দিরের এক কোণে রহিয়াছে রুধির-সিক্ত ভীষণ দীর্ঘ খড়্গ। মন্দিরপ্রাঙ্গণে হাড়িকাঠ। তাহার দুইদিকে রক্তের ধারায় সিক্ত কর্দমাক্ত মাটি।

কী ভীষণ নীরবতা! লোক নাই—লোকালয় নাই আশে পাশে। গভীর অন্ধকার রাত্রি। গাছপালায় স্থানটিকে আরও ভীষণ অন্ধকার ও ভয়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মন্দিরে পুরোহিত নাই। মন্দিরে ভাঙ্গা কপাট। একটা মাটির প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সেই মহিষমর্দিনী মূর্তিকে দেখাইতেছে অতি ভীষণা রক্তলোলুপা, যেন রক্তচক্ষু করিয়া দেবী বলিতেছেন—রক্ত দে—রক্ত দে!

পূজা করিতেছে হারাণ বাগ্দী। ডাকাতের সর্দার সে। পূজার মন্ত্র কি জানি না—তবে পূজার উপচার বড় কম ছিল না। সে জয় মা কালী বলিয়া চীৎকার করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণ ধ্বনিত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নিবিড় বনে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় শোনা গেল লোকজনের শব্দ। দেখা দিল লণ্ঠনের আলো। সেই সংকীর্ণ খালের ধার দিয়া আগে আসিতেছিলেন নিতাইবাবু। গায়ে একখানি মাত্র উড়নি, সাদা থান ধুতি পরা, সৌম্যশান্ত মূর্তি।

সব চুপচাপ! যেন কোন লোকজন নাই। ডাকাতেরা লাঠি তলোয়ার সড়কি লইয়া মন্দিরের আশেপাশে বনের আড়ালে লুকাইয়া আছে। হারাণ সর্দার একটা মানুষের মাথার খুলির মধ্যে বলির রক্ত লইয়া বাহিরে আসিয়া যেমন নিতাইর কপালে তিলক পরাইতে গিয়াছে অমনি ক্ষীণ আলোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, দুই হাত পিছাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—কু—কু—কু।

বিস্মিত হইলেন না, ভীত হইলেন না নিতাইবাবু। যেন কিছু ঘটে নাই—সব ভয়, আতঙ্ক কিছুতেই ভীত না হইয়া দেবীর ধ্যান করিতে শুরু করিলেন; তারপর মাকে প্রণাম করিয়া যেমন মাথা তুলিলেন—দেখিলেন তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে একদল সশস্ত্র ডাকাত। ডাকাতদের হাতে লাঠি, তলোয়ার ও সড়কি। ভীষণদর্শন তাহাদের মূর্তি। মাথায় ভরা ঝাঁকড়া চুল। কালিমাখা মুখ, চক্ষু রক্তবর্ণ। সকলে নীরব। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

নিতাইবাবু এইবার ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। পূর্বের সাহস আর তাঁহার ছিল না। এমন সময় হারাণ বাগ্দী—দলের সর্দার—মানুষের মাথার খুলিতে ভরা রক্ত লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কি ভয়ংকর তাহার মূর্তি! মাথাভরা জটার মত লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। রক্তচক্ষু ঠিক জবাফুলের মত। কালিমাখা ভীষণ মুখ। দীর্ঘ দেহ। বলিষ্ঠ গঠন।

নিতাই কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—কে তোরা?

সকলে জোরালো স্বরে বলল—আমরা ডাকাত!

—ডাকাত, ডাকাত! তোমরা কি আমায় মেরে ফেলবে?

এমন সময় আগাইয়া আসিল হারাণ বাগ্দী, কহিল—না মারব না। দৈব আপনাকে রক্ষা করেছে—মায়ের মন্দিরে এসেছেন, নইলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতেন।

—আমার সঙ্গীরা—

—তাদের নৌকোর মালপত্তর এতক্ষণে লুঠপাট হয়ে গেছে। সব এখানে এসে পৌছবে।

—কেন—কি তাদের অপরাধ?

—অপরাধ নয়। আমাদের প্রয়োজন আছে। তাই লুঠ করেছি।

হারাণ সর্দার এইবার নিতাইবাবুর কাছে আসিয়া বলিল—ভাল করে চেয়ে দেখ বাবু, আমায় চিনতে পার ?

—চিনতে—তা—ঠিক—না—হাঁ প্রেরেছি।—তুই—তু—মি—তুমি হারাণ ?

—হাঁ, আমি হারাণ!

—তুমি ডাকাত ?

ভীষণ অট্টহাসি হাসিয়া হারাণ কহিল—হা—হা আমি ডাকাত! কিন্তু আমাকে ডাকাত করেছে কে ? তুমি নিতাইবাবু।

ডাকাতেরা একে একে আসিয়া নিতাইর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

—আমি—আমি—

—হাঁ তুমি! মনে পড়ে বাবু, তোমার বড় ছেলে যখন গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল, কে তাকে বাঁচিয়েছিল ? মনে পড়ে ? না—না—তোমরা বড়লোক! সব কথা ভুলে যাও। কোম্পানীর গুদামে হাজার হাজার টাকা পৌছে দিয়েছি—আমি হারাণ সর্দার! মনে পড়ে বাবু ?

নিতাই নীরব।

সেই তুমি বিনা দোষে—সেবার খাজাঞ্চিখানার সিন্দুক হতে এক হাজার টাকার একটা তোড়া পাওয়া যায় নি বলে আমাকে চোর বলে সারা গায়ে মেরেছিলে কোড়ার বাড়ি! এই দেখ এখনও সেই দাগ! শুধু কি তাই ? কোতোয়ালের হাতে দিয়ে আমাকে কয়েদখানায় পাঠিয়েছিলে। কয়েদখানার দেওয়াল টপকে পালিয়ে এসেছিলাম, তাই রক্ষে ; নইলে সেখানেই প্রাণ যেত। এই দেখ, কোড়ার দাগ, এই দেখ আমার ভাঙ্গা চোয়াল। তুমি সেই নিতাই-বাবু! এখন আমি—

কাঁদিয়া ফেলিলেন নিতাই বাবু। করুণকণ্ঠে বলিলেন—আমাকে মাপ করো হারাণ।

—তোমায় মেরে কন্ধকাটা করে খালে ভাসিয়ে দেব—আমাদের ডাকাতের খালে!—চীৎকার করিল হারাণ সর্দার।

হা-রে-রে-রে শব্দ করিয়া সব ডাকাত তলোয়ার উঁচু করিল।

একটু পরে হারাণ জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, ভদ্রলোক বেইমান হয়, চোর হয়, জোচ্চোর হয়, গরীবের খাবার কেড়ে নেয়, মিথ্যা করে চোর বলে ধরিয়ে দেয়, কিন্তু গরীব তা করে না। তোমরা কাকেও বিশ্বাস করতে জান না!—

নিতাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—আমায় কি মেরে ফেলবে হারাণ ?

হারাণ বাগ্দী আঙ্গুল তুলিয়া ডাকাতদের যেমন ইসারা করিল, তাহারা অমনি সরিয়া দাঁড়াইল নিতাইর পাশ থেকে।

হারাণ বলিল—কালু, নিতাইবাবুর নৌকোর লুঠের জিনিস সব এনেছিস্ ?

—হাঁ সর্দার!

—যা, সব গুদামঘরের কাছে জড়ো কর।

লোকটি চলিয়া গেল। ডাকাতের দল নিতাইবাবুকে লইয়া মন্দির হইতে বাহিরে আসিল।



॥ তিন॥

বাঁশী বাজিল। দামামা বাজিল ডিম্-ডিম্। ঢাক বাজিল জোরে।

বনের এক প্রান্তে মন্দিরে অল্প দূরে বিস্তীর্ণ মাঠ! সেই মাঠের পাশে একটা বিরাট বটগাছের নীচে আসিয়া বসিল হারাণ সর্দার!

ক্রমে ফর্সা হইল। পূব আকাশ লাল হইয়া উঠিল। পাখীরা ডাকিতে লাগিল। আবার বাঁশী বাজিল। দেখিতে দেখিতে পিঁপড়ার সারির মত পুরুষ ও নারী—শিশু-বালক-কিশোর—ছোট বড় সব আসিতে লাগিল।

হারাণ বাগ্দী প্রত্যেককে ডাকাতদের হাত দিয়া এবং নিজের হাতে বিলাইতে লাগিল—কাপড়, টাকাকড়ি, চাল ডাল—তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কঙ্কালসার এসব ভিখারী-ভিখারিণীর দল নিতাইবাবু বুঝি আর আগে দেখেন নাই। দেখিলেন পরণে কাপড় নাই, মাথায় তেল নাই, কি অভাব—কি দুর্দশা দেশের লোকদের।

নিতাইবাবু বসিয়া বসিয়া এইসব দেখিতেছিলেন। এই সব দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই তাঁহার দেশের লোক, এত গরীব—এত অভাগা। আর কি অন্যায় করিয়াছেন তিনি এই হারাণ বাগ্দীর উপর। বিনা দোষে কি বেদনা দিয়াছেন। নিতাই মনে মনে একথাই বিশেষ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন—কে বড়—ধনী ব্যবসায়ী নিতাইবাবু—না হারাণ বাগ্দী—ডাকাতের সর্দার ?

একে একে অন্যান্য ডাকাতেরা নিমেষে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল। সেইখানে রহিল শুধু ডাকাতের সর্দার, নিতাইবাবু আর চারজন ডাকাত!



॥ চার॥

—বাবু এইবার।

—কি করবে আমায় ?

—মার কাছে বলি দেব।...বলিয়া হারাণ হাসিল। আবার উচ্চকণ্ঠে—হা—হা—হা। সে কি ভীষণ অট্টহাসি।

নিতাইবাবু করুণকণ্ঠে কহিলেন—তাই দাও!

—সে কি কথা! আমরা গরীব, মুখ্য-সুখ্য লোক—কিন্তু বেইমান নই।...কালু।

—সর্দার !

—বাবুর চোখ-মুখ বেঁধে বনের সীমা পার করে ওর গাঁয়ের পথে খালের মধ্যে যে নৌকা আছে তাতে রেখে আয় ! ওর সঙ্গের মাঝি-মাল্লাদের ছেড়ে দে।

—আমাকে ছেড়ে দিলে—হারাণ ?

—কি করবো আপনাকে মেরে ?

—তুমি অপরাধ ভুলে যেয়ো হারু !

—ভুলে গেছি বাবু, ভুলে গেছি। তবে একটা কথা বলি বাবু, দারোগা পুলিশ করবেন না—তা হলে বিপদে পড়বেন। আর একটা কথা বলছি বাবু, এই আমাদের মত ছোটলোক গরীব-দুঃখীদের ভুলবেন না। অনেক টাকা রোজগার করেছেন, আরো করবেন, কিন্তু এদের কথা মনে রাখবেন ! প্রণাম হই বাবু, আপনি যে আমার মনিব। ডাকাত হয়েছি বলে ত আপনার উপকার ভুলতে পারবো না—যতদিন বেঁচে থাকবো।

নিতাইবাবু হারাণ বাগ্দীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—বাবা ! আমি প্রতি বৎসর তোমার হাত দিয়ে এমনি করে আমার কাঙ্গালী মা-ভাইবোনদের অন্ন বিলাবো, কাপড় দেবো। তুমি নিজের হাতে বিলিয়ে দেবে তাদের মধ্যে—মায়ের নাম করে !

কতদিন চলিয়া গিয়াছে। যে বনভূমিতে নিতাইবাবু গরীব-দুঃখীদের দান করিতেন, সেই স্থানের নাম হইয়াছে নিতাইগঞ্জ। কে না জানে নিতাইগঞ্জের হাটের নাম ?

আজ লোকে নিতাইবাবু ও হারাণ বাগ্দীর নাম ভুলিয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতিতে বাঁচিয়া আছে নিতাইগঞ্জের হাট আর শীর্ণকায় ডাকাতের খাল।

১৯



অতিথির হাতে প্রাণ রক্ষা

এক

কয়েক বৎসর আগে গিয়েছিলাম বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামে। গঙ্গার তীরে বৃহৎ পল্লী। গঙ্গা বর্ষার শেষে ক্রমে ক্ষীণসলিলা হইয়া পড়ে এবং গ্রীষ্মের দিকে অনেক জায়গায় শুকাইয়া যায়, লোকে তখন হাঁটিয়া পারাপার হয়। আমি যখন পূর্বস্থলী গিয়াছিলাম, তখন বাহির হইতে কোন লোক-সমাগম নাই, বাংলাদেশও বিভক্ত হয় নাই। স্টেশন হইতে গ্রাম দূরে। বড় গ্রাম। আমার সঙ্গীর বাড়ী নদীয়া—নবদ্বীপ শহরে। তিনি বলিলেন, চলুন গ্রামের ভিতর। স্থানীয় একজন বৃদ্ধ মুসলমান হইলেন সঙ্গী। যে গ্রামের দিকে চলিলাম, সেই গ্রাম পূর্বস্থলীর অনেক দূরে। সে গ্রামের নাম আজ আমার মনে নাই।

মাঠ ছাড়াইয়া আসিলাম পল্লীপথে। অপ্রশস্ত পল্লীপথ, পথ উঁচুনীচু, দুইদিকে গভীর বাঁশবন, আমবাগান। বট ও অশ্বত্থ এবং পাকুড় গাছ। দক্ষিণে ও বামে দুই দিকেই বন ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিতেছিল। ঘরবাড়ী বড় একটা চোখে পড়িতেছিল না। ভগ্নজীর্ণ দালানকোঠা। কোথাও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছাত নাই, গায়ে বুনোগাছের চারা গজাইয়া অন্ধকার করিয়াছে। সাপ, গো-সাপ ও শৃগালের নিরাপদ বাসস্থান। বড় বড় দীঘি-সরোবর নানা জলজ উদ্ভিদে ঢাকা, শৈবালদলে পরিপূর্ণ।

আমরা দুইদিকে ভগ্নজীর্ণ বাড়ীঘর, কুঁড়ে, সংকীর্ণ পথ, কাঁটাগুল্ম ঝোপঝাড় পার হইয়া চলিতে চলিতে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম রাস্তার বাঁ-দিকে একটি প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে প্রাচীর। প্রাচীর কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও খাড়া আছে। গাছগাছড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। একটি ভাঙ্গা সিংহ-দরজা, তাহার একদিকে ইঁট পড়িয়া আছে। প্রকাণ্ড একটা দীঘি। তাহার পাড়ে শিবমন্দির, শিবমন্দিরে শুধু গৌরীপট পড়িয়া আছে। মুসলমান ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতর আগে আগে চলিলেন। বাহিরে পূজার দালান, নাটমন্দির, অতিথিশালা পড়িয়া আছে ; এই সব দেখাইয়া বলিলেন, আসুন বাড়ির ভিতর। বিরাট চকমিলান বাড়ি। এক বৃহৎ অট্টালিকা। জানালা-দরজা ভাঙ্গা। বাহিরের বৃহৎ একটি ঘরে কোন যুগের জীর্ণ শীর্ণ সতরঞ্চের অতি সামান্য অংশ পড়িয়া আছে। বাড়ীর নীচের তলে বড় বড় ঘর। সিঁড়ি ভাঙ্গা, কোনরূপে আমরা ধূলো-বালিতে ভরা দ্বিতলে উঠিলাম। আমরা এক পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নীচে প্রকাণ্ড বড় রন্ধনশালা আর যতদূর চোখে পড়ে একটা বড় আমবাগান। হঠাৎ একটা সাপ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া হিস্-হিস্ করিয়া চলিয়া গেল। গুটিকয়েক শেয়াল মানুষের পদশব্দে দৌড়াইয়া পলাইল। নির্জন নিঝুম এ পুরী, যেন ভূতের বাড়ী। কয়েকটা নারকেল গাছ মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার সঙ্গী ও আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। এখানে এই পরিত্যক্ত জনহীন নির্জন পুরীতে, চারিদিকের একটা ভয়ানক পরিবেশের মধ্যে দিনের বেলাও ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল।

বন্ধু বলিলেন—চলুন।

আমি বলিলাম—বেলা হয়েছে, এবার যাওয়াই ভাল।

স্থানীয় সেই বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক বলিলেন—আর একটু করতে হবে, চলুন বাড়ির অন্দরের দিকে।

কোন রকমে সেই ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। সম্মুখে বিরাট বাঁধান চত্বর। ইঁট-সুরকি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গভীর গর্ত। ভাঙ্গা দরজার ভিতর দিয়া চলিলাম ভদ্রলোকের পেছনে। দুইদিকে রান্নার দালান। শিল-নোড়া, ভাঙ্গা হাঁড়ি-কড়াই পড়িয়া আছে, মরচে ধরা। একটা ঘর—সে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা, সেইটা ছিল খাবারের জায়গা। সে ঘরের ছাদ নাই। কুলুঙ্গিতে কালো ধোঁয়ার দাগ। তুলসী মঞ্চ, শুষ্ক ইঁদারা, আরও দূরে ঢালু জায়গা,—একটু পরে খিড়কীর পুকুর। পুকুর বেশ বড়, কিন্তু আগাছা উদ্ভিদে পূর্ণ। পুকুরে লম্বা লম্বা বুনো ঘাস জন্মিয়াছে। একটা ঘরের ভিতর পড়িয়া আছে মরচে-পড়া প্রকাণ্ড খড়্গ, সামনে হাড়িকাঠ। সেই প্রকাণ্ড হাড়িকাঠের একদিক জরাজীর্ণ আর একদিক

ঠিক আছে, তাহার পাশেই বিরাট খাঁড়া। মরচে-পড়া সেই খাঁড়া।

—দেখলেন ত বাবুমশাই!

—কি বলতে চাও তুমি?

—বাবু এখানেই হয়েছিল সর্বনাশ! এখনও রাতের বেলা, সন্ধে রাতে মানুষ দেখে ভূত! এসেছেন ত এই দিন-দুপুরে, তাও লোকজনের চলাচলতি নেই। একথাটা সত্য। লোকজনেরা এ বাড়ীর পাশ এড়িয়ে মাঠের পথে চলে।

একে একে সব দেখাইয়া বৃদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাবু দুনিয়ায় ত মানুষের এমনি হয় পরিণাম। এত বড় জমিদারের বাড়ী, তার দেখুন কি দুর্দশা, কি পরিণাম।

একটি কথাও মিথ্যে নয়। গাছপালা, দীঘি-পুকুর, দেয়াল সব যেন হা-হা করিতেছে! বিষণ্ণ-মনে ফিরিয়া আসিলাম বন্ধুর বাড়ি। সন্ধ্যার সময় আসিলেন মুসলমান ভদ্রলোক এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন সেকালের এক ভয়ানক সত্য কাহিনী। সে কথাই বলিতেছি।



॥দুই॥

মুসলমান ভদ্রলোকের কথিত বিবরণ বলা হইতেছে—

সে একশ' দেড়শ' বছর আগে ঐ গ্রামের চৌধুরীপাড়ায় বাস করিতেন শম্ভুনাথ চৌধুরী। বিরাট ছিল তাঁহার জমিদারী। ধনে-মানে সম্পত্তিতে তিনি ছিলেন মস্ত বড়লোক। অতিথি-অভ্যাগত দিন-রাত্রি আসাযাওয়া করিত, বাড়ি নিত্য করিত গম্‌গম্‌। শম্ভুনাথ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। নিত্য পূজাপার্বণ লাগিয়াছিল তাঁহার বাড়িতে। গানবাজনা, কীর্তন যেমন হইত, তেমনি গ্রামের দুঃখী-দরিদ্রেরা পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পাইত। যেমন ছিলেন কর্তা, তেমনি ছিলেন মা ঠাকুরানী। অতিথিসেবা না হইলে কর্তা ও গৃহিণী কেহ খাইতেন না। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়িতে আসিলেন এক বৃদ্ধ ও তাঁহার যুবক পুত্র। দুই অতিথি।

চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ির কাছে যখন তাঁহারা আসিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে।

যুবক পুত্র বলিল—বাবা এ ত বেশ বড়লোকের বাড়ি, আজ রাত্রের মত এ বাড়িতে অতিথি হলে হয় না? কি বলেন?

ক্লান্ত বৃদ্ধ অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন, বলিলেন—তা ত হয় বাবা। কিন্তু এ অঞ্চলের সম্বন্ধে নানা দুর্নামও ত আছে, অনেক সময় জমিদারও ডাকাত হন—যদি এ ডাকাতের বাড়ি হয়?—কি করে বুঝবো।

পুত্র বলিল—কাছে ত আর গ্রাম নেই, রাত্রিও বেড়েই চলেছে। বাঘের মুখে পড়ার চেয়ে এ বাড়িতে অতিথি হলে মন্দ কি? তারপর এমনও হতে পারে যে পথে ঠেঙ্গাড়ের হাতেও পড়তে পারি।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—কথাটা ঠিক। সম্বল ত মাত্র ভিক্ষার এক হাজার টাকা। তা অবশ্যই বেশ শক্ত করেই থলেতে বেঁধেছি। এ টাকাটা গেলে মেয়ের বিয়ে দেব কি করে? কি জানি জগদম্বার মনে কি আছে!

—ওঃ—দিদির বিয়ের কথা বলছো? সে হবে। কেউ নেবে না এ টাকা।

দুইজনে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে একেবারে ফটকের কাছে আসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধের কাঁধে একটি সেতার ঝুলানো, বাঁ হাতে লাঠি। যুবকের হাতে পোটলা-পুঁটলি। বৃদ্ধের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। যুবকের বয়স কুড়ি-পঁচিশ হইবে—বেশ বলিষ্ঠ।

একজন প্রৌঢ় গৌরবর্ণ সুপুরুষ ভদ্রলোক ইঁহাদের লক্ষ্য করিতে-ছিলেন এবং ফটকের কাছে আসিয়াও তাঁহাদিগকে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মশাইদের কোথায় যাওয়া হবে?

—আজ্ঞে—মেড়পাড়া। আমরা ব্রাহ্মণ—এইটি আমার পুত্র।

পৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের দর্শন পেলুম। আমার আজ অতিথি সেবা হয় নি। আসুন!

মহাশয় কি এই বাড়ির কর্তা?—জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে হাঁ। আসুন!—ভদ্রলোক পরম সমাদর সহকারে অতিথি দুইজনকে লইয়া আসিলেন এবং অতিথিশালার একটি বৃহৎ ও পরিচ্ছন্ন কক্ষে তাঁহাদের রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভৃত্য আসিয়া হাত-মুখ ধোয়ার জল দিল এবং রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম বাণীনাথ তর্কালঙ্কার। পরম পণ্ডিত মানুষ কন্যাদায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম যশ ছিল, কাজেই শিষ্য ও অন্যান্য ধনী মহাজন ও ভক্তদের কাছ হইত যে হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্যই চিন্তিত ছিলেন পিতাপুত্র। পাছে ডাকাতে কেড়ে নেয়। তাঁহারা ভাবিলেন এ বাড়ি কখনও ডাকাতের বাড়ি নয়!

চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিনয়ে মোহিত হইয়াছিলেন পিতা-পুত্র। প্রচুর আয়োজন করিয়া দিয়াছিল ভাণ্ডারী। রান্নাবান্না শেষে পরম পরিতোষের সহিত আহার করিয়া পিতা-পুত্র ঘরে আসিলেন। পুত্র শুইয়া পড়িল। তর্কালঙ্কার টাকার তোড়াটা আরও শক্ত করিয়া থলেতে বাঁধিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া বসিলেন। তিনি সেতারের সুরে সুরে গান ধরিলেন। প্রসাদী সুরে—

রইলি না মন আমার বশে,
ত্যজে কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয়-রসে।

গানের সে সুরলহরী গভীর নিশীথে দিকে দিকে সুরের মূর্ছনা জাগাইয়া দিতেছিল। বাড়ির ভিতরে যেখানে শম্ভুনাথ চৌধুরী শুইয়াছিলেন সেই সুর তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বাহিরের সেই অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিলেন তর্কালঙ্কারের পাশে। করযোড়ে কহিলেন—ধন্য

আপনি। আমাদের মানসম্ভ্রম, অর্থলোভ ও বিষয়-বাসনা আর গেল না!

গল্প চলিতেছে, এমন সময় আবার দুইজন অতিথি আসিল। এইবারও একজন বৃদ্ধ এবং একজন যুবক। বৃদ্ধের হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠি আর উভয়ের কাঁধে ঝুলানো প্রকাণ্ড তীর-ধনুক।

চৌধুরী মহাশয় একটু ভীত হইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কারা? তাঁহার মনে হইয়াছিল বুঝি ইহারা ডাকাত।

বৃদ্ধ কহিল—বাবুসাব, হামলোক শিকারী হ্যায়, বহুৎ দূর যানে হোগা। আপ্ বড়া আদমি, আজ রাতমে আপকা কুঠিমে রহেনে মাঙ্গতা। যুবককে দেখাইয়া বলিল—ও হামারা লেড়কা, ইস্‌কো নাম মহাবীর। ভারি জব্বর শিকার খেলনেওয়ালা। জয় হনুমানজী! জয় রামজী!

এই দুইজন নবাগত অতিথিও আশ্রয় পাইল। তাহারা ডাল-রুটি খাইয়া রাত্রিতে অতিথিশালার একটি ছোটঘরে আশ্রয় পাইল। তর্কালঙ্কারের সঙ্গে তাহাদের নানা কথা হইল। তারপর তর্কালঙ্কার শুইয়া পড়িলেন। শম্ভু চৌধুরীও অন্দরে চলিয়া গেলেন।



॥ তিন ॥

রাত্রি গভীর হইয়াছে। চারিদিকে স্তব্ধভাব। বাতাসে গাছের পাতা সর-সর শব্দে দুলিতেছে। দেউড়িতে বরকন্দাজেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় অনেকগুলি মশাল জ্বলিয়া উঠিল। একদল দস্যু অন্দর মহলের দিক হইতে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের বিকট—হা—হা—অট্টহাসিতে হইল বিভীষিকার সৃষ্টি! প্রত্যেকের হাতে বর্শা ও তলোয়ার। বরকন্দাজ ও পাহারাওয়ালারা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু এত বড় দস্যুদলের আক্রমণে কি করিতে পারে বিশ-পঁচিশজন বরকন্দাজ।

দস্যু-সর্দারের হুকুমে একদল দস্যু শম্ভু চৌধুরী মহাশয়ের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দোতলার সিঁড়ি দিয়া চাপা দরজা ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে শুরু করিতেছিল। ঝন্-ঝন্ শব্দে কপাট ভাঙ্গিতেছিল আর বরকন্দাজদের বর্শা ছুঁড়িয়া মারিতেছিল।

এমন সময় বৃদ্ধ শিকারী তাহার যুবক পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—বাচ্চা, ক্যায়া দেখতা, ছোড় তীর!

বীর-বিক্রমে লাফাইয়া উঠিল মহাবীর। অদ্ভুত শিক্ষা বৃদ্ধ শিকারীর ও যুবকের। তাহারা গোপনে একটা দরজার আড়ালে থাকিয়া মুষলধারা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়িতে লাগিল। অব্যর্থ তাহাদের তীরের সন্ধান। তীরের আঘাতে দস্যুরা একে একে মাটিতে পড়িতে লাগিল। একটা প্রবল উত্তেজনা ও ভয়ে ডাকাতেরা পলাইতে আরম্ভ করিল। যে ডাকাতেরা চৌধুরীমহাশয়ের ঘরে ঢুকিতে দ্বিতলের দিকে ছুটিতেছিল, তাহাদের একজনও প্রাণে বাঁচিল না।

অতিথিশালার দিকে কয়েকজন ডাকাত যেমন পলাইবার মুখে ছুটিয়া আসিতেছিল বৃদ্ধ শিকারী এমন কৌশলে তাহাদিগের দিকে তীর ছুড়িতেছিল যে, সকলেই আহত হইয়া পড়িতেছিল, কিংবা মরিতেছিল।

পরদিন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের পুত্র চৌধুরীমহাশয়কে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দারোগা পুলিশ আসিল। আহত ব্যক্তিদের তাহারা শহরে চালান দিল। অনেক ডাকাত ধরা পড়িল। শিকারী বৃদ্ধ ও তরুণ—পিতা ও পুত্র, কোম্পানীর কাছ হইতে পুরস্কার পাইল।

এই কাহিনী শেষ করিয়া মুসলমান ভদ্রলোক বলিলেন—'শম্ভু চৌধুরী মহাশয় শিকারী পিতা ও পুত্রকে তাঁর বাড়ির রক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন বেশ নিরাপদে কেটে গেল। কোন দস্যু-ডাকাত আর এ অঞ্চলে এর মধ্যে ডাকাতি করতে আসে নি। কিন্তু সেই যে খড়্গ পড়ে আছে দেখলেন, সেখানে একদিন হয়েছিল ভীষণ এক ঘটনা। সে বড় করুণ। একজন তান্ত্রিক সাধু ঐ যে ভগ্নজীর্ণ কালীমন্দির দেখলেন, সেখানে পূজা-অর্চনা করতেন। শ্মশানে বসে করতেন সাধনা। একদিন সেই নিষ্ঠুর গভীর নিশীথে এক চণ্ডাল বালককে চুরি করে এনে বলি দিয়ে শবের উপর বসে উপাসনা করেন! পরদিন ভোরে চৌধুরীমহাশয় জানতে পারলেন এবং নিজের চক্ষে দেখলেন সেই ভীষণ দৃশ্য! দেখলেন তান্ত্রিক কালান্তক! বালকের শব শ্মশানে ভূলুণ্ঠিত! শিউরে উঠলেন। চৌধুরী ভাবলেন আর নয়—আর ত সংসারে থাকা চলে না!

সংসার ছাড়িয়া চৌধুরী হইলেন দেশত্যাগী। পুত্র থাকিতেন পশ্চিমে বেরিলি শহরে! একমাত্র পুত্র কমিশরিয়টের অফিসে চাকরি করতেন, তাঁকে লিখলেন—বাবা! তোমার সংসার, তোমার সম্পত্তি বুঝে নাও, আমাকে বিদায় দাও, সংসার থেকে—বৃন্দাবনে যাব!

মাস যায়, বছর যায়, কোন উত্তর নাই।

যে পুত্র প্রতি মাসে পত্র দিতেন, সে পুত্র এমন একটি ঘটনা জানিয়াও বাবা-মায়ের চিঠির উত্তর দিলেন না। ফিরিয়া আসিলেন না।

বৃদ্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে পতি-পত্নী দুইজনে চিরদিনের মত সব ছাড়িয়া চলিলেন বৃন্দাবনে। সেই বৃদ্ধ শিকারী ও তার পুত্র মহাবীর রইল তাহাদের সাথী।

তাহার পর বুঝলেন বাবুমশাই—এই বাড়ীর হয়েছে এই হাল। পাশ দিয়ে কেউ যায় না। দেখে ভীষণ মূর্তি তান্ত্রিক খাড়া কাঁধে করে নরবলি দিতে ছুটেছে; আর দেখে হা-রে-রে-রে শব্দ করে মশাল জ্বেলে ডাকাতেরা বাড়ি লুটছে।

আপনারা কি বিশ্বাস করেন এসব? আমরা কিন্তু করি।

সেই পতিত বাড়ী—সেই ভীষণ দৃশ্য আমাদের মনে জাগাইয়া দিয়াছিল ভীষণ আতংক।

আমরা নীরব রহিলাম।



২০



মনোহর ডাকাত

॥এক॥

দক্ষিণ কলিকাতার একটি বিখ্যাত পথের নাম মনোহরপুকুর রোড। আজকাল সেখানে বড় বড় লোকের বাড়ি। সুপ্রশস্ত রাজপথ, শৌখিন পল্লী। প্রায় দুইশত বৎসর আগে এ অঞ্চল কেমন ছিল সে-কথা সকলের ধারণার অতীত। চারিদিকে ঘন বনজঙ্গল, খাল, বিল, জলা, হোগলা বন। লতাগুল্মে কাঁটা-বনে চারিদিক আবৃত। পথ নাই, ঘাট নাই, লোকের বসতি বিরল। একদিকের একটা ছোটখালের মধ্য দিয়া চলিত সালতি নৌকা। সুন্দরবনের যাত্রীরা কাঠ কাটিতে, মধু সংগ্রহ করিতে এবং শিকার করিতে যাইত এই পথে। বনের মাঝে নিরিবিলি স্থানে, সকলের অজানা গোপন স্থানে বাস করিত চোর-দস্যু ও ডাকাতের দল। জেলে, বাগ্দী, বাউরীরা এবং জংলী লোকেরা এখানে থাকিত। কেহ মাছ ধরিতে যাইত আদি গঙ্গায়, গঙ্গায় ও আশেপাশের ঝিলে বিলে। এমন দুর্গম বনমধ্যে বাস করিত—একজন বিখ্যাত ডাকাত। তাহার নাম ছিল মনোহর বাগ্দী।

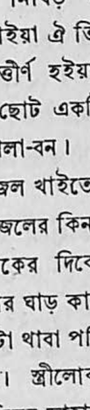
মনোহরও ছিল দুর্দান্ত ডাকাত। সেকালে পুলিশের এত হাঙ্গামা ছিল না। কোম্পানীর আমল ও শাসন আরম্ভ হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের শেষে দেশে চলিতেছিল অরাজকতা, অভাব, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা অশান্তি। সে-সময়ে দস্যু-ডাকাতদের অত্যাচারে মানুষের প্রাণ বাঁচানো ছিল দায়! একদিকে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, সাপ, শূকরের তাড়া, অন্যদিকে ঠেঙ্গাড়ে, দস্যু প্রভৃতির ভয়ে লোকের ছিল আতঙ্ক।

সেকালের কালীঘাটের কালী-দর্শনে আসিত দক্ষিণ হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা। নিবিড় বনপথে কিংবা আদিগঙ্গা দিয়া আসিত নৌকাপথে কালীঘাটের কালী-দর্শনের জন্য। বনের মধ্য দিয়া ছিল সংকীর্ণ পথ—সে পথে আসিত যাত্রীর দল।

মনোহর বাগ্দী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কিংবা গভীর রাত্রিতে কখনও শহরের বসতির দিকে কিংবা নৌকায় করিয়া দলবল লইয়া যাইত—উত্তরপাড়া, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, নদীয়ার দিকে! তখন ঐসব অঞ্চলের ডুমুরদহ, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি ছিল ডাকাতদের আড্ডা। ডাকাতরা সব একত্র হইয়া—বিভিন্ন দলের সর্দারেরা পরামর্শ করিয়া কোথায় কোন্ অঞ্চলে ডাকাতি করিলে সুবিধা হইবে সেদিকে ভিন্ন ভিন্ন দল পাঠাইয়া দিত। তাহাদের অদ্ভুত মন্ত্রগুপ্তি আর এমনই একটি ব্যবস্থা ছিল যে, খুব কম সময়েই লুণ্ঠিত মালের খবর বাহিরের লোকেরা জানিতে পারিত। প্রত্যেক সর্দার নিজ নিজ দলের লোকদের লুণ্ঠিত মাল সমানভাবে ভাগ করিয়া দিত।

এই নিবিড় বনে ছিল মনোহরের আস্তানাই বল, আর আড্ডাই বল, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। বাড়িতে দুইখানি ছিল মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘর। ঘরে খড়ের ছাউনি। মনোহরের স্ত্রী ছিল না। এক বুড়ি পিসি তাহার রান্নারান্না করিত। বাড়ির কর্ত্রী ছিল সে। তাহার বাড়ির অল্প দূরে ছিল ছোট্ট একটি ভাঙ্গা মন্দির, পাষাণী কালীমূর্তি! মূর্তিটি আকারে ছোট হইলেও অতি ভীষণদর্শনা ছিল। ডাকাতেরা এই কালীমূর্তির নাম দিয়াছিল কঙ্কালমালিনী। কোন অলংকার ছিল না সেই মূর্তির অঙ্গে—দেবী ছিলেন আয়ুধভূষিতা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা এবং তাহার হাতে দেওয়া হইয়াছিল, নরবলি দেওয়া কোন হতভাগ্যের করোটি। নিত্য পূজা হইত কঙ্কালমালিনীর, নিত্য হইত ছাগবলি, মহিষবলি। কিন্তু পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হইত নরবলি। এইভাবে বহু হতভাগা এই পথে যাইতে প্রাণ হারাইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর কালীঘাটে কালীমাতার পূজা ও অর্চনা করিয়া তিনজন লোক সেইপথে ফিরিতেছিল, তাহাদের বাস রাজাপুর গ্রামে। একটি বৃদ্ধ পুরুষ, তাহার সঙ্গে ছিল একজন স্ত্রীলোক এবং পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি বালক, শিশু বলিলেই চলে। অন্ধকার হইয়াছে। নিবিড় বনে পথ হারাইয়া কিছু দূরে একটি আলো দেখিতে পাইয়া ঐ তিনজন যাত্রী সেদিক লক্ষ্য করিয়া লতাগুল্ম, কাঁটাবন উত্তীর্ণ হইয়া সেদিক পানে দ্রুত চলিয়া আসিতেছিল। পথে ছিল ছোট একটি খাল—আশেপাশে ডোবা—খালের গায়ে গভীর হোগলা-বন। সেই হোগলা-বনের আড়ালে থাকিয়া একটা বাঘ খালে জল খাইতেছিল। বৃদ্ধ আগে আগে খাল পার হইবার জন্য যেমন জলের কিনারায় আসিয়াছে, অমনি বাঘটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল পথিকের দিকে। নিমেষ-মধ্যে বাঘ ঝাঁপাইয়া পড়িল বৃদ্ধের উপর, তাহার ঘাড় কামড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বাঘের একটা থাবা পড়িয়াছিল স্ত্রীলোকটির গায়ে। জল রক্তে লাল হইয়া গেল। স্ত্রীলোক ও বালকটি পড়িয়া গেল খালের পাড়ে। কাদা ও জলের ভিতর তাহাদের দেহ হইল বিলুণ্ঠিত।



॥দুই॥

সেই পথে গভীর রাত্রিতে ফিরিতেছিল মনোহর ও তাহার সঙ্গী ডাকাতেরা। একজন ডাকাত আগে আগে মশাল হাতে আসিতেছিল। অন্যদের হাতেও ছিল মশাল। সেই আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল স্ত্রীলোকটি ও বালকটিকে। মশালধারী চিৎকার করিয়া কহিল—সর্দার, হেথা একটা মাইয়া মানুষ আর ছাইলা মইরা পইড়া আছে।

মনোহর উত্তর করিল—কে মারলে?

বোধ হয় বড় শিয়াল হবে। বাঘকে তাহারা বলিত বড় শিয়াল।

মনোহর আসিয়া দেখিয়া বলিল—নিয়ে চল, বোধ হয় বেঁচে আছে।

সর্দারের হুকুমে ডাকাতেরা স্ত্রীলোকটি ও বালকটিকে মনোহরের বাড়িতে লইয়া আসিল। ডাকাতদের সেবা-শুশ্রূষা ও যত্ন-চেষ্টায়

স্ত্রীলোকটি বাঁচিল না। মনোহর ছেলেটাকে লইয়া ওড়িল মহা ফ্যাসাদে—কার ছেলে, বাড়ি কোথায়? কে সন্ধান করিবে? সন্ধান লইতে গেলেই যে বিপদ ঘটিবে। আর পালিবেই বা কে?

শেষটায় মনোহর কহিল—"পিসি, ছেলেটাকে দেখ, যত্ন কর। কার ছেলে কিছুই ত জানি না।"

পিসি বলিল—কার বাছা নিয়ে শেষটায় পড়বি বিপদে, গলা টিপে মেরে ফেলে দে বাদার জঙ্গলে।

মনোহর গর্জিয়া উঠিল—তুই মাইয়া মানুষ হইয়া এমন কথা বলিস্। ডাকাত বটি কিন্তু এ হাতে কোনদিন মাইয়া মানুষ আর ছোট ছোট ছাইল্যা মাইয়া মারি নাই। পিসি তুই কি পুতনা রাক্ষসী!

অদ্ভুত বিকট হাসি হাসিল মনোহর। পিসি চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন হইতে মনোহর ছেলেটিকে করিয়া লইল আপনার জন। তাহার কাছে গল্প করিত, তাহার জন্য ভাল কাপড়-জামা সংগ্রহ করিয়া আনিত। স্নেহের অপূর্ব পরশ লাগিল তাহার মনে ও দেহে! দিন যায়, বৎসর যায়, স্নেহ বাড়িয়াই চলে। এ কি হইল মনোহরের! ডাকাতিতে তেমন মন নাই, দলের লোকদের কথায় তেমন উল্লসিত হয় না। তাহারা মনে করিল, তবে বুঝি সর্দার আর ডাকাতি করিবে না। মাঝে মাঝে অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া ডাকাতি করিতে যাইত।

ছেলের নাম রাখিয়াছিল সে হারাধন। হারাধন মনোহরকে ডাকিত বাবা। কোনদিন ডাকাতি করিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইলে হারাধন তাহার গলা জড়াইয়া বলিত, বাবা, তুই কোথায় যাস্? যাস্‌নে কোথাও। কখন ফিরবি বাবা? ভয় করে একা থাকতে!

মনোহর আদর করিয়া বলিত, যাদু আমার, মাণিক আমার—এই এলাম বলে।

পিসি কিন্তু হারাধনকে একেবারেই দেখিতে পারিত না। কেন যে দেখিতে পারিত না, তাহা বোঝা খুব কঠিন নয়। পিসি ভাবিত, মনোহরের যদি ভালমন্দ কিছু হয়, তবে সে মনোহরের টাকা-কড়ি সব দিবে তাহার গরীব দেওরকে, কিন্তু তাহা হইল না। তিনদিনের জ্বরে হইল বুড়ী পিসির মৃত্যু। সেইজন্যই হারাধন বলিত, বাবা, একা থাকতে বড় ভয় করে।

মনোহরের বয়স বাড়িতেছিল। পূর্বের মত গায়ের শক্তি-সামর্থ্য আর ছিল। সে ভাবিত—তাই ত ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার এই পালিত পুত্র হারাধনের? এদিকে হারাধনের পূর্বস্মৃতি কিছুই ছিল না। সে জানিত মনোহর তাহার বাবা!

সেই সময়ে ভবানীপুর অঞ্চলে খৃষ্টান পাদরীরা ধীরে ধীরে পাঠশালা খুলিতেছিলেন। গরীব-দুঃখীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন, খৃষ্টান করিতেন ও বাইবেল পড়াইতেন। একদিন হারাধনকে খৃষ্টান পাদরীর কাছে লইয়া গেল মনোহর, গিয়া বলিল—সাহেব আমার এই ছেলেকে লেখাপড়া শেখাও।

মহা উৎসাহে পাদরী সাহেব তাহাকে ভর্তি করিয়া লইলেন। হারাধনের নাম হইল হারাধন বিশ্বাস। পিতার নাম মনোহর বিশ্বাস। হারাধন খুব মেধাবী ছিল। সে যত্ন করিয়া পড়াশুনা করিত। হারাধন মনোহরের কাছে আসিয়া গল্প করিত, বলিত—বাবা, সর্বদা সত্যকথা বলিতে হয়, চুরি-ডাকাতি করিতে নাই, সৎপথে চলিতে হয়।

মনোহরের মাথার চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছিল, কাশফুলের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল তাহার মাথা। সে চলিতে ফিরিতেও পারিত না। এদিকে কোম্পানীর আমল শুরু হইয়াছিল। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি কমিয়া আসিতেছিল। ফাঁড়ি থানার সৃষ্টি হইতেছিল—চারিদিকে কড়া নজর। মনোহর-ডাকাতের দলও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এখন সে ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিত না একমুহূর্তও। এইভাবে দিন যাইতেছিল।



॥ তিন ॥

মনোহরের শেষের দিন ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। তাহার মনে জাগিতেছিল অনুতাপ। কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মনোহর, তাহার পূর্বজীবনের কথা গোপন করিল। বলিলে পাছে তাহার প্রতি ঘৃণা হয় হারাধনের, সেজন্য সে কোন কথাই বলে নাই। শেষ জীবনে সে চাষবাস করিয়া, লোকজন খাটাইয়া চাষীরূপে জীবন কাটাইত। হারাধন তাহাকে সাহায্য করিত প্রফুল্ল মনে।

জ্বরে পড়িল মনোহর। উত্থানশক্তি রহিত হইল তাহার। একদিন সে বিছানার পাশে হারাধনকে ডাকিয়া ঘরের মেঝের একটি জায়গা দেখাইয়া বলিল—বাবা, ওখানটা খোঁড় ত!

—কেন বাবা?

—দেখ না খুঁড়ে!

হারাধন খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাইল তিন ঘড়া টাকা ও মোহর এবং তাহার মধ্যে অনেক সোনা-রূপা। মনোহর কম্পিত হস্তে হারাধনের হাত ধরিয়া কহিল—বাবা হারাধন, এই সব তোর। আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না। আমি মরে গেলে ঘটা করে শ্রাদ্ধ-শান্তি করবি, কাঙ্গাল-দুঃখীদের যত্ন করে খাওয়াবি। কয়েকটা দীঘি, পুকুর কাটিয়ে দিবি, এদিকে গ্রীষ্মকালে জলের বড় কষ্ট। গরু-মোষ জল পায় না, মানুষ জল খেতে পায় না। এই কাজ অবশ্য করবি, ভাল বাড়িঘর করে সুখে বাস করবি। বড় ইচ্ছা ছিল তোকে একটি সুন্দরী মেয়ে এনে বিয়ে দিই; পারলেম না ত! সে সুখ আমার নেই!……

মনোহর ডাকাত মরিল, কিন্তু তাহার নাম হইয়া রহিয়াছে অমর। হারাধন মনোহরের প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। আজও দক্ষিণ কলিকাতার এই অঞ্চল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য হারাধন যে

সকল দীঘি ও পুকুর খনন করিয়াছিল, সেই সকলের অস্তিত্ব পাড়ার চারিদিক ঘিরিয়া অসংস্কৃত অবস্থায় এখনও আছে। সেইসব দীঘি-পুকুরের আয়তন বড় কম ছিল না। তোমরা দেখিলেই তাহা ঝুঝিতে পারিবে।

আজ মনোহর নাই, হারাধনও নাই—কিন্তু মনোহরের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে দক্ষিণ কলিকাতার মনোহরপুকুর রোড।



নামটি কেমন ?—না, রায় বাহাদুর ভালুক ! তোমাদের আশ্চর্য মনে হইতেছে। কিন্তু যে গল্প বলিতেছি, তাহা যেমন সত্য, রায়-বাহাদুর ভালুক এই উপাধিটির মধ্যেও আছে তেমনি সত্য।

সে অনেক দিন আগের কথা—একশো বছরেরও বেশী আগের। একদিন একজন ব্রাহ্মণ অনেক নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক-নোট লইয়া একটি ভালুক কিনিবার জন্য হুগলী শহরে গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কারণে ভালুক কেনা না হওয়ায় একখানি তিনদেঁড়ে পানসী নৌকা ভাড়া করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। গড়িহাটি নামক একটি হাটের কাছে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেখান হইতে যখন পলতার ঘাটে আসিলেন, তখন সেখানে নৌকা ভিড়াইয়া মাঝিরা ব্রাহ্মণকে কহিল—'আপনার বাড়ি পৌঁছতে রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। জোয়ার এসেছে, নৌকা চালান হবে কঠিন। রাত্রিশেষে নৌকা ছেড়ে দিলে ভাটির টানে সকাল সকাল পৌঁছা যাবে।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তোমরা যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। তবে কি জান, রাতারাতি বাড়ী ফিরলেই ভাল হ'ত।'

মাঝিরা বলিল—'সে ত ঠিক কথা। তবে বুঝতেই পারছেন, জোয়ার ঠেলে নৌকা নিয়ে বড় একটা এগুতে পারব না। তাই নৌকা এই ঘাটেই বাঁধা যাক।'—তা বাপু, যেমন ইচ্ছা তাই করো।

নৌকা ঘাটে বাঁধা হইল। কিছুক্ষণ পরে একজন মাঝি বলিল—ঠাকুরমশাই, একটা কথা।

—কি কথা বাপু!

—'আজ্ঞে, কাছাকাছি আমাদের বাড়ি। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে একে একে আমরা বাড়ি থেকে খেয়ে আসতে পারি।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'বেশ, তবে তাড়াতাড়ি এস। এই নদীর ঘাটে একা থাকা ত ভাল নয়।'—সে ত ঠিক কথা, ঠাকুরমশাই !

একজন মাঝি চলিয়া গেল। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল তবু সেই মাঝি ফিরিল না।

এইবার দ্বিতীয় মাঝি কহিল—'তাই ত ঠাকুরমশাই ও ত বড় দেরী করে ফেলল, দেখে আসি কেন দেরী হচ্ছে ! আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দেব, আর আমিও ফিরে আসব।' এই বলিয়া দ্বিতীয় মাঝিও চলিয়া গেল। এদিকে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল, তাহারা দুইজনে ফিরিয়া আসিল না। তখন তৃতীয় মাঝি ঐ দুইজনকে অনেক গালাগালি দিয়া বলিল—'যাই আমি ওদের পাঠিয়ে দিই !'

এক পা দুই পা করিয়া সেও চলিয়া গেল। বাকি যে হালের মাঝি ছিল, সেও ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ রহিলেন একা। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'এ কি সর্বনাশ ! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয় ! এইরূপ ভাবনায় তাঁহার মনে নানা শংকার উদয় হইল।' তখন নৌকা হইতে উঠিয়া—সঙ্গে টাকার পুঁটুলিটি লইয়া নদীর পারে আসিলেন। দেখিলেন একটা বড় বটগাছের কাছে এক মুদীর দোকান। মুদীকে দেখিয়া তাঁহার ভরসা হইল। ব্রাহ্মণ মুদীকে মাঝিদের সব কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন···মুদী ভাই, বল ত দাঁড়ি-মাঝিরা এখনো কেন এল না ? কারণ কি ?

মুদী বলিল—ঠাকুরমশাই, কি দেখছেন ? আপনার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। আপনার নৌকার দাঁড়ি-মাঝিরাই ডাকাত। আপনাকে মেরে ফেলে টাকাকড়ি সব কেড়ে নেবে, এজন্য আরও সব সঙ্গী দস্যুদের ডাকতে গেছে।

ব্রাহ্মণ নিরাশ হইয়া কহিলেন—'তবে ভাই, এখন উপায় কি—কি করা যায় ? তুমি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও নিরাপদ স্থানে রেখে এস, তবে আমি রক্ষা পাই।'

মুদি কহিল—'সে কি করে হবে ? আমি একা, দোকান ফেলে কি করে যাই ? কিন্তু আপনাকে লুকিয়ে রাখতে পারি।

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, কে জানে এই মুদী কেমন ! এও ত ডাকাত-দলের একজন হতে পারে। একেই বা বিশ্বাস কি ? একে জানি না, চিনি না, যদি আশ্রয় দিয়ে আমার প্রাণনাশ করে ? এখন কি করি !

নিরুপায় ব্রাহ্মণ কি করিবেন, ভাবিতে ভাবিতে পথ দিয়া চলিলেন। পথের দুইধারে বড় বড় সব গাছপালা অন্ধকার রাত্রিকে নিবিড় অন্ধকার করিয়াছে। এমন সময় দেখিলেন, নিকটেই একটি বেশ বড় বাগান। বাগানের দরজার কাছে একজন লোক একটা ভালুক লইয়া বসিয়া আছে। লোকটা বেশ জোয়ান। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—'ভাই, আমি বড় বিপদে পড়েছি। তুমি যদি আমাকে সঙ্গে করে থানা পর্যন্ত চল, তবে আমি ধনে-প্রাণে রক্ষা পাই।'

ভালুকওয়ালা বলিল—'ঠাকুরমশাই আমি সব কথাই শুনলাম ও বুঝলাম, তবে কি জানেন, আজ সমস্ত দিন ভিক্ষা না হওয়াতে আমি না খেয়ে আছি, আমার ভালুকটাকেও কিছু খাওয়াতে পারি নি। আপনি যদি আমাকে কিছু পয়সা দেন, তবে আমি ভালুকটাকে খাওয়াতে পারি, আমিও খেতে পারি ; তারপর আপনি যে-কথা বলবেন, আমি শুনব !'

ব্রাহ্মণ তাহাকে কিছু পয়সা দিলেন—সে মুদীর দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া নিজেও খাইল এবং ভালুকটাকেও খাওয়াইল। তারপর কহিল—'ঠাকুর, সঙ্গে আসুন, আমি গঙ্গা হইতে ভালুকটাকে জল খাইয়ে নি।' ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, না জানি ইহার পেটের ভিতর আবার কি দুষ্টবুদ্ধি আছে।

ভালুকওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে চলিলেন। সে তাহার ভালুককে জল খাওয়াইল, তারপর বলিল—'ঠাকুরমশাই আপনি এই নৌকার উপর উঠুন। কোন ভয় নেই, আমি আপনাকে

রক্ষা করব, তাতে সন্দেহ নেই। আমি বেঁচে থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। আপনি নৌকার খোলের ভিতর লুকিয়ে থাকুন ; দেখুন না, আমি কেমন ডাকাতদের জব্দ করি!' ব্রাহ্মণ তখন আর কি করেন? আর উপায় নাই, সুতরাং নৌকার খোলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভালুকওয়ালা নৌকার উপর বসিল এবং কি করিল জান? সে তাহার ভালুকের মুখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া তাহাকে বেশ ভালভাবে নানারকম কায়দা শিখাইতে লাগিল। ভালুক গোঁৎ-গোঁৎ শব্দ করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে। এমন সময় নৌকার মাঝিরা তাহাদের সঙ্গে একদল লোক লইয়া আসিয়া গঙ্গার পারে উপস্থিত হইল। প্রত্যেকের হাতে লাঠি-বর্শা ও তলোয়ার ; মুখ কালিমাখা—যেন প্রেত পিশাচ আর কি—এমনি ভীষণাকৃতি! তাহারা চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—ঠাকুরমশাই! ও ঠাকুরমশাই!

ব্রাহ্মণের কোন উত্তর না পাইয়া তাহারা ভালুকওয়ালাকে নৌকার উপর বসা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুই কে রে?

—দেখতে পাচ্ছ, আমি ভালুকওয়ালা।

—তুই আমাদের নৌকায় কেন? ঠাকুরমশাই কোথায় গেল?

ভালুকওয়ালা বলিল—'আমি এই নৌকায় কাকেও দেখি নি ; রাত্রি হয়েছে, কোথায় যাব? শীতও খুব জোরে পড়েছে, তাই এই খালি নৌকায় বসে আছি।'

একজন দস্যু-মাঝি বলিল—তুই বেটা নেমে যা। ভালুকওয়ালাও কর্কশকণ্ঠে কহিল—'আমি কখনই নৌকা থেকে নামব না।'

তবে রে বেটা। বলিয়া ডাকাতেরা তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল, অমনি ভালুকওয়ালা ভালুককে কহিল—যা বেটা জাম্বুবান! হিস্ হিস্ হিস্—। অমনি সেই শিক্ষিত পশু লাফ দিয়া ডাকাতদের উপর পড়িল এবং নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ও কামড়াইয়া এমনভাবে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে তাহাদের জখম করিতে লাগিল যে, তাহাদের আর নড়িবার শক্তি রহিল না।

বাকী যাহারা ছিল তাহারাও পলাইতে পারিল না, যেমন পলাইতে যায় অমনি ভালুক পিছু ছুটিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। দস্যুরা ভালুক মারল রে—খেয়ে ফেলল রে—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ওই সময় এক চৌকিদার রোঁদে বাহির হইয়াছিল, সে সেখানে আসিয়া লোকদের জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

ভালুকওয়ালা কহিল—'তুমি থানায় খবর কর, পরে সব কথা জানতে পারবে।' চৌকিদার তখনই সংবাদ দেওয়ায় বৈদ্যবাটির দারোগা ত্রিশ-বত্রিশ জন লোকসহ তদন্ত করিতে আসিলেন এবং ভালুকওয়ালাকে বলিলেন—কি হয়েছে বল।

হুজুর, আপনি চারদিক পুলিশ ও পাহারাওয়ালা দিয়ে ঘিরে ফেলুন, যেন একজন লোকও না পালাতে পারে, তারপর সব বলছি। এই কথা বলিয়া সে রণজয়ী ভালুকটিকে ধরিয়া আনিয়া তাহার রাগ কমাইল এবং বাঁধিয়া রাখিয়া দারোগাকে নৌকায় আসিতে বলিল।

দারোগা নৌকায় আসিলে ব্রাহ্মণ নৌকার খোলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সমুদয় ঘটনার কথা বলিলেন এবং সঙ্গের টাকা দেখাইলেন। দারোগা সব শুনিয়া ব্রাহ্মণকে ভালুকসহ ভালুক-ওয়ালাকে এবং ডাকাতদের থানায় আনিলেন এবং পরদিন সকালবেলা তাহাদের সকলকে শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিলেন। চৌকিদার সব বিষয়ের তদন্ত করিয়া জানাইল যে, ঐ বারোজন ডাকাত দাগী আসামী এবং মেয়াদ খালাসী।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আহত ডাকাতদের ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। ডাক্তার সাহেব ডাকাতদের আঘাত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—এদের মধ্যে অনেকেই বাঁচবে না।

ব্রাহ্মণ ধনে ও প্রাণে এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাইয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ভালুকওয়ালাকে একশত টাকা পুরস্কার দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও ভালুকওয়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নিজে দুই শত টাকা প্রদান করিলেন।

সেকালের একখানি পত্রিকাতে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া লেখা হইয়াছিল—"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুলিশাধ্যক্ষ মিঃ ডেম্পিয়ার সাহেবের সহযোগে ঐ ভালুককে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি পদে অভিষিক্তকরণ-কারণ অনুরোধ সহকারে অবিলম্বেই গবর্মেন্টকে রিপোর্ট করেন। ভালুকরাজ যেরূপ বীরত্ব প্রকাশপূর্বক দস্যু ধৃত করিয়াছে, তাহাতে সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ দূরে থাকুক, অনেক পদস্থ ম্যাজিস্ট্রেটদিগের অপেক্ষা তৎপদের বিশেষ যোগ্য হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা লাঠির নিকটস্থ হয়েন না, ভালুক সাহেব পুনঃ পুনঃ লাঠির আঘাতে আহত হইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হইল না।

ভালুকের এই ডাকাত দমনের সংবাদ পড়িয়া সেকালের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—সম্পাদক মহাশয়, আপনার ৩রা বৈশাখ শুক্রবাসরীয় পত্রে ঋক্ষ কর্তৃক দস্যু ধৃত হওয়ার বিষয়ে যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা যথার্থ। আমি শ্রীরামপুর হইতে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াছি এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া ভল্লুক কর্তৃক রক্ষা পান, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বিস্তারিত বিবরণ স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ ভালুক কেবল নখাঘাত দ্বারা দুর্জনদিগ্যে ধৃত করে নাই, তাহার মুখের থুতু দুরাত্মাদিগের অঙ্গের যে যে স্থানে লাগিয়াছিল, সেই সেই স্থান ক্ষত হইয়াছে। হে মহাশয়! আপনি ঐ জাম্বুবানকে রায়-বাহাদুর উপাধি দিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে অভিষিক্ত করণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমি তাহাতে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহাকে এককালে ফুল ম্যাজিস্ট্রেটি দেওয়াই উচিত হয়, কারণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা কিছুই করিতে পারেন না। আপাততঃ কৃষ্ণনগর জেলায় অনেক দস্যুতা হইতেছে, অতএব তাহাকে প্রথমে সেইখানেই পাঠানো উচিত।

এখন বলত, আমরা আমাদের গল্পের নাম যে রায়-বাহাদুর ভালুক দিয়াছি, তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা?

সংবাদ প্রভাকর—৩রা বৈশাখ, শকাব্দঃ ১৭৭০ (১২৫৫), ৯ই বৈশাখ দ্রষ্টব্য



২২ ডাকাত গঙ্গারাম

॥ এক ॥

শতবর্ষ পূর্বে চাকদহ ছিল ভীষণ নরবলি, রাহাজানি, আর জলে-স্থলে চুরি ডাকাতির জন্য কুখ্যাত। সেকালে চাকদহ ছিল অতি ভয়ানক স্থান।

সুখসাগরের উত্তরে চাকদহ। ঐতিহাসিকেরা চাকদহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন Notorious for ghat murders। গঙ্গার ঘাট ছিল বনজঙ্গলে ঢাকা সেই ভীষণ অরণ্যে যেমন বাস করিত হিংস্র ব্যাঘ্র-ভল্লুক, তেমনি ভয়ংকর বিষাক্ত সর্প। গঙ্গার ঘাট ছিল অতি ভয়াবহ। একদিকে অরণ্য মধ্যে ভীষণা শ্মশানকালী, অন্যদিকে মহাশ্মশান। সে-সময়ে চাকদহ ছিল শবদাহ ও গঙ্গাস্নানের জন্য বিখ্যাত। সেখানকার শ্মশান—মহাশ্মশান নামে পরিচিত ছিল। দূর-দূরান্ত হইতে শবদেহ এই পুণ্যস্থানে ভস্মীভূত করিবার জন্য আনা হইত। এ-স্থানকে পুণ্যস্থান কেন বলা হইত জান? ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন, তখন তাঁহার রথের চক্র এই স্থানের মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত লইয়াছিল বলিয়া এস্থানের নাম চক্রদহ এবং ক্রমে সহজ ভাষায় হইয়াছে চাকদহ।

কুড়ি-একুশ দিনের দূর দেশ হইতেও শবদাহ করিবার জন্য চাকদহের মহাশ্মশানে আনা হইত। সেই সব গলিত শবের দুর্গন্ধের জন্য পথে লোক চলাচল দুঃসাধ্য হইত। তোমরা হয়ত জান না যে, পূর্বে কলিকাতায় ও তাহার নিকটস্থ পল্লীতে কাহারও মৃত্যু হইলে গঙ্গার পশ্চিম তীরে দাহ করা হইত। যে শ্মশানকালীর কথা বলিতেছি, সেখানে ডাকাতেরা প্রতি সপ্তাহে বা মাসে দেবীর কাছে দিত নরবলি। ঘাটে কোন নৌকা ভিড়িলে ডাকাতেরা নৌকার যাত্রীদের লুঠতরাজ করিয়া জিনিসপত্র যেমন কাড়িয়া লইত, তেমনি তাহাদের কাহাকেও ধরিয়া লইয়া ভীষণা শ্মশানকালীর নিকট বলি দিত এবং সেই রক্তরাঙা তলোয়ার হাতে লইয়া ছুটিত ডাকাতি করিতে। নররক্তে ললাটে পরিত জয়-তিলক। এই ডাকাতদের ভয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে শবদাহ করা হইত।

এই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত ছিল গঙ্গারাম। তাহার দলে ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। হিন্দু, মুসলমান, দেশী খৃস্টান, সাঁওতাল—সব জাতির ও নানা দেশের লোক ছিল তাহার দলে। গঙ্গারাম নিজে যেমন দক্ষ লাঠিয়াল ছিল—তলোয়ার খেলিতে নিপুণ ছিল, তেমনি ছিল বিখ্যাত কুস্তিগীর। জাতিতে ছিল সে বাগ্দী। দলের লোকদের উপর তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। দলের লোকেরাও ছিল বেশ মজবুত গঠনের এবং সড়কি-বল্লম খেলিতে পটু।

একদিন চাকদহের কাছে এক বাড়িতে বিবাহ-উৎসব। যাঁহার বাড়িতে বিবাহ তিনি ছিলেন প্রকাণ্ড ধনী ব্যবসায়ী, নাম ছিল তাঁহার মথুর শা। মহাজনী কারবার, জাহাজের বিলাতী মাল খালাসী কারবার, দেশ-বিদেশে নানা খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি, নীলকর কুঠিয়াল সাহেবের সময়ে অসময়ে টাকা ধার দেওয়া, জমিজমা অলংকার-পত্র বন্ধক রাখিয়া সুদী কারবার—সব কাজই চলিত তাঁহার আড়তে। কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতায় ছিল তাঁহার আড়ত ও গদী। এমন কি সুদূর ঢাকা ও আসামের নানা স্থানেও তাঁহার গদী ছিল। কলিকাতার চিৎপুর অঞ্চলে গঙ্গার ঘাটের কাছে ছিল তাঁহার মস্ত আড়ত! মস্ত বড় ধনী—কোটি কোটি টাকার মালিক। পুকুর, দীঘি, নানা ফুল-ফলের বাগানে শোভিত বিরাট বাড়ির চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা। ফটকে হাতে তলোয়ার পশ্চিম দেশীয় পাহারা-ওয়ালা। পাঁড়েজী আর দোবেজীর মস্ত বড় গোঁপ, গালপাট্টা দাড়ি—যেন যমের দোসর আর কি!

মথুর শার একমাত্র মেয়ে রাধারাণীর বিবাহ। বরের বাড়ি কলিকাতা শহরে। মনে মানে তাহারাও শ্রেষ্ঠ! নদীপথে বজরা করিয়া বিলাতী বাজনা বাজাইয়া সেকালের বড়লোকেরা গমনাগমন করিতেন। মথুর শাও সেই ব্যবস্থাই করিয়াছেন। লোকজন, জ্ঞাতি-কুটুম্বে বাড়ি-ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কাজের বাড়িতে যেমন হয়, আনন্দের অবধি নাই—সকলেই প্রসন্ন মুখ। ফটকে নহবত বাজিতেছে। মহা ধুমধাম চলিতেছে।



॥ দুই॥

গঙ্গার ঘাটে লোকারণ্য। কলিকাতা হইতে বরযাত্রীরা আসিয়াছেন। বর আসিয়াছে। বরকর্তা আসিয়াছেন। নৌকা ভিড়িবামাত্র মথুর শা নিজে এবং তাঁহার ছেলেরা আসিলেন, গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিলেন বর ও বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করিতে। শঙ্খ বাজিল। ইংরাজী বাজনা বাজিল বরসহ শোভাযাত্রা চলিল মথুর শার বাড়ির দিকে। লণ্ঠনের আলো, মশালের আলো জলিল; চারিদিক দীপ্তিমান হইল। বরযাত্রী দল একটা বাগানের পাশ দিয়া বাঁ দিকের যেমন শা-জীর বাড়ির দিকে চলিয়াছে—অমনি সেইখানে আসিয়া মিলিত হইল প্রায় একশত লোকের শোভাযাত্রা সহ আর একদল বরযাত্রী। তাহাদের শোভাযাত্রার সঙ্গে ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশী, নাগরা-টিকারা বাজিতেছিল। মথুর শার বরযাত্রীদের পেছনে তাহারা চলিয়াছে। তাহাদিগের দিকে কেহ বড় একটা লক্ষ্য করে নাই, সকলেই মনে করিতেছিল—বোধহয় একদল দেশী বাজনদারও মথুর শা বায়না করিয়াছেন।

ক্রমে উভয় দল অদৃশ্য হইল। সকলেই বাড়ির আলোকমালা-বিভূষিত বৃহৎ ফটকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল। বর ও বরযাত্রীদের দেখিবার জন্য গ্রামবাসী নরনারীরা বাহির হইয়াছিল। লোকজনের হৈ-চৈ, আদর-অভ্যর্থনা, আসুন, বসুন রবে চারিদিকে গোলমাল লাগিয়াছে। এই তামাক আন, পান দাও, ওরে সরবত নিয়ে আয় —এই সব শব্দ শুনা যাইতেছে। মেয়েরা বাড়ির মধ্য হইতে উলুধ্বনি করিতেছে। শঙ্খ বাজিতেছে। গড়ের ইংরাজী বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় ভীষণ হা-রে-রে-রে রবে বিকট চীৎকারে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ওরে ডাকাত পড়েছে, পালা পালা রবে চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল।

বিবাহ বাড়ির মহা-সমারোহের মধ্যে হইল একটা মহা-আতঙ্কের সৃষ্টি। ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল—হা-রে-রে-রে রব!



॥তিন॥

কে যেন কি কৌশলে বাড়ির সব আলো নিবাইয়া দিয়াছে। ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঝাড়-লণ্ঠন সব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অন্ধকার—চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার। কে শত্রু কে মিত্র কিছুই বুঝা যাইতেছে না মারামারি, ছুটাছুটি, কান্নাকাটি—ভীষণ বিপদে সকলেই কি যে করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। বরকর্তা বরযাত্রীরা কলিকাতার মানুষ, তাঁহারা এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুসূদন! সংকটে রক্ষা করো, রক্ষা করো বলিয়া মথুর শা কাঁদিতেছিলেন।

ডাকাতেরা অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং কৌশলে অতি দ্রুত কন্যার গায়ের অলংকার কাড়িয়া লইল। ডাকাতের সর্দার বলিল—তোমার কোন ভয় নেই, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তারপর পুরমহিলাদের বলিল—তোমরা মায়েরা নিজের হাতে সব গয়না খুলে দাও; আমি কাপড় পেতেছি, এই কাপড়ের ওপর দাও। আমরা মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না। মা সকল, তাড়াতাড়ি খুলে দাও। গোয়েন্দা পুলিশ আসবার আগে আমাদের সব দিয়ে ফেল। যদি না দাও, তবে বাধ্য হয়েই ছিনিয়ে নেব। হল্লা করো না, চীৎকার করো না।

মহিলারা সকলেই ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া গায়ের অলংকার খুলিয়া দিল। যে-ঘরে বরের জন্য দান-সামগ্রী, বরের পণ বড় একটা সোনার থালে করিয়া সাজানো ছিল, সেখান হইতে মুঠা মুঠা করিয়া প্রায় দশ-পনেরো হাজার টাকা ডাকাতেরা যে যে-ভাবে পারিল লুটিয়া লইল। এভাবে বোধ হয় পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে সব কাজ সারিয়া ডাকাতেরা নির্বিঘ্নে চলিয়া গেল। যাহারা বাধা দিতে আসিয়াছিল, তাহারা লাঠি, বল্লম, সড়কির আঘাতে আহত ও নিহত হইল। যাইবার সময় ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকাতের সর্দার চীৎকার করিয়া বলিল—শা-জী, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। এখন কন্যার বিবাহ দিন, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়িত করুন। আপনার ত অনেক আছে, আমরা আর কতই বা নিলাম।

মথুর শা করজোড়ে বলিলেন—'বাবা, আমার মান রক্ষা করো। আর যেন কোন বিপদ না ঘটে। যা চাও তাই আমি দেব, কে তুমি বাবা।"

—আমি ডাকাত গঙ্গারাম! নাম শোনেন নি? ওরে বাবা! বলিয়া মথুর মূর্চ্ছা গেলেন। নিশীথ রাত্রিতে নিরাপদে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন বর-কনে ও বরযাত্রিদল নিরাপদে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। মথুর শার বাড়িতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে মথুর শার বাড়িতে এই ভীষণ ডাকাতি হইয়াছিল। গঙ্গারাম ছিল সে অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। তাহার ডাকাতিতে ছিল অদ্ভুত কৌশল। সে তাহার দলের ডাকাতদের বরযাত্রী সাজাইয়া ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশী, নাগরা, টিকারা বাজাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিত। তাহাদের শত শত মশালের আলোকে গ্রামখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। বর ও বরযাত্রিদল দেখিবার জন্য যখন গ্রামবাসী নরনারীরা বাহির হইত, তখন ইহারা 'হা-রে-রে-রে' রবে বিকট চীৎকার করিতে করিতে লাঠি বল্লম, সড়কি, তলোয়ার প্রভৃতি লইয়া নিষ্ঠুরভাবে গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠন করিত—নিরীহ গ্রামবাসীদের নানারূপে নির্যাতন ও হত্যা করিয়া অবশেষে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

গঙ্গারাম পরে ধরা পড়ে। ধৃত হইলে সে স্বীকারোক্তি করে যে, মাত্র বারো বৎসর বয়সে ডাকাতের দলে মিশিয়া সে ডাকাতি আরম্ভ করে। সে নদীয়া, যশোহর, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে নিজের দল লইয়া ছত্রিশ বার ডাকাতি করিয়াছে।

২৩



হনুমান চৌবে

এক

চুর্ণী নদীর পারে এক প্রকাণ্ড ধনীর বাড়ি। নদী যেখান দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানেই বাড়িখানি থাকায়, দূর হইতে নৌকারোহীরা বাড়িখানি দেখে, খোলা মাঠের ভিতর দিয়া পায়ে-চলা পথিকেরা পথ-নির্দেশ করিয়া চলে।

গ্রামের মালিক হরিমোহন বসু। সাধু-সজ্জন ব্যক্তি। বারো মাসে তেরো পার্বণ করেন। বার্ষিকী রাসপূর্ণিমায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত গিরিধারী ও রাধারাণীর উৎসব হয়, মেলা বসে। সামনের মাঠে দীঘির পাড়ে মেলা হয়। সে-মেলায় নানা দেশ হইতে লোক আসে, জিনিসপত্র কেনাবেচা হয়। শহর হইতে পসারীরা আসে। মেলার খুব নামডাক।

মেলা শেষ হইয়াছে। দোকানীরা সব জিনিসপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া যার যার ঘরে চলিয়া যাইতেছে। মাঠ খালি হইয়া আসিয়াছে। কার্তিক মাসের শেষ। শীতের আভাস মাত্র দেখা দিয়াছে। তেমন

কিছু নয়। দূরে—নদীর পাশে পাশে কোথাও অরণ্য—কোথাও নদীর বুকে পাড়ের কাছাকাছি রাস্তা পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর একখানি, দুইখানি, তিনখানি নৌকা আসিয়া চরের একপাশে ঝাউবনের আড়ালে ভিড়িল।

একখানি ছিপ-নৌকার মধ্য হইতে বাহির হইল একজন খঞ্জ। মাথায় তাঁহার ঝাঁকড়া চুল। হাতে একখানি লাঠি, লাঠির উপর ভর করিয়া সে হরিমোহন বাবুর সদর দরজার ভিতর ঢুকিল। আকাশে নক্ষত্র। ক্ষীণ আলো। বেশ অন্ধকার। হনুমান চৌবে রুটি সেঁকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছে…সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।

এমন সময় খোঁড়া লোকটি চৌবেকে বলিল…গোড় লাগে পণ্ডিতজী!

জয় সীতারাম! বাহিরে চুল্লীর অগ্নিতে সেই বীভৎস মূর্তি দেখিয়া চৌবে সহসা চমকিয়া উঠিল, পরে কহিল…তুই কোন হ্যায় রে? চৌবেজী বাংলা দেশে থাকিয়া বেশ একটু বাংলা শিখিয়াছিল, তাহার ভাইবোনদের কাছে বলিত, হামি বাঙালীদের মত বাংলা বলতে পারি। তাই চৌবেজী কহিল…হাঁ রে, তুই কোন্ রে? ভূতকা মাফিক আসিয়াছিস? কি মতলব?

খোঁড়া চৌবেজীর ঘরখানির রকে বসিল, কহিল…চৌবেজী, মেলা দেখতে আয়া হ্যায়, ভারি জব্বর মেলা। সঙ্গীসাথীরা সব চলে গেছে। খাঁ-খাঁ করে মাঠ, থাকবার কোন জায়গা নেই। যদি কর্তাকে বলে আমাকে এক রাত্রির জন্য থাকবার ঠাঁই করে দেন, তবে রামজী আপকো বহুত দোয়া করবেন।

চৌবে জী কহিল…সে ত ঠিক হ্যায়! মানুষকা নসিবমে রামজী কখন যে কাকে দুখ্ নেন, কখন সুখ দেন, কে বলতে পারে? আপ বৈঠো। পরে একটু ভাবিয়া কহিল‥ আও হামরে সাথমে? কর্তা বাবুর সাথে ভেট হওয়া চাহি।

বিরাট বৈঠকখানা। সেকালে ত বিজলী বাতি ছিল না, ছিল ঝাড়-লণ্ঠন। বৈঠকখানায় ফরাশ পাতা। বড় বড় তাকিয়া। বাবু অর্ধশায়িত অবস্থায় গড়গড়ার নল টানিতেছেন। তাহার পাশে দুই-তিনজন মোসাহেব বসিয়া মেলার তারিফ করিতেছেন। হরিমোহন বাবু মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। মুখে তাঁহার প্রসন্নতার দীপ্তি। এমন সময় হনুমান চৌবে ঐ খোঁড়া লোকটিকে লইয়া উপস্থিত হইল এবং মাথা নিচু করিয়া কহিল—নমস্তে মহারাজ!

হরিমোহন বাবু কহিলেন—কি চাই হনুমান?

মহারাজ, এই খোঁড়া লোকটা মেলায় এসেছিল, বাড়ি যেতে পারে নি, বলতা কি, আজ রাতমে হিঁয়া রহেগা, আপকো হুকুম হোনেসে—

হরিমোহন বাবু লোকটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে রে তুই? কোথায় তোর বাড়ি? বল না!

খঞ্জ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—হুজুর, শান্তিপুরের কাছাকাছি। বামুনডাঙ্গা।

—ওঃ!

একজন বয়স্য কহিলেন—কি বিদঘুটে চেহারা বাবা। শেওড়া-গাছের ভূতও এমন ভয়ানক নয়।

হরিমোহন বাবু কোনদিকে আর লক্ষ্য করিলেন না। হুকুম দিলেন—হনুমান!—

জী মহারাজ!

ওকে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দে গে যা। তারপর কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেন—খবরদারি থেকো।

হনুমান চৌবের সঙ্গে খঞ্জ চলিয়া গেল।



দুই

সেদিন অতিথিশালায় আর কোন লোক ছিল না। বেশী লোক থাকিলে তাহাদের জন্য ডাল, চাল, তেল, তরিতরকারী দিয়া সিধা পাঠানো হইত। একে মানুষটা খোঁড়া, তারপর রাত বাড়িতেছে, রান্নাবান্না কে-ই বা করে! সে ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাইল, তারপর ধীরে ধীরে অতিথিশালায় ফিরিয়া গেল।

রাত্রি গভীর হইল। নদীর জলে ঢেউ খেলিতেছে। চূর্ণী নদীর মন্দ মন্দ কুলু কুলু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। দূরে শোনা যাইতেছে—শেয়ালের হুক্কা-হুয়া রব। মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে—কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ। নিস্তব্ধ পল্লী। কোনও সাড়া নাই! দেউড়ির বরকন্দাজেরা খবরদারি করিয়া বেড়াইয়া অবশেষে নীরব হইয়াছে।

এমন সময় খঞ্জ চুপি চুপি অতিথিশালা হইতে বাহির হইয়া নদীর দিকে গেল। এখন আর সে খঞ্জ নাই। নদীর পাড়ে নৌকাগুলির পাশে আসিয়া দেখিল চূর্ণী নদীতে জোয়ার আসিয়াছে। জোয়ারের জলে চড়া অল্প অল্প ডুবিয়াছে। সে ধীরে ধীরে নদীর পাড়ে আসিয়া শিস্ দিল। অমনি দশ-বারজন দস্যু নৌকার ভিতর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মশাল জ্বালিয়া পাড়ে উঠিল এবং অতি সন্তর্পণে বাড়ির পেছন দিয়া দেয়াল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে পড়িল। ছাতের পাশে কয়েকটি নারকেল গাছ ছিল, সেই গাছ বাহিয়া অনেক দস্যু ছাতের উপর উঠিল। তারপর ছাতের সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে আসিয়া ভীষণভাবে হল্লা আরম্ভ করিল! যে-ঘরে হরিমোহনবাবু সস্ত্রীক ঘুমাইতেছিলেন, সে ঘরে দুম্ দুম্ করিয়া ঘা মারিতে লাগিল!

ভিতর হইতে হরিমোহন বাবু কহিলেন—এ কি! কেও?

উত্তর আসিল—ডাকাত! দরজা খোল!

হরিমোহন বাবু ভীতকণ্ঠে কহিলেন—সাবধান! দরজা ভেঙ্গো না। আমি দরজা খুলে আসছি, কি চাও শুনবো।

বেশ!

এদিকে বাহিরে দেউড়ির বরকন্দাজেরা ডাকাতদের সঙ্গে লড়িতেছিল। আট-দশজন প্রহরী ও বাড়ীর কয়েকজন ভৃত্য মুক্ত তরবারি হস্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া লড়িতেছিল।

কয়েকজন দস্যু মশাল জ্বালিয়াছিল। সেই আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। হনুমান চৌবে লাঠি খেলায় ও তলোয়ার খেলিতে খুব দক্ষ ছিল—সে প্রথমেই খোঁজ করিল সেই খোঁড়া লোকটার। কিন্তু অতিথিশালায় গিয়া দেখিল, খোঁড়া লোকটা

সেখানে নাই। তখন তাহার মনে পড়িল, নিশ্চয়ই লোকটা ডাকাত—ডাকাত-দলের সর্দার! বাইরে বরকন্দাজদের হুকুম দিল—তোমরা লড়, আমি বাবুর খবর করি।

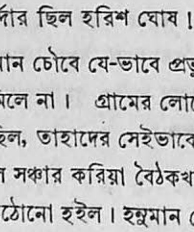
সে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া খিড়কির দরজা দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং দরজা ভাঙ্গিয়া হরিমোহন বাবুর শোবার ঘরের কাছে গিয়া দেখিল, ভয়ানক বিপদ! সেই খোঁড়া এখন আর খোঁড়া নাই। হরিমোহন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া সে তলোয়ার ধরিয়াছে।

হরিমোহন বাবু প্রাণপণে লাঠি দিয়া ঠেকাইতেছেন। তাঁহার স্ত্রী থর-থর করিয়া কাঁপিতেছেন এবং স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। সে এক সংকটময় মুহূর্ত! এমন সময় হনুমান চৌবে দস্যুর মাথায় মারিল এক তলোয়ারের ঘা, সে আঘাতে ডাকাত পড়িয়া গেল। রক্তে ঘর ভাসিয়া গেল।

সর্দারকে এইভাবে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া চারিজন ডাকাত একসঙ্গে আসিয়া হনুমানকে আক্রমণ করিল। হনুমান এক হাত দিয়া হরিমোহন বাবুকে ও তাঁহার স্ত্রীকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া ঐ চারিজন দস্যুর সহিত একা লড়িতে লাগিল। সে হনুমানেরই মত লাফ দিয়া উঠিয়া এমন দ্রুতগতিতে তলোয়ার ঘুরাইতেছিল যে, একজন দস্যুও তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার সঙ্গে লড়িবার মত হাতিয়ার ধরিতে দক্ষ ডাকাতদের মধ্যে কেহই ছিল না; কাজেই কেহ মরিল, কেহ হাত-পা কাটা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

বাহিরেও বহু লোকজন মিলিত হইয়া ডাকাতদের বাধা দিতে-ছিল। নৌকারোহীরা নৌকা থামাইয়া উপরে আসিয়া দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ডাকাতেরা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ পলাইল, কেহ ধরা পড়িল। সর্দার বলিয়া হনুমান চৌবে যাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, সে কিন্তু সর্দার নয়; সে ছিল দস্যুদের অন্যতম নেতা। নাম ছিল তাহার বলরাম সর্দার। ডাকাতদলের প্রকৃত সর্দার ছিল হরিশ ঘোষ। তাহার বাড়ি ছিল শান্তিপুর।

হনুমান চৌবে যে-ভাবে প্রভুর জন্য লড়াই করিয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে না। গ্রামের লোকেরা ধৃত ও মৃত দস্যুদের যে-যেখানে পড়িয়াছিল, তাহাদের সেইভাবেই রাখিয়া দিল। হরিমোহন বাবু হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। থানায় ও জেলায় সংবাদ পাঠানো হইল। হনুমান চৌবে লড়াই করিতে করিতে অবসন্ন দেহে মূর্ছা গিয়াছিল। হরিমোহনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিজেদের হাতে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিলেন।



॥ তিন ॥

সেই সময়ে নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ব্ল্যাকোয়ার সাহেব (Mr. Blaquire)। ব্ল্যাকোয়ার সাহেবকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দস্যু-দমনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন।* প্রথমে তাঁহাকে নদীয়ার ন্যায় দস্যু-ডাকাত-পীড়িত স্থানের ম্যাজিস্ট্রেট করা হইয়াছিল। ব্ল্যাকোয়ার সাহেব বাংলাদেশের লোকের আচার-ব্যবহার জানিতেন। তিনি ও তাঁহার সহকারী পি. এগুজি দস্যু-দমনে অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি গোয়েন্দা ও সর্দার নিয়োগ করিয়া নদীয়ার নানা স্থানের দস্যু-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাহেব হরিমোহন বাবুর বাড়ির ডাকাতির সংবাদ শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া জানিতে পারিলেন, এ শান্তিপুরের কুখ্যাত দস্যু হরিশ ঘোষের কাজ। ব্ল্যাকোয়ার সাহেব ছিলেন অদম্য সাহসী ও অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি হরিশ ঘোষকে গ্রেপ্তার করিলেন। সে নিরুপায় হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল। শান্তিপুরের একটি মামলায় এবং হরিমোহন বাবুর বাড়িতে ডাকাতির ফলে তাহার কঠোর সাজা হইয়াছিল।

হরিমোহন বাবু তাঁহার প্রিয় সাহসী দরোয়ান হনুমান চৌবেকে সোনার মালা গড়াইয়া নিজ হাতে পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং জমিজমা দিয়াছিলেন। তাহার বংশধরেরা এখনও সেই জমিজমা ভোগ করিতেছে। হনুমান চৌবে নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া যে-ভাবে প্রভু ও প্রভুপত্নীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল, সে-সংবাদ সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সরকার হইতেও তাহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

২৪



ডাকাতের দাবা খেলা

এক

পদ্ম গুপ্ত—পুরা নাম পদ্মলোচন গুপ্ত। গায়ের রং কালো বটে কিন্তু শরীর মোটা-সোটা! বয়স পঞ্চাশের উপর। দিনাজপুর শহরে ওকালতি করেন। বাড়ি বিক্রমপুর—গুণগাঁও নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। সে গ্রাম আর নাই, অনেক দিন হইল পদ্মার বুকে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

পদ্ম গুপ্ত বেশ বড়লোক। সেকালে যাঁহারা ওকালতি করিতেন, সকলেই বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেন। পদ্ম গুপ্তের তালুকমুলুক হইতেও বেশ আয় হইত। মেজাজ ছিল চড়া, এক কথায় বলা চলে রগ-চটা। সহজেই রাগিয়া উঠিতেন—আবার চুপ-চাপ। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন, আবার সহজেই সে আগুন নিবিয়া যাইত। পূজার

*The vigorous administration of Mr. Blaquire, first as Magistrate of Nadia, and later as Superintendent (or Inspector General) of Police, had the effect of practically ridding the district of dacoits by the end of the first decade of the nineteenth century—Bengal District Gazetteers, Nadia, Page—120.

সময় বাড়ি আসিতেন। দুর্গাপূজা ঘটা করিয়া করিতেন। গরীব-দুঃখীদের সে-সময় ছিল তাঁহার বাড়িতে দুইবেলা মায়ের প্রসাদ পাওয়ার নিমন্ত্রণ। সেকালের প্রথামত, গ্রামবাসীদের অনুরোধে উপরোধে হইত কবিগান অথবা যাত্রাগান। কৃষ্ণ-যাত্রাই ছিল তাঁহার বিশেষ প্রিয়। পদ্ম গুপ্ত কবে বাড়ি আসিবেন, সেজন্য সকলেই উৎসুক হইয়া থাকিত; আমুদে লোক, হাসি-তামাসা, গান-বাজনা চলিত দিনরাত্র। প্রাচীনেরা দাবা-পাশার আসর লইয়া বসিতেন। বৃদ্ধ হইলেও হার-জিতের সময় তাঁহারা এমন চেঁচামেচি করিতেন যে, ছেলেদের কলহ ও মারামারির হৈ-হল্লাও তাঁহার কাছে হার মানিত।

পদ্ম গুপ্ত দাবা খেলিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন! সেই খেলার সময় তাঁহার কোন খেয়ালই থাকিত না। খেলার সাথী ছিলেন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। বিদ্যালঙ্কার তাঁহার বাল্যবন্ধু। এক গ্রামে বাড়ি। বিদ্যালঙ্কার পণ্ডিত মানুষ—দিনাজপুরে চতুষ্পাঠী খুলিয়া ঠিকুজী, কোষ্ঠী, লিখিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেন। সন্ধ্যার পর মক্কেলের কাজ সারিয়া দুই বন্ধু বসিতেন দাবা খেলিতে। রাত বাড়িয়া চলিত, ভাত ঠাণ্ডা হইত; গুপ্ত-গৃহিণী রাগিয়া টং হইতেন। ভৃত্য আসিয়া বলিত—কর্তা! পদ্ম গুপ্ত গর্জিয়া বলিতেন—যা! যা!—কি কর্তা কর্তা করচিস? এখন তোর কাগজ দেখব না—যা-যা…। বিদ্যালঙ্কার, এইবার তোমার ঘোড়া সামলাও—

বিদ্যালঙ্কার টিকি নাড়িয়া হুঙ্কার দিয়া বলিতেন বড়ে ত ছাড় সামলাও ত ঘোড়া—হুঁ!

কোনদিন দুই বন্ধুতে হার-জিত লইয়া হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত—রাত্রি দুপুরও হইত! এমনি ছিল দাবাখেলার নেশা।

পদ্ম গুপ্তের ভৃত্য রামচরণ নিরুপায় হইয়া বেড়ার পাশে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িত; তাহার নাক ডাকিত। ঐদিকে ভাত হইত ঠাণ্ডা, ব্যঞ্জন হইত অখাদ্য। এ-হেন পদ্ম গুপ্ত অন্দরে গিয়া গৃহিণীর কাছে হইতেন শান্তশিষ্ট সুবোধ ভদ্রলোক. গৃহিণী বলিতেন—এ নেশা ছাড় বলে দিচ্ছি! রামচরণকে ডাকতে পাঠালেম, তবু এলে না। আমরা কি সারা রাত্তির জেগে থাকব? এ কি কাণ্ড বল ত!

নির্বিকার ভাবে পদ্মলোচন বলিতেন—কোথায় রামচরণ? সে বোকা গেলে কি আমি তোমার ডাকে না এসে থাকতে পারি?

গৃহিণী হাসেন। রামচরণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিত—মা ঠাকরুণ, কর্তারে ডাকি ডাকি হয়রান হলেম। কথাই শুনতি চান না—

খড়ম লইয়া গর্জিয়া উঠেন গুপ্ত মহাশয়—এখনি তোকে তাড়িয়ে দেব—বেটা মিথ্যাবাদী!

রোজই এমন ঘটনা হয়। কি যে তাঁহার দাবাখেলার ঝোঁক! অবসর পাইলেই দাবা নিয়া বসেন।

এইভাবেই পূজার আমোদ-প্রমোদ শেষ হইল। তাঁহার বাড়ির পাশে বড় খালে মায়ের বিসর্জন হইল। ঢাক বাজিল, ঢোল বাজিল। পদ্ম ও নন্দ, দুই বন্ধু একবার পূজার মণ্ডপে বিসর্জনের সব আয়োজন করিয়া, দেবীকে শেষ প্রণাম করিয়া—আসিয়া বসিলেন দাবা খেলিতে! রাত ভোর হইল—তবু খেলাই চলিতেছে। গ্রামে একদল ছিল বিদ্যালঙ্কারের পক্ষে আর একদল ছিল গুপ্তমহাশয়ের পক্ষে। খেলার এই আনন্দে- তাঁহারাও আনন্দ পাইতেন।



দুই

দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা শেষ করিয়া পদ্ম গুপ্ত সপরিবারে দিনাজপুর যাত্রা করিলেন।

দুইখানি বড় পানসী নৌকা। একখানিতে ছেলেমেয়ে সব, পদ্ম গুপ্তের পত্নী ও বিদ্যালঙ্কারের ব্রাহ্মণী এবং দাসী-চাকর। আর একখানিতে পদ্ম গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কার দাবা লইয়া বসিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন জোয়ান জোয়ান লাঠিয়াল সেকালে ডাকাতের ভয় ছিল খুব বেশি। সেজন্য সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। ছোট দুইখানা ডিঙ্গি নৌকা ছিল পানসীর সঙ্গে বাঁধা। তাহাতে রান্নাবান্না হইত।

তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে হাট-বাজার বসিত। যেখানে লোকসমাগম, হাট-বাজার, বন্দর, সেখানে নৌকা ভিড়াইয়া মাছ তরিতরকারী সংগ্রহ করা হইত। অমৃতের মত স্বাদ হইত সে অন্ন-ব্যঞ্জনের! রন্ধননিপুণা বিদ্যালঙ্কার-গৃহিণী ও গুপ্তজায়ার পরিচালনায় হইত রান্না। ভোজন আর গালগল্পের মধ্য দিয়া জোয়ার-ভাটায় নৌকা চলিত। পদ্মার জল ছল-ছল কল-কল করিয়া ছুটিয়া চলিত। আকাশের গায়ে সান্ধ্য মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে। কে দেখে সেই শোভা-সম্পদ! গড়গড়ার নল আর নস্যির শামুক হাতে গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কার খেলেন দাবা। তাহাতেই তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ।

পদ্মলোচন গুপ্তের মাঝির নাম ছিল গোলোক মাঝি। বরাবর সে-ই এই পথে গুপ্তমহাশয়কে নিয়া আসা-যাওয়া করে। সে জানিত কোন্ খাল ধরিয়া গেলে সোজাসুজি যাওয়া যায়, কোথায় কোন্ গঞ্জ বা বন্দর আছে, সে-সকলের সংবাদ সে যেমন রাখিত, তেমনি কোন্ পথে, কোন্ জায়গায় ডাকাতদের আড্ডা সে-কথাও তাহার অজানা ছিল না। সে-সব জায়গায় পূর্ব হইতেই সে হুঁশিয়ারি করিত। তবু কয়েকবার তাঁহাদের ডাকাতের হাতে পড়িতে হইয়াছিল; তবে ধনেপ্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন। গোলোক মাঝির অনেক গুণ ছিল। সে ছিল গল্পের রাজা। এমন সব গল্প বলিত যে, সেই সব অবিশ্বাস করার সাধ্য ছিল না। আমাদের বাল্যকালে গোলোক মাঝির গল্প শুনিয়াছি, তখন তাহার বয়স হইয়াছিল একশো বছরের কাছাকাছি। আমরা যদি বলতাম, মাঝি দাদা, চলন বিলের গল্প বল না। অমনি বলিত, তবে শোন্ তা। তাহার ডাকাত তাড়াইবার বিক্রম, আর চলন বিলের দু'মনি রুই মাছ, দুই হাত বড় কই মাছের গল্প বলিতে বলিতে, সেকালের অনেক কথা বর্ণনা করিত। অবিশ্বাস

করার কি জো ছিল? কখনও কোন কথার প্রতিবাদ করিলে রাগিয়া বলিত—যা—যা, তোরা আর কি দেখেছিস্! অতি চমৎকার গল্প বলিবার ক্ষমতা ছিল গোলোক মাঝির।

নৌকাপথে চলিতে চলিতে গোলোক মাঝি মাঝে মাঝে গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কারের কাছে আসিয়া বসিত এবং কীর্তনের সুরে গান ধরিত

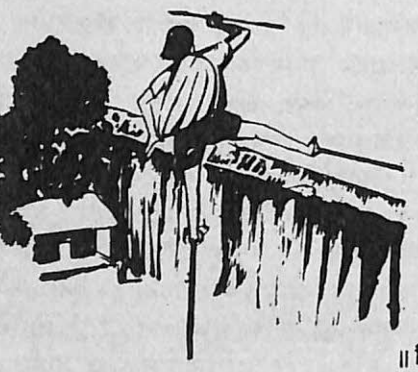
কেন দাবা খেলতে এলি বল,
এতে কমে যে তোর এলো বল।

গুপ্ত মহাশয় রাগিয়া বলিতেন—গোলোক দাদা, যাও ত ভাই—এই চালে যে ভুল হলো রে—অমনি গোলোক একটু সরিয়া বসিয়া গাহিত—

ছি ছি না জেনে চাল, হবি বেচাল রে,
ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল।
তুই বড়ের লোভে চাললি তুই ঘোড়া—
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা!

আর যায় কোথায়—বিদ্যালঙ্কার টিকি নাড়িয়া পাশের খড়ম লইয়া করিতেন তাড়া—যা—যা—হাল ধরগে যা।

পদ্ম গুপ্ত গভীরভাবে হুঙ্কার দিতেন নিকালো হিঁয়াসে। গোলোক হাসিয়া আবার নৌকোর হালে গিয়া বসিত।



॥ তিন॥

দিনগুলি নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিতেছিল। পরে আসিয়া পড়িল চলন বিল। সেকালের চলন বিল কেমন ছিল, সে কল্পনাও তোমরা করিতে পারিবে না। সে যেন সমুদ্রের ছোটখাট খোকা। সাগরের মত তাহার বিস্তার—জল থৈ থৈ করে! ঢেউ উঠে সাগরের মত। কত নৌকা যে ডোবে, কত ডাকাতি যে হয় চলন বিলে, কে তাহার সন্ধান রাখে!

গোলোক মাঝি এখানে দল বাঁধিয়া অন্যান্য যাত্রীদের নৌকার সঙ্গে বাহিয়া চলিল। সন্ধ্যাবেলা। সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চলন বিলের জল কালো হইয়া গিয়াছে। সহসা ঈশান কোণে একটা মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুদ্র মেঘ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। একটা দমকা হওয়া তীরের মত বেগে নৌকাগুলিকে লইয়া চলিল—অজানা দিকে। গোলোক ও তাহার সঙ্গী মাঝিরা হালে থাকিয়াও কিছু করিতে পারিল না। প্রবল তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে দুলিতে দুলিতে সেগুলি শেষটায় গিয়া ঠেকিল বিলের পাড়ের একটি বড় বাড়ির সম্মুখে। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতেছিলেন প্রাণের ভয়ে, মাঝিরাও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বিধাতা প্রাণে বাঁচাইলেন বলিয়া সকলে তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য প্রকৃতির বিদ্যালঙ্কার ও পদ্ম গুপ্ত। তাঁহারা এতক্ষণ খেলা বন্ধ হওয়ার অন্য দুঃখিত ছিলেন, এইবার ঝড়-ঝঞ্ঝা থামিয়া গিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে দুইজনে বেশ বড় দুইটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া দাবা আর বড়ে লইয়া বসিলেন। মাঝি-মাল্লারা নৌকা বাঁধিয়া রান্নাবান্না আরম্ভ করিয়া দিল। এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সকলের মুখে হাসি।

খেলা চলিতেছে। দুইজনে খেলার ভিতর ডুবিয়া গিয়াছেন। এমন অবস্থায় কখন কোন সুযোগে যে একজন লোক নৌকার উপরে উঠিয়া তাঁহাদের খেলা লক্ষ্য করিতেছিলেন সেদিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

লোকটি দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ। গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার আড়াল হইতে পৈতার গোছা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাথায় বড় বাবরি চুল, সেকালের ভদ্রলোকের মত। হাতে একখানি তলোয়ার। পাড়ে চারি-পাঁচজন লোক লাঠি-সড়কি হাতে দাঁড়াইয়াছিল। মাঝি-মাল্লারা দেখিতে পাইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। স্ত্রীলোকেরা আতঙ্কিত হইয়া রান্নার নৌকা হইতে পানসী নৌকাতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আকাশ তখন পরিষ্কার হইয়াছে। তারা ফুটিয়াছে। ঝড়ো হাওয়ার মত বেগে হাওয়া বহিতেছে। এমন সময় কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল—কি খেলছো, পণ্ডিত গজ দু'টি যে গেল।

দুইজনে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন ভীষণদর্শন মূর্তি। তাহারা বলিয়া উঠিলেন—কে—কে—আপনি?

উত্তর হইল—আমি হরি বাগচি। ডাকাতও বটি, জমিদারও বটি। দুই ব্যবসাই আমার চলে। এখানে কি করে এলে বল।

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—ভুলপথে ঝড়ে নিয়ে এসেছে। তাই—

—জান না, বিলের মধ্যে এই ডাঙ্গা। এ-ডাঙ্গাকে বলে ডাকাতের ডাঙ্গা। ডাকাতের ডাঙ্গায় এসেছ মরতে। আমরা যাচ্ছিলাম শিকার খুঁজতে, ঐ দেখ আমার লোকজন—বাড়িতেই জুটল শিকার। এই বলিয়া হাসিলেন হরি বাগচি। কি বিকট হাসি —হা—হা—

বিদ্যালঙ্কার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন! পদ্ম গুপ্ত বলিলেন—আমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যাচ্ছি দিনাজপুরে। আপনি ব্রাহ্মণ, জমিদার। আপনার বিবেচনার উপরই সব নির্ভর করে।

—দেখ—এক শর্তে আমি তোমাদের প্রাণরক্ষা করব। আমার সঙ্গে দাবা খেলতে হবে। যদি খেলায় আমাকে হারাতে পার—তবে তোমরা প্রাণে বাঁচবে, নইলে আমি জিতলে তোমাদের রক্ষা নেই। হাতের তলোয়ারখানি তুলিয়া বলিলেন—কচি বাচ্চা, মেয়ে, পুরুষ কারো প্রাণ রাখব না—কেটে কুচি কুচি করে ফেলে দেব বিলের জলে—বল কি করবে? বল!

বিদ্যালঙ্কার চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—যদি আমরা হারি তবে যে—

—তবে-যে তবে-যে কেন করো ঠাকুর? আমার যে কথা সেই কাজ। কি বল তুমি?

পদ্ম গুপ্ত বলিলেন—বেশ কথা। যদি হারেন তবে ত আমাদের প্রাণে বাঁচাবেন, আর নিরাপদে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেবেন?

আলবৎ! আলবৎ! বলিয়া হুঙ্কার দিলেন হরি ডাকাত, ওরফে বাগচি মহাশয়; আমার কথার নড় চড় নেই, চল আমার বৈঠকখানায়।···ওরে শোন্ তোরা—এখানে পাহারা থাক, মাঝিরা যেন নৌকা নিয়ে না পালায়।···মাঝিরা—তোরা সব নিশ্চিন্ত মনে রান্নাবান্না করে খা।



।।চার।।

হরি ডাকাত ছিলেন পাকা দাবা-খেলোয়াড়। সে তল্লাটে তাঁহার মত দাবা-খেলোয়াড় কেহ ছিল না। তাহার চরিত্রেরও এই ছিল দুর্বলতা। দক্ষ দাবা-খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলিতে ভালবাসিতেন। হারিলেও খেলোয়াড়জনোচিত সহৃদয়তা দেখাইতেন। যে-কোন নৌকাযাত্রী তাহার হাতে পড়িত, তাহার সঙ্গেই দাবাখেলার প্রস্তাব করিতেন। মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

পদ্ম গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কার পাড়ে উঠিলেন। সামান্য একটু পথ যাইতেই সম্মুখে দেখা গেল বিরাট চকমিলান বাড়ি; কালিমন্দির, পূজার মণ্ডপ, বৃহৎ বৈঠকখানা, নাটমন্দির। বৈঠকখানায় তক্তপোশের উপর ফরাস পাতা, বহু বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন। হরি ডাকাতের আদেশে ভৃত্যেরা ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়া দিল। তিনি আদেশ দিলেন—বাড়ির ভিতরে গিয়ে বল পনেরো জনের খাবার আয়োজন করতে। আর মাঝি-মাল্লাদের ও মা-ঠাকরুণদের বল যে আমার এখানেই সব ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের আর কষ্ট করে রান্নাবান্না করতে হবে না।

ডাকাত হইলে কি হইবে, এদিকে এইরূপ বদান্যতাও ছিল।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে খেলিতে শুরু করিলেন পদ্মলোচন। বহুক্ষণ খেলা চলিল। দৈব সহায়; হরি ডাকাত হারিলেন, জয়ী হইলেন পদ্ম গুপ্ত। আশ্চর্য স্বভাব হরি বাগচির। তিনি মহা উৎসাহে গুপ্তের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন—সাবাস্! সাবাস্!

এইবার বিদ্যালঙ্কারের পালা। বিদ্যালঙ্কার এতক্ষণ খেলার চাল লক্ষ্য করিতেছিলেন। খেলায় বিদ্যালঙ্কারও জয়ী হইলেন। দৈব হইয়াছিল তাঁহাদের সহায়! আবার বাগচি মহাশয় খেলিলেন পদ্ম গুপ্তের সহিত, হারাইতেই হইবে তাহাকে।

দুই জনেই সুনিপুণ খেলোয়াড়। শেষটায় স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া অমোঘ চালে ডাকাত বাগচিকে হারাইয়া দিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন গুপ্ত—কিস্তিমাৎ। কিস্তিমাৎ। কিস্তিমাৎ।

বিজয়ী পদ্ম গুপ্তকে আলিঙ্গন করিলেন হরি ডাকাত। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন।

অনেকদিন পরের কথা। পদ্ম গুপ্তের বৈঠকখানায় বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার ও পদ্ম গুপ্তের সহিত একজন বলিষ্ঠকায় বৃদ্ধকে মাঝে মাঝে দাবা খেলিতে দেখা যাইত—কেহ জানিত না যে সে-ই হরি ডাকাত।

দিনাজপুরে আসিলে প্রায়ই তিনি পদ্ম গুপ্তের আসরে আসিতেন। পরে বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল পরস্পরের মধ্যে। তখন আর হরি বাগচি ডাকাতি করিতেন না। চলন বিল ছাড়িয়া রাজসাহী জেলায় কোন গ্রামে বাড়িঘর করিয়া, শান্তশিষ্ট দানশীল ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

২৫



জলসোরার ডাকাত

।।এক।।

হুগলী জেলায় জলসোরা গ্রাম। কলিকাতা হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর। জলসোরা গ্রাম একটি প্রসিদ্ধ পল্লী—এখানে ছিল বহু ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস। ঐ গ্রামে বহু ধনী ব্যক্তিও ছিলেন এবং বিখ্যাত জমিদার ছিলেন রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামনারায়ণ বাবু শারদীয়া পূজার সময় কলিকাতা আসিতেন এবং নিজে পূজার জন্য কাপড়-চোপড় এবং বহু জিনিসপত্র কিনিয়া দেশে যাইতেন। বড় ধুমধামের সহিত দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করিতেন। সেই সময়ে তিনি গরীব-দুঃখীদের ভোজন করাইতেন এবং তাহাদের মধ্যে কাপড়-চোপড় বিতরণ করিতেন। সত্য সত্যই রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাধু-সজ্জন লোক, গ্রামবাসীরা ছিলেন হিতকারী বন্ধু। যে-কোন আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে তাঁহার কাছে আসিলেই গ্রামবাসীরা পাইত সাহায্য। এজন্য তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। কেহ তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিত না। এমন কি হুগলী জেলার ডাকাতদলও তাঁহার বাড়িতে কোনদিন ডাকাতি বা কোন অত্যাচার করে নাই। বিরাট বাড়ি—লোকজন সর্বদা হৈ-হৈ করিত। দীঘি, খাল, ধানের ক্ষেত, তালের বাগান, নানাবিধ শস্যের উঁচু নিচু জমির সমাবেশে দূর হইতে গ্রামখানিকে দেখাইত অতি সুন্দর।

দুর্গাপূজার ও কালীপূজার সময় গ্রামের কঙ্কিনী দেবীর মন্দিরের পাশে বসিত মেলা। মেলায় আসিত নানা দেশের লোকজন। নানা রকম জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় হইত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের কথা। সেবার পূজার সময় রামনারায়ণ বাবু তাঁহার ছোট ভাই দেবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে বাড়ি চলিয়াছেন। জিনিসপত্র বজরায় উঠিতেছে। রামনারায়ণ বাবু বজরার উপর একখানা মোড়ায় বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট

ভাই সব দেখিয়া শুনিয়া ফর্দ করিয়া লোকজন দ্বারা জিনিস-পত্র তুলিতেছেন।

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া রামনারায়ণ বাবুকে নমস্কার করিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামনারায়ণ বাবু তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়ের কি কোন প্রয়োজন আছে?

ব্রাহ্মণ করজোড়ে কহিলেন—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিছু প্রার্থনা করি।

রামনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মণকে একটি টাকা দিলেন!

ব্রাহ্মণ হাসিমুখে জয় হোক রাজাবাবুর, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবার কিছু পরে গলিপথে আসিতেছিল একজন বজরার মাঝি। তখনকার দিনে কলিকাতার গলিতে তেমন আলো ছিল না। মিট মিট করিয়া জ্বলিত কেরোসিনের ল্যাম্প। অনুজ্জ্বল ছিল তাহাদের দীপ্তি।

গলিপথে মাঝির সঙ্গে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দেখা হইল, মাঝি বলিল —ঠাকুরমশাই ইনি মস্তবড় ধনী—জলসোরার জমিদার। আমরা রাত্রিতেই রওনা হ'ব—বুঝেসুজে আসবেন। আমরা জোয়ারের সময় নৌকা ভাসাব।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। মাঝিও তাহার গামছাখানিতে কিছু চাল-ডাল, তরিতরকারি লইয়া নৌকায় ফিরিল।

সন্ধ্যার পর রামনারায়ণ বাবুর বজরা ছাড়িয়া দিল। দাঁড়ী-মাঝি সকলে দ্রুত বজরা চালাইতে আরম্ভ করিল। নদীতে জোয়ার আসিয়াছিল। নৌকা তর-তর করিয়া ছুটিয়া চলিল। সঙ্গের ছোট নৌকাটিতে পাচক ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছিল। রামনারায়ণ বাবু বজরার কক্ষে বসিয়া দীপালোকে মহাভারত পড়িতেছিলেন।



॥ দুই ॥

সেই যে বাহ্মণ আসিয়াছিল রামনারায়ণ বাবুর কাছে ভিক্ষা করিতে তাহার নাম ছিল রামঠাকুর—কলিকাতার বিখ্যাত ডাকাত।* তাহার দলে ছিল বহু লোক। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া জেলার সর্বত্র সে ডাকাতি করিত। বহুকাল পর্যন্ত সে ধরা পড়ে নাই। সে ও তাহার দলের লোকেরা ঘাটের মাঝি, দোকানী, এমন সব লোকজনের কাছ হইতে ডাকাতি করিবার খোঁজখবর লইত। জলসোরা গ্রামের রামনারায়ণ বাবুর সব সন্ধান লইয়া সে প্রস্তুত হইল ডাকাতি করিতে। সে তাহার সঙ্গে লইল তাহার অধীনস্থ দুইজন বিখ্যাত সর্দার শেখ কালু, আর ঈশ্বর বাগ্দীকে। ইহারা ছিল রামঠাকুরের সঙ্গী বা চেলা। ছিপ নৌকাতে চলিল দলের প্রায় কুড়িজন ডাকাত। পথে তাহারা কিছুই করিল না—বজরার পিছনে পিছনে চলিল একটু দূরে দূরে থাকিয়া।

রামঠাকুর এদিকে তাহাদের চেলাদের মধ্যে কয়েক জনকে দলের লোকদের সংবাদ দিতে নানা স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

রামনারায়ণ বাবুর বজরা চলিয়াছে। জলসোরার খালের মধ্যে বজরা ঢুকিবামাত্রই হঠাৎ রামঠাকুরের দলের ডাকাতেরা বজরা আক্রমণ করিল। 'হা-রে-রে-রে' শব্দে পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। রামনারায়ণ বাবু জাগিয়া উঠিবার পূর্বে তাঁহার ছোট ভাই উপর্যুপরি বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। ডাকাতদের কাহারও গায়ে বড় একটা লাগিল না। তাহারা ছিপ ফিরাইয়া নিয়া গঙ্গায় পড়িল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রামনারায়ণ বাবু নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছিলেন। তাঁহার নৌকা যে ডাকাতেরা খালের মুখে আক্রমণ করিয়াছিল, সে-কথা গ্রামবাসীদের কাছে বলিলেন। গ্রামের লোকেরা চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। চারিদিকে লোকজন ও প্রহরীর ব্যবস্থা হইল। থানা হইতে পুলিশ ও দারোগা আসিল। বড়লোকের বাড়ি; সেইজন্যই সকলে সতর্ক হইলেন—ডাকাতদের দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।



॥ তিন ॥

পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। কালীপূজা আসিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। ভয়ানক দুর্যোগ। ঝড়বৃষ্টির কামাই নাই। ঘন ঘন মেঘ ডাকিতেছে। পল্লীগ্রামের চারিদিক অন্ধকার। বৃষ্টির জন্য লোকজন বড় কেহ বাহিরে নাই। এমনি দুর্যোগের দিনে রামনারায়ণ বাবুর বাড়ির দেওয়াল টপকাইয়া ডাকাতদল প্রবেশ করিল এবং ভীষণভাবে ডাকাতি করিল।

ডাকাতেরা দরজার কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিল তারপর বাক্স-সিন্দুক ভাঙ্গিয়া জিনিসপত্র লুণ্ঠন করিল। এই ডাকাতিতে বর্ধমান, চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি নানা অঞ্চলের ডাকাতেরা মিলিত হইয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় ছিল প্রায় দুই শত। জমিদার বাড়ির সর্বত্র তাহারা 'হা-রে-রে-রে' চিৎকার করিয়া এবং গ্রামের এখানে সেখানে মশাল জ্বালিয়া ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল নিরাপদে। রামনারায়ণ বাবুকে হাতে-পায়ে বাঁধিয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তিনি গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছিলেন। ভ্রাতা দেবনারায়ণ বারান্দায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইরূপ সাংঘাতিক ডাকাতি করিয়া ডাকাতেরা নিরাপদে প্রস্থান করিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গ্রামের লোকেরা দারুণ দুর্দিনে—

* সরকারী রিপোর্টে তাহার সম্বন্ধে লেখা আছে…a very celebrated Brahmin dacoit, named Ram Thakoor, who had lived in Calcutta for many years and committed dacoity in the neighbouring districts with perfect impunity.—P. 70 of *Suppression of Dacoity in Bengal.*

ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্যে এই দুঃসংবাদ জানিতে পারে নাই। পরদিন প্রাতে গ্রামবাসীরা জমিদার বাড়ী আসিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল।

থানায় সংবাদ গেল। দারোগা ও পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট সহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চলিয়া আসিলেন তদন্তে।

চারিদিকে তত্ত্বতালাস করিতে করিতে দারোগা লক্ষ্য করিলেন যে, রামনারায়ণ বাবুর মাথার কাছে একটি কাগজের টুকরো পড়িয়া আছে। তাহাতে লেখা ছিল—যে গরীব ব্রাহ্মণকে আপনি একটি টাকা দান করিয়াছিলেন, সে সেই টাকাটা আপনাকে ফিরাইয়া দিয়া গেল। আপনার বাড়িঘরে যা পাইয়াছি সবই নিলাম। আপনার খাবার বাসনপত্র মাত্র রাখিয়া চলিলাম।



২৬ সাপুড়ে ও ডাকাতদল

কলিকাতার বিখ্যাত লাহাবাবুদের জমিদারী ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সীমানায় মাথাভাঙ্গা গ্রাম। সেই পল্লীগ্রামের চারিদিকের নদীর চরাভূমি, জমিজমা সবই তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত। সেখানকার নায়েব তাঁহাদেরই একজন পরিচিত ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোকের নাম অমৃতলাল চক্রবর্তী। অনেক দিন এই স্টেটে কাজ করিতেছেন। ভদ্রলোক গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠকায়, বুদ্ধিমান ; বয়স তাঁহার চল্লিশের নিচে। পূজার ছুটিতে হুগলী জেলার মল্লিকপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে আসিয়াছিলেন। এইবার ছুটিশেষে কার্যস্থলে ফিরিয়া যাইতে উদ্যোগী হইলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও চার-পাঁচ বছরের পুত্র।

অমৃতবাবুর কার্যস্থল দূর পথ, নৌকায় যাইতে হয়। সেখানে জিনিসপত্র তেমন মিলে না। কাজেই পল্লীগ্রামে সচরাচর মিলে না এমন দুই একটি শৌখিন জিনিস সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া মনিবের সঙ্গে দেখা করিয়া এবং আবশ্যকীয় জিনিসপত্রাদি লইয়া রওনা হইবার দিন স্থির করিলেন। হুগলী হইতে নৌকা ঠিক করিলেন এবং নিজ বাসভবন মল্লিকপুরের ঘাটে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। পরদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া রওনা হইবেন—এইরূপ স্থির হইল।

নৌকাখানি বেশ বড়। তাহাতে তিনজন দাঁড়ী ও একজন মাঝি। যথাসময়ে একজন ভৃত্য ও স্ত্রীপুত্রসহ অমৃতবাবু নৌকায় উঠিলেন। দাঁড়ী-মাঝিরা গঙ্গায় পড়িয়াই 'দরিয়ার পাঁচপীর বদর বদর' বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। পানসী নৌকাখানি দেখিতে দেখিতে শহরের সীমানা ছাড়িয়া গেল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। পথ-ঘাট অমৃতবাবুর জানা। তিনি শুইয়া শুইয়া নিশ্চিন্ত মনে নদীর শোভা দেখিতেছিলেন। ছেলেটি মায়ের বুকে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খানিক পরে ঠাণ্ডা বাতাসে অমৃতবাবুও ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার আগে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি দেখিলেন মাঝিরা একটি খালের ভিতর নৌকা লইয়া আসিয়াছে। এ-পথ ত মাথাভাঙ্গা বন্দরে যাইবার পথ নয়। তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কোথায় এলে, কোন্ পথ দিয়ে চলেছ ? এ পথে ত আমি কোনদিন যাই নি।

অমৃতবাবুর বিশ্বাসী ভৃত্য রামহরি কৈবর্ত কহিল—হাঁ কর্তা, এ আমরা কোন্ পথে যাচ্ছি ? চারদিক বন-বাদাড়, বড় বড় গাছ, বাঁশবন। এ যে একেবারে চারদিক থেকে অন্ধকার এসে যেন খেয়ে ফেলতে চাইছে। এ কোথায় যাচ্ছি ?

মাঝি কোন উত্তর দিল না।

এইবার অমৃতবাবু একটু ভয় পাইলেন, মাঝিকে বলিলেন—আমরা ত কোনদিন এ-পথে যাইনি। তোমরা কি পথ ভুলেছ ?

মাঝি বিরক্ত হইয়া কহিল—কি সব মিছিমিছি কথা বলছেন বাবু ! সব মাঝিই কি সব পথ জানে ? এই খালের পথ সোজা পথ। এ খাল দিয়ে গেলে একদিন আগে মাথাভাঙ্গা পৌঁছে যাব।

নিশ্চিন্ত হইলেন অমৃতবাবু। মনে করিলেন, হইতেও পারে—জানি না ত। কিন্তু রামহরি কেবলই ব্যস্ত ভাব দেখাতে লাগিল—কেমন যেন উস্‌খুস্ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিল। এইবার খালের দুই পাশে দেখা যাইতে লাগিল মাঠ। কৃষকেরা গরুর পাল লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। মাঠের দূর প্রান্তের দুই-একটি গ্রাম হইতে দেখা যাইতেছিল প্রদীপের আলো। এমন সময় মাঝিরা খালের এক কিনারায় নৌকা ভিড়াইয়া নোঙ্গর করিল !

অমৃতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কোন্ গ্রাম ? এ খালের নামও ত শুনি নি ? আর এখানেই বা নোঙ্গর করলে কেন ?

দাঁড়ী-মাঝিদের একজন বিরক্ত হইয়া বলিল—কর্তা কি যে বলেন ! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গ্রাম থেকে কিছু চাল-ডাল কিনে নিয়ে আসছি !

এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল। প্রথম দাঁড়ী চলিয়া যাইবার পর দ্বিতীয় দাঁড়ীও চলিয়া গেল। তারপর বাকী দাঁড়ী ও মাঝি একে একে কহিল—তাই ত কেন এল না ওরা, দেখে আসতে হয়। জায়গাটা ত ভাল নয়, দস্যু-ডাকাত আর বাঘের ভয়ও বেশ আছে।

এমনি সব কথা বলিয়া তাহারাও একে একে নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অমৃতবাবু লণ্ঠন জ্বালাইয়া নৌকার ভিতর বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী রান্নাবান্নার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অনেক রাত্রিতে চাঁদ উঠিবে।

* এই ডাকাতি সম্বন্ধে ডাকাতি দমনের কমিশনার লিখিয়াছেন—"One of the most serious robberies committed by him, was at the village Julsora, in the Hoogly District, about fifty miles from Calcutta.

অমৃতবাবু এইবার চিন্তিত হইলেন—কি ব্যাপার! তিনি ধীরে ধীরে খালের পাড়ে উঠিলেন। দেখা গেল দিগন্তবিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ—সে মাঠের যেন আর শেষ নাই। লোকালয়ের কোন চিহ্ন নাই. ধূ-ধূ করে মাঠ। যেন এক অন্ধকারের অজানা রাজ্যে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মনে আসিল নানা ভাবনা ও দুশ্চিন্তা। মাঝিরা গেল কোথায়? কে ইহারা? শিশুপুত্র ও স্ত্রী লইয়া এমন অবস্থায় ত তিনি কোনবার পড়েন নাই।

ক্রমে রাত্রি অনেক বাড়িয়া গেল। জঙ্গলের মধ্য হইতে নানা প্রকার চেঁচামেচির শব্দ শোনা গেল। অমৃতবাবু নৌকায় আসিয়া বসিলেন এবং ছেলেটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

রামহরি সর্দার বলিল—বাবুমশাই, ব্যাপারটা ভাল দেখছি না। এ পথটা ভাল মনে হয় না। চারিদিকে দস্যু-ডাকাত-ঠেঙ্গাড়ের ভয়। মাঝি বেটারা যে কোথাকার লোক তাও জানি না।

এইসব কথা শুনিয়া অমৃতবাবুর স্ত্রীও ভীত হইলেন এবং স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে বল?

অমৃতবাবু বলিলেন—কোন ভয় নেই। এই মাঝিদের কথাই বলছিলাম। এখনও ওরা ফিরে এল না কেন?

এ-কথায় তাঁহার স্ত্রী প্রবোধ মানিলেন না।

এমন সময় একজন দীর্ঘকায় লোক আসিয়া নৌকার পাশে দাঁড়াইল। মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, কালো কুৎসিত চেহারা, মলিন কাপড় পরা হাঁটু পর্যন্ত। হাতে বালা; গলায় স্ফটিকের মালা, কাঁধে একটা বাঁশের দুই পাশে বড় বড় দুইটি ঝাঁপি, হাতে একটা অদ্ভুত ধরনের বাঁশী। লোকটাকে এরূপ পরিবেশে সহসা দেখিতে পাইয়া অমৃতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই কে রে?

লোকটি কহিল—আজ্ঞে কর্তা, আমি সাপুড়ে। সাপ খেলাতে গিয়েছিলাম দূর গাঁয়ে। ফিরতে রাত হয়ে গেল। এখন কোন নৌকো মিলবে না। আমাদের সঙ্গের নৌকো অন্য দিকে গেছে! দিনের বেলায় নৌকো আসবে কর্তামশাই। আমি এই নৌকোর সামনের দিকে পাটাতনটায় সাপের ঝাঁপি নিয়ে শুয়ে থাকব···

: তোমার ঝাঁপি থেকে সাপ বেরিয়ে যদি বিপদ ঘটায়—

: সে ভয় করবেন না মশায়, বরং আমাকে একটু ঠাঁই দিলে—আমি হয়ত আপনাদের কাজেই লাগব। আপনারা এখানে এলেন কেমন করে?

তখন অমৃতবাবু তাহাকে সব কথা জানাইয়া বলিলেন, আচ্ছা এস! তোমার নাম কি ভাই?

লোকটা উত্তর করিল—আমার নাম বৈকুণ্ঠ বেদে।

বৈকুণ্ঠ এবার নৌকায় আসিয়া বসিল সামনের পাটাতনের উপর। সাপের ঝাঁপি দুইটি তাহার পাশে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিল এবং এক ছিলিম তামাক টানিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল—বাবু এ বড় ভীষণ ঠাঁই! কেন যে এখানে এলেন জানি না। এই মাঠের পর দুটি বড় গাঁ আছে, সেখানে যারা বাস করে তারা সকলেই ডাকাত। মাঝিরাও ডাকাত। এইবার তারা এল বলে।

অমৃতবাবু বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কহিলেন—ভাই, তুমি আমাদের বাঁচাও।

বেদে বলিল—ডাকাত মাঝিরা আমাদের একজনকেও জীবিত রাখবে না। প্রাণে মেরে সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে। তারপর এই নৌকা আবার যাবে শহরের দিকে। আবার যাত্রী নিয়ে এসে এখানে শেষ করবে।

: ভাই, তুমি আমাদের এ-বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

: দেখি কি করা যায়। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার যোগাড় দেখি।

অমৃতবাবু কহিলেন—ভাই, আমাদের রান্না চড়েছে। রান্নাবান্না হলেই আমরা একসঙ্গে খাব।

: বাবু কি ব্রাহ্মণ?

: হাঁ ভাই।

: দেবতা, আপনি ভয় করবেন না, আমি এ-অঞ্চলে প্রায়ই আসি। এদের স্বভাব জানি। আপনার মাঝিরা আসবে রাত দুপুরে। ভাববে আপনারা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখনই সাবাড় করে বেগে নৌকো চালিয়ে, আপনাদের লাশ নদীর জলে ফেলে দিয়ে আবার শহরে যাবে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে। কিন্তু কাহারও চোখে ঘুম নাই।

মাঝিদের কাহারও দেখা নাই, তাহারা গেল কোথায়!

এমন সময় একটা লোক আসিল লম্বা লাঠি কাঁধে লইয়া। তারপর আসিল একজন তারপর আরও একজন। সেইরূপ বেশে কয়েকজন লোক আসিল খালের পাড়ে। আগত লোকদের মধ্য হইতে একটা লোক লাঠি হাতে নৌকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং রামহরিকে সামনে পাইয়া শুধাইল—তুই কে রে এখানে?

: আমি বাবুর সাথী—বাবুর বন্দরে যাচ্ছি।

: দাঁড়া বেটা, তোকে দিচ্ছি শেষ করে।—এই বলিয়া একসঙ্গে সাত-আটজন লোক লাফাইয়া নৌকার উপর উঠিল।

এমন সময় তড়িৎগতিতে বৈকুণ্ঠ বেদে তাহার ঝাঁপি খুলিয়া একটা বড় কালো গোখরো সাপ বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিল। সাপটা ফণা তুলিয়া ছোবল দিল প্রথম ডাকাতকে। ওরে বাবা রে, গেছি রে! বলিয়া লোকটা নৌকা থেকে পড়িয়া গেল খালের জলে।

এইভাবে বন্ধনমুক্ত তিন-চারটি সাপের আক্রমণে ভয় পাইয়া কেহ জলে, কেহ নদীর পাড়ে পড়িল হুটোপুটি করিয়া। বৈকুণ্ঠ এইবার বড় গোখরো সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। সে ফোঁস-ফোঁস্ করিয়া এমনভাবে পাড়ে গিয়া ডাকাতের দলকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা পালাইবার পথ পাইল না।

বৈকুণ্ঠ বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র পড়িল কে জানে? কি কৌশলে কি ভাবে যে বৈকুণ্ঠ সাপদের লেলাইয়া ডাকাতদের তাড়াইয়া দিল, তাহা আশ্চর্য বলিতে হইবে।

ক্রমে জানা গেল ঐ ডাকাতদলের মধ্যে মাঝিরাও আছে। অমৃতবাবু গম্ভীরকণ্ঠে তাহাদের বলিলেন—খবরদার! এক্ষুনি নৌকায় উঠে—চল নৌকা নিয়ে গঙ্গার দিকে।

মাঝিরা বেগতিক দেখিয়া একটি কথাও না বলিয়া নৌকা চালাইতে চালাইতে বলিল—বাবু, আপনার পায়ে পড়ে বলি, আমাদের থানায় ধরিয়ে দেবেন না।

নৌকা নদীর মুখের কাছে আসিলে অমৃতবাবু দেখিলেন—জল-দারোগার একখানি নৌকা ঐ দিকেই আসিতেছে। বৈকুণ্ঠ বেদে চিৎকার করিয়া সেই নৌকা থামাইল। নৌকা থামিলে বৈকুণ্ঠ একে একে সব কথা দারোগাকে বলিল।

পুলিশের দল দাঁড়ী-মাঝিদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

ডাকাত মাঝিরা যে এত সহজে ধরা পড়িবে অমৃতবাবু আশা করেন নাই।

মাঝিদের সাহায্যে অন্যান্য ডাকাতেরা ধরা পড়িয়াছিল এবং তাহাদের সাজা হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠ সাপুড়ে সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছিল।

২৭



ডাকাত রামার ভদ্রকালী

॥এক॥

রামা-শ্যামা—দুই ভাই।

তাহারা বিখ্যাত ডাকাত। তাহাদের ভয়ে ফরিদপুর জেলার লোকেরা প্রাণভয়ে কাঁপে। পদ্মার এক বাঁকে তাহাদের বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। বড় বড় চালা ঘর—আটচালা, চৌচালা, দোচালা। প্রচুর গরু-বাছুর আছে। চরের উর্বর মাঠে তাহাদের লোকজনেরা চাষবাস করে, সেটা শুধু লোক দেখান মাত্র। রাত্রিতে দলের লোকেরা আসিয়া বৈঠক করে, তারপর ছিপ নৌকা ছোটে দিকে দিকে ডাকাতি করিতে।

রামা-শ্যামা জাতিতে বাগ্দী। এমন ভীষণ চেহারা বড় দেখা যায় না। যমজ দুই ভাই। বলিষ্ঠ চেহারা। লম্বা চওড়া জোয়ান। সেকালের ইতর-ভদ্র সকলেই রাখিত লম্বা বাবরি চুল। ইহাদেরও ছিল তাই। গলায় শঙ্খের মালা, হাতে বাজু, বালা—সোনার তৈরী। তাহাদের তাঁবে ছিল শ' দুই লাঠিয়াল ও তলোয়ারধারী, বল্লমধারী ডাকাত। জলপথে ও স্থলপথে দুইদিকেই তাহারা ডাকাতি করিত। জেলার হাকিম, পুলিশ দারোগা তাহাদের ধরিতে পারিত না। কোম্পানীর আমল। কালেক্টর সাহেব কলিকাতায় পাঠাইতেন রিপোর্ট—সাহায্য চাহিতেন লোকজন, গোয়েন্দা ও জলপথে স্থলপথে সাহসী সেনার। তবু তাহাদের দমন করা সম্ভব ছিল না।

রামা-শ্যামাকে ধরা সহজ ছিল না, কেননা সেকালে কয়েক ঘর ডাকাত জমিদার বাস করিতেন পদ্মার পাড়ে। বিরাট ছিল তাঁহাদের বাড়ি। তাহাতে ছিল দালানকোঠা, অতিথিশালা, কাছারি, বরকন্দাজ, দারোয়ান। এমন দুর্দান্ত দস্যু জমিদার অনেক ছিলেন তাঁহারা দল বাঁধিয়া যোগ দিতেন রামা-শ্যামার সঙ্গে ডাকাতি করিতে। ডাকাতদের সঙ্গে মিলিয়া করিতেন দশমহাবিদ্যার পূজা। সে পূজায় দিতে হইবে নরবলি। জমিদার বংশের একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন মা কালী তাঁহাকে দশমহাবিদ্যা মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি নরবলি দিতে আদেশ করিয়াছেন।

প্রচার হইল স্বপ্নকথা। গ্রামে গ্রামে সকলে সতর্ক রহিল নিজ নিজ ছেলেদের লইয়া। কেহ ঘর হইতে ছেলেদের বাহির হইতে দিত না। ঐ ছেলে নিতে এল রে!—শোনা যাইত জননীদের মুখে ঘরে ঘরে। দারোগা-পুলিশ সতর্ক নজর রাখিতে লাগিলেন চারিদিকে। কিন্তু নির্ভীক চৌধুরী জমিদারেরা রামা ও শ্যামার সাহায্যে একটি শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়া গভীর নিশীথে দশমহাবিদ্যার কাছে বলি দিলেন! তান্ত্রিক সাধক শ্যামানন্দ করিয়াছিলেন দশমহাবিদ্যার পূজা।

সেকালে ধর্মের নামে ছিল এমনি নৃশংসতা! এখনও কি নাই?

এই চৌধুরী জমিদারেরা ছিলেন রামা-শ্যামার মত দুর্দান্ত দস্যুদের সঙ্গী, কাজেই ইহারা সর্বদা নির্ভয়ে ডাকাতি করিয়া ফিরিত। কে তাহাদের ধরিবে!



॥দুই॥

সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে ঢাকা শহরে ও পূর্ববঙ্গের নানা শহরে। লোক বিপন্ন। কলিকাতা হইতে কোম্পানীর একদল সিপাহী দুইজন ইংরেজ কাপ্তেনের সঙ্গে গিয়াছে ঢাকা শহরের দিকে। দেশী সিপাহী ছিল বেশী। তাহারা নৌকা ভিড়াইয়া রান্নাবান্না করিতেছিল। সাহেব কাপ্তেনরা বোটে খানা খাইতেছিলেন। নৌকা ছাড়িবার সময় হইতেছিল। কাপ্তেন বাঁশী বাজাইতে যাইবেন, এমন সময় ঘটিল অঘটন।

সিপাহীরা আহারাদির জন্য কলাপাতার সন্ধানে চৌধুরীদের বাগানে প্রবেশ করে। চৌধুরীদের কর্তা ও তাঁহার লোকেরা তাহাদের বলে—খবরদার এক পা এগুবে না। কাটতে পারবে না কলাপাতা।

সিপাহীদের মেজাজ ত স্বাভাবিক ভাবেই ছিল চড়া। উদ্ধত সিপাহীরা তাহাদের কথা শুনিল না—নিঃশঙ্কচিত্তে কলাপাতা কাটিতে লাগিল।

সেদিন রামা ও শ্যামা সদলবলে সেখানে উপস্থিত ছিল। কথা ছিল—নদীর পরপারের এক জমিদার বাড়ি লুঠ করবে সেদিন। কিন্তু আকস্মিক ঘটিল এই বিপদ। চৌধুরীদের কর্তা হুকুম দিলেন তাঁহার লোকজনদের—ওদের মেরে তাড়িয়ে দাও। সিপাহীদের নৌকা ডুবিয়ে দাও পদ্মার জলে। টেনে তোল পাড়ে কাপ্তেন সাহেবের বোট।

আরম্ভ হইল ভীষণ হাঙ্গামা। লাঠালাঠি, বল্লম-বর্শা ছোড়াছুড়ি, একটা ছোটখাট লড়াই হইল। সিপাহীদের নৌকা ডুবাইয়া, তাহাদের বন্দুক কাড়িয়া হাত-পা বাঁধিয়া—ফেলিয়া রাখিল একটা

অন্দরের বড় দুইটা ঘরের ভিতর।

সাহেবেরা অবশ্য ঢাকা চলিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। রামা-শ্যামার দল এই লড়াইয়ে খুবই বীরত্ব দেখাইয়াছিল।

এক সপ্তাহ পরের কথা। ঢাকা হইতে আসিল বহু সৈন্য-সামন্ত; চৌধুরীদের বাড়ি ঘেরাও করিয়া ফেলিল।

কোম্পানীর কাছে যখন এ-সংবাদ পেঁছিল তখন হুকুম আসিল অতি ভীষণ—চৌধুরীদের বাড়ীতে তেল ঢেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেল!

আদেশ পালিত হইল। নিরুপায় চৌধুরীরা সর্বস্ব হারাইয়া এক দূর নির্জন পল্লীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা অতি হীন অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছে।

রামা-শ্যামার খবর শোন এইবার।



॥তিন॥

দাঙ্গা-হাঙ্গামার শেষে রামা-শ্যামা মনে করিল, ফল ভাল হইবে না। ধরা পড়িলে, ফাঁসী হইবে নিশ্চিত।

তাহারা দলবল সহ পলাইল। পলাইবার পথে পদ্মার একটা শাখানদী বাহিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইল একখানি বড় বাড়ি। নদী সেখানে শীর্ণ হইয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। তাহারা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নদীর পাড়ের ঝোপঝাড়ের আড়ালে নৌকা নিয়া বাঁধিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। চারদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

রামা বলিল—শ্যামা, বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখে আয়। বেশ বড় লোকের বাড়ি। এতদিন ত কোন মালই হাতে এল না!

দাদার যোগ্য ভাই শ্যামা। চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—দাদা! ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ি। বেশ মাল জুটবে। তৈরি হও, রাত দুপুরে আমরা লুঠ করব।

সে ব্যবস্থাই হইল।

দুপুর রাত্রে ঐ বাড়ি আক্রমণ করিতে চলিল রামা-শ্যামা। কিন্তু—এ কি! বাড়ির সকলেই যে জাগিয়া আছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে! কিছুক্ষণ আগে যে বাড়ি ছিল নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার, সহসা তাহাতে এত আলো আসিল কোথা হইতে? এত লোকজনই বা আসিল কোথা হইতে?

রামা ও শ্যামা সেই লোকজন ও আলো গ্রাহ্য না করিয়া দলে দলে নানা দিক দিয়া 'হা-রে-রে-রে' করিতে করিতে মশাল জ্বালিয়া উজ্জ্বল আলো উজ্জ্বলতর করিয়া ঘিরিল সেই বাড়ি।

সিংহ দরজার মধ্য দিয়া যে-সময় প্রবেশ করিতে যাইবে তখন দেখিতে পাইল এক ভয়াবহ দৃশ্য। চমকিয়া উঠিল রামা-শ্যামা। তাহাদের হাত কাঁপিল।

ভীষণদর্শন এক তান্ত্রিক সাধক। হাতে তাঁহার—করালবদনা, ভয়ংকরাকৃতি, আলুলায়িত-কেশা এক চতুর্ভুজা দক্ষিণা-কালীমূর্তি! দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, বামভাগের অধোহস্তে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও উর্ধ্বহস্তে খড়্গ, দক্ষিণ ভাগের উর্ধ্বহস্তে অভয় ও অধোহস্তে বরসূচক মুদ্রা রহিয়াছে!

সর্দারের হুকুম নাই। কাজেই ডাকাতের দল নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

এ কি! এ কি! মা যে হাস্যমুখী! দুই ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে রক্তধারা! শিহরিয়া উঠিল রামা-শ্যামা।

মূর্তিহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন ভীষণদর্শন তান্ত্রিক—দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কেশ, রক্তচন্দনচর্চিত ললাট। গলায় দীর্ঘ-বিলম্বিত স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা। বাহুতে—করপ্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা—চোখ দুইটি জ্বলিতেছে অগ্নি-গোলকের মত! সাধক হাসিতে লাগিলেন—হা—হা—অট্টহাসি! গভীর রাত্রিতে কোথায় ডুবিয়া গেল ডাকাতদের 'হা-রে-রে-রে' শব্দ।

তান্ত্রিক সাধকের অট্টহাসি—দিকে দিকে বনে বনে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল ভীম ভয়ংকর ভাবে—হা-হা-হী!

রামা একটু জ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—ঠাকুর! আপনি কে? সঙ্গে সঙ্গে সাধকের পায়ে লুটাইয়া পড়িল দুই ভাই।

ঃ আমি—কে আমি? আমাকে জানিস্ না? আমার নাম কামদেব তার্কিক—তন্ত্রচূড়ামনি।

ঃ আপনি! আপনি!—কথা বাহির হইতেছিল না তাহাদের কণ্ঠ হইতে।

ঃ হাঁ আমি। এ আমার শিষ্যবাড়ী। আজ এই অমাবস্যার দিনে আমার মাকে নিয়ে শ্মশানে পূজায় বসেছিলাম। আমার ভক্ত ও শিষ্য—কালীচরণ, কেঁদে গিয়ে বললে—বাবা, আমার যে বড় বিপদ!

বললাম, আমি থাকতে বিপদ। দেখি, রামা-শ্যামা কত বড় ডাকাত যে, আমার আশ্রিত মায়ের নিরীহ ছেলের ওপর অত্যাচার করে! করবি ডাকাতি? এই দেখ মা হাসছেন—ঝরে পড়ছে রক্তধারা দুই ঠোঁট বেয়ে।

রামা ও শ্যামা কামদেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ঠাকুর পদ্মাপারে একটা হাঙ্গামা করে এসেছি, এখানে দিলেন বাধা। কি করি বলুন তো ঠাকুরমশাই?

ঃ তোদের হাঙ্গামায় বিপদ হবে না!

ঃ তা ত হলো। তবে আমরা কি খাব? কেমন করে বাঁচব? ডাকাতি ছাড়লে কে দেবে আমাদের খেতে?

মহাপুরুষ কামদেব বলিলেন—ভয় নেই, এই মূকালীর্তি দিচ্ছি। এই মাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে নির্ভর করে বসে থাক। মা-ই সমস্ত দেবেন।

এই বলিয়া মায়ের পূজার মন্ত্র দিলেন রামা-শ্যামাকে—দীক্ষালাভ হইল তাহাদের।

দিন যায়, মাস যায়, অনাহারে অনিদ্রায় রামা-শ্যামার দিন কাটে। তন্ময় হইয়া মা মা বলিয়া ডাকে; তবু মা দেখা দিলেন না। তখন দুই ভাই শক্তিসাধক কামদেবের নিকট গিয়া কাঁদিয়া বলিল—

ঠাকুর, মা ত কথাও বলেন না, খাবারও দেন না।

কামদেব বলিলেন—মা যদি কথা না বলেন, তবে মুগুর পেটা করিস্, পেটানোর চোটে আপনি কথা বলবেন।

রামা-শ্যামা দুই ভাই আবার আসিয়া বসিল। আবার একমাস ডাকাডাকি করিল।

দেবীর কৃপায় শ্যামার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল।—কিন্তু রামা?—রামার কি হইল?

রামা একদিন মাকে স্পষ্টবাক্যে বলিল—দেখ্, মা, ভালমানুষের মত কথা বলিস্ ত বল, না হলে এই মুগুরে তোর মাথা চূর্ণ করব। —এই কথা বলিয়া যেমন সে মুগুর তুলিয়াছে, মা অমনি পশ্চাৎভাগ হইতে মুগুরের সহিত তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

সেদিন হইতে তাহাদের দৈন্য ঘুচিয়া গেল। নিত্যপূজা ও ভোগ দিতে প্রতিদিন শত শত লোক আসিতে লাগিল। মায়ের কৃপায় সব অভাব ঘুচিল।

ফরিদপুরের কয়ড়া গ্রামে—ডাকাত রামার ভদ্রকালী আজিও ভক্তের পূজা পাইয়া আসিতেছেন।



২৮

ফকির রামদুলাল ও ডাকাতদল

এক

সেকালের রাস্তাঘাটের সঙ্গে একালের রাস্তাঘাটের তুলনাই হয় না। তখন কলিকাতার আশে-পাশের গ্রাম, বন্দর ও হাটবাট ছিল বনজঙ্গলে ভরা। দিনে রাতে সকল সময়েই লোকে পথ চলিত ভয়ে ভয়ে—কখন দস্যু-ডাকাতের হাতে পড়ে। এজন্য অনেক সময় লোকে দল বাঁধিয়া চলিত।

এখানে তোমাদের কাছে বলিতেছি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথা। তাঁহার নাম ছিল রামদুলাল সরকার। রামদুলাল ছিলেন ভারি সাধু প্রকৃতির লোক। কোন মানুষই ত একদিনে বড় লোক হয় না। রামদুলালও ছেলেবেলায় ছিলেন অত্যন্ত গরীব, এমন কি দুইবেলা ভাল করিয়া আহারও জুটিত না। অতিকষ্টে দিন চলিত—কোন কোন দিন না খাইয়াও থাকিতে হইত। অবশেষে রামদুলাল পাইলেন এক বিল-সরকারের কাজ কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বাগবাজারের মদনমোহন দত্তের বাড়িতে। মদনমোহনবাবু অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী লোক ছিলেন। তাঁহার কাছে রামদুলাল টাকাকড়ি আদায়ের ভার লইলেন। তাঁহার কাজ ছিল বিভিন্ন বন্দরে গিয়া মহাজনদের কাছ হইতে টাকা আদায় করিয়া আনা। রামদুলাল একাজ এমন নিষ্ঠার সহিত করিতেন আর এমনভাবে টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিতেন যে, সামান্য ভুলচুকও থাকিত না।

একদিন দুপুরবেলা মদনমোহন ডাকিয়া বলিলেন—রামদুলাল, তোমাকে আজ দমদমের কাছারিতে যেতে হবে। নায়েব জানিয়েছেন যে, তহবিলে অনেক টাকা জমা আছে। চারদিকে ঠগী, ঠেঙ্গাড়ে, লেঠেল প্রভৃতি নানা রকমের ডাকাতের ভয়, এজন্য সেই টাকাগুলো কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে চান। তুমি এখনি চলে যাও। দমদম ত আর বেশী দূর নয়। ওখান থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে হচ্ছে বামুন-ডাঙ্গার কাছারি। পথখরচা নাও পাঁচটি টাকা। পথে যদি গোরুর গাড়ী পাও তবে তাতে করেই যেও।

রামদুলাল রাজী হইলেন এবং কাঁধে একখানি চাদর ফেলিয়া রওয়ানা হইলেন দমদম কাছারির দিকে।

দমদম যাইতে সেকালে খুব সাবধান হইতে হইত। পায়ে চলা পথের দুইদিকে ভীষণ জঙ্গল—বড় বড় বটগাছ, পাকুড়গাছ, বাঁশবন, ঝিল, বিল, খাল আর হোগলা বন। ভাবিতে পারিবে না সেকালের পথের কথা। রামদুলালকে তাঁহার মনিব পূর্বে ছোটখাট মোকামে বিল আদায় করিতে পাঠাইতেন। সে-সব কাজ ভালভাবে করিতেন বলিয়াই দত্তমহাশয় তাঁহাকে মোটা টাকা আদায় করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রামদুলাল যথাসময়ে কাছারিতে গেলেন এবং মনিবের চিঠি দেখাইলেন। সেই কাছারির নায়েব ছিলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি রামদুলালের কাছে দত্তমহাশয়ের চিঠি পাইয়া বলিলেন—বাবা, তোমার বয়স দেখছি খুবই কম; সঙ্গে কোন লোকজনও নেই। তুমি এত টাকা নিয়ে কেমন করে কলকাতায় বাবুর বাড়ি যাবে?

রামদুলাল উত্তর দিলেন—কর্তার হুকুম, যেতেই হবে।

নায়েব মহাশয় বলিলেন—তা বাপু, আমি আজ তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না। কাল মধ্যাহ্নে সব বুঝ-প্রবোধ করে পাঠিয়ে দেব। বুড়ো মানুষের কথা শোন।

রামদুলাল রাজী হইলেন এবং রাত্রিটা রহিয়া গেলেন। একটা বিলের পাড়ে ছিল কাছারি-বাড়ি। চারিদিকে বাগ্দী, কাহার, সাঁওতাল প্রভৃতি নীচ জাতির বাস। মুসলমান চাষীর সংখ্যাও খুব বেশী। তবে কাছারিতে পশ্চিমদেশের বরকন্দাজ, লেঠেল সর্দার সব আছে, দিনরাত্র পাহারা দেয় তাই রক্ষা।



রাত বেশ নিরাপদেই কাটিল। পরদিন হিসাবপত্র বুঝিয়া পাঁচ হাজার টাকার থলি লইয়া রামদুলাল কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন সেই বুনো গ্রাম্যপথে। তখন কলিকাতা পর্যন্ত রেলগাড়ী হয় নাই। কাজেই অতি সাহসী লোককেও অতি সন্তর্পণে চলিতে হইত।

রামদুলালের যাবার সময় নায়েব মহাশয় বলিলেন—বাবা, সাবধানে যেও যাতে বেলাবেলি পৌঁছুতে পার সে-চেষ্টা করবে। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া রামদুলাল ধরিলেন কলিকাতার পথ।



॥দুই॥

দমদম কলিকাতার কাছে হইলে কি হইবে? আগেই বলিয়াছি যে, তখনকার দিনে কলিকাতার কাছাকাছি হইলেও দমদমের বনে-জঙ্গলে সাপ, বাঘ, জন্তু-জানোয়ারের ছিল যেমন ভয়, তেমনি ডাকাতেরা সন্ধ্যায়ই হউক কিংবা রাত্রেই হউক, পথিকের সর্বস্ব লুঠিয়া লইয়া বিলের জলে লাশ ফেলিয়া দিত।

রামদুলাল কাছারি হইতে রওনা হইয়া কলিকাতার পথে চলিয়াছেন! আশে পাশে বসতি নাই। দূরে দূরে দুই-একটি গ্রাম আছে। সেখানে লোকজনের বাস। গ্রামের লোকেরা সকলেই যে ভালমানুষ তাহাও ত কেহ বলিতে পারে না।

পথ চলিতে চলিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেদিন ছিল অমাবস্যা। সন্ধ্যাকালেই পথের ধারের বনজঙ্গল অন্ধকারে ঢাকা পড়িল। রামদুলাল ভীত হইয়া পড়িলেন—কি ভাবে কেমন করিয়া প্রভুর টাকা নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন!

দূরে একটি গ্রামের ঘর হইতে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া ভাবিলেন, ঐ বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলে বেশ হয়। আবার তাঁহার মনে হইল, গৃহস্থ নিজেই যদি ডাকাত হয়, তাহা হইলে সব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ত মারিয়া ফেলিবে! একদিকে ডাকাতদের ভয়, অন্যদিকে বাঘ-ভালুকের ভয়, কি করা যায়? এমন সময় দেখিলেন, দূরে একদল লোক আসিতেছে। মুহূর্ত মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য কাণ্ড করিলেন। পথের ধারের একটি কুঁড়েঘরের পাশে ছিল একটি বড় বটগাছ—শাখা-প্রশাখায় ঢাকা এবং তাহার জট নামিয়াছে অনেক। তাহারই এক পাশে রামদুলাল গায়ের কাপড়চোপড় খুলিয়া টাকার থলিটির একটি পুঁটলি করিলেন। টাকার পুঁটলিটি বটের ঝুরির মধ্যে রাখিয়া দিয়া, সারা গায়ে মাটি মাখিয়া মাথার চুল ঝুটির মত করিয়া পথের ধূলা-কাদা মাখিয়া সাজিলেন এক পাগলা ফকির। তারপর তিনি বটগাছে হেলান দিয়া বসিলেন।

এমন সময় লাঠি ও মশাল হাতে আসিল একদল ডাকাত। নজর পড়িল তাহাদের রামদুলালের ওপর; মশালের আলো ফেলিল তাঁহার মুখের সামনে। অমনি হি-হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ছদ্মবেশী রামদুলাল। দলের সর্দার বলিল—এ বেটা পাগলা ফকির। চল্ চল্—গাঁয়ের দিকে যাই। ডাকাতেরা রামদুলালকে কিছু না বলিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উষার আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাখীর ডাক শুনিতে শুনিতে রামদুলাল কলিকাতার দিকে রওয়ানা হইলেন এবং বেলা দ্বিপ্রহরে পৌঁছিলেন দত্ত বাড়িতে। মদনমোহন দত্তের কাছে টাকার থলিটি বুঝাইয়া দিয়া পথের বিপদের কথা বলিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হইলেন দত্ত মহাশয় এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার ওপর দিলেন আরও গুরুতর কার্যের ভার।

কেমন করিয়া রামদুলাল একটা ডুবো জাহাজ কিনিয়া তাঁহার মনিবের উদারতার গুণে মহাধনী হইয়াছিলেন, সে গল্পটি তোমরা হয়ত অনেকেই জান। প্রভুর টাকায় ডুবো জাহাজ কিনিয়া চৌদ্দ হাজার টাকার পরিবর্তে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকায় একজন ইংরাজের কাছে তাহা বিক্রয় করিয়া আসিয়া প্রভুকে সব কথা জানাইয়া টাকাগুলি দিয়াছিলেন। তখন মদনমোহন দত্ত সানন্দে বলিয়াছিলেন—রামদুলাল, তোমার সাধুতার পুরস্কার এই এক লক্ষ টাকা। এ-টাকা আমি চাই না, এ টাকা তোমার! তুমি এই টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হও, আমার আশীর্বাদ জেনো!

এই বলিয়া দত্ত মহাশয় রামদুলালের হাতে লক্ষ টাকার থলিটি তুলিয়া দিয়াছিলেন।



২৯ দুলাল দাদা

॥এক॥

সেকালে উনবিংশ শতাব্দীতে শান্তিপুরে ছিল দস্যু-ডাকাতের বাস। পাড়ায় পাড়ায় বাস করিত দস্যু-ডাকাতেরা। শান্তিপুরের দক্ষিণে গঙ্গানদীর বুকে সবচেয়ে বেশি ডাকাতি হইত।

পূজার সময় নানা দেশের যাত্রীরা নানা দিকে নিজ নিজ বাসস্থানে যাইতেছেন—সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, পূজার কাপড় টাকাকড়ি, লোকজন। সেকালের নৌকাযাত্রা ছিল বড় আনন্দের, জোয়ারের টানে নৌকা চলিত তর্-তর্ বেগে। মাঝিরা স্রোত ফিরিলে কোন হাটে বা বন্দরে নৌকা ভিড়াইত—বাজার করিত। যাত্রীরা তীরে রান্নাবান্না করিত। আবার নৌকা চলিত নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে।

নৌকা-যাত্রীরা ভয়ে ভয়ে পথ চলিত, বিশেষতঃ ডুমুরদহ, গুপ্তি-পাড়া প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়া যাতায়াতের সময়ে নিরীহ নৌকা যাত্রীদের বিপদে পড়িতে হইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শান্তিপুর ছিল অতি ভয়ানক স্থান। কেহ শান্তিপুরের কাছ দিয়া নৌকা লইয়া যাইতে সাহস করিত না—বিশেষতঃ রাত্রিতে। শান্তিপুরের ডাকাতেরা দিন-দুপুরেও ডাকাতি করিত। তখনকার দিনে না ছিল পাহারা, না ছিল চোর-দস্যুদের ধরিবার কঠোর ব্যবস্থা।

শান্তিপুরের ডাকাতদের মধ্যে কুখ্যাত ডাকাত ছিল দেবী ঘোষ, নবীন ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, ডাকাত কালমেঘা, শিবেশনি। এই

ডাকাতেরা সকলেই ছিল শান্তিপুরের অধিবাসী। বাইরের দুই-চারিজন ডাকাতও ইহাদের দলে মিলিয়া মাঝে মাঝে ডাকাতি করিত। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল দুলাল সর্দার। ডাকাতদের অনেকেই ছিল গোয়ালা ও জেলে।

ওই সব দলে আবার অনেক বাবুডাকাতও ছিলেন। রাত্রিতে তাঁহারাও দস্যুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ডাকাতি করিতে যাইতেন। সেকালে বড়লোক অনেকেই ছিলেন ডাকাত।

আশানন্দ ঢেঁকি ছিলেন শান্তিপুরের গৌরব—অসাধারণ শক্তিশালী বলিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার ভয়ে এসব ডাকাত শান্তিপুর গ্রামে বড় একটা ডাকাতি করিত না। আশেপাশে এমন কোন গ্রাম ছিল না, নদী খাল-বিল ছিল না, যেখানে শান্তিপুরের ডাকাতরা ডাকাতি না করিত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা কিছুতেই ডাকাতদের দমন করিতে পারিতেছিল না। শান্তিপুরের জমিদারেরাও ডাকাত ধরিবার অছিলায় অনেক সময় নিজেরাও ডাকাতি করিতেন। সেকালে অকথ্য অত্যাচার হইত নিরীহ প্রজাদের উপর—যাহারা নীলকুঠির সাহেবদের নিকট হইতে দাদন লইতে চাহিত না, নীল বুনিতে চাহিত না। নীল চাষ করিতে বলিলে তাহারা করিত বিদ্রোহ।

শোন দুই-একটি গল্প। কিরূপ নির্ভীক ও সাহসী ছিল এই ডাকাতদল।

সেকালে শান্তিপুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সূতার গুদাম ছিল। সেই গুদামে সব মাল জমা হইত। কোম্পানীর গোমস্তারা গুদামের কাজকর্ম দেখিতেন এবং সেখানে তূলা, সূতা ইত্যাদি সব মাল জমা করিয়া রাখিতেন। লোকজনও পাহারা থাকিত। শহরের উপর গুদাম।

একদিনের ঘটনা। শান্তিপুরের আড়তে যথারীতি পাহারাওয়ালারা পাহারা দিতেছে। রাত্রি এক প্রহরও হয় নাই, এমন সময় শোনা গেল হা-রে-রে রে শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার পায়ের ঘটাঘট্ খট খট্ শব্দ! কালো-মুখোশপরা ভীষণাকৃতি প্রায় পঞ্চাশ জন ডাকাত—কাহারও হাতে তলোয়ার, কাহারও হাতে লাঠি, বর্শা ও বন্দুক—আড়তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুদাম ভাঙ্গিয়া তচ্‌নচ্ করিল! মশালের তীব্র আলোকে চারিদিক দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গ্রামের লোকেরা কেহ বাধা দিতে সাহসী হইল না। ডাকাতেরা আড়তের সকলের হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিল। তারপর জোর করিয়া আড়তের গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্যকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভট্টাচার্য মহাশয় কোম্পানীকে সূতার মাল যোগান দিতেন।

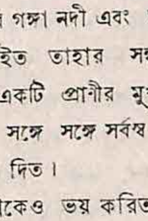
এই ডাকাতির ফলে কোম্পানীর কাজ একেবারে অচল হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল যে, এই আড়ত লুঠ করিতে প্রায় দুই-তিন শত বরকন্দাজ, ঘোড়সওয়ার আসিয়াছিল! কাজেই গ্রামের লোকেরা প্রাণের ভয়ে কেহই বাধা দিতে আসে নাই। এ যে সাধারণ ডাকাতি নয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

কোম্পানীর গুদাম লুঠ করা ত আর সহজ কথা নয়! অনেকেই মনে করিলেন নীলকুঠির সাহেবের সঙ্গে নীলের চাষ লইয়া—দাদন লইয়া এবং চাষীদের ওপর অত্যাচারের দরুন কোম্পানীর শাসকদের শাসন-ব্যবস্থা নীলকর সাহেবের পক্ষে ক্ষতিজনক হইয়াছিল, তাই কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোম্পানীর গুদামে এইরূপ ডাকাতি হইল। বোর্ডের নিকটও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল।

১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ডাকাতি দমনের জন্য একটি নূতন বিভাগ খুলিলেন। নাম হইল ডাকাতি দমন বিভাগ (Suppression of Dacoity in Bengal)। এই দস্যু দমন সংক্রান্ত বিভাগের কমিশনার শান্তিপুরের গঙ্গার তীরে তীরে, শহরে ও অন্যান্য স্থানের ডাকাতি দমনের জন্য একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম চন্দ্রশেখর রায়। ইনি অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবু শান্তিপুরের অনেক দস্যুকে গ্রেপ্তার করেন। গঙ্গা নদীতে যাহাতে ডাকাতি না হয়, সেজন্য প্রহরী নৌকার ব্যবস্থা হইল। তাহারা নদীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দিত। স্থলভাগে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রহরী থাকিত। এইরূপ প্রহরায় কতকটা উপকার হইয়াছিল।

অনেক কথা বলিলাম। এইবার দুলাল সর্দারের কথা বলি। দুলাল সর্দার ছিল রংপুরের বিখ্যাত ডাকাত। জাতিতে জেলে ছিল বলিয়া জলদস্যুগিরিতে সে ছিল ওস্তাদ। তাহার দলে ছিল তাহার অনেক জ্ঞাতভাই। ইহারা বাঙলার নানা জায়গায় দ্রুত নৌকা বাহিয়া আসিয়া উত্তরবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের গঙ্গা নদী এবং অন্যান্য নদীতে সর্বত্র যেসব যাত্রীবাহী নৌকা যাইত তাহার সন্ধান লইত, তারপর অতর্কিতে আক্রমণ করিত—একটি প্রাণীর মুখ দিয়াও কোন কথা বাহির হইতে পারিত না। সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্ব লুঠিয়া আরোহীদের মারিয়া কাটিয়া জলে ভাসাইয়া দিত।

এই দুলাল সর্দার কাহাকেও ভয় করিত না। সে ছিল দক্ষ লাঠিয়াল—হাড়ে মাংসে গড়া প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। রণ-পা করিয়া দূর গ্রামে দলবল লইয়া ডাকাতি করিয়া সে রাত্রিতেই আবার আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রা যাইত। সকালবেলা সকলে দেখিত সহজ সরল ভাল মানুষ দুলাল তাহার বাবরি চুল দুলাইয়া বৈঠা হাতে সঙ্গীদের সহ চলিয়াছে নদীতে ও খালে বিলে মাছ ধরিতে। কিন্তু এই দুলাল সর্দারের রাত্রির রূপ তোমরা কল্পনাও করিতে পারিবে না। সারা মুখে কালি মাখিয়া, কপালে সিন্দুর লেপিয়া, গায়ে তেলকালি মাখিয়া, বনজঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজা দিয়া বাহির হইত সে ডাকাতি করিতে—ভূত-প্রেতের মত বিকট নৃত্যভঙ্গীতে। সে সকলের আগে লাঠি ও তলোয়ার হাতে চলিত দল লইয়া, মুখে জয় মা কালী—জয় মা কালী রবে!



॥ দুই॥

'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়', একথা ত আমরা সকলেই বলি; কিন্তু এই শান্তিপুরেই ছিল ডাকাতদের প্রধান আড্ডা, তাহা আগেই বলিয়াছি।

অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধরেরা শান্তিপুরে বাস করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিরা বলিয়াছেন :

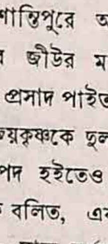
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞী সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥

শান্তিপুরের বৈষ্ণব গোস্বামিগণ ইঁহারই বংশধর। পূর্বে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল শ্রীহট্টের অন্তর্গত নবগ্রাম নামক গণ্ডগ্রামে। এই বংশের নৃসিংহ মিশ্রই প্রথম শান্তিপুরে বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাঁহারই বংশে অদ্বৈতাচার্যের জন্ম। এই বংশের গোস্বামীরা শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। অদ্বৈত বংশের দশম পুরুষ হইতেছেন বিখ্যাত ধর্মাচার্য মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

যে দুলাল সর্দারের কথা বলিতেছি—সেই দুলাল সর্দার ছিল গোস্বামীদেরই প্রজা। বাড়ি ছিল রংপুর জেলায়। বিজয়ের পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামী ছিলেন সাধু ও সজ্জন—অতি সরল স্বভাবের লোক। পরের সেবা-যত্ন করিয়াই তাঁহার আনন্দ হইত। এই আনন্দকিশোর গোস্বামীর তৃতীয়া পত্নী দেবী স্বর্ণময়ীর গর্ভে ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়। বিজয়কৃষ্ণের জননী পরম দয়াবতী ছিলেন। ইঁহার নিকট ছোট-বড় বিচার ছিল না। যে আসিত তাহাকেই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। সেই দস্যু দুলাল যখন কোন কাজে শান্তিপুরে আসিত, তখন প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরের নিকট মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত, প্রসাদ পাইত। অদ্ভুত চরিত্র ছিল এই দুলালের।

বালক বিজয়কৃষ্ণকে দুলাল বড়ই ভালবাসিত, আদর করিত। কয়েকবার বিপদ হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। কেহ যদি দেবী স্বর্ণময়ীকে বলিত, একটা শিশুকে ডাকাতের কোলে কেন তুলে দিচ্ছেন?—মাতা স্বর্ণময়ী হাসিয়া বলিতেন—দুলালও ত মানুষ।

ডাকাত দুলালের গতিবিধি ছিল সর্বত্র। নানা দেশে সে ডাকাতি করিয়া ফিরিত। কখনও সে শান্তিপুরে গঙ্গার বুকে ডাকাতি করিত আবার কখনও করিত উত্তর বঙ্গে। এমনি ছিল দুলাল সর্দারের গতিবিধি। বাল্যকালে রংপুরের বাসায় আসিলে, দুলাল বিজয়কে সর্বদা কোলে রাখিত। বালক বিজয়ও তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন, যদিও দুলাল ছিল দস্যু-দলপতি। সারা বাঙলাদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে তাহার নাম না জানিত এমন লোক ছিল না। এইবার বলিতেছি এহেন দুলাল দাদার কীর্তি-কাহিনী!



॥ তিন ॥

বিজয়কৃষ্ণ অল্পবয়সে পিতাকে হারাইয়াছিলেন। সেজন্য সংসারে দেখা দিয়াছিল অভাব-অভিযোগ। আনন্দ কিশোর গোস্বামীর মৃত্যুর পর মাতা স্বর্ণময়ী নিজেই শিষ্যবাড়ী যাইতেন।

একবার স্বর্ণময়ী দেবীর দুই পুত্র ব্রজগোপাল ও বিজয় এবং অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন লইয়া নৌকাতে করিয়া রংপুর জেলার শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন। সেই সময়ে চারিদিকে দস্যুভীতি—সর্বত্র লুঠ, ডাকাতি, রাহাজানি।

রাত্রিকালে নৌকা চলাচল নিরাপদ ছিল না। নদীর মধ্যে একটা চরের কাছে ছিল ঝাউবন, সেই বনের আড়ালে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যাত্রীদল। চারদিক নীরব ও নিস্তব্ধ। ঝাউবনে মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকিতেছিল হুক্কা-হুয়া রবে।

এমন সময় ঝাউবনের পাশ দিয়া নদীর ধারে আসিয়া একখানি ছিপ নৌকা ভিড়িল। চুপি চুপি আসিয়া দস্যুরা একজনের পর একজন হাতিয়ার হাতে নৌকার উপর উঠিল। সেই সময়ে ডাকাতেরা চিৎকার করিয়া উঠিল—জয় মা কালী! হা-রে-রে-রে-রে! ধ্বনিত হইয়া উঠিল দিকে দিকে সেই ভীষণ রব।

নৌকারোহীরা সকলে প্রমাদ গণিলেন; ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন! বুঝিলেন আর বাঁচিবার উপায় নাই।

এমন সময় বাহির হইতে ডাকাতদের সর্দার হুকুম করিল—নৌকা লুঠ কর। সব মেরে ভাসিয়ে দে নদীর জলে!

কী ভীষণ মূর্তি সর্দারের! দীর্ঘাকৃতি—ছয় ফুট লম্বা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল—লাল কাপড় দিয়া মাথা বাঁধা। মুখে কালি মাখা। হাতে লম্বা লাঠি। সারা শরীরে তেলকালি। ভীষণ কর্কশ স্বরে আবার হুকুম হইল সর্দারের—নৌকা লুঠ কর। লোকদের মেরে ভাসিয়ে দে নদীর জলে।

সর্দারের হুকুম শুনিয়া বিজয়ের মনে হইল, এ যে পরিচিত স্বর! বালক বিজয় চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন —কে-ও? ও কে —দুলাল দাদা তুমি?

দস্যুরা চমকিয়া উঠিল। দস্যুসর্দার নৌকার ভিতর হইতে বালক-কণ্ঠে তাহার নাম শুনিয়া বিস্মিত হইল। এ ডাকাত-সর্দার আর কেহ নহে, স্বয়ং বিজয়ের দুলাল দাদা।

দুলাল অমনি নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল—ছইয়ের মধ্যে অন্ধকারে কাহারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছেন। দুলাল বিস্মিতভাবে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—কে গো? ও কে? আমার দাদা গোঁসাই! এত রাত্রে এই নদীর ভিতর চরের কাছে কেন নৌকা লাগিয়েছেন? কে কে সঙ্গে আছেন?

বিজয় বলিলেন—মা আছেন দুলালদা! দাদা আছেন, আরও অনেকে আছেন।

—উঃ তাই নাকি! আর একটু হলেই ত সর্বনাশ হত! বড় বাঁচা বাঁচলে গোঁসাই দাদা! দাদা গোঁসাই, শ্যামসুন্দরই তোমাদের বাঁচিয়ে দিলেন।

সেই মুহূর্তে লজ্জায় ও অনুতপ্ত-চিত্তে দুলাল নীরবে দলবল সহ চলিয়া গেল। যাইবার সময় দলের একটি লোককে নৌকায় রাখিয়া, দেবী স্বর্ণময়ীকে সে বলিয়া গেল—মা ঠাকরুন, কোন ভয় নেই। সঙ্গে লোক দিলাম—নিরাপদে পৌঁছে যাবেন শিষ্যবাড়ী।...ভয় করো না দাদা গোঁসাই।

এই বলিয়া সে নৌকার বাহির হইতে মাতা স্বর্ণময়ী ও বিজয়কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

৩০ ডাকাত ও কুকুর



॥এক॥

১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের কথা। টালিগঞ্জের নালা বা খালের অনেকটা দূরে একটি শ্মশান। শ্মশানে আছে মন্দির—মন্দিরে আছেন ভীষণ-মূর্তি শ্মশানকালী। চারিদিকে গভীর বনভূমি। আশে পাশে লোকালয় নাই। দূরে দেখা যায় বটগাছের ছায়ায় বাঁশবনের আড়ালে দুই একটি পল্লী। মন্দিরটি অতি প্রাচীন। এই মন্দিরের ইতিহাস কেহ জানে না। শ্মশানকালীর মন্দিরের পিছনে পড়িয়া আছে বহু মড়ার মাথার খুলি আর হাড়গোড়। এখানে মাঝে মাঝে হয় নরবলি।

একদল ডাকাত মহীশূরের এক সুলতান-নন্দিনীর প্রাসাদে ডাকাতি করিবে স্থির করিয়াছে। এখানেও মহীশূরের সুলতানের একটা প্রাসাদ আছে, তাহা হয়ত তোমরা জান। ডাকাতি করিবার পূর্বে ডাকাতেরা করে কালীপূজা। কালীপূজা না করিয়া তাহারা কোথাও ডাকাতি করিতে যায় না। সেইজন্য এক অমাবস্যা রাত্রিতে পঞ্চাশ জন ভীষণাকৃতি ডাকাত শ্মশানকালীর মন্দিরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। শ্মশানকালীর পূজা দিয়া তবে তাহারা যাইবে ডাকাতি করিতে। কি ভীষণমূর্তি শ্মশানকালী রক্তচক্ষু, মুক্তকেশী, স্মিতবক্ত্রা, নানালংকারভূষিতা। ডাকাতদের পুরোহিত ছিল এক ব্রাহ্মণ ডাকাত। তাহার নাম রমাই ঠাকুর—ওরফে রমাই ডাকাত। রমাই মন্ত্র পড়িল—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লী কালিকে ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ।

সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতেরা জয় মা কালী বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। কলসী কলসী মদ পান করিল। সকলে আনন্দে উৎফুল্ল।

ডাকাতদের একটা নিয়ম আছে, কোথাও ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্বে একটা শপথ করিতে হয়। এইবার সর্দার ডাকাত রাধা শিকারী বলিল—ভাই সব, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আজ আমরা কাজ (কাজ অর্থে ডাকাতি) করতে যাব; তোমরা রাজী?

সমস্বরে সেই পঞ্চাশ জন ডাকাতের মুখ দিয়া বাহির হইল—রাজী!

—ভাই সব, হাতিয়ার হাতে নিয়ে বলো—কাকেও ভয় করব না। ধরা পড়লে নিজে মরব, কিন্তু দলের লোকের কারু নাম করব না—বল কথা রাখবে?

সকলে সমস্বরে বলিল—রাখব।

—মায়ের কাছে বল—মা কালী, আশীর্বাদ কর আমরা যেন কাজে সমর্থ হই। সফল হলে তোমায় মা নরবলি দিয়ে পূজা করব।

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আমরা সবাই একমন—একপ্রাণ। তারপর তাহারা চারিদলে বিভক্ত হইল। তাহাদের একদল ভার লইল, যদি গ্রামবাসীরা তাহাদের তাড়া করে, তবে তাহারা সবাইকে তাড়াইয়া দিবে। একদল নিল প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়িতে ঢুকিবার ভার। কেহ ভার নিল সদর দরজা খুলিবার।

এইভাবে সব ব্যবস্থা করিয়া তাহারা প্রস্তুত হইল ডাকাতি করিতে।



॥দুই॥

আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। চাঁদ-তারার দর্শন মিলে না। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দুই-একটি তারা উঁকি মারে।

বাদল সারং ও নেপাল ডোমের দলের কয়েকজন লোক—লম্বা লম্বা বাঁশ ফেলিয়া মহীশূর-প্রাসাদের প্রাচীরের উপর উঠিয়া—আবার তেমনি কৌশলে বাঁশগুলি নীচে নামাইয়া দিয়া—মাটিতে নামিল। কিন্তু তাহাতে ভয়ানক বিপদ ঘটিল। সুলতান-নন্দিনীর স্বামী শাহজাদার ছিল অনেক বড় বড় বিলাতী শিকারী কুকুর। সেগুলি টের পাইয়াছিল ডাকাতদের প্রবেশ; অমনি ঘেউ-ঘেউ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ডাকাতদিগকে তাড়া করিল। বিপদ গণিল ডাকাতদল। দেওয়াল টপকাইতে গিয়া বাঁশ ধরিয়া যেমন তাহারা উঠিতে যাইবে অমনি কুকুরগুলি কাহারও পা কাহারও হাত কামড়াইয়া নিচে নামাইয়া ফেলিল। মাত্র তিনজন ডাকাত দেওয়াল টপকাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। ডাকাতদের ভীত ও শংকিত চিৎকারে বাড়ির সকলে জাগিয়া উঠিল। কুকুরেরা কোন কোন ডাকাতের বুকের উপর বসিয়া—তাহাদের একেবারে মারিয়া ফেলিল।

যে ডাকাতেরা সদর দরজা দিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল—তাহাদের হইল আরও দুরবস্থা। তখন কুকুরের দল রক্তের স্বাদ পাইয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। যেমন ডাকাতেরা সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া বাড়ির নীচের তলা হইতে সিঁড়ির পথে দ্বিতলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরগুলি আসিয়া এই দলের লোকদেরও আক্রমণ করিল। ডাকাতদের সাধ্য নাই যে উপরে ওঠে। ওদিকে শাহজাদা জাগিয়া উঠিয়াই দোনলা বন্দুক হাতে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া গুলি ছুঁড়িতেছিলেন। বন্দুকের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার—চাকর-বাকর, লোকজন সকলে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাইতেছে, পাহারাওয়ালা ডাকু আয়া হ্যায় বলিয়া চিৎকার করিতেছে। সামালো সব বলিয়া বন্দুক হাতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে থানার লোকেরাও। ডাকাতদের হইল অতি ভীষণ সংকটময় অবস্থা। পঞ্চাশ জনের মধ্যে দশ-বারোজন ডাকাত কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িল না। ঐ দলের মধ্যে ছিল নেপাল ডোম, গোপাল ডোম আর বাদল

সারা প্রভৃতি নাম করা ডাকাতেরা। তাহারা কোনরকমে পলাইয়া গিয়া পথে এক ধনী ভদ্রলোকের বাড়ি লুঠ করিতে পারিয়াছিল।

এদিকে মহীশূর প্রাসাদে যে সব ডাকাত ধরা পড়িল, তাহারা পুলিশের কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিল। কালীমায়ের কাছের প্রতিশ্রুতি ও শপথ কোথায় ভাসিয়া গেল। শাহজাদার ছোটখাটো কিছু জিনিস এই অল্প সময়ের মধ্যেই দুই একজন ডাকাত লুঠিয়া লইয়াছিল; মারপিটের চোটে পুলিশের কাছে তাহা তাহারা ফিরাইয়া দিল এবং অন্যান্য ডাকাতির মাল কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও বাহির করিয়া দিল।

ডাকাতেরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিয়াছিল—হুজুর, আমরা ধরা পড়তাম না। নবার বাড়িতে ডাকাতি করে নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারতাম। ধরা পড়লাম এই কুকুরগুলোর জন্য। ওরা আমাদের টেনে হেঁচড়ে কামড়ে কাবু করেছে!

কুকুরেরা যে প্রভুকে কত বড় ডাকাতদলের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এইটি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। শাহজাদার এইরূপ ভীষণ হিংস্র শিকারী কুকুর পঞ্চাশটি ছিল।•



৩১

ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা—চন্নার মাঠ

এক

বর্ধমান জেলার ওড়গাঁও গ্রাম। গুশকরা স্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এই ওড়গাঁও পল্লী। পল্লীর সম্মুখেই বিরাট ডাঙ্গা। উঁচু-নিচু বিশাল মাঠ, শুষ্ক কঠিন মাটি। সেই মাঠের যেন শেষ নাই! খুব দূরে দূরে পল্লী। সেই সব পল্লীতেও খুব বেশী লোক-জনের বাস নাই। যাহারা বাস করে, তাহারা দিন-দুপুরে কিংবা সন্ধ্যার পর মাঠে আসে না; কারণ দস্যু-ডাকাতেরা এই মাঠে যাহাকে পায় তাহাকেই আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করে, সব কাড়িয়া নিয়া হত্যা করে। সামান্য জিনিসের লোভেও তাহারা হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করে না। লোকেরা দল বাঁধিয়া পথ চলে সতর্কভাবে। ঐ রকম মাঠ বা ডাঙ্গার মাঝে মাঝে ছোট-বড় অনেক গভীর গর্ত। সেই সব গর্তের ভিতর ডাকাতেরা লুকাইয়া থাকে। কোন রাস্তা তালবনের সারি। তালবনের আড়ালে রহিয়াছে ছোট-বড় পুকুর, আর আছে খেজুরগাছ—কোথাও বা দুই চারিটি আমগাছ।

ওড়গাঁও-এর ডাঙ্গা—তাহা শুধু মাঠ নয়, যেন ঢেউ-খেলানো ধূসর মরুভূমি। মাঠের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না সবুজ-শ্রী। শুধু অতি দূরে—সেই বিশাল প্রান্তরের দূরপ্রান্তে যেখানে আকাশের সহিত হইয়াছে ডাঙ্গার মিলন—সেখানে দেখা যায় দুই-একখানি পল্লীর ধূসর ছায়া। জনশূন্য এই ভীষণ প্রান্তরে ডাকাতেরা যে কত লোককে খুন করিয়াছে কে জানে তাহার সংখ্যা! এই মাঠের পর চান্না গ্রাম। সেকালে প্রচলিত ছিল—যদি গেল চান্না, ঘরে উঠলো কান্না।

এই যে ডাঙ্গা, তাহার সংখ্যা তিনটি—বড় ডাঙ্গা, মাঝারি ডাঙ্গা ছোট ডাঙ্গা। এই অঞ্চলের লোকেরা ছিল ডাকাত। তাহাদের ও অন্যান্য দস্যুদের আক্রমণ ভয়ে লোকেরা থাকিত সন্ত্রস্ত, কখন কি বিপদ ঘটে!—

এক দিনকাব একটি ঘটনার কথা বলিতেছি, শোন সেই কাহিনী।



দুই

একদিন গভীর রাত্রে ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার পথে চান্নার মাঠ ধরিয়া চলিয়াছেন এক দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মধ্যবয়সী পথিক। পথিক ব্রাহ্মণ, শক্তি-উপাসক। ব্রাহ্মণ শিষ্যবাড়ি হইতে ফিরিতেছেন, বাস পল্লীতে। সঙ্গে সামান্য তৈজসপত্র, একটি গুড়ের কলসী আর বাম হাতে বাঁধা চাল, ডাল এবং কিছু তরিতরকারী। ব্রাহ্মণ একা নিজমনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। তাঁহার কাঁধে ঝুলিতেছিল ছাতা; ছাতার সঙ্গে ছিল লাঠি।

আকাশে তারা ফুটিয়াছে। গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। প্রফুল্ল মনে ব্রাহ্মণ চলিতেছিলেন আর গাহিতেছিলেন—

"তোমার গলে জবাফুলের মালা,—
কে দিয়েছে তোমার গলে!
যত সমর-পথে, নেচে যেতে যেতে
রয়ে রয়ে দোলে—"

এমন সময় হা-রে-রে-রে শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল মাঠ। ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিল একদল দস্যু। জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতেছিল তাহাদের বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি। প্রত্যেকের হাতে লাঠি ও ঠেঙ্গা—ঠেঙ্গাড়ে ডাকাতের দল।

দস্যু-সর্দার ও দলের লোকেরা ব্রাহ্মণকে ঘিরিয়া ফেলিয়া কহিল—কে রে তুই? বড় যে ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে চলছিস্ বাঝাধন। সঙ্গে কি আছে, দে। নইলে এখুনি শেষ করে ফেলব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—আমার সঙ্গে ত ভাই কিছুই নেই। দেখতেই পাচ্ছ কাঁধে নিয়েছি ছাতা-লাঠি, হাতে নিয়েছি গামছায় বেঁধে চালকলা আর আছে গুড়ের কলসী। নেবে ভাই—নাও।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ হাসিলেন হা—হা—হা! কি সরল সুন্দর হাসি।

• Shahazada had some very large English dogs, which would attack and kill any person who got over the wall alone.

ডাকাতেরা কহিল—একথা সবাই বলে। কোমরা থলিতে টাকা লুকিয়ে রেখেছিস্ হুম্, আমরা সব জানি রে।—তুই কে। কোন্ গাঁয়ে যাবি ?

—আমি গরীব ব্রাহ্মণ। যজমানী করি, শিষ্যবাড়ি যাই, সেখানে যা পাই তা দিয়ে কোন রকমে দিন চলে। আমায় মেরে কি করবি বল! বাড়ি আমার কোটলহাটি।

—বেশ।—তা, ও কথা আমরা ঢের ঢের শুনেছি। দে কি দিবি ? দে সব।

—তা' হলেই কি আমায় ছেড়ে দিবি ?

—সব দিলেও তোকে মারব, না দিলেও তোকে মেরে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে ডাঙ্গার গর্তের ভিতর ফেলে দেব। আর টু-টা করতে পারবি নে।

—বেশ, তাই হবে। এই নে সব।

ব্রাহ্মণ শিষ্যবাড়িতে যে সামান্য প্রাপ্য পাইয়াছিলেন, তার সবই একে একে তুলিয়া দিলেন দস্যুদের হাতে।

সব পাইয়া দস্যু-সর্দার বলিল—তা ত হ'ল। এবার তোকে মারব, তৈরী হ। বুঝলি ও ঠাকুর, তৈরী হ।

—সব পেয়েও খুশী হলি না ভাই! গরীব বামুনের প্রাণ না নিয়ে খুশী হবি না ? তবে তাই হবে একটা কথা—

কি বল্ না।—কর্কশ স্বরে বলিল দস্যু-সর্দার।

—আমি একবার মায়ের নাম করব। মায়ের নাম করা শেষ হলে মেরে ফেলিস্ আমাকে।

আচ্ছা, তাই হবে—কি বলিস্ রে ?

সকলে বলিল—তাতে আর দোষ কি ? আচ্ছা মায়ের নাম কর ; কিন্তু জানিস্ নাম করাও শেষ হবে, আমরাও তোকে শেষ করব—হা—হা—হা—

সকলে পাশে লাঠি সড়কি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে বসিলেন যোগাসনে। গান ধরিলেন—শ্যামা মায়ের নাম। মাতৃভক্ত—জীবন-মৃত্যু সব কথা ভুলিয়া গেলেন, সকল বিপদ-ভয় নিবারণী শ্যামা মাকে স্মরণ করিলেন, শরণাগতপালিনী ব্যতীত কে রক্ষা করিবে তাঁহাকে ? রামপ্রসাদী সুরে গান ধরিলেন—

আর কিছু নাই গো শ্যামা মা—
কেবল তোমার দুটি চরণ রাঙ্গা!
শুনি, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
দেখে হলাম সাহস-ভাঙ্গা ?
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,—
বিপদ-কালে কেউ কোথাও নাই,
ঘরবাড়ি ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা!

ডাকাত সর্দার ব্রাহ্মণের মধুরকণ্ঠে প্রাণের বেদনায় গীত এই ভক্তিভরা প্রাণের আকুতিপূর্ণ গান শুনিয়া কহিল—ওরে ঠাকুর, তুই যে বড় আচ্ছা গানেওয়ালা—গা—গা, আরেক খানা গান শুনি। তারপর যা করার করা যাবে।

দস্যুদল আরও কাছে আসিয়া ঘিরিয়া বসিল। তখন মাঠের চারিদিকে প্রান্তরে প্রান্তরে জ্যোছনার ঢেউ খেলিতেছিল।

আবার গান আরম্ভ করিলেন ব্রাহ্মণ—

তোমার ভালো চিন্তা সদা
করি গো! তোমার নিকটে।
দুঃখে যাক্ সুখে-যাক্ জেনেছি,
যে আছে লিখন ললাটে!
বারে বারে ভ্রমণ করি মা!
আমার এই কর্ম বটে।
কিন্তু দীন দেখে যদি দয়া কর,
তবে দীন-দয়াময়ী নামটি রটে!

দস্যু-সর্দার নীরব। তাহার দুর্দান্ত সঙ্গীরাও নীরব। ভক্তের মুখে এমন মধুর সংগীত শুনিয়া পাষাণ-হৃদয়ও গলিতে আরম্ভ করিল। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—ঠাকুর! ও ঠাকুর! তুই কি দেবতা নাকি রে ? শোনা—আর একটা গান শোনা ভাই!

অমনি ভক্ত ব্রাহ্মণ গান আরম্ভ করিলেন—

মন! চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলই ঘটে।
অল্প পুণ্য-ভরা সাজিয়ে পসরা,
এনেছে ভবের হাটে।
যা কর উপায় পাঁচে মিলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে!

গান শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দস্যু-সর্দার ও তাহার নরহত্যাকারী দস্যুদল মাতৃনামের অপূর্ব প্রেরণা-বলে যেন নূতন জীবন লাভ করিল। তাহাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠিল ভক্তির উৎস-ধারা! নরপশুদের হৃদয়ে জাগিল দেবতার আশিস্। তাহারা সকলে ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ঠাকুর আমাদের ক্ষমা কর। নে তোর এই ছাতা-লাঠি, নে তোর এই গামছা, পোটলাপুঁটলি! নে তোর গুড়ের কলসী!

তাহাদের চোখ বাহিয়া পড়িতে লাগিল ভক্তির অশ্রুধারা! যে নিষ্ঠুর দস্যুদল ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাই এখন তাঁহার চরণে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল—কত কাঁদিল। ব্রাহ্মণের চরণে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ জয় মা কালী—জয় মা কালী! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন শ্যামা মাকে। সঙ্গে সঙ্গে দস্যুদলও বলিতে লাগিল, জয় মা কালী—জয় মা কালী! তাহারা ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাসপল্লী কোটলহাটি গ্রামে পৌছাইয়া দিল এবং সকলে পরদিন প্রভাতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সেইদিন হইতে ঐ দস্যুরা ছাড়িয়া দিল দস্যুবৃত্তি—হইল ভক্ত সাধক! চাষবাস করিয়া তাহারা জীবনযাপন করিতে লাগিল। তাহাদের বংশধরেরা এখন জীবিত আছে।

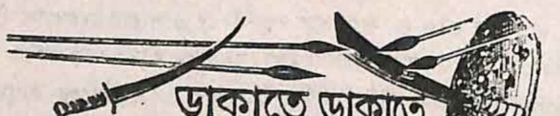
ভক্তের জয় হইল। দস্যু হইল ভক্ত। মহাপুরুষদের ভক্তি-প্রভাবে এমনি করিয়াই অসাধু হয় সাধু। পাপী হয় পুণ্যবান্।

এই ব্রাহ্মণ কে জান? ইনি হইতেছেন বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ভক্ত, শক্তি-সাধক মহাপুরুষ; নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁহার গান অপূর্ব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান গাহিতে বড় ভালবাসিতেন। কমলাকান্তের একটি গান রামকৃষ্ণদেবের বড় প্রিয় ছিল; প্রায়ই সে গানটি গাহিতেন। সে গানের শেষ চরণ হইতেছে—

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি ছাখ আমি দেখি,
আর যেন ভাই কেউ না দেখে!……

সাধক কবি কমলাকান্ত আনুমানিক ১৮০৮ খৃস্টাব্দে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান হইতে বর্ধমানে আসিয়া বাস করেন। ইনি শক্তি-সাধক, বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজেশচন্দ্র ইঁহার সদ্গুণে বিমোহিত হইয়া ইঁহাকে সভাপণ্ডিত ও গুরুপদে বরণ করেন। বর্ধমান জেলার কোটলহাটি গ্রামে রাজা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ ১২৭৭ সালের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমলাকান্তের রচিত বহু সংগীত কালনার সর্বত্র এক সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখনও তাহা লুপ্ত হয় নাই। ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার বিশাল প্রান্তরে যেখানে দস্যুদল কমলাকান্তকে আক্রমণ করিয়াছিল, এখনও গ্রামবাসীরা সেই স্থান দেখাইয়া পরম গৌরব বোধ করে।



৩২ ডাকাতে ডাকাতে লড়াই

এক

সে প্রায় একশত বৎসর আগের কথা। হুগলী জেলার বিখ্যাত পাণ্ডুয়া গ্রামে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ জমিদার। গ্রামে অনেক লোকের বাস। বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ। তাহা ছাড়া বাগ্দী, অন্যান্য কৃষিজীবী হিন্দু এবং মুসলমানও ছিল। সেই সময়ে প্রত্যেক ভদ্র ও সংগতিশালী ব্যক্তিকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। তখন ইংরাজ-শাসন বদ্ধমূল হইলেও চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুবই বেশী। পাণ্ডুয়াতে একটি থানা ছিল, তবু স্থানীয় লোকদের নিরাপদ ভাবে বসবাস করিবার উপায় ছিল না। প্রায়ই ডাকাতি হইত ভীষণভাবে।

সেকালের চন্দননগর, হুগলী ও বর্ধমানের ডাকাতের দল অদ্ভুত কৌশলের সহিত ডাকাতি করিত। পুলিশ কিছুই করিতে পারিত না।* ডাকাতেরা নির্বিঘ্নে লুঠ করিয়া চলিয়া যাইত। সেকালে ডাকাতেরা এমন দুর্ধর্ষ ছিল যে, তাহারা যে বাড়িতে ডাকাতি করিতে যাইবে, সেই বাড়িতে পূর্বেই পত্র দিয়া জানাইয়া দিত কিংবা কোন লোক দিয়া কৌশলে সংবাদ দিত। এমনও দেখা গিয়াছে যে, অতিথির বেশে কিংবা সন্ন্যাসী বা ফকিরের বেশে আসিয়া ডাকাতেরা গৃহস্থের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। ঐ সময়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতেন। থানায় দারোগা ও পুলিস থাকিত বটে, কিন্তু তাহারা দুর্দান্ত দস্যুদের সঙ্গে কোনরূপেই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

পাণ্ডুয়া গ্রামের জমিদারের নাম ছিল পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং সম্পত্তিশালী লোক। জমিদার মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বেঁটে মানুষ, হাড়ে-মাসে গড়া মজবুত শরীর। প্রজাদের প্রিয় জমিদার। প্রজাদের তিনি সত্য সত্যই সন্তানের মত ভালবাসিতেন। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত রোগ প্রায়ই গ্রামে সংক্রামক আকারে দেখা দিত। সে-সময়ে তিনি তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন; অন্নহীনে অন্নদান, দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলাজাত শস্য হইতে ধান চাউল ইত্যাদি দান করিতেন। সরকারের কাছেও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিনি দরবারে বসিতেন।

পূজার কিছুদিন পরের কথা। পতিতপাবন বাবু কাছারিতে বসিয়া আছেন। বিস্তৃত ফরাস বিছানো, তাহার উপর ছোট একখানা গদি—ধব ধবে পরিষ্কার, পাশে তিন-চারটি তাকিয়া। পতিতপাবন বাবু আলবোলা টানিতেছেন এবং নায়েব, জমানবিস, সুমারনবিস ও মুহুরীদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন—চাষবাসের কথা, ফসলের কথা, সামাজিক, বৈষয়িক ও স্বাস্থ্যের কথা। এমন সময় একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়া মুহূর্ত মধ্যে চলিয়া গেল। লোকটার দিকে নজর রাখিবার সুযোগ কেহ পাইল না।

পতিতপাবন বাবু চিঠিখানি পড়িয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পাশে বসিয়াছিলেন তাঁহার একান্ত বিশ্বাসী নায়েব হরলাল ঘোষ। পাশের গ্রামেই তাঁহার বাড়ি। প্রকৃতপক্ষে হরলাল ঘোষই পতিতপাবন বাবুর জমিদারীর শাসন-সংরক্ষণ, দেখাশুনা সবই করেন। ওদিকে সেকালের কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি—রোগীদের ঔষধ-পথ্য দিয়া প্রায়ই সাহায্য করিতেন। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মানুষ। চোখে মুখে তাঁহার প্রতিভার দ্যুতি।

পতিতপাবন বাবু পত্রখানি পড়িয়া হরলাল বাবুর হাতে দিলেন। হরলাল বাবু দুই-তিনবার পত্রখানি পড়িয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তারপর পতিতপাবন বাবুকে বলিলেন—আপনি আজকের মত কাছারি ভেঙে চলুন আমার সাথে—একটু গোপন কথা আছে।

তাঁহারা দুই জনে বাড়ি হইতে অনেকটা দূরে একটি ছোট পুকুরের কাছে আসিলে হরলাল বাবু ডাকিলেন—নবীনদা, বাড়ি আছ?

উত্তর আসিল—আছি, কে তুমি?

: আমি হরলাল, সঙ্গে আছেন কর্তাবাবু।

* সরকারী রিপোর্টে আছে—The Hooghly and Burdwan Police unable to effect them……As in the Pandooah Thana, they are unsuccessful.

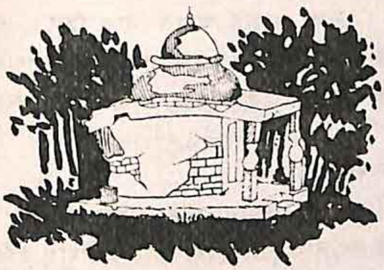
ঃ আরে কি বরাত—কি বরাত !···বলিয়া একজন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক লোক বাহিরে আসিল। লোকটার কি ভীষণ চেহারা—দেখিলেই ভয় হয়। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায়, হাত-পায়ের পেশী স্ফীত, মনে হয় যেন লোহার তৈয়ারী, চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত। বাহির হইয়া আসিয়া দুই জনকে প্রণাম করিয়া নবীন বলিল—কর্তা-মশায়ের পায়ের ধূলো পড়ে আমার এ-মাটি সোনার মাটি হয়ে গেল।

পতিতপাবন বাবু বলিলেন—নবীন, আমার বড় বিপদ।

নবীন কহিল—তোমার আবার বিপদ কি কর্তা!

হরলাল বাবু বলিলেন—তুমি এক্ষুনি এস আমাদের সাথে।

নবীন পলক মধ্যে লাঠি হাতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়া আসিল।



দুই

নবীন বলিল 'এই কথা! কোন ভয় নেই। নবীন বাগ্দীর হাতে লাঠি থাকতে কারো সাধ্য নেই যে এ বাড়ি লুঠ করে। আপনি কাকেও কোন কথা না বলে, মা-ঠাকরুণদের ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে হরে ভাইয়ের বাড়ি চলে যান। সাবধান, কাকেও কিছু বলবেন না।' একটু ভাবিয়া কহিল—'না হয় আমিই আপনাদের পৌঁছে দেব।'

এই বলিয়া সে বাড়ির চারিদিক মায় অন্দর-মহল্ পর্যন্ত সব ঘুরিয়া আসিয়া কহিল—আমি সব লোকজন ঠিক করে ফেলি।

পতিতপাবন বাবু কহিলেন—নবীন ভাই, আমি বাড়ি ছেড়ে যাব না। যদি এমন কিছু হয় তবে আমার বন্দুক আছে, গুলি চালাব।

নবীন বলিল—কর্তামশাই, কিছু করতে হবে না। আপনি মাঝের ঘরে মা-ঠাকরুণদের নিয়ে থাকুন। আমি নিজে আপনার দোরের কাছে পাহারা দেব।

নবীন যাইবার সময় কহিল—বাবু! কাছারির পাইক, বরকন্দাজ যারা আছে তাদের সকলকেও লাঠি-বল্লম, দা-কুড়ুল, টাঙি-তলোয়ার যা কিছু আছে সব নিয়ে তৈরী থাকতে বলবেন।

হরলাল বাবু সব ব্যবস্থা করিতে বাহির হইলেন। পতিতপাবন বাবুকে বলিয়া গেলেন—আপনি নিশ্চিন্ত মনে আহার ও বিশ্রাম করুন। কিছু ভাববেন না।

নবীন বাগ্দী ছিল একজন কুখ্যাত ডাকাত! সে ছিল দলের সর্দার। তখনও সে-ই সর্দার। পতিতপাবন বাবু তাহাকে জমি-জিরাত ঘর বাড়ি করিয়া দিয়াছেন। এখন সে চাষবাস করে ক্ষেত-খামার দেখে। তবে সে যে একেবারে ডাকাতি ছাড়িয়াছে একথা কেহ বিশ্বাস করে না। এক সময়ে সে ছিল সর্দার ডাকাত। পতিতপাবন বাবুর প্রতি ছিল তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাহার দাপটে পাণ্ডুয়ার কোন বাড়িতেই বড় একটা চুরি-ডাকাতি হইত না। এই কারণে ডাকাত জানিয়াও গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলে তাহাকে ভাল-বাসিত। এদিকে তাহার ব্যবহার ছিল অতি মধুর। প্রতিদিন তাহার বাড়িতে পুরোনো বন্ধু-ডাকাতদের সঙ্গে তাহার আড্ডা বসিত—সে এই আড্ডার মায়া তখনও ছাড়িতে পারে নাই!

সে দিন আবার একটা হাতিয়ার ধরার সুযোগ পাইয়া নবীন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং একে একে কেফাতুল্লা, রাজু বৈরাগী, গোপাল ডোম প্রভৃতিকে সংবাদ দিয়া আনিয়া বলিল—ভাই, আমার বাবুর বাড়ি ডাকাতি হবে বলে চিঠি এসেছে। বাবুকে বাঁচাতেই হবে। তোমরা দলে বলে আমার এখানে এস। জং পড়া তলোয়ারটা আবার রক্ত খেয়ে তাজা হয়ে উঠুক।

তাহার বন্ধু ডাকাতরা রাজী হইয়া সমবেত কণ্ঠে কহিল—'হাঁ, আমরা সকলে আসব তোমার বাড়ি। তারপর হুকুম মত কাজ করব।'

নবীন নিশ্চিন্ত হইল—রাত্রির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।



তিন

রাত্রি হইয়াছে। পল্লী নিস্তব্ধ। বাড়ির কাহারও কোন সাড়া শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রামগ্ন। জমিদার-বাড়ির পশ্চিম দিকের দেওয়ালের পাশে ছিল একটা বিশাল বটগাছ। উহার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তার পরেই বাগান। বাগানে নানা জাতের গাছ ডালে ডালে পাতায় পাতায় মিলিয়া গিয়াছে। গাছের নিচে অন্ধকার। রাত্রে ত দূরের কথা, দিনের বেলাও সেখানে ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না। বাগানের পাশ দিয়া একটি শীর্ণকায় খাল বহিয়া চলিয়াছে ঝির্ ঝির্ করিয়া। তাহার পাড়েই শ্মশান।

ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। আকাশে ফাঁকা-ফাঁকা মেঘ! ডাকাতেরা এইবার মশাল জ্বালিয়া তাহাদের দলের সর্দার গৌর লিঙ্গারির হুকুমে জয় মা কালী আর হা-রে-রে-রে শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া বটগাছের শাখা ধরিয়া বাড়ির ছাদের উপর উঠিতে শুরু করিল। তাহারা ঘন ঘন চিৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের বীভৎস চিৎকার গ্রামের চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এদিকে নবীন ও তাহার দলের লোকেরা বাড়ির চারিদিকে সারি বাঁধিয়া ডাকাতদের কীর্তি-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। যেমন একজন ডাকাত আসিয়া ছাদে লাফাইয়া পড়িতেছিল অমনি নবীন ও তাহার দলের লোকেরা পাল্টা জবাব দিতেছিল হা-রে-রে-রে করিয়া।

দুই পক্ষেরই মশাল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ওদিকে কয়েক জন ডাকাত খিড়কির দরজা ভাঙ্গিয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া হৈ-হল্লা করিতেছিল, আর কয়েক জন বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইবার নবীন বাঁশী বাজাইল।

সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল ভীষণ লড়াই—হাতাহাতি, লাঠালাঠি। সড়কি ও বল্লমের আঘাতে দুই পক্ষের লোকই আহত হইতে লাগিল। নবীনের দলে কম লোক হইলেও তাহাদের উন্নত অস্ত্র-পরিচালনার

কৌশলে ছাদের পথ দিয়া যে-সব ডাকাত আসিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই লাঠির ঘায়ে হাঁটুভাঙ্গা 'দ' হইয়া পড়িয়াছিল।

বাহিরে কেফাতুল্লা, রাজু বৈরাগী এবং গোপাল ডোমের ভীষণ আক্রমণে ডাকাতদের অনেকেই আহত অবস্থায় কাছারির বাহিরে বিরাট মাঠের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিল।

ডাকাতেরা দুই ঘণ্টার মধ্যেই হার মানিয়া পলাইতে শুরু করিল। এমনকি তাহারা মৃত ও আহত সঙ্গীদিগকে সরাইয়া লইবার সুযোগও পাইল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ি শান্ত হইয়া গেল। জমিদার বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

পরদিন সকালবেলা গ্রামের লোকের মুখে মুখে ডাকাতির কথা এবং নবীনের প্রশংসা হাটে-ঘাটে প্রচারিত হইয়া পড়িল। থানার দারোগা ও পুলিশ দল আসিল—মৃত ও আহত ব্যক্তিদের তাহারা সদরে চালান দিল।

এই ডাকাতদল বিভিন্ন সময়ে যে কত স্থানে ডাকাতি করিয়াছে তাহার সংবাদও পাওয়া গেল এবং আরও অনেকে ধরা পড়িল। সরকারী বিবরণীতে এই ডাকাতদের বলা হইয়াছে 'চন্দননগরের গ্যাঙ্গ'—চন্দননগরের ডাকাতদল।*

পতিতপাবন বাবু নবীনকে প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর নবীন সম্পূর্ণরূপে ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়াছিল।



৩৩ ডাকাত ও নৌকাডুবি

এক

কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে যে রাস্তাটি বনগাঁ হইয়া খুলনা পর্যন্ত গিয়াছে, সেই রাস্তা এখন প্রশস্ত, সুন্দর এবং দিনরাত্র উহার উপর দিয়া বাস ও মোটর গাড়ি চলে। খুলনা পর্যন্ত রেলগাড়িও যায়। কাজেই সর্বদা ঐ রাস্তায় লোক সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় দুই শত বৎসর আগেই এই পথ ছিল ভীষণ বনাকীর্ণ। পথের দুই ধারে মাঠ। সেই সব মাঠ যেন একেবারে তেপান্তরের মাঠ। এই পথে লোকজন চলিত শহরে, বন্দরে, গঞ্জে। পথের পাশে ছিল ছোট ছোট চটি। ঘন-বনের আড়ালে বাস করিত দলে দলে ডাকাত। পথিকেরা নিরাপদে পথ চলিতে পারিত না। আজ যেখানে গৌরীপুরের হাট বসে তাহারই অল্প দূরে গৌরীপুর এবং আরও কয়েকটি ছোট-বড় পল্লীতে ডাকাতের বসতি। তাহার একটি পল্লীতে বাস করিত মাণিক ঘোষ। সে ছিল ঐ অঞ্চলের সর্দার ডাকাত।

মাণিক কাছাকাছি স্থানে বড় একটা ডাকাতি করিত না, দূরে দূরে ডাকাতি করিত। দলে তাহার অনেক লোক ছিল। ধরা পড়িলেও তাহাদের ঠিকানা মিলিত না। তাহারা নিজেদের বিভিন্ন নামে পরিচয় দিত এজন্য তাহাদের ঠিকানা জানা যাইত না। অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিল মাণিক ঘোষের দল—কেরামদ্দী লিকারী ছিল তাহার দলের একজন' নামকরা ডাকাত।

কেরামদ্দী এবং মাণিক ঘোষ দুইজনে বহু দূর দেশান্তরে ডাকাতি করিতে যাইত। বিভিন্ন নদী-নালা পার হইয়া নদীয়ার সীমান্ত হইতে সুন্দরবনের সীমানা পর্যন্ত, অপর দিকে যশোহরের সীমান্ত হইতে বারাসতের পশ্চিমে গোবরডাঙ্গা, কাগজপুকুরিয়া, লুবশা প্রভৃতি গ্রামে তাহারা ডাকাতি করিত। কখনও সফল হইত, কখনও না।

এখানে একটা কথা শুনিলে সেকালের জমিদার ও তালুকদারদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। দেশের জমিদারেরা ও তালুকদারেরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশী জমিদারের সহিত বিবাদ বাধিলে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেরামদ্দী ও মাণিক ঘোষকে ডাকিতেন। সেই অঞ্চলের চোর, দস্যু, দুশ্চরিত্র লোক—যে জাতিরই হউক না কেন—তাহাদের আহ্বানে আসিয়া মিলিত হইত। মাণিক ঘোষ ও কেরামদ্দীর দলে হিন্দু, মুসলমান সব জাতির লোক ছিল।

আর একদল ডাকাত ছিল বারাসতের নিকটবর্তী কদমগাছি থানার অন্তর্গত একটি পল্লীতে। একজন ধনী মুসলমান ছিল সেই দলের নেতা। সেই ডাকাতদলকে ধরিতে বা সাজা দিতে দারোগা-পুলিস দূরের কথা, ম্যাজিস্ট্রেটও পারিতেন না। এমনি কৌশলী ও সুচতুর ছিল তাহারা। কিন্তু একবার ঘটিল এক আশ্চর্য ঘটনা—সে-কাহিনীই বলিতেছি।

কেরামদ্দী ও মাণিক শুনিয়াছিল যে, সুখসাগরের পথে এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার বাড়ির দিকে চলিয়াছেন। সঙ্গে আছে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, একটি ছোট ছেলে এবং একজন মাত্র ভৃত্য। প্রচুর টাকা-পয়সা লইয়া চলিয়াছেন তিনি। অগ্রহায়ণ মাসে ধনী ব্যক্তির বাড়িতে তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইবে। সুখসাগরের কাছেই তাঁহার বাস-পল্লী। সুখসাগর হইতে একটি ছোট খালের মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাঁহাদের গ্রামে। দলের লোকেরা পূর্বেই এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মাণিক ঘোষকে জানাইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া মাণিক ঘোষ গেল সুখসাগরের দিকে—কেরামদ্দী চলিল শান্তিপুরের দিকে। প্রত্যেকের দলেই ছিল কুড়ি-পঁচিশজন করিয়া লোক।

---

*সরকারী বিবরণীতে বর্ণিত হইয়াছে—এইরূপ দুঃসাহসিক ডাকাতি এবং ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে গ্রামবাসীদিগকে বড় একটা দেখা যায় না, পাণ্ডুয়ার এ ডাকাতিতে তাহা দেখা গেল।

চন্দননগরের ডাকাতদলের সম্বন্ধে সরকারী বিবরণীতে এইরূপ লেখা আছে: "The French settlement of Chandernagore is now swarming with dacoits driven from Calcutta, or the remants of Mofussail gangs. From the French territory they sally out and commit depredations in the neighbouring districts. They are perfectly safe, because, having for the most part assumed false names. I cannot call on the French authorities to deliver them up, neither can any people follow them into the foreign territory to discover their places of concealment.—Suppression of Dacoity in Benal 1854.



দুই

ধনী ভদ্রলোকের নাম শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ি চলিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভদ্রলোকের মেয়ের বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসে। বিধি-ব্যবস্থা করিতেও সময় লাগিবে। এজন্যই তিনি দুই মাস আগেই চলিয়াছেন।

আশ্বিন মাস। নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ। ভাগীরথীর বুক দিয়া চলিয়াছে নৌকা। নৌকায় আছে তাঁহার ভৃত্য, একথাও আগেই বলিয়াছি ভৃত্যটি ছিল খুবই বিশ্বাসী, তাহার নাম কানাই। কানাইয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুক প্রশস্ত, হাত-পা গোলগাল এবং পেশীবহুল শক্তিশালী পুরুষ। সে নৌকার একধারে বসিয়া মাঝিদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। কর্তা ও গৃহিণী ভিতরে বসিয়া গল্প এবং হাস্য-কৌতুক করিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে জিনিসপত্র নেহাৎ কম ছিল না; কারণ অনেক দিন পরে বাড়িতে গিয়া প্রথমেই ত জিনিসপত্র মিলিবে না, তাই আবশ্যকীয় সব জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন।

সুখসাগরের কাছে আসিতেই মাঝি বলিল—'কর্তা, তাড়াতাড়ি এ জায়গা পার হয়ে খালের পাড়ে যে হাট আছে সেখানে গিয়ে নৌকা বাঁধব। জানেন কর্তা, এখানে বড় ডাকাতের ভয়। আমাদের ত কিছু নেই, কিন্তু আপনি দাদাঠাকুর টাকা-কড়ি নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে বাড়ি যাচ্ছেন। যদি ডাকাত পড়ে তা'হলে যে আর রক্ষা নেই। তাই আপনাকে পূর্ব থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। সুখসাগরটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে গিয়ে গঞ্জের হাটে পৌঁছতে পারলেই হল।

কর্তা বলিলেন—'সুখসাগর প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে অনেক বড় বড় বাড়ি, সাহেবের কুঠি, থানা আছে। এক কাজ কর, রাত্রিটা এখানে থেকে কাল সকালে আমরা বাড়ির দিকে যাব।'

মাঝিরা আর একটি কথাও বলিল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সুখসাগরের কাছাকাছি প্রত্যেকটি গ্রামেই ছিল ডাকাতের ভয়। দিনে হউক, রাত্রিতে হউক, নৌকায় চলাচল করা ছিল খুবই বিপজ্জনক। ডাকাতেরা আসিয়া লুঠপাট করিয়া লইত, কখনও বা নৌকারোহীদের প্রাণে মারিয়া ফেলিত। মাঝিরা এই সব কথা জানিত বলিয়া শ্যামাচরণ বাবুকে সতর্ক কবিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। কহিলেন—'বাপু, যাই বল না কেন, আমরা রাত জেগে পাহারা দেব, ডাকাত আমাদের কি করবে?

কাজেই সুখসাগরের কাছাকাছি কোন স্থানে নৌকা নোঙ্গর করিবার ব্যবস্থা হইল।



তিন

নৌকা চলিতেছে। দূর হইতে সুখসাগরের দালান-কোঠা দেখা যাইতেছে। এমন সময় আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। রাত্রির আরম্ভেই ঘন বর্ষণ আরম্ভ হইল। ভাগীরথীর বুকে উঠিল প্রবল ঢেউ। সোঁ-সোঁ সাঁই-সাঁই শব্দে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল। ঢেউয়ে নৌকা দুলিতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাঝিরা নৌকা ঠিক রাখিতে পারিল না। একেবারে ঘাটের কাছে আসিয়া হইল নৌকাডুবি। ঘোর অন্ধকারের রাত্রিতে ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর নিমেষ মধ্যে নৌকা ডুবিয়া গেল। মাঝিমাল্লারা কেহ কেহ তীরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হায় হায় করিবারও কেহ রহিল না।

এমনি সময়ে সেই ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রিতে একদল লোক নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং বিশ-পঁচিশ জন লোক অসীম বিক্রমে টানিয়া তুলিল নৌকা। তাহারা আরোহীদের পাড়ে টানিয়া লইয়া তড়িৎগতিতে মশাল জ্বালিল এবং নিকটবর্তী দোকানীর চালাঘরে লইয়া গেল। তাহাদেরই একজন ছুটিয়া গিয়া পরিচিত এক পাদ্রী-সাহেবকে ডাকিয়া আনিল।

পাদ্রীসাহেব ছিলেন একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে সকলেরই জ্ঞান হইল। পরে সাহেব ও তাঁহার অনুচরগণ নৌকার লোকদের সাহেবের বাসগৃহে লইয়া গেল। সকলের চেষ্টায় ও যত্নে পরদিন নৌকারোহীরা বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল।

কে ইহারা, যাহারা নৌকারোহীদের উদ্ধার করিল? শোন!

উদ্ধার করিয়াছিল ডাকাত মাণিক ঘোষের দল। তাহারা বহুদূর হইতে শ্যামাচরণ বাবুর নৌকাখানির অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। যখন তাহারা দেখিতে পাইল নৌকাখানি তীরে ভিড়িবার সময় আকস্মিক ঝড়ের ঝাপ্‌টায় পড়িয়া নদীর কিনারায় আসিয়া ডুবিয়া গেল, তখন তাহারা ডাকাতির কথা ভুলিল, হিংসা ভুলিল, ভুলিল নৃশংস নরহত্যার কথা। তখন তাহারা নিমেষ মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল খরস্রোতা ভাগীরথীর বুকে। ভাগ্যক্রমে নৌকাখানি তুলিয়া তাহারা সকলকে উদ্ধার করিল এবং জীবন রক্ষা পাইল আরোহীদের সকলের। এমন কি ডাকাতেরা টাকার বাক্সটি পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইয়া দিয়াছিল মালিকের হাতে।

দুই দিন পর শ্যামাচরণ বাবু, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সুস্থ ও সবল হইলেন। শ্যামাচরণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেবকে—আমাদের প্রাণরক্ষা করিলেন কে?

পাদ্রীসাহেব উদ্ধারকারীদের কথা জানাইয়া কহিলেন—মহাশয়, পাপকে ঘৃণা করিবেন, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিবেন না। লোকের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আপনাদের অপরাধও ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন।

পরদিন সকালে আসিল মানিক ঘোষ।

পাদ্রীসাহেব বলিলেন—মানিক, হামি জানি টুমি ডাকাত, কিন্তু টুমি যে মহট কাঞ্জ করিয়াছ সেজন্য ঈশ্বর টোমাকে ক্ষমা করিবেন!

মাণিক আসিলে শ্যামাচরণবাবু ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—'বাবা, তুমিই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ!'

মানিক ঘোষ একটি কথাও বলিল না। সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন সেই মুহূর্তে মাণিক ঘোষের মনে আসিল অপূর্ব পরিবর্তন। সে ডাকাতি ছাড়িয়া দিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে ধরিয়া চালান দিয়াছিলেন; কিন্তু জজ তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু কন্যার বিবাহে মাণিক ঘোষের দলের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহারাও নিমন্ত্রণে যোগদানের পরে আনন্দিত মনে দেশে ফিরিয়া গেল।

আমরা সরকারী কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি, শেষ-জীবনে মাণিক ঘোষ সৎভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল।

৩৪



বিদ্যালঙ্কার ও ডাকাত

এক সময় গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, বলাগড়, ডুমুরদহ, জিরাট—সব গ্রাম ছিল ডাকাতদলের আড্ডাস্থল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সোমড়া গ্রামে নিয়মিত ভাবে নরবলি হইত। পার্শ্ববর্তী বলাগড় গ্রামে বহু কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেখানে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে প্রতিদিন বারোজন ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চাশ জন ভিক্ষুক নিয়মিত ভিক্ষা পাইত। একশত বৎসর পূর্বে জিরাট গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বৈষ্ণবের বাস ছিল। গ্রামে টোল ছিল, সেখানে ন্যায়শাস্ত্র পড়ান হইত। গ্রামে ত্রিশটি গোঁসাই পরিবার বাস করিত। এমন বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে ছিল সুদাম, রাধানাথ এবং স্বরূপ ডাকাতের আড্ডা। তাহারা ডাকাতি করিত, নরহত্যা করিত। কেহ তাহাদের কোন কথা বলিতে পারিত না। ওই সকল পল্লী-অঞ্চল সেকালে সম্পূর্ণরূপে ডাকাতদের অধীন ছিল। ওই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ডাকাত ছিল গঙ্গারাম —তাহার বাড়ী যে কোথায় ছিল তাহা বলা কঠিন। লোকে বলে তাহার বাড়ী ছিল সোমড়ায়, কাহারও কাহারও মতে চাকদহে। সে যাহা হউক না কেন, নদীয়া, যশোহর, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে নিজ দলবল লইয়া গঙ্গারাম ছত্রিশ বাড়ি ডাকাতি করিয়াছে। তাহার ডাকাতির বিশেষত্ব ছিল। গঙ্গারাম নানাভাবে কৌশলে ডাকাতি করিত। তাহার চেহারা ছিল ভদ্রলোকের মত। সেকালের প্রথা অনুসারে গঙ্গারাম ঢাকাই ধুতি পরিধান করিত সেরজাই গায়ে দিত। মাথায় ছিল বাবরি চুল, হাতে ও বাহুতে সোনার বালা, বাজু এবং গলার সোনার হার। আচার-আচরণে সে এতই ভদ্র ছিল যে সহজে তাহাকে কেহ ডাকাত বলিয়া চিনিতে পারিত না। যে—বাড়ীতে সে ডাকাতি করিত, সেই বাড়ীর কর্তার সহিত সে পূর্বেই আলাপ করিয়া লইত। এমন কি ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত পরিচয়, বিষয়-সম্পত্তির কথা, পুত্র-পরিবার-পরিজনের সম্বন্ধেও সে জানিয়া লইত। গঙ্গারাম চতুর ও বুদ্ধিমান ছিল। সে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু নীলকর সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে সে দুই চারিটি ইংরাজী শব্দও বলিতে পারিত।

কামারডাঙ্গার খাল সেকালে খুবই ভয়াবহ ছিল। নৌকাপথে যাতায়াত করিতে মানুষ ভয় পাইত। ঐ খালের পাড়ে বহু সমৃদ্ধ পল্লী ছিল—সেখানে অনেক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে ছিল আড়তদার, মুচ্ছদি, আবার কেহ কেহ সেই কালের কমিসারিয়েটে কাজ করিতেন। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। এখনও গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, জিরাট, সোমড়া, ডুমুরদহ প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানে স্থানে এই সকল ভগ্নদশা অট্টালিকার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে—কালের কবলে উহা ধ্বসিয়া যাইতেছে, ইট-চুন-বালি খসিয়া পড়িতেছে। বাগান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এই অঞ্চলের সুন্দর সুন্দর মন্দিরগুলি দেখিলে মানুষের চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

কামারডাঙ্গার খালের পারে একটি বর্ধিষ্ণু পল্লী। গ্রামের নাম আটপাড়া। গঙ্গা সেখান হইতে বেশ খানিকটা দূরে। গ্রামখানা দেখিতে ঠিক শহরের মত। পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গ্রামের লোকদের মধ্যে অনেকেই বাড়ীতে থাকেন—আবার কেহ কেহ শহরেও থাকেন। এই গ্রামেই বাস করেন বিখ্যাত স্মৃতির পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। প্রকৃত নাম আমরা গোপন রাখিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের টোল ছিল বিখ্যাত। নানাদেশের বিদ্যার্থীরা এই টোলে পড়িতে আসিত। বর্ধমানের রাজবাড়ীতে তিনি ছিলেন দ্বারপণ্ডিত। কলিকাতার রাজা-মহারাজা, সম্ভ্রান্ত ধনী-বিত্তশালী এমন কি নদীয়া, যশোহর হইতেও তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত।

পণ্ডিত মহাশয় বিত্তবান তালুকদার। তাঁহার নিজের খামার আছে। জমিজমা, দীঘি-পুষ্করিণী আছে এবং ব্রহ্মোত্তর জমিও আছে। বারো মাসে তের পার্বণ হয় তাঁহার বাড়ীতে। প্রাচীরঘেরা বৃহৎ বাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপ, চতুষ্পাঠী, বাহির মহল ও অন্দর মহল ইত্যাদি সবই সুন্দর সুন্দর দালান। দীঘির পাড়ে মঠ ও মন্দির প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে নিয়মিত পড়াশুনা করে। অতিথি-শালায় অতিথি আসে। ভিখারী সন্ন্যাসী কেহই খালি হাতে ফিরিয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কৃপণ নহেন—দানশীল এবং মহৎ ব্যক্তি। সেইজন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যাও যথেষ্ট। পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার সুনামও যথেষ্ট।

রেভারেণ্ড লঙ সাহেব বলেন, সেই সময়ে—The country is in the hands of the Dacoits; they do not scruple to plunder in open daylight.

একদিন সকালবেলা পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পৌত্রীর বিবাহের দিনক্ষণ দেখিতেছেন। পাত্রপক্ষীয়েরা উপস্থিত। দেনা-পাওনা, বরযাত্রী দলের সংখ্যা, অলংকার-পত্র, খাওয়া-দাওয়া, দান-সামগ্রী বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। এমন সময় সেখানে একজন দীর্ঘকায় সুগঠিত-দেহ ভদ্রলোক আসিয়া একটি মোহর দিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মুখ তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—'জয়োঽস্তু! আপনাকে পরিচিত বলিয়া মনে হয় না।'

ভদ্রলোক এক পাশে বসিয়া বলিলেন—আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু আপনার নাম শুনিয়াছি। পাঁজি হইতে নজর ফিরাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—'আপনার আগমনের কারণ ?'

ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—'আজ্ঞে আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে থাকি। কানপুরে মোকাম। আড়তদারি কাজ করি। আপনি দয়া করিয়া একটি যাত্রার দিন দেখিয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইব।'

ঃ উত্তম ! উত্তম ! আমি দেখিয়া দিতেছি। ভাল, মহাশয়ের নাম ? পণ্ডিত মহাশয় নাকে নস্য দিতে দিতে বলিলেন।

ঃ আজ্ঞে, হরনাথ দেবশর্মা চক্রবর্তী।

ঃ নিবাস ?

ঃ পূর্বস্থলী।

ঃ বেশ। বেশ। বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় পাঁজি দেখিতে লাগিলেন। ভদ্রলোক নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটি চারিদিকে ঘুরিতেছিল।

পাত্রীপক্ষীয়েরা বিস্মিতভাবে লোকটিকে দেখিতেছিল। ছাত্রদের পড়াশুনার উচ্চ কণ্ঠও নীরব হইতেছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—বৈশাখ মাসের ষোল তারিখ অতি উত্তম দিন। ঐ তারিখ প্রত্যুষে রওনা হইবেন।...তাহার পর সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—দিনটি উত্তম। ঐদিনই আমার পৌত্রীর বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। যদি সম্ভব হয়, তবে যাত্রাপথে দেখিয়া যাইবেন, কি বলেন ?

ভদ্রলোক বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন—আজ্ঞে নিশ্চয়ই।

খালের ঘাটে একখানি ডিঙি বাঁধা ছিল। স্রোতের মুখে ডিঙি-খানা বেগে গঙ্গার দিকে ছুটিয়া চলিল। ডিঙির মধ্যে একটি লোক তালোয়ার হাতে চুপচাপ বসিয়া ছিল।

* * * *

বিবাহ বাড়ী। নহবত বসিয়াছে। সানাইয়ে আনন্দের সুর বাজিতেছে। আত্মীয়-কুটুম্ব ও পরিজনে বাড়ী ভরপুর—আনন্দ কলরবে চারিদিক মুখর হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ব্যাপার। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়াও বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য মনীষী ব্যক্তিও আছেন। অন্দর মহলে রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোথায় খাওয়া-দাওয়া হইতেছে। আবার কোথাও নানা তর্কবিতর্ক চলিতেছে। পুরমহিলারা, দাসদাসীরা নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ কনে সাজাইবার আয়োজন করিতেছে, কেউ বিবাহ মণ্ডপ সাজাইতে ব্যস্ত। এইরূপে সর্বত্র এক কর্মকোলাহলের রূপ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিজে সব তদারক করিতেছেন—যাহাতে কোথায়ও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে।

ক্রমে রাত্রি হইল। সকলে বরযাত্রীদের আগমণের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। রাত্রি যখন এক প্রহর, তখন শুনা গেল সানাই, বাঁশী, নাকারা, টিকারা বাজাইয়া বরযাত্রীরা আসিতেছে। বিবাহ বাড়ীর সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বরকে আনা হইবে—তাহার ব্যবস্থা হইল।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সমাগত ভদ্রলোকদের বলিলেন—'আজ অতি শুভলগ্ন আগত। অনেক গ্রামেই আজ বিবাহ হইতেছে। এমনি সময়ে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে বরযাত্রীর দল আসিয়া পৌঁছিল। বর, বরের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আনন্দিত হইলেন এবং সকলকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। পুরমহল হইতে ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।

লগ্ন সমাগত। বরকে বিবাহের স্থানে লওয়া হইয়াছে। বরযাত্রী-দল বিবাহের আসরে বসিয়াছেন। কনেকে পিঁড়িতে বসানো হইয়াছে। কনে দেখিতে অপূর্ব সুন্দরী। তার পরণে ছিল বেনারসী শাড়ী। নানা অলংকারে সুসজ্জিতা হওয়ায় তাহাকে আরও ভাল দেখাইতেছিল। পুরোহিতগণ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট।

সহসা নিকটবর্তী স্থানে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, আর একদল বরযাত্রী। শত শত মশাল জ্বালাইয়া তাহারা চলিয়াছে। মশালের আলোতে গ্রামখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসী নরনারী যেমন নবাগত বরকে দেখিতে বাহির হইয়াছে—অমনি হা-রে-রে-রে রবে বিকট চিৎকার করিতে করিতে ডাকাতদল লাঠি, বল্লম, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি লইয়া পথের পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলি লুণ্ঠন করিতে করিতে অবশেষে বিবাহ বাড়ীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের আসরে এই বরযাত্রীবেশী ডাকাতদলের বিকট চিৎকারে, মশালের তীব্র আলোয়, মার মার কাট-কাট শব্দে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হইল।

পুরনারীগণ, লোকজন যে যে-ভাবে পারিল পলাইল—খাবারের জিনিস সবই পড়িয়া রহিল। পুরোহিতগণ আসনে বসিয়া কাঁপিতে-ছিলেন। বর নির্বাক, কনে দিশেহারা নিষ্পলকে বসিয়া আছে।

হঠাৎ ডাকাত-সর্দার সভাস্থলে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে চিৎকার করিয়া বলিল—'ঠাকুর, টাকাকড়ি, অলংকার, জিনিসপত্র যাহা আছে সব বাহির কর। কনের গায়ের গয়না খুলিয়া দাও। না দিলে বাড়ীর সবাইকে কাটিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিব। সাবধান ! চিৎকার করিবে না।' মুহূর্তে বিবাহমণ্ডপ নীরব হইয়া গেল।

বিদ্যালঙ্কার হাত জোড় করিয়া বলিলেন—'দেখ বাপু, ডাকাত হইলেও তুমি মানুষ ! বিবাহটা নির্বিঘ্নে হইতে দাও। তাহার পর সব জিনিসই দিয়া দিব। আমি ব্রাহ্মণ—আমাকে বিশ্বাস কর।'

বজ্রকণ্ঠে ডাকাত-সর্দার বলিল—'পণ্ডিত মহাশয়, তোমার চালাকি বুঝিতে পারিয়াছি। ইতিমধ্যে তুমি থানাদারকে এবং দারোগাকে খবর দিয়া আমাদের ধরাইয়া দিবে—এই তোমার মতলব। কথায় আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তুমি ব্রাহ্মণ, জুলুম করিব না।

দাও। দাও। নতুবা একজনকেও জ্যান্ত রাখিব না। এই বলিয়া যেমন রক্তচক্ষু করিয়া তলোয়ার উদ্যত করিয়াছে—সেই মুহূর্তে এক দীর্ঘকায় পুরুষ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহাকে দেখিয়া চিনিলেন। তাঁহার প্রাণে বল ফিরিয়া আসিল, আশার সঞ্চার হইল। এই ভদ্রলোক একদিন তাঁহার নিকট যাত্রার শুভদিন জানিতে আসিয়াছিল।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—'জানি নে, আপনি কে? আপনি এই সমূহ বিপদ হতে রক্ষা করুন। আমার সর্বস্ব যাক, ক্ষতি নেই, শুধু ধর্মরক্ষা হোক!' বলিতে বলিতে পণ্ডিত মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আগন্তুক বলিলেন—'আপনি শান্ত হন, কোন ভয় নেই।' এই বিপদে কনে একবার মুখ তুলিয়া নবাগতের দিকে চাহিয়া করুণস্বরে বলিল—'বাবা, আমাদের রক্ষা করুন।'

বর জড়ের মত বসিয়াছিল। দুইজন পুরোহিত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—'আমাদের বাঁচান। আমাদের বাঁচান।'

আশ্চর্যের বিষয়, নবাগতকে দেখিয়া ডাকাত-সর্দারের সেই বজ্র হুঙ্কার কর্পূরের মত উড়িয়া গেল। একেবারে নির্বাক। সে যেন কোন মন্ত্রবলে বাকহীন হইয়াছে এমনি অবস্থা। আগন্তুক ডাকাত-সর্দারের কাছে গিয়া কানে কানে বলিল—'এই মুহূর্তে বাইরে চলে যাও। সাবধানে বাড়ী পাহারা দাও। যেন কোন বিপদ না ঘটে। যদি আমার হুকুম না মানো, তবে কাহারও মাথা থাকবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাকাত-সর্দার বাহিরে চলিয়া গেল। আগন্তুক কনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মা কোন ভয় নেই। তোর মত আমার একটা মেয়ে ছিল। এমনি ছিল তার মুখ, গায়ের রং, গড়ন। এমনি ছিল তার মিষ্টি চাহনি।'

পরে পুরোহিত ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনারা নির্ভয়ে সব কাজ করুন। কোন কাজ ভণ্ডুল হবে না।'

নিরাপদে বিবাহ হইয়া গেল। বাড়ির সকলের মুখে হাসি ফুটিল। উলুধ্বনি ও শাঁখের শব্দে এবং সানাইয়ের মধুর স্বরে বিবাহ-বাড়ী আনন্দমুখর হইয়া উঠিল। বরযাত্রী ও কনেযাত্রীদের মুখে হাসি ফুটিল। ভয় ও আতঙ্ক দূর হইল। সকলে আনন্দের সঙ্গে পরিমিত ভোজন করিল।

আগন্তুক বাহিরে আসিয়া বলিল—'কেশব, এবার তোরা ফিরে যা।' কেশব দলের সর্দার। সে বলিল—'সর্দার, এই কাজটা কি ভাল হোল?'

আমি এই বাড়ীতে ডাকাতি করিতে আসিয়াছিলাম। দেখিলাম তোরা আগেই আসিয়াছিস। নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করা ভাল নয়। ভয় কি, দেশে কি ধনীর অভাব আছে নাকি?

কেশবের দল বিনা বাক্য ব্যয়ে চলিয়া গেল। কেশব রায় ডুমুরদহের জমিদার। দিনে ভালোমানুষ—রাত্রিতে ডাকাতি ছিল তাহার ব্যবসায়।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিবাহ বাড়ীর আহারাদির ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে। বরকনে বাসর ঘরে গিয়াছে।

আগন্তুক বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল—বাবাঠাকুর, এবার আমায় বিদায় দিন।'

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আগন্তুকের দুইটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'চক্রবর্তী মশায়, আপনি বিপদভঞ্জন মধুসূদনের মত এসে আমাকে রক্ষা করলেন। আমি আশীর্বাদ করি, আপনি চিরজীবী, চিরসুখী হন।'

আগন্তুক ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—'আমি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে—অর্থাৎ ডাকাতি করতে এসেছিলাম।' কিন্তু দৈব আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। অন্যদল না আসিলে হয়ত আমিই ডাকাতি করিতাম। —এই কথা বলিয়া লোকটি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না—তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তবে তুমি—তুমি কে?'

: আমি গঙ্গারাম ডাকাত।

: অ্যাঁ-অ্যাঁ! বল কি?

: কোন ভয় নাই। আপনার পৌত্রী আমার কন্যার রূপ ধরিয়া আপনার ঘরে আসিয়াছে। আজ দুই বৎসর হইল সে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

পাষাণ গলিল—গঙ্গারাম ডাকাতের দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে আবার বলিল—আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার বাড়ী আসিয়া একবার করিয়া মাকে দেখিয়া যাইব। মনে আছে, আপনি আমাকে বিবাহে উপস্থিত থাকিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—হাঁ বাবা!

তাহার পর গঙ্গারাম এক ছড়া সোনার হারবাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন —'আমার মাকে হার যৌতুক দিলাম।'

: এসব কেন?

: এই হার চুরি-ডাকাতির নয়। আমার স্ত্রী তাঁর গলার হার কন্যাকে দিয়াছিলেন। আজ তাহাদের কেহই বাঁচিয়া নাই! আপনি দেবেন আমার মাকে। নিন।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় হার গ্রহণ করিলেন। গঙ্গারামকে বিশেষ অনুরোধ করাইয়া মিষ্টি মুখ করাইয়া বিদায় দিলেন।

* * * *

অনেকদিন পর গঙ্গারাম পুলিশের কাছে ধরা পড়িয়াছিল। সে নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছিল—ছত্রিশ বার সে ডাকাতি করিয়াছে। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল। ধৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট স্থানে গঙ্গারাম বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পৌত্রীকে দেখিয়া আসিত এবং নানারূপ জিনিস উপহার দিত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পৌত্রী তাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিত।





৩৫ ব্রাহ্মণী ও ডাকাতদল

বনগাঁয়ের কাছে একটি গ্রাম। গ্রামের নাম ক্ষীরোদশায়ী। এই গ্রামে বাস করিতেন রামমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সামান্য তালুকদারী আছে। যজন-যাজন আছে—কথকতা আছে। পূজার সময় ধনী জমিদারের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ আসে। এইভাবে দুই পয়সা যেমন আয় হয়, তেমনি সঞ্চয়ের দিকেও তাঁহার নজর আছে। ব্রাহ্মণ সঞ্চয়ী।

তাই লোকে জানে রামমোহন চট্টোপাধ্যায়ের টাকাকড়ি আছে। সেকালে এত ব্যাঙ্ক ছিল না। হয় মহাজনের গদিতে নতুবা মাটির নিচে হাঁড়ির ভিতর করিয়া পুতিয়া রাখা হইত। ইহা ভিন্ন বিশেষ কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। চ্যাটার্জী মহাশয় সেইরূপ কিছু না করিয়া তাঁহার সঞ্চিত নগদ সাতশত টাকা ও অলংকার-পত্র যাহা কিছু ছিল—একটি সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

পাশের গ্রামে ছিল এক নামকরা চোর—নাম নদীয়াবাসী দাস। নদীয়াবাসী নাম হইলেও সে নামের কোন গৌরব রাখিত না। গ্রামে গ্রামে চুরি করিয়া বেড়াইত। চুরিই ছিল তাহার ব্যবসায়। এদিকে লোকটি ছিল দিব্য শান্তশিষ্ট। দীর্ঘ কালো চেহারা। হাড়ে-মাংসে জড়ানো পাকা বাঁশের মত শরীর। মাথায় বাবরি চুল—কাঁচা-পাকায় মিশানো। সে যখন লাঠি খেলিতেও পারিত, তেমনি সিঁদ কাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া টাকা-কড়ি লইয়া চম্পট দিতেও সে ছিল সমান দক্ষ।

নদীয়াবাসীর বহু চর থাকিত। একজন চর আসিয়া সংবাদ দিল—'দাসের-পো, রামঠাকুরের সিন্দুকে অনেক সোনাদানা, টাকাকড়ি আছে, একবার হাত দেবে কি'?

নদীয়াবাসী আমাকে টান দিয়া বলিল—অতি উত্তম সংবাদ। তবে দিনটা ঠিক করে দেখা যাক। জানিস,'এ চাঁদনি রাতে হবে না—অমাবস্যা রাত্রিতেই ঠিক হবে। মোটকথা, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতেই কাজ হাসিল করা যাবে।' তখনই দিনক্ষণ স্থির হইয়া গেল।

অমাবস্যার রাত্রি। বন-জঙ্গল ঢাকা গ্রামের পথ। রাম চ্যাটার্জীর বাড়ীর চারিদিক বেড়িয়া আম-কাঁঠালের বাগান ঝোপঝাড়। দুইদিকে বড় বড় পুকুর। গাছে গাছে ঢাকা পথ—ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকার পথে গুটি গুটি নদীয়াবাসী সিঁদ কাটিতে আসিল। সঙ্গীরা দূরে রহিল—পাহারা দিতে। পাছে কোন লোকজন, গ্রাম্য চৌকিদার টহল দিতে এই পথ ধরিয়া চলাফেরা করে।

চৈত্র মাস। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে।—এই সুযোগ।

ব্রাহ্মণী শুনিলেন—ঝুরঝুর করিয়া মাটি পড়ার শব্দ, আর খুব আস্তে আস্তে টুকটুক শব্দ হইতেছে। ব্রাহ্মণী ঠিক বুঝিতে পারিলেন—চোর সিঁদ কাটিতেছে। সিঁদ কাটবার শব্দ শুনিয়াই তিনি জাগিয়া গিয়াছিলেন। আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণকে জাগাইয়া বলিলেন—'ওগো। ওঠো। চোর এসেছে। সিন্দুক থেকে টাকা বের করে অন্যত্র গিয়ে লুকিয়ে থাকো।'

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া ঘরের এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। এমন সময় চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। সে সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তালা ভাঙ্গিতে পারিতেছিল না। নদীয়াবাসী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কী বিপদ! চোর যখন সিন্দুক খুলিতে না পারিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—ঠিক সেই মুহূর্তে বাহিরে শুনা গেল ভীষণ—হা-রে-রে, হা-রে-রে—। প্রায় তিনজন ডাকাত মশাল জ্বালিয়া বিকট শব্দ করিয়া ব্রাহ্মণের ঘরের কপাট ভাঙ্গিতে লাগিল।

চতুর রামমোহন তৎক্ষণাৎ চোরের কাটা সিঁদ দিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিলেন। ঘরে ভিতর রহিল চোর ও ব্রাহ্মণী। উভয়ে ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

বাহিরে মশালের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ডাকাতদের সর্দার সদলে ঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণীর হাত ধরিয়া বলিই—'ব্রাহ্মণ কোথায় বল? নইলে তোকে এখুনি কেটে ফেলবো।'

ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে চোরকে দেখাইয়া বলিল—'ঐ আমার স্বামী রয়েছেন। আমাকে মেরো না। আমি মেয়ে মানুষ। আমাকে ছেড়ে দাও।'

অমনি দস্যুদল চোরকে ধরিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিল। বেদম জোরে প্রহার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল—'ঠাকুর চাবি দে, বার কর টাকা। কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বল।

এই অবসরে ব্রাহ্মণী সেই সিঁদের পথ দিয়া পলাইয়া গেলেন।

চোর মহাবিপদে পড়িল। ডাকাতেরা তাহাকে অমানুষিক প্রহার করিল—মশাল দিয়া গা পোড়াইয়া দিল। আর সেই এক কথা—বল টাকা কোথায় রেখেছিস, বল্ বল্—আবার প্রহার।'

চোর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'ভাই সব আমাকে মার কেন? আমি চোর। এ বাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়া বিপদে পড়িয়াছি।'

সর্দার বলিল—'চালাকি করতে হবে না। চোর সেজে রেহাই পাবি নে ঠাকুর! বেটাকে মার। আবার বেদম প্রহার আরম্ভ হইল।

নিরুপায় হইয়া চোর আবার বলিল—'আমি সত্যি বলছি সর্দার। আমি চোর। বামুনের টাকা চুরি করতে এসেছিলাম। ঐ দেখ, সিঁদ কেটেছি। যার বাড়ি সে বামুন পালিয়ে গেছে। বামুনীও পালিয়েছে।'

সর্দারের তখন চৈতন্য হইল। সে বিস্মিত হইল। কিন্তু চোরকে সেই বাঁধা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিল। ওদিকে রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—ভোরের আলো ফুটবার দেরী নাই। ডাকাতেরা



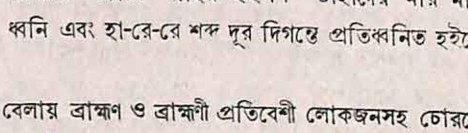
ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে চোরকে দেখাইয়া বলিল—ঐ আমার স্বামী রয়েছেন···

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সন্ধানে বাহির হইল। তাহাদের মার মার কাট্‌, কাট্‌, ধ্বনি এবং হা-রে-রে শব্দ দূর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দিনের বেলায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী লোকজনসহ চোরকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল। দারোগা সব কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে চতুরতার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন। তাহার পর ঐ ডাকাতদের সন্ধানে বাহির হইলেন। ডাকাতদল ধরা পড়িয়াছিল কিনা সে সংবাদ জানা যায় নাই।*

* সেকালে সংবাদপত্রে এই ডাকাতির কাহিনীটি প্রকাশিত হইয়াছিল। সমাচার দর্পণ ১৫ মে ১৮২৪ খ্রীঃ। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩১ দ্রষ্টব্য।

৩৬



আর্মেনিয়ান ডাকাত-এরাটুন

সেকালের ডাকাতের দলে অনেক ফিরিঙ্গি, আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ ও অন্যান্য জাতির যোগ-সাজস ছিল। বাংলায় দুই-একজন ইংরাজ ডাকাতের নামও পাওয়া যায়।

কলিকাতা শহরে যদু মাল এবং শ্রীনাথ দত্ত নামে দুইজন প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল। তাহারা দুইজনেই ছিল জলদস্যু। তাহাদের কাজ ছিল—যাত্রীদের পণ্যবাহী নৌকা দেখিলে আক্রমণ করিয়া লুঠ করা এবং নৌকার তলা ছিদ্র করিয়া ডুবাইয়া দেওয়া। পরে তলোয়ারের আঘাতে যাত্রী ও মহাজনদের মাথা কাটিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া। মস্তকবিহীন মৃতদেহ সনাক্ত করা কঠিন হইত।

কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী মহকুমা ও বন্দর হইতে কখন মহাজনি নৌকা মাল বোঝাই করিয়া কোথায় যাইবে—সে খবর যদু ও শ্রীনাথ রাখিত। তাহার পর তাহারা নৌকার পশ্চাদনুসরণ করিত। উহাদের দলে' এরাটুন নামে এক আর্মেনিয়ান ছিল।

এরাটুন সাহেব ছিল খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাহার বাবা ছিলেন কলিকাতার একজন বিশিষ্ট মিশনারী—ধার্মিক ও সজ্জন ব্যক্তি। দৈবের এমনই ঘটনা যে,' মিশনারীর এই পুত্র বাল্যকাল হইতে কুসঙ্গে মিশিয়া এক দুর্দান্ত ডাকাত হইয়াছিল। সে বিভিন্ন ছদ্মবেশে ডাকাতি করিত। কলিকাতার নামকরা ডাকাতদলের সঙ্গে তাহার যোগ-সাজস ছিল। বিশেষ করিয়া নৌ-ডাকাতদের সঙ্গে সে খুবই মেলামেশা করিত।

একবার এরাটুন সাহেব সাজিল আবগারি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। যদু মাল ও শ্রীনাথ দত্ত দুইজনে হইল যথাক্রমে সেরিস্তাদার ও পেশকার। দলের অপর তিনজন ডাকাত হইল মহুরী, অপর একজন জমাদার। অন্যান্যরা সাজিল আর্দালি, পিওন। এইভাবে তাহারা বজরা, পিনিস, ডিঙ্গি, ছিপ লইয়া চলিল সুন্দরবনের দিকে। নৌকাতে অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না। ছিল বন্দুক, বর্শা, সড়কি, লাঠি ও তলোয়ার।

কলিকাতা হইতে পাঁচখানি মহাজনি নৌকা ঢাকার দিকে যাইতেছিল। নৌকাতে নানা মূল্যবান পণ্যসামগ্রী ছিল। এই মহাজনি নৌকাগুলির পিছু পিছু যাইতেছিল এরাটুন সাহেব। যদু মাল, শ্রীনাথ ও অন্যান্যরা।

সুন্দরবনের এক নদীর বাঁকে মহাজনি নৌকা পাঁচখানি নোঙ্গর করিল। জোয়ার না আসিলে নৌকাগুলি চলিবে না। মাঝি-মাল্লারা রান্না-খাওয়ার আয়োজন করিতেছিল।

নৌকায় মহাজন বা প্রতিনিধি স্থানীয় লোকেরা বিশ্রাম করিতেছে। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। এরাটুন সাহেবরা বজরা, পিনিস ও ছিপ সরকারী নিশান পত পত করিয়া উড়াইয়া এ নৌকাগুলির একটু দূরে নোঙ্গর করিল।

কিছুক্ষণ পরে এরাটুন সাহেবের একজন আর্দালি মহাজনের নৌকায় আসিয়া তাহাকে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার তলব করিল। মহাজন এবং তাহার লোকেরা ব্যাপারটা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। বরং ছদ্মবেশী ডাকাত বলিয়া ভুলক্রমে সন্দেহও করিল না। তাহারা ভয়ে ভয়ে সাহেবের নৌকায় দেখা করিতে আসিল।

এরাটুন সাহেব তাহাদের তর্জন করিয়া বলিলেন—'টোম লোক কোন হ্যায়? চোর হ্যায়?

মহাজনেরা লালমুখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—'হুজুর, আমরা চোর নই। ঢাকা শহরে ব্যবসা করি! মালপত্র নিয়ে ঢাকা যাচ্ছি।'

সাহেব ক্রুদ্ধ সুরে বলিল—'হামি জানটে পেরেছি টোমরা

আবগারি মাল আফিং গাজা চুরি করে পালাচ্ছো।...বরকন্দাজ, সেরিস্তাদার, সব আডমিকো বাঁড়কে তল্লাসি করো।'

সাহেবের হুকুম। আর যায় কোথায়? তৎক্ষণাৎ বরকন্দাজ-বেশী ডাকাতরা তাহাদের শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ছিপ নৌকায় লইয়া আসিল। তাহাদের করুণ চিৎকার, নির্দোষ প্রমাণের অজুহাত সবই ব্যর্থ হইল।

এইবার তাহাদের উপর চলিল অত্যাচার, জুলুম, মারপিট। ক্রমে রাত্রি হইল। নির্জন সুন্দরবনের নদীতে নিরীহ মহাজনদের কে রক্ষা করিবে?

অবশেষে ডাকাতেরা ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া স্বমূর্তি ধার করিল। সাহেব বজরার ছাদে দাঁড়াইয়া তলোয়ার ঘুরাইয়া হুকুম করিতে লাগিলেন—'মারো সব আড্‌মিকো মারো—সব লুট করো।

মাঝি মাল্লাদের মধ্যে কেহ কেহ লাঠি বর্শার আঘাতে মারা গেল, আবার কেহ কেহ বিপদ দেখিয়া নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মহাজনি নৌকার মালপত্র, টাকাকড়ি লুট করিয়া নিজেদের নৌকা, বজরা ও ছিপ বোঝাই করিয়া তাহাদের কলিকাতার আড্ডায় ফিরিল। পথে তাহাদের বাধা দিবার কেহই ছিল না। প্রচুর পরিমাণে লুটের টাকা, জিনিস ইত্যাদি ডাকাতেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

এরাটুন সাহেব, শ্রীনাথ ও যদু মাল এইভাবে ডাকাতি করিয়া ব্যবসায়ী মহলে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। সরকারি গোয়েন্দা পুলিশ, ডাকাতি দমন বিভাগের কর্তারা কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। তিন মাসের মধ্যে ডাকাত দল চল্লিশটি নৌ-ডাকাতি করিয়া এমন ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল যে, মহাজনদের কারবার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

সেই সময় এস. ওয়াকোফ (S. Wauchofe) সাহেব ডাকাতি দমন বিভাগের কমিশনার। তিনি ডেমপিয়ার (W. Dampier) নামে নিম্নবঙ্গের পুলিশ কমিশনারকে ডাকাত দমন করিবার জন্য আদেশ দিলেন। এই আদেশ বলে প্রয়োজন হইলে বিচক্ষণ গোয়েন্দা ও জল-দারোগাকে দিয়া দেশ হইতে ডাকাতদের উৎখাত করিবার বিধানও ছিল। ডেমপিয়ার সাহেব কমিশনারের আদেশ পাইয়া বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। নদীর মোহনায় মোহনায় জল-দারোগা ও পুলিশেরা ডাকাতদের ধরিবার জন্য ওৎ পাতিয়া রহিল।

কলিকাতার ডাকাতদের একটি প্রধান আড্ডা ছিল চন্দননগরে। চন্দননগর ছিল ফরাসী এলাকাভুক্ত। যখন এদিকে খুব ধর পাকড়ের তোড়জোড় চলিত, তখন তাহারা চন্দননগরে পলাইয়া যাইত। এইজন্য বিদেশী এলাকায় ডাকাতদের ধরিতে বাধার সৃষ্টি হইত।

ডেমপিয়ার সাহেব নিজেও এই ব্যাপারে একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। স্বয়ং পুলিশ দল এবং বিচক্ষণ দুইজন দারোগাকে মহাজন সাজাইয়া নৌকা পথে ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে চলিলেন। ডাকাতরা যাহাতে বুঝিতে না পারে সেইজন্য কিছু কিছু মহাজনী নৌকা তাঁহাদের পিছন পিছন চলিল। মহাজনদের সঙ্গে ডেমপিয়ার সাহেব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সব মহাজনি নৌকায় বন্দুকধারী পুলিশ ও পাহারাওয়ালা রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সুন্দরবনের আড়াইবাঁকির মোহনা পার হইয়া মালঞ্চা নদী। মালঞ্চা ও আড়পাদাশিয়া নদীর মধ্যে হরিখালি নামে খাল দুই নদীকে সংযুক্ত করিয়াছে। খালের দুইদিকে গভীর বন। ঐ খালের মধ্য দিয়া মহাজনি নৌকার গন্তব্য পথ।

এরাটুন সাহেব, তাহার দুই বিশ্বস্ত বাহন শ্রীনাথ, যদু ও দলের অন্যান্যরা মালঞ্চের খালের মুখে মহাজনি নৌকা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তাহারা জানিত পুলিশ ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে তাহাদের ধরিবার জন্য। এইজন্য দূরে ঐ নিরাপদ স্থানে আসিয়া মহাজনি নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ডেমপিয়ার সাহেব ও মহাজনদের নৌকাগুলি ঠিক সন্ধ্যার সময় সেখানে আসিয়া থামিল। তখন ডাকাতদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা পূর্বের নিয়মে মহাজনি নৌকায় আসিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। এবার কিন্তু তাহাদের কথায় মহাজনেরা ভয় পাইল না। তাহারা বলিল—'তোমাদের অধিকারী সাহেবকে এখানে আসতে বল। আমরা কেন যাবো? আমরা ত কোন অন্যায় করিনি।'

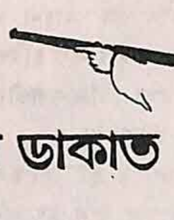
ইহাতে ছদ্মবেশী ডাকাতেরা না দমিয়া আরও ভয় দেখাইতে লাগিল। ক্রমে বচসা ও কলহ আরম্ভ হইল। কৌশলী ডেমপিয়ার সাহেবের আদেশে পুলিশের নৌকাগুলি ডাকাতদের নৌকাগুলিকে ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ফেলিল। যদু মাল ও এরাটুন সাহেব হুকুম করিল—'কী দেখছ! এখুনি নৌকো লুট করো।' যেমন ডাকাতদের এক একজন মহাজনি নৌকা লুট করিবার জন্য এক একটি নৌকায় লাফাইয়া পড়িল—অমনি পুলিশ ও মহাজনি নৌকার রক্ষীরা বন্দুক ছুঁড়িল। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাতাসে সেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

দুই পক্ষে হাতাহাতি মারামারি ও তলোয়ারের লড়াই চলিল। পলায়নের পথ না পাইয়া ডাকাতদের অনেকে ধরা পড়িল। অনেকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাইল। পুলিশ ও সিপাহীরা ডাকাতদের নৌকায় লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদের নিরস্ত্র করিল এবং প্রত্যেকের হাতে ও পায়ে হাতকড়ি ও বেড়ি পরাইয়া দিল। সুচতুর এরাটুন সাহেব ও যদুমাল রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া গেল। মহাজনি নৌকার রক্ষী পুলিশদের হাতে শ্রীনাথ দত্ত ও আরও যে সব ডাকাত ধরা পড়িয়াছিল, পরে তাহারা পুলিশের কাছে নিজের ও দলের সকলের নাম বলিয়া দিয়াছিল। এমন কি বিভিন্ন সর্দারদের নাম বলিতেও তাহারা কসুর করেনি। এই স্বীকারোক্তিতে আরও অনেক ডাকাত ধরা পড়িল। বিচারে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হইল।

এরাটুন সাহেব ও যদু মাল সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় নাই। তাহারা কে কোথায় পলাইয়াছিল—সে সন্ধানও মিলে নাই। অনেকদিন পরে এরাটুন সাহেব ধরা পড়িয়াছিল। যে কারণেই হউক তাহার কোন সাজা হয় নাই। এরাটুন সাহেব এইভাবে ডাকাতি করিয়া প্রচুর অর্থ ও ধন সম্পদ লাভ করিয়াছিল।

যদু মাল, শ্রীনাথ দত্ত ও এরাটুন সাহেব এক সঙ্গে চল্লিশটি ডাকাতি করিয়াছিল।

৩৭



পণ্ডিত সা ডাকাত

পণ্ডিত সা ছিল সেকালে বগুড়া জেলার একজন বিখ্যাত ডাকাত। বগুড়া ও শেরপুর যাবার পথের মাঝে—মাঝির নামক একটা গ্রামে সে বাস করিত। মাঝির গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ধনী-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং নানা জাতির বাস ছিল। এখনও সেই গ্রামের অতীত চিহ্ন বুকে করিয়া ইষ্টক স্তূপ, ভগ্ন বাড়িঘর, বহু দীঘি ও পুষ্করিণী দেখা যায়।

পণ্ডিত সা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করিত না। জাতিতে সে যে কি ছিল তাহাও জানা যায় না। কাহারও মতে সে ছিল রাজবংশী, আবার কেহ কেহ বলেন সে ছিল চণ্ডাল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন তখনও ভাল ভাবে কায়েম হয় নাই। ডাকাতি, রাহাজানি ছিল নিত্যকার ঘটনা। পণ্ডিত সা ঐ সময় খুবই দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল! তাহার ভয়ে বগুড়া জেলার লোকেরা আতঙ্কে দিন কাটাইত।

পণ্ডিত সা'র দলে নানা জাতির লোক ছিল। হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ি, উত্তর-পশ্চিম দেশীয় সাঁওতাল, বাগ্‌দি, রাজবংশী প্রভৃতি জাতির দুর্ধর্ষ লোকেদের লইয়া পণ্ডিত সা'র দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণবর্ণ, বেঁটে, বলিষ্ঠ, মাথায় একরাশি বাবরি চুলবিশিষ্ট পণ্ডিত সা ছিল দলের সর্দার! দলের লোকেরা পণ্ডিত সাকে যমের মত ভয় করিত। তাহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। এই ডাকাত দলের লোকেরা হাতিয়ার ধরিতে খুবই অভ্যস্ত ছিল। এক দল লোক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধনী, জমিদার ও মহাজনদের সংবাদ লইয়া আসিত। ইহার পর পণ্ডিত সা সুযোগ মত দলবল সহ ধনী ব্যক্তিদের বাড়ী আক্রমণ করিত, তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ঘরে ফিরিত।

সেই সময় লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন ভারতবর্ষের বড়লাট। চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। টিপু সুলতান ওয়েলেসলির বন্ধুত্ব পছন্দ করিতেন না—তাই মহীশূরের সঙ্গে যুদ্ধ হইতেছিল। বাংলার দিকে সরকারের মোটেই লক্ষ্য ছিল না। বাংলাদেশের জেলায় জেলায় তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, ফৌজদার, দফাদার, দারোগা, চৌকিদার থাকিলেও কোন শাসন ছিল না। পথঘাট ছিল দুর্লভ। যানবাহন ছিল না—ডাক চলাচলের সুবিধা ছিল না।

আর ছিল থানা ও ফাঁড়ি। কাজেই কোন গ্রামে ডাকাতি হইলে প্রাণের ভয়ে পল্লীবাসীরা পলায়ন করিত। বাধা দিবার সাহস তাহাদের ছিল না। থানাদার ও ফাঁড়িদাররাও ছিল ডাকাতের সঙ্গী। কাজেই নির্বিঘ্নে চলিত ডাকাতি ও রাহাজানি।

বগুড়া জেলায় কোথাও কোথাও ছিল দিগন্তজোড়া মাঠ। মাঠের সীমা নাই, শেষ নাই। এই সব মাঠের প্রান্তসীমায় ছিল কয়েকটি গ্রাম। কাজেই ডাকাতরা কোন গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার কোন আশংকাই ছিল না। সুতরাং পণ্ডিত সা সর্বত্র ডাকাতি করিয়া নির্ভয়ে চলাফেরা করিত—তাহাকে ধরিবার কেহই ছিল না। ঘোড়ায় চড়িয়া বল্লম হাতে সে সদলবলে ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

পণ্ডিত সা'র সম্বন্ধে একটি গল্প শুনা যায়। ডাকাতি করিতে গিয়া সে কখনও শিশু, বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিত না। এইজন্য অনেকে তাহার পক্ষপাতী ছিল। অনেক গরীব গৃহস্থের সে উপকার করিত। দীন-দরিদ্র প্রার্থীদের সে সাহায্য করিত। এইজন্য সরকার হইতে তাহার কোন সংবাদ জানিতে আসিলে গ্রামবাসীরা তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিত না। সুতরাং নিরাপদেই ডাকাতি চলিত পণ্ডিত সার।

একবার পণ্ডিত সা এক জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ি ডাকাতি করিতে গিয়াছে। দিনের বেলা। মধ্যাহ্ন কাল। দারুণ গ্রীষ্ম। ঘূর্ণিবায়ুতে ধূলা উড়িতেছে। এমন সময় পণ্ডিত সা দেখিল একদল সাঁওতাল স্ত্রীলোক দল বাঁধিয়া কলসী মাথায় ও কাঁখে করিয়া চলিতেছে। তাহারা পণ্ডিত সার কাছাকাছি আসিলে পণ্ডিত সা জিজ্ঞাসা করিল—'তোরা কুথা যাচ্ছিস?'

সাঁওতাল নারীরা বলিল—'ভিন্ গাঁয়ে জল আনতে যাচ্ছি রে। মোদের গাঁয়ে পুকুর-দীঘি নেই রে।'

পণ্ডিত সা বলিল—'তোদের গাঁ কতদূর?'

তাহারা মসীরেখার মত দূরের গ্রামসীমা দেখাইয়া দিল। পণ্ডিত সা তাহাদের সঙ্গে গ্রামে গিয়া দেখিল—সত্যই সেই সাঁওতাল পল্লীতে কোন দীঘি বা পুষ্করিণী কিছুই নাই। তিন-চার ক্রোশ হইতে সাঁওতাল মহিলাদের জল আনিতে হয়। তাহাদের এই কষ্ট দেখিয়া পণ্ডিত সার খুবই দুঃখ হইল। তাহার আদেশে ঐ সাঁওতাল পল্লীতে একটি দীঘি কাটান হইল। দীঘিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ মাইল—প্রস্থে পোয়া মাইল। দীঘিতে এখন অল্প জল থাকে। এখনও লোকে এই দীঘিটির নাম পণ্ডিত সার দীঘি বলিয়া থাকে।

দীঘির উত্তর পাড়ে একটি ভগ্ন ও জীর্ণ কালীমন্দির। মন্দিরের ইট খসিয়া গিয়াছে, চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহারই গায়ে একটি অশ্বত্থ গাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে জঙ্গল। ভিতরে একটি পাষাণনির্মিত কালীমূর্তি। সম্মুখে হাড়িকাঠ। গাঁয়ে সাঁওতাল ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের বাস। ঐ কালীমন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণ নয়—একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল এখানকার পূজারী। মায়ের সম্মুখে শূকর, পাঁঠা, মুরগী, হাঁস সবই বলি হয়। শনি মঙ্গলবারেই বেশী হয়। ভয়াবহ স্থান।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

সেই সময় শেলবর্ষ পরগণার জমিদার ছিলেন—আসজুমা চৌধুরী। চৌধুরী সায়েব বেশ প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রজারা পণ্ডিত সার অত্যাচার ও লুণ্ঠনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। চৌধুরী সাহেব নিজেও নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যে কোন সময় ডাকাত পড়িতে পারে—এই আশংকায় তিনি ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে দিন কাটাইতেন।

এদিকে পণ্ডিত সা বেশ ভালভাবেই জানিত যে আসজুমা চৌধুরী তাহার প্রথম শত্রু। সেই জন্যে সে গোপনে চৌধুরী সাহেবের বাড়ী আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ওদিকে জমিদার সাহেবও ডাকাতের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে সর্বদা বাস করা অপেক্ষা ডাকাত ধরাইয়া দিবার জন্য খুবই সচেষ্ট হইলেন। তিনি রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট চিঠি লিখিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিলেন। দারোগা ও ফাঁড়িদারের নিকট পরোয়ানা আসিল। তাহারা ডাকাত ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডাকাত পণ্ডিত সার কথা জানিতেন। পণ্ডিত সা যথেচ্ছভাবে ডাকাতি ও লুণ্ঠন করিয়া বেড়ায় এ সংবাদও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অজানা ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট পণ্ডিত সার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগও আসিয়াছে। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পণ্ডিত সাকে ধরিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

একদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গোয়েন্দার মুখে খবর পাইলেন যে, শ্রাবণের শেষে পণ্ডিত সা জমিদার আসজুমার বাড়ি আক্রমণ করিবে। সংবাদ পাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুবই সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি অত্যন্ত গোপনে সিপাই সান্ত্রী ও একদল ফৌজসহ জমিদার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পথে জমিদার বাড়ীতে সশস্ত্র ফৌজ পাঠাইতে লাগিলেন।

স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট যে জমিদার বাড়ীতে আছেন সেই খবরের বিন্দু বিসর্গও পণ্ডিত সা জানিতে পারে নাই। চতুর পণ্ডিত সার এবার হিসাবে খুবই ভুল হইল।

শ্রাবণ মাসের মহা দুর্যোগের রাত্রি।

বাহিরে বজ্র বিদ্যুৎসহ ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। বাতাসের হানাহানিতে এক মহাপ্রলয়ের আকার ধারণ করিয়াছিল। এই দুর্যোগের মধ্যে পণ্ডিত সা দলবল লইয়া জমিদার আসজুমার বাড়ী আক্রমণ করিল।

ডাকাতেরা বড় বড় মশাল জ্বালাইয়া ভৈরব হুঙ্কারে হা-রে-রে-রে শব্দে প্রবল আঘাতে সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, কেহ কেহ দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। এমন সময় গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হইল। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে সেপাইরা, চৌধুরী সাহেবের লোকেরা প্রচণ্ডভাবে ডাকাতদের বাধা দিতে লাগিল।

ডাকাতদের অনেকে মারা গেল, অনেকে পলায়ন করিল। অনন্যোপায় পণ্ডিত সা তার সীমিত শক্তি লইয়া কিছুক্ষণ লড়াই করিল। কিন্তু কতক্ষণ! এদিকে পূর্ব আকাশে ভোরের আলো দেখা দিল। বৃষ্টিও থামিয়া গেল। পণ্ডিত সা পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় একদল সেপাই তাহাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গের ডাকাতরাও রেহাই পাইল না।

রাজসাহীতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উহাদের বিচার হইল। বিচারে পণ্ডিত সার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হইল। অন্যান্য ডাকাতদের মধ্যে কাহারও পাঁচ, কাহারও সাত এইরূপ কারাদণ্ড হইল।



৩৮

রাজাজীর ডাকাতি

কয়েক বছর আগে আমি মাদ্রাজ গিয়াছিলাম—নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়া। প্রথম দিন রাজাজী আসিয়া বাংলায়, বাংলায় যখন গভর্নর ছিলেন, সেই সময়কার কথা তুলিয়া, বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের অনেক কথা বলিলেন। বেশ লাগিল। রাজাজীর সহিত রাজনৈতিক মতভেদ থাকিলেও এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছি যে, সভা-সমিতিতে তাহার ভাষণ সকলেরই উপভোগ্য হয়।

বাঙলা দেশে থাকিবার সময় আমার একজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি সেই সভাস্থলেই প্রস্তাব করিলেন—'আপনার সঙ্গে আমরা একদিন ব্যক্তিগতভাবে একটু আলোচনা করতে চাই। আপনার অনুমতি চাইছি।'

রাজাজী একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—'রাজনীতি নয়তো? সে বিষয়ে আমি এখন বড় একটা কারুর সঙ্গে কথা বলি না। এখন শুধু সাহিত্যচর্চা করি।'

আমরা বলিলাম—'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

—বেশ, তবে আপনাদের, সাংবাদিকদের বিশ্বাস করা বড় কঠিন।

সে যাহা হউক, শেষটায় তিনি রাজী হইলেন। এবং সময় ঠিক করিয়া দিলেন।

আমরা নির্দিষ্ট দিনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ী যাইতেই খুব আদর যত্ন করিয়া আমাদের বসিতে বলিলেন এবং পান করিবার জন্য কফি আনিয়া দিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর দুই একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। অতীতের নানা কথা শুরু হইল। রাজাজী কৌতুকপ্রিয় এবং মিষ্টভাষী। তামিলি বন্ধুদের সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহাদের একজন সাংবাদিক। অপরজন একজন রিপোর্টার বা সংবাদগ্রাহক।

তিনি বলিলেন—'আমি বাংলা জানি না। তবে বাঙালীকে ও বাংলা ভাষাকে ভালবাসি। আপনাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যে বহু কৃতী সন্তান জন্মেছেন। যাঁরা নাটকে, কাব্যে, উপন্যাসে ভারতকে করেছেন গৌরবান্বিত। আমাদের তামিল সাহিত্যও প্রাচীন এবং অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের দেশের রামায়ণ, মহাভারত চমৎকার।'

আমাদের হাস্য-পরিহাসের সঙ্গে যখন কথাবার্তা শেষ হইয়াছে, এমন সময় অপর মাদ্রাজী ভদ্রলোক বলিলেন, আচ্ছা, রাজাজী, শুনিয়াছি আপনি নিজের হাতে মানুষ মারিয়াছেন, একথা কি সত্য? ব্যাপারটা একবার বলিবেন কি? বেশ কিছুদিন পূর্বে আপনি একটা লোককে না গুলি করিয়াছিলেন!

রাজাজী হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, আমি একটা লোককে গুলি

করেছিলাম। সে শুধু আত্মরক্ষার জন্য।' তবে এ-বিষয়ে আমাকে লইয়া নানাজনে নানাভাবে কাহিনীটি রটাইয়াছে। তবে শুনুন আমার মুখে সত্য যাহা ঘটিয়াছিল।

সাংবাদিক তৎক্ষণাৎ তাঁহার নোট বই খুলিয়া বসিলেন। রাজাজী অমনি হাত তুলিয়া বলিলেন—'না, ও-কাজটি করবেন না। তাহলে আমি বলব না। গম্ভীরভাবে তিনি কথা কয়টি বললেন।'

ভদ্রলোক চুপ করিলেন।

রাজাজী আবার বলিলেন—'লেখাপড়ার ভেতর আমি নেই। তা'হলে সব কথা গোলমাল হয়ে যায়।'

শুনুন।

'অনেক কাল আগের কথা। আমি তখন ওকালতি করি। পশার ভালই। নামাক্কাল নামে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম একটি মোকদ্দমা পরিচালনা করবার জন্য। সেলেম হতে নামাক্কাল যাত্রা বড় সহজ নহে। অনেকটা পথ। সেখানে যেতে হলে নিতে হ'বে ঘোড়ার গাড়ী, নতুবা গরুর গাড়ী। আমি নিলাম বৃহদাকারের একখানি গো-যান। দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় বলবান বলদ গাড়ী টেনে চলেছে। রাত্রিবেলা বেশ আরামে ঘুমাবার উদ্দেশ্যে গো-যান নিয়েছিলাম।'

সেই সময়ে ওই অঞ্চলে অত্যন্ত ডাকাতের ভয় ছিল। সেজন্য আমার সেলেমের বন্ধুরা বলিয়াছিলেন—'রাজাজী, সাবধান। ওদিকটায় বড় ডাকাতের ভয়। পথটা একেবারেই ভাল নয়। পথে পথে আবার টোলঘর বা খাজনা আদায়ের ঘরও আছে।'

আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ তামিল ভাষায় একদল লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—'টাকা চাই। টাকা চাই। টাকা দাও।

গাড়ী থামিয়া গিয়াছিল। আমি বুঝিলাম ডাকাত পড়িয়াছে।

কিন্তু ঘাবড়াইলাম না। স্বাভাবিক ব্যঙ্গ ভরে বলিলাম—'কী? তুমি প্রণাম চাইছো?'

'হ্যাঁ'—উত্তর দিল একজন কঠোর স্বরে।

ঘন ঘোর অন্ধকার রাত্রি। কাছাকাছি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। লোকটি আবার কর্কশ কণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ, প্রণাম চাই।'

আমি লম্বালম্বি শুইয়াছিলাম গরুর গাড়ীতে। কে একজন আমার গাড়ীর কিনারায় দাঁড়াইয়া আমার পা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

আমার বিছানার কাছে রাখিয়াছিলাম আমার রিভলবার বা পিস্তলটি। যেদিক দিয়া শব্দ আসিতেছিল সেইদিক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলটি ছুড়িলাম। গুড়ুম করিয়া একটা শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম কে যেন ভীষণ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। আমার ভয় হইল এবং মনে হইল এবার ডাকাত নিশ্চয়ই আমার গরুর গাড়ী ঘিরিয়া ফেলিবে। আমি পিস্তল হাতে করিয়া প্রস্তুত হইলাম। মনে যে একটু আতঙ্ক হইয়াছিল, সেকথা মিথ্যা নহে। কিন্তু আমার আশংকা অমূলক। কানে আসিয়া পৌঁছিল একটা করুণ আর্তনাদের ধ্বনি।

গুলির শব্দে শুষ্ক খড়ের পার্শ্বে শায়িত কয়েকজনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা একটি কালিমাখা ক্ষীণ আলোর লণ্ঠন লইয়া আমার গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা লোকটিকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—'হুজুর লোকটা মরেনি।'

আমার লক্ষ্য ভুল হয় নি। আমি শব্দ শুনিয়া গুলি ছুড়িয়াছিলাম, আমার শব্দভেদী গুলি ঠিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছিল।

গুলিটা লোকটার মাথার খুলি ভেদ করিয়া প্রবেশ করে নাই, তাহার কানের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। পুরাতন ধরনের রিভলবার, বেশ বড় আকারের। আমি লোকটিকে আমারই গাড়ীতে তুলিয়া কাছাকাছি একটি শহরে লইয়া গেলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। আমি নির্দোষ বলিয়া খালাস পাইলাম। আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুঁড়িবার অধিকার আমার ছিল।

আমরা মনে মনে ভাবিলাম—'তা'হলে রাজাজী ডাকাতির ওপর ডাকাতি করে এলেন।'

৩৯ অদ্ভুত ডাকাতি বিগ্রহ চুরি



১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার থানা বেনেপুরে, পাণ্ডুয়া, ধনিয়াখালির অন্তর্গত নালাগ্রাম হইতে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গ্রামবাসীরা আসিয়া প্রতিদিন অভিযোগ করিতে লাগিল—'হুজুর! আমাদের রক্ষা করুন। আমরা ধনে প্রাণে মারা পড়লাম।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীনস্থ সমুদয় থানার দারোগাদের উপর পরোয়ানা জারি করিলেন—'তোমার এলাকার সব দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের ধরে এনে আমার কাছে হাজির কর।'

সে-সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র দস্যু-ডাকাতদের প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। সময়টা সিপাই বিদ্রোহের পাঁচ-ছয় বৎসর আগের কথা। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানার কোন ফল হইল না। কি করিয়া হইবে? থানার দারোগা, জমিদার, তালুকদার সকলেরই ডাকাতের সঙ্গে হাত মিলান ছিল। প্রতিবেশী জমিদার এবং পার্শ্ববর্তী কোন কোন গ্রামের তালুকদারের সঙ্গে কলহ হইলে এইসব ডাকাত হইত তাহাদের সহায়। কোন-না-কোন পক্ষে তাহারা যোগ দিত। দারোগারা ডাকাতদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পাইত। সুতরাং কি জমিদার, কি তালুকদার সকলেই নানা ভাবে ডাকাতদের প্রশ্রয় দিতেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দুই-একজন সৎ স্বভাবাপন্ন দারোগা ব্যতীত সকলেই জানাইল—'হুজুর, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি দেখি কি করতে পারি। আমাদের থানায় ত বেশী লোক নেই—কাজেই আমাদের ত প্রাণের আশংকা আছে।'

একদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে সংবাদ আসিল—কালনা

থানার পার্শ্বের গ্রামের দেবমন্দির হইতে স্বর্ণনির্মিত দেবদেবীর বিগ্রহ ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিচলিত হইলেন। তিনি কালনা থানার দারোগাকে ডাকিয়া আনিলেন। বলিলেন—তোমাকে এই বিগ্রহ চুরির হদিস বাহির করিতে হইবে—চোর-ডাকাত যেই হউক না কেন তাহাকে ধরিয়া আনিতেই হইবে।

দারোগা বিনীতভাবে বলিল—আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

কিন্তু কি হইল কে জানে! মাসের পর মাস গেল। কোন ফল হইল না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজেও জোর খোঁজ করিলেন। কিন্তু কোন সন্ধান মিলিল না। তখন তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাকাত দমন বিভাগের শরণাপন্ন হইলেন। সেই বিভাগের কর্তা মিঃ ওয়াকেল সাহেবকে বিস্তারিত ভাবে সব লিখিয়া জানাইলেন।

ওয়াকেল সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চিঠির উত্তর দিলেন। কোন সময় কি ভাবে বিগ্রহ চুরি গিয়াছিল জানিতে চাহিলেন। সাহেব অনুসন্ধান করিয়া সব খবর লিখিয়া জানাইলেন।

সেই সময় ওয়াকেল সাহেবের অধীনে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নাম চন্দ্রশেখর রায়। চন্দ্রশেখরবাবু যেমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছিলেন—তেমনি ছিলেন সাহসী ও নির্ভীক। অদ্ভুত ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারিতেন তিনি। ইহা ছাড়াও তিনি নানা প্রচলিত ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক ভাষায় তিনি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন।

এই জন্যই ওয়াকেল সাহেব তাহার মত একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাহেব তাঁহার সহকারী চন্দ্রশেখরবাবুকে এই অদ্ভুত ডাকাতির অনুসন্ধানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন—'আমি বিগ্রহ চুরির তদন্তের ব্যাপারে মিঃ রায়কে পাঠাচ্ছি। তিনি অত্যন্ত যোগ্য লোক। তিনি আপনার সঙ্গে যথা সময়ে দেখা করবেন। তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করবেন।'

গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড দেবমন্দির। নদীর তীরে প্রকাণ্ড বাঁধান ঘাট। ঘাটে পুরুষ ও স্ত্রী সকলে স্নান করিতেছে। কেহ পূজা করিতেছে। কেহ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিতেছেন। কেহ গল্প করিতেছেন। ছেলে-মেয়েরা সাঁতার কাটিতেছে—জলে ফুল ভাসাইতেছে। গঙ্গার বুকে নানা জাতীয় নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। এমন সময় দেখা গেল একজন বিরাটকায় সন্ন্যাসী একখানি ছোট নৌকা হইতে গঙ্গার পারে নামিয়া বাঁধানো ঘাটের কাছে বৃহৎ বট-গাছের নীচে বাঘছাল বিছাইয়া ধূপধুনা জ্বালিয়া বসিলেন। পরে আরও তিন চারিজন সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথম সন্ন্যাসীর কাছে আসন পাতিয়া বসিলেন। পরে কল্কে বাহির করিয়া উহাতে গাঁজা ভরিতে লাগিলেন।

এমন সময় একজন বৃদ্ধা আসিয়া প্রথম সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—'এ কোন দেওতার মন্দির রে বেটিয়া।'

বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'বাবা ঠাকুর দেবতা কী আছে? ঘোর কলি—দেবতা আর কত পাপ সইবেন—দেবতা অন্তর্ধান করেছেন।'

সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া বলিলেন—'ঝুটা বাৎ মত বলো, বুড়া মাঈ?'

বুড়ি সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—ঠাকুর রাজার পাপে রাজ্যি নাশ। রাজার অত্যাচার দেবী সইবেন কী করে? মন্দির অন্ধকার করে চলে গেলেন বিগ্রহ। চলে গেলেন। সত্যি বাবা, মিছে বলছি না।'

ঃ ফের ঝুটা বাত।

বুড়ি বলিল—'না বাবা, দেবতা বামুনের কাছে কি মিথ্যে বলতে আছে! ডাকাতেরা মন্দিরের দরজা ভেঙে বিগ্রহ চুরি করে নিয়েছে।'

সন্ন্যাসী গাঁজার কল্কেতে জোরে টান দিয়া মুখ ও নাক হইতে অনেক ধোঁয়া বাহির করিলেন। বলিলেন—'সো হোনে সেকে মায়ী; হোনে সেকে।'

ক্রমে অনেক লোক আসিয়া জড়ো হইল। স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকার ভিড় বাড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন মৌন রহিলেন। বুড়ী তাহার ছোট কলসীটি কাঁখে করিয়া ভিজে গামছাখানি মাথায় দিয়া কাপড় হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

বুড়ি প্রথমে মন্দিরে গেল। পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে গিয়া সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিল। মন্দির সংলগ্ন ছিল বিরাট অতিথিশালা। মন্দিরের নিয়ম ছিল সাধু সন্ত ভিখারী বৈষ্ণব যে-কোন লোক অভুক্ত অবস্থায় অতিথিশালা হইতে যাইতে পারিবে না। বুড়ীর নিকট খবর পাইয়া পূজারী নিজে আসিয়া ঐ সন্ন্যাসী এবং তাঁহাদের চেলাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া অতিথিশালায় ডাকিয়া আনিলেন। প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি আনিলেন। সন্ন্যাসীর সেবা ও রন্ধনের ভার নিলেন মন্দিরের পূজারী। সাধু-সন্ন্যাসিগণ যে সাক্ষাৎ দেবতা!

গ্রামের রাজার বাড়ী। তাহার এক নিভৃতকক্ষে দুইজনের সঙ্গে রাজার কথা হইতেছিল।

রাজা বলিলেন—'দেখ হলধর, তুমি যদি কালনার ঐ দেবমন্দির হইতে সোনার ঠাকুর-ঠাকুরানীকে ডাকাতি করিয়া আনিতে পার তাহা হইলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব। এই কাজ ভালভাবে করিতে পারিবে তো?'

হলধর বলিল, হুজুর টাকার পরিমাণ খুবই কম। ভোজপুরি, মির্জাপুরি পালোয়ানেরা সব পাহারা দেয়। মন্দিরের চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা। সেখান হইতে সোনার বিগ্রহ চুরি করিয়া আনা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার, প্রতি মুহূর্তে বিপদ। যে-কোন সময় প্রাণনাশ হইতে পারে।

হলধর মাল—সেই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। সে ডাকাতদের সর্দার। তাহার নামে সকলেই ভয় পাইত। বর্ধমান অঞ্চলের হলধর মালের নাম শুনিলে মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইত। তাহার অধীনে বহু ডাকাত ছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলে ছিল তাহার দলে। হলধর মালের সঙ্গে রাজার দেনা-পাওনার রফা হইল।

অগ্রিম টাকা কিছু লইয়া হলধর কালনার সেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

হলধর অত্যন্ত চতুর ছিল। লোকজন সঙ্গে থাকিলেও নিজেই কৌশলে কাজ করিতে চেষ্টা করিত।

হলধরের বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার দৌলতগঞ্জ নগরে মাতিয়ারি নামক পল্লীতে। তাহার দলে ছিল ভগবান ঘোষ, কমল বাকনা, মধু ঘোষ প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন তলোয়ার চালনায় অভিজ্ঞ সুদক্ষ সর্দারগণও তাহার দলভুক্ত ছিল। প্রত্যেক সর্দারের অধীনে অনেক লোক থাকিত। উহারা অনেক সময় মিলিতভাবে ডাকাতি করিত। লুণ্ঠিত দ্রব্য কিভাবে ভাগ করিয়া লইবে—তাহা পূর্ব হইতেই নিজেরা ঠিক করিয়া লইত। এই ব্যবস্থায় যেমন দলভারী করা খুবই সহজ হইত অপর পক্ষে বিভিন্ন পথে ডাকাতদের পলায়নেরও সুযোগ ঘটিত।

হলধর রাজার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে চন্দননগরে ভগবান ঘোষের বাড়ি আসিল। অন্যান্য সর্দাররাও সেখানে ছিল। হলধর রাজার কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, ভাই ভগবান, তুমি বৈরাগী সাজিয়া মন্দিরে প্রবেশ কর। যদি মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণকে হাত করিতে পার তাহা হইলে ব্যাপারটি খুবই সহজ হইবে।

ভগবান রাজী হইল। সে কালনা গিয়া সব কাজ ঠিক করিয়া তিনদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। হলধরকে সে কথা জানাইল। এইবার মহোৎসবে তাহারা একদিন রাত্রিকালে মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মন্দিরের পিছনের দরজাটি খুলিয়া হলধরকে ভিতরে লইয়া গেল। নিজের দেনাপাওনা হাতে লইয়া সেই মূল্যবান বিগ্রহ তাহার হাতে তুলিয়া দিল। মন্দিরে প্রচুর পরিমাণ অর্থ হস্তগত করিয়া সেইদিন রাত্রেই পুরোহিত উড়িষ্যার দিকে নিজ বাসগ্রামে চলিয়া গেল।

এই বিগ্রহ চুরির ব্যাপার লইয়া সেই সময় বর্ধমান জেলার সর্বত্র একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজা কিন্তু ডাকাতদের প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন।

যে সন্ন্যাসীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে—সেই সন্ন্যাসী অল্পদিনের মধ্যে বেশ পয়সা করিয়া ফেলিল। ক্রমে সন্ন্যাসীর সঙ্গে পূজারী ব্রাহ্মণের আলাপ আরম্ভ হইল। প্রথমে শুরু হইল বিগ্রহ চুরির কাহিনী। সন্ন্যাসী পূজারী ব্রাহ্মণদের নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সকল কাহিনী শুনিলেন, ডাকাতির গল্পও শুনিলেন। আনুষঙ্গিক অন্যান্য কথাও। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আকস্মিক অন্তর্ধান। তার বাড়ী-ঘরের পরিচয়। আহত দারোয়ানের নিকট হইতে জানিলেন—ডাকাতদের কথা। হলধর মালই যে এই গর্হিত কার্য করিয়াছে এইরূপ সন্দেহ দারোয়ান বার বার করিল। সন্ন্যাসী এই হত্যাবিহীন ডাকাতির কি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না।

বর্ধমান ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটও মন্দিরের বিগ্রহ চুরির ব্যাপারে নানাভাবে খোঁজখবর করিতেছিলেন। এক সপ্তাহকাল পরে কালনার ঠাকুরবাড়ি হইতে সন্ন্যাসীরা দুইজনে চলিয়া গেলেন। দুইজনে সেখানে থাকিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দারোয়ান দিয়া মন্দিরের পুরোহিতদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা ভয়ে ভয়ে অনেক কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। গ্রামের আরও পঞ্চাশ-ষাটজন লোক সাক্ষ্য দিল।

জগন্নাথ-দর্শনের যাত্রীদলের সঙ্গে যাত্রীবেশে একজন সন্ন্যাসী উড়িষ্যার সাক্ষীগোপালের নিকটবর্তী একটি গ্রামে কালনার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের বাড়ির সন্ধান পাইলেন। সন্ন্যাসী নিজে অযোধ্যাবাসী তীর্থযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেন। পুরোহিতের নাম নীলমণি পাণ্ডা। পাণ্ডামহাশয় গ্রামে আসিয়া ধনীলোকের মত জীবনযাপন করিতেছিলেন। নীলমণি পাণ্ডা কোন তীর্থযাত্রী আসিলে বড় একটা কাছে আসিত না। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিত—পাছে কেহ বিগ্রহ চুরির কথা বলাবলি করে।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ বেশ ঘনিষ্ঠ হইলে, নীলমণি যে পূর্বে বাঙলাদেশে ছিল সে কথা অকপটে বলিয়া ফেলিল! ভবিষ্যতে বাঙলাদেশের অস্বাস্থ্যকর স্থানে যে আর যাইবে না একথাও বলিল। দেশে জমিজমা তালুক কিনিয়াছে—আর কেনই বা যাইবে!

সন্ন্যাসী বলিলেন—'বহুৎ আচ্ছা বাৎ।'

তিন মাস পরের কথা। মন্দিরের পুরোহিত ধৃত হইল। উৎপীড়নের ভয়ে সে অনেক গোপনীয় কথা ফাঁস করিয়া দিল। এমন কি যে রাজা বিগ্রহ চুরি করিয়াছিল, যে দস্যুদের সহায়তায় বিগ্রহ চুরি হইয়াছিল তাহাও নীলমণি পাণ্ডা প্রকাশ করিয়া দিল।

এইভাবে যখন অনুসন্ধান চলিতেছে, মন্দিরের পুরোহিতরা অপরাধ স্বীকার করিয়া বিচারের অপেক্ষায় হাজত ভোগ করিতেছে। হলধর মাল, ভগবান ঘোষ ধরা পড়িলেও স্বর্ণ-বিগ্রহ যে কোথায় গেল তাহা জানা গেল না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল মন্দিরের দরজার পার্শ্বে সুবর্ণ বিগ্রহ পড়িয়া রহিয়াছে।

গ্রামবাসী তাহা দেখিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। যাঁহার বিগ্রহ চুরি গিয়াছিল—তিনি বিপুল উৎসাহে, প্রচুর অর্থব্যয়ে পুনরায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে প্রতিষ্ঠাতা জানাইয়া দিলেন—'দেবতা যখন দয়া করে ফিরে এসে দর্শন দিয়েছেন, তখন তিনি কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রাখতে চান না এবং তাদের দণ্ড দিতে ইচ্ছুক নন। তবে সরকারের যা ইচ্ছে তা—করতে পারেন।'

হাকিম তা শুনলেন না। অপরাধীদের সাজা হোল। একমাত্র শাস্তিভোগ করিলেন না রাজা, যিনি বিগ্রহ চুরির পুরোভাগে ছিলেন। এই অদ্ভুত চুরির উদ্দেশ্য কী তাহা প্রকাশ পায় নাই।

জনপ্রবাদ আছে—'যে গৃহে এই বিগ্রহ থাকে, সে গৃহে লক্ষ্মীদেবী অচলা হয়ে থাকেন এবং পরলোকে স্বর্গলাভ ঘটে। স্বর্গে যাবার লোভে রাজা লোক দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন।'

সরকারী বিবরণীতে আছে—Two or three months passed over the Rajah had heard what was going on, and one morning the idol was found in the village from which it had been stolen. The theft had been comitted from religions, not mercenary motives, The idol was considered so sacred that its possession in this world was to ensure happiness in the next.



৪০ সর্দার বিশ্বনাথ রায়

ডুমুরদহ সেকালে ডাকাতির জন্য কুখ্যাত ছিল। গঙ্গানদীর তীরবর্তী বনে এ অঞ্চলের লোকেরা নৌকাযাত্রীদের উপর ডাকাতি করিত। সেকালে ডুমুরদহের রায় বংশের প্রসিদ্ধি ছিল। ঐ বংশের কেশব রায় ও গুমান রায়ের নামে লোকে ভয়ে কাঁপিত। ইহারা ছিল বোম্বেটে। ও-অঞ্চলে নৌকার সাহায্যে ডাকাতি করা ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। নৌকার সাহায্যে ডাকাতি করা ইহারাই প্রথম চালু করে।

বাংলা ভাষাতে 'তীর্থ ভ্রমণ' নামে একখানি বই আছে। বইখানার লেখক স্বর্গত যদুনাথ সর্বাধিকারী। তিনি সেকালের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তীর্থভ্রমণ পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন—'ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে শিজে ডুমুরদহ—সেখানে কেশব রায় ও গুমান রায়ের বাড়ী। উহাদের ভয়ে নৌকাপথে কেহ যাতায়াত করিতে পারিত না। নৌকা-ডাকাতির উহারাই সৃষ্টিকর্তা। কলিকাতার বাগবাজারের ঘাট পর্যন্ত তাহাদের বোম্বেটের নৌকা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত।'

দুর্গাচরণ রায় লিখিত 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' শীর্ষক পুস্তকে ডুমুরদহ সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—বামদিকে দেখা যাইতেছে ডাকাত প্রধান স্থান ডুমুরদহ। এক সময়ে ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাত ছিল। ঐ গ্রামের লোকেরা বাড়ীতে অতিথিদিগকে বাস করিতে দিয়া রজনীতে প্রাণ-সংহার করিত। ফলতঃ সেই সময় কি জলপথে কি স্থলপথে কোনখানেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া টাকাকড়ি সহ কেহ গেলে নিস্তার থাকিত না। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথবাবু এই স্থানে গঙ্গাতীরস্থ একটি দোতলা কোঠাবাড়ীতে বাস করিতেন। বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বহুদূর পর্যন্ত কোথায় কি আছে দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহার অধীনস্থ ডাকাতেরা নৌকাযোগে যশোহর পর্যন্ত ডাকাতি করিত।

যশোহর শহরের কাছে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। গ্রামটি যেমন বড়, তেমনি সেখানে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। গ্রামের শেষ প্রান্তে একজন জমিদারের বাড়ী। জমিদারের ধনদৌলত টাকা পয়সার অভাব নাই। কিন্তু লোকজন, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মনে বিশেষ শান্তি ছিল না। তিনি ভয়ে ভয়ে থাকিতেন—কখন তাঁহার বাড়ীতে ডাকাত পড়ে।

একবার বিশ্বনাথ সর্দারের নিকট হইতে একখানি চিঠি আসিল 'সাবধান, তোমার বাড়ী ডাকাতি করবো। বাধা দিলে বিপদ হবে।' ভদ্রলোক চিঠি পাইয়া ভীষণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে বাড়ী ছাড়িয়া সপরিবারে দূর গাঁয়ের এক আত্মীয় বাড়ী গিয়া উঠিলেন। পথে যাহাতে কোন বিপদ না ঘটে সেই কারণে পাহারাওয়ালা, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদিও চলিল। টাকাকড়ি ইত্যাদি যতদূর সম্ভব সঙ্গে লইলেন। বাড়ীতে রহিলেন তাহার দূরসম্পর্কীয় এক দরিদ্র পিসিমা। বাড়ীর রক্ষয়িত্রীরূপে তিনি একাই বাড়ী আগলাইয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ সর্দার সদলবলে এই গ্রামে আসিলেন এবং সোজা জমিদার বাড়ী গেলেন। সঙ্গের লোকজন আশে পাশে লুকাইয়া রহিল। সেকালে ডাকাতেরা পাল্কি করিয়া ডাকাতি করিতে আসিত। বিশ্বনাথ পাল্কি করিয়া আসিয়াছিলেন। পাল্কি হইতে নামিয়া দেখিলেন—বাড়ী নিঝুম—জন-মনুষ্যের চিহ্নমাত্র নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছপালা ও বাঁশবনে অসীম নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। তাহার উপর বাড়ীর নির্জনতা এক থমথমে ভাব ধারণ করিয়াছিল।

জমিদার বাড়ীর এই দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বনাথ খুবই বিরক্তি বোধ করিলেন। এখন তিনি কি করিবেন? ধীরে ধীরে তিনি বাড়ীর অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন পাখী খাঁচা ছাড়া—শুধু এক বৃদ্ধ সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলসীতলায় প্রণাম করিতেছে। পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া পাশে একটি লোককে দেখিয়া বুড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে বাবা তুমি?'

বিশ্বনাথ উত্তর দিল—'আমি একজন বিদেশী অতিথি।'

বুড়ি ভাবিল—'বাড়ীর কর্তার কোন আত্মীয় হবে। তাই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—'এস বাবা এস'।

বিশ্বনাথকে তিনি ভাল ঘরে লইয়া গেলেন। হাতমুখ ধুইবার জল দিলেন। পরে বলিলেন—'বাবা, বাড়ীর কর্তা-গিন্নী ছেলেপুলে নিয়ে ভিন গাঁয়ে চলে গেছেন। কে এক বিশে ডাকাত নাকি আজ ডাকাতি করতে আসবে। আমাকে এখানে একা রেখে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে বসে তামাক-টামাক খাও বাবা। আমি খাবার তৈরি করে নিয়ে আসি।'

বৃদ্ধা চলিয়া গেল। বিশ্বনাথ একটি কথাও না বলিয়া দিব্যি আরামে তামাক খাইতে লাগিল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তাহার নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল।

এদিকে বৃদ্ধা খাবার তৈয়ারি করিয়া আগন্তুকের বসিবার আসন পাতিয়া দিল। সম্মুখে খাবারের থালা আগাইয়া দিল। পাশে বসিয়া বলিল—'এটি খাও, ওটি খাও' বলে সস্নেহে খাদ্যদ্রব্যাদি দিতে লাগলো। বৃদ্ধার এরূপ সদয় ব্যবহারে বিশ্বনাথ আশ্চর্য বোধ করল।'

বৃদ্ধা বলিল—'দেখ বাবা, তুমি যখন এ বাড়ীতে এসেছো…তখন রাত্রিটি থেকে যাও। কোথাও যেও না বাবা। বিশে ডাকাত এলে আমাকে জ্যান্ত রাখবে না। মেরে কেটে চলে যাবে।'

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—'ভয় কি! আমি আজ রাত্রিতে থাকবো 'খন।'

সে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল। এমন সময় বৃদ্ধা তাহার কাজ সারিয়া জপের মালা হাতে

ভগবানের নাম করিতে করিতে বলিলেন—'দেখ বাবা, আমার বরাত মন্দ! নইলে দাসীবৃত্তি করবো কেন? আমার জমি-জমা বাড়ীঘর টাকাকড়ি সব ছিল। স্বামী আর ছেলে মারা গেলে পর, আমার টাকাকড়ি অলংকার জমিজমা সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে দেবর ও জ্ঞাতিরা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই দুটি ভাতের জন্য এখানে রাঁধুনিগিরি করছি—এই দূরসম্পর্কের আত্মীয় বাড়ী। এমনি অদৃষ্ট বাবা। আজ যদি আমার ছেলে বেঁচে থাকতো, তাহলে কি জ্ঞাতিরা এমন সর্বস্বান্ত করে তাড়িয়ে দিতে পারতো। অদৃষ্ট মন্দ। তাই এ বাড়ীতে এ-অবস্থায় আছি।' এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধা পুত্রশোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথ সব শুনিয়া দুঃখিত হইল। কৌশলে বুড়ির নিকট হইতে তাহার দেবর, জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনদের খবর জানিয়া লইল। তাহাদের বাড়ীঘরের ঠিকানাও জানিয়া লইল।

বিশ্বনাথ এবার জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা আপনি কি বিশে ডাকাতকে কোনদিন দেখেছেন?'

'না বাবা! কি করে দেখবো। ডাকাত দেখতে যেন কোনদিন না হয়।'

"আচ্ছা, আমি যদি বলি আমিই বিশে ডাকাত, তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

বিশ্বনাথ হাসিয়া এমনভাবে কথাগুলি বলিল যে, বৃদ্ধা তাহাতে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হইল না। সে বলিল—'না, তুমি কখনও বিশে ডাকাত হতে পার না। তোমার মতো সুন্দর ছেলে কি কখনো ডাকাত হতে পারে? আমার ছেলেও তোমার মত সুন্দর ও বলিষ্ঠ ছিল। সে গত বছর মারা গেছে—তাই তো এ বাড়ীতে রান্নার কাজ করতে এসেছি।' এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধার দুই চক্ষু বহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল। বিশ্বনাথ নীরব হইল।

বিশ্বনাথ পরদিন অন্য বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া যে অর্থ পাইয়াছিল তাহা বৃদ্ধাকে দিয়া গেল। সে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'মা তোমার কোন ভাবনা নেই। আমি তোমার দেবর ও জ্ঞাতিদের কাছ থেকে সব সম্পত্তি উদ্ধার করো দেবো।'

বিদায় লইবার পূর্বে বৃদ্ধার চরণ-ধূলি মাথায় লইয়া বলিয়া গেল—'মা আমি সত্যি সত্যি বিশে ডাকাত। যখন বিপদে পড়বে, তখন তোমার এই ছেলেকে মনে করবে। আমার দলের লোকেরা তোমাকে মাঝে মাঝে দেখে যাবে। তুমি তোমার বাড়ী-ঘর সম্পত্তি যাতে ফিরে পাও, সে ব্যবস্থা আমি করবো। সাবধান, আমার কথা কাউকেও বলো না, মা।'

বৃদ্ধা বিশ্বনাথের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল—'আমি বিধবা বামুনের মেয়ে। আমি তোমার অনিষ্ট করবো? এমন কথা মনে ভেবো না। ছেলের সর্বনাশ কি মা কখনো করে? তবে আমার একটি কথা মনে রাখবি বাবা?'

—কি মা?

"এ বাড়ীতে ডাকাতি করো না। বাড়ীর কর্তা গিন্নী বড় ভাল মানুষ। গরীবের বাপ-মা। আমার প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করেন। আমার মতো অনেক অসহায়কে সাহায্য করেন।"

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে বলিল—'তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আমি এ বাড়ীতে কখনও ডাকাতি করবো না। তবে একদিন বাড়ীর কর্তার সঙ্গে দেখা করে পরিচয়টা দিয়ে যাবো। কি বলো?

বৃদ্ধা বলিলেন—'বাবা, সে কাজটি করো না। মানুষকে বিশ্বাস নেই। তোমার কোন বিপদ হয় সে আমি চাই না। তুমি যে আমার ছেলে। ঠিক তারই মত। তোমাকে দেখে মনে হয়—হারানো রতন ফিরে পেয়েছি।'

বিশ্বনাথ চলিয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যে সে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল। বিধবার জ্ঞাতি ও দেবরদের হাত হইতে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া বৃদ্ধাকে দিয়াছিল। বিশ্বনাথ ডাকাতের সদাশয়তার আরও অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ একটা বড় রকমের ডাকাতি করিতে গিয়া ধরা পড়ে। হুগলী জেলে তাহার ফাঁসী হয়। বিশ্বনাথের ফাঁসীর খবর তখনকার বিখ্যাত সংবাদ-পত্র সমাচার দর্পণে, (১৮১৯ ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১২২৬) নিম্নলিখিত ভাবে বাহির হইয়াছিল।— *

৪১ আচ্ছারাম ও কুণ্ডীর জমিদার



রংপুর জেলার কুণ্ডী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সে গ্রামের জমিদার ছিলেন ব্রাহ্মণ। ১৭৯৩ সালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহারা অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ী, বাহির মহল, অন্দর-মহল, বাগানবাড়ী ইত্যাদি ছিল। চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। সকলের পিছনে বাগানবাড়ীর দেওয়ালের পর হইতেই বহুদূর বিগত একটি নিবিড় অরণ্য। পাশে একটি ছোট নদী তির তির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। আশে পাশে কয়েকটি নদী। কুণ্ডী গ্রামে জমিদার বাড়ী ছাড়াও অনেক সম্ভ্রান্ত তালুকদার ব্যবসায়ী ও মহাজনের বাস। জমিদারের বিভিন্ন শরিকেরাও বাস করেন। এক বড় শরিক চৌধুরী মহাশয় প্রৌঢ়, বলবান, সুদক্ষ শিকারী। প্রজাবৎসল জমিদার বলিয়া

* [ডাকাতিঃ এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে মধ্যে হয় এমত শুনিতে পাইতেছি। এমত রাত্রি নাই যে তাহাতে ডাকাতি হয় না, কিন্তু এমত থাকিবে না। পূর্বে এই অঞ্চলে এমত চোর-ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক-লোক পাঁচ-সাত জন একত্র, না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জেলাতে অনেক ডাকাত জমা হইয়াছিল। তাহাদের ভিতর সর্দার বিশ্বনাথবাবু নামে এক দুরন্ত ডাকাত ছিল তাহার হুকুমে দিন ও রাত্রি ডাকাতি হইত। অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে, তাহারা পূর্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভাল মানুষ হইয়াছে।]

সকলের প্রিয়।

বাহির বাড়ীর তোরণ পার হইলেই কাছারিবাড়ী। কাছারিবাড়ী ও অন্দরমহলের মাঝখানে জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানা। সেখানে বসিয়াই তিনি প্রজাদের অভাব-অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করেন এবং যথাযথ বিচার করেন। নায়েব গোমস্তাদের প্রয়োজন মত আদেশ ও উপদেশ দেন।

একদিন সকালবেলায় জমিদার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া গড়গড়ার নল টানিতেছিলেন। জমিদারির কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। এমন সময় একজন বরকন্দাজের সঙ্গে আসিল পাঁচজন ভেটিয়া জমিদার। তাঁহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিলে মনে হয় তাহারা ভূটানের অধিবাসী।

ভেটিয়া কয়টির কুৎসিত চেহারা। বলিষ্ঠ গঠন এবং বিচিত্র বেশ-ভূষায় ভীষণ কদাকার দেখাইতেছিল। দলের প্রধান বলিল—'আমরা সুদূর ভূটান হইতে হুজুরের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। জাতিতে আমরা ভোটদেশের কীচক। কিরাতও আমাদের বলে।

চৌধুরী মহাশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'তোমার নাম কি?'

'হুজুর, আমাকে লোকে আচ্ছারাম কাজিয়া বলে ডাকে।'

'আচ্ছা, আমার কাছে তোমাদের কি প্রয়োজন?'

আচ্ছারাম বলিল—'আজ্ঞে নিবেদন করছি। আমরা আমাদের দেশের ঘোড়া, কম্বল, প্রভৃতি বিক্রী করে বেড়াই। নেকমর্দনের মেলায় আমাদের অনেক টাঙ্গন বিক্রি হয়। তাই মেলার দিকে যাচ্ছি। আমাদের একদল লোক আগেই মেলার দিকে রওনা হয়ে গেছে।'

—'বেশ আমাকে কী করতে হবে বল?'

—'হুজুর, আমরা কোম্পানির টাকার বদলে দেশ-বিদেশের টাকাও বিক্রী করে থাকি। এও আমাদের এক ব্যবসায়।'

এই কথা বলিয়া থলিয়া হইতে কয়েকটি টাকা বাহির করিল। ইহা দেখিয়া জমিদার শিহরিয়া উঠিলেন। এইগুলি যে নারায়ণী মুদ্রা! কোথা হইতে উহারা ইহা পাইল। এই টাকার যাহারা লেনদেন করিত তাহারা ভাল লোক নহে। এই কথা সকলেরই জানা ছিল। জমিদার মহাশয় বিলক্ষণ ইহা জানিতেন। তিনি বলিলেন—'এ টাকা তো তোমাদের ভোটানের নয়। এতো সাধু-সন্ন্যাসীর ফকিরদের কাছে থাকে দেখেছি। তারা তো দেশে দেশে লুঠতরাজ করে বেড়ায়। তুমি কি ভাবে ও-টাকা পেলে? কে তোমাদের দিল?'

জমিদার মহাশয়ের কথায় ভেটিয়ারা ভয় পাইয়া গেল। তাহাদের মুখে-চোখে অশুভ ছায়া দেখা দিল। কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—আগেই তো বলেছি হুজুর, আমরা ভেটিয়া কীচক জাতি, নানাস্থানে ভোটকম্বল, ঘোড়া বিক্রি করে বেড়াই। অনেকগুলি টাকা তাই হাতে পড়েছে। একেবারে খাঁটি চাঁদি। এমন টাকা সহজে মিলে না। আপনি যদি......।

জমিদার মহাশয় কিছু টাকা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, তোমার নামই তো আচ্ছারাম কাজিয়া।

—'হ্যা, হুজুর আগেই তো বলেছি।'

জমিদার মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। এই নাম যেন তিনি পূর্বেই শুনিয়াছেন। সেইজন্য তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। তিনি লোকটার দিকে আবার তাকাইয়া দেখিলেন। উহার মাথায় উসকোখুসকো বড় বড় চুল। মুখটা চ্যাপ্টা ও লাল। নাকটার চিহ্নমাত্র দেখা যায় দুইটি নাসারন্ধ্রের জন্য। দুইটি হৃষ্টপুষ্ট শক্তিশালী হাত। চোখ ছোট-ছোট, পায়ে লম্বা জুতো। লম্বা আলখেল্লার মত পোশাকে সারা শরীর ঢাকা। কাঁধে দুইখানা কম্বল ঝুলান বেশ থাক করিয়া বাঁধা। সঙ্গের চারিজন লোক বেশ জোয়ান। তাহারা কৌতুহলভরে চারিদিকের আসবাবপত্র লক্ষ্য করিতেছিল।

জমিদার মহাশয় সহজ সরল ভাবেই কথাবার্তা বলিলেন। তাহাদের নিকট হইতে কয়েকটি নারায়ণী মুদ্রা বিনিময় করিলেন।

তাহার পর একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া উহাদের খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

আচ্ছারাম বিনীতভাবে বলিলেন—'আপনার দয়াই যথেষ্ট। আমাদের এখন অনেক কাজ। মেলায় যেতে হবে। আর একদিন ফেরার পথে আপনার অতিথি হবো।'

এই কথা বলিয়া আচ্ছারাম সদলে প্রস্থান করিল। তাহারা চলিয়া গেলে জমিদার মহাশয় তাঁহার বিশ্বস্ত ব্রজ সর্দারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রজ আসিলে তাহাকে বলিলেন—'ব্রজ, আজ রাত্রে খুব সতর্ক থাকবে। আমার সন্দেহ হয় এই ভেটিয়ারা কোন ডাকাত দলের লোক।

ব্রজ জমিদারবাবুকে সেলাম করিয়া করজোড়ে বলিল—'হুজুর নিশ্চিন্ত থাকুন। ভয়ের কিছু নেই। আমরা সজাগ তো থাকবই। আপনিও মহারাজ একটু হুঁশিয়ার থাকবেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

জমিদারবাবু বলিলেন—'ব্রজলাল যা বললাম, তাই কর। দেউড়িতে ও বাড়ীর চারদিকে সেপাই মোতায়েন করো। এখুনি খোঁজ নাও—কোথায় গেল ভেটিয়ার দল।'

ব্রজলালকে যথারীতি উপদেশ দিয়া তিনি মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

আচ্ছারাম জমিদার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে বাড়ীর পিছনে নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। বনের মধ্যে এক পুষ্করিণীর পাড়ে তাহার দলের লোকজন বসিয়াছিল। উহাদের সঙ্গে ছিল লম্বা লম্বা তলোয়ার, ঢাল, সড়কি, বল্লম। কয়েকজন লোক রান্নাবান্নার যোগাড় করিতেছিল। আচ্ছারাম ও তাহার সঙ্গীদের নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া জাতীয় ভাষায় তাহারা সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল। আচ্ছারাম যেমন জিহ্বা বাহির করিল, অমনি দলের সব লোক জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে সকলে একস্থানে মণ্ডলাকারে বসিল। তাহার পর আচ্ছারাম চারিদিকে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলি হাঁ, হাঁ, হুঁ, হুঁ শব্দ করিতে করিতে যার যার স্থানে ফিরিয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয়, সব কাজই নীরবে সম্পন্ন হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বনের ভিতর দিয়া কে যে কোথায় ছিটকাইয়া গেল—তাহার কোন চিহ্নই রহিল না। সেখানে থাকিল আচ্ছারাম

ও সঙ্গী পাঁচজন। আরও গভীর রাত্রে লাল মশালের আলো দেখিয়া তাহারাও বনভূমি পরিত্যাগ করিল। বনের ভিতর শুধু বাতাসের সোঁ সোঁ সাঁই সাঁই শব্দ ও বুনো পশুদের চীৎকার ভাসিয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। জমিদার মহাশয় সন্ধ্যার একটু পরে মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার পর ভূগর্ভের নিরাপদ কক্ষে তাহাদের রাখিয়া দিলেন। চারিদিকে সতর্ক পাহারা মোতায়েন রহিল। পুরোভাগে ব্রজলাল অধিনায়করূপে চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাহার 'খবরদার' হো হো চিৎকারে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এত সতর্কতা ও ঘোরাফেরা সত্ত্বেও ঘটিল এক বিচিত্র ঘটনা।

আচ্ছারাম ও দলের লোকজন সুযোগ বুঝিয়া ঝোপঝাড় হইতে বাহিরে আসিল। পরে তাহারা দেওয়াল টপকাইয়া একে একে অন্দরমহলের দিকে লাফাইয়া পড়িতে লাগিল।

আচ্ছারাম ও তাহার পাঁচজন সঙ্গী দীর্ঘ তলোয়ার ও বল্লম লইয়া জমিদার মহাশয়ের ঘরের কাছে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আচ্ছারাম ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ হৈ-চৈ চিৎকার শুরু হইল—

'—আগুন! আগুন! আমাদের কুঁড়েঘর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রক্ষে কর।' দলের লোকেরা জমিদার বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর আগুন লাগাইয়া দিয়া আসিয়াছিল।

জমিদার মহাশয় অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া শেষটায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। পাশেই মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সামনে দোনলা বন্দুকটিতে টোটা ভরা।

হঠাৎ একটি ভীষণ শব্দে তাহার ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি ভীষণ দর্শন মূর্তি প্রবেশ করিল। তিনি তাহাদের দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিলেন। লোকগুলির মাথা ভর্তি একরাশ অবিন্যস্ত চুল। সারা দেহ কালো রঙের পোশাকে আবৃত—হাতে রক্তমাখা শাণিত দীর্ঘ তরবারি। তাহারা ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিতেছিল। জমিদার মহাশয় প্রথমটা আঁতকাইয়া গেলেও মনের বল হারাইলেন না। তিনি তাহাদের কদাকার রূপ ততোধিক কুৎসিত নৃত্য, তলোয়ার ঘোরানো দেখিয়া ভয় পাইলেন না। যেই তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল অমনি এক নিমেষে বিছানা হইতে লাফাইয়া একজনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দস্যুটি মাটিতে পড়িয়া গেল। ধুঁয়োয় ঘর আচ্ছন্ন হইল। জমিদার মহাশয় সেই সুযোগে বন্দুক ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ঘরের পিছনের সিঁদ দিয়া দ্রুত নীচে নামিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, আচ্ছারাম তোমার মাথা এখনই উড়াইয়া দিতেছি, দাঁড়াও। মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক গর্জিয়া উঠিল—গুড়ুম্। ভেটিয়ারা তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিল না।

এদিকে গ্রামের লোকেরা বন্দুকের শব্দ, হল্লা, চিৎকার শুনিয়া জমিদার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিল। ভেটিয়া কীচদের সঙ্গে জমিদার বাড়ীর সেপাই ও গ্রামবাসীদের ভীষণ লড়াই চলিল। গ্রামের লোকের হাতের কাছে লাঠি, সোটা, বল্লম, দা, তলোয়ার যা পাইয়াছিল তাহা লইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল।

জমিদার মহাশয় বন্দুকের গুলি ছুঁড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ভেটিয়া ডাকাতরা তখন প্রাণ লইয়া পলায়নে বাধ্য হইল। গ্রামবাসীরা তাড়া করিয়া দুইজন ডাকাতকে ধরিয়া ফেলিল। চারিজন নিহত হইল। দলের বাকী লোকেরা যে কোন পথে অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহার সন্ধান মিলিল না। জমিদারপক্ষের ছয়জন মারা গেল। ইহাতে ব্রজসর্দার অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

কুণ্ডীর জমিদারের সাহসিকতা, নির্ভীকতা প্রশংসার যোগ্য। সরকারি কাগজপত্রে তাঁহার বীরত্বের উল্লেখ আছে। অন্যান্য জমিদারদের মতো পলাইয়া যাননি—বরং লড়াই করিয়া ডাকাতদের দমন করিয়াছিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল ব্রজসর্দারের। সে নিজে দুইটি ডাকাতকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

এই কীচকদলের একটি ইতিহাস আছে। যে দুইজন ধরা পড়িয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে জানা যায়। ইহাদের দেশ ভোটান ও নেপালের পার্বত্যপ্রদেশে। তাহারা যাযাবর জাতি। পেশায় ছিল তাহারা বেদেদের মত। হাত দেখা, বাজি করা, চুরি ডাকাতি করিয়া বেড়ানোও ছিল তাহাদের অন্যতম জীবিকা। ইহারা কিরাত নামেও পরিচিত—ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ভেটিয়াদের মত। কীচকের দাবী করে ভীমসেন নামে তাহাদের একজন পূর্বপুরুষ বিজয়ী রাজা ছিলেন। ভীমসেন রংপুরের মাঝামাছি ছটুরাজা নামে একজন রাজাকে পরাজিত করিয়া রংপুর জেলায় আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়া জেলা পর্যন্ত তাহার অভিযান চলিয়াছিল।

কুণ্ডীর জমিদার-বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া আচ্ছারাম পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া পলাইয়াছিল। তাহাকে কোম্পানির সেপাই-সান্ত্রীরা ধরিতে পারে নাই। এই দুর্দান্ত ডাকাতের বাড়ী ছিল ভোটান অঞ্চলের ফকিরগঞ্জ গ্রামে।

একসময়ে ঢাকা শহরের উত্তরাংশে সেগুন-বাগান অঞ্চলে কয়েক ঘর কীচকের বাস ছিল। এখন কীচকদের সন্ধান বড় একটা মেলে না।*



* ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর জেলার প্রাচীন কাগজপত্রে এই ডাকাতির উল্লেখ আছে। তাহা এই: Another thieving gang called Kichaks or Godemars, came from Bhootan. They were generally looked upon as Gypsies, who snared game, told fortunes, and stole as they had opportunity. The looting of the Cooch Behar tribute at Mogulhat in 1793 was traced to them, as they were found to be changing the new Narainy rupees, of which it consisted in the markets : and amongst other dacoties committed by them, there was one Coondv Zeminder's house, in which six persons were killed and over half a lakh in cash was stolen.



৪২
তরুণ মাঝী ও বীরু মুসলমান

তরুণ মাঝির বাড়ী ছিল হালিশহর। সে ছিল গঙ্গার ঘাটে একজন খেয়ার মাঝি। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে যাত্রীদের পারাপার করিত। সন্ধ্যার পূর্বে অনেক ডাকাতের দলকেও সাধারণ যাত্রীর বেশে পারাপার করিতে দেখা যাইত। লোকে তাহাদের চিনিতে না পারিলেও তরুণ মাঝি তাহাদের জানিত ও চিনিত। অনেক সময় কোন্ মহাজনের নৌকা কোন জেলায় যাইতেছে তাহার হদিশও ডাকাতেরা তরুণ মাঝির নিকট হইতে জানিয়া লইত। এই ডাকাতদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কলিকাতা। ঐখানেই তাহারা চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয় করিত। কলিকাতার বিরাট জনসমুদ্রের মধ্য হইতে তাহাদের ধরা বড় সহজ ছিল না। ডাকাতের দল এই অঞ্চল হইতে নৌকাপথে হুগলীর গ্রামে গ্রামে, এমনকি সুন্দরবনে গিয়াও ডাকাতি করিত। পরে নির্দিষ্ট আড্ডায় ফিরিয়া আসিত। যদি কোন সময় ধরা পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিত তাহা হইলে চোরাই মাল ও অস্ত্রশস্ত্র নদীর বুকে ফেলিয়া দিত। প্রাণে বাঁচিলে ত আবার পুরাদমে ডাকাতি করা যাইবে। ডাকাতেরা নানা নাম ব্যবহার করিত। এইজন্য তাহাদের আসল নাম জানা যাইত না। তাহাদের ধরাও সহজ ছিল না।

রাত্রিতে ডাকাত-সর্দারগণ তরুণ মাঝির সন্ধান লইয়া তাহার বাড়ী যাইত। উদ্দেশ্য কোন মহাজনের নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা জানিয়া লওয়া। ওই ডাকাতদের একজনের নাম ছিল নিমচাঁদ পোদ্দার। মজা হইল, নিমচাঁদ তাহার আসল নাম নহে—আসল নাম হইল লিয়াব বা বীরু মুসলমান।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সে ছিল সখসাগরের ডাকাত দলে। পরে কলিকাতার লাঠিয়ালগণ ডাকাত-দলে যোগ দেওয়ার পরে সে ধরা পড়ে এবং নদীয়ার জেলে বন্দী থাকে। সেখান হইতে বীরু কৌশলে পলায়ন করিয়া নিমচাঁদ এই ছদ্মনামে ডাকাতি শুরু করে। কোন প্রকারেই ইংরেজ সরকার তাহাকে ধরিতে পারিতেছিল না। এই সময় সে নৌকায় নৌকায় ডাকাতি করিত এবং নানা স্থানে লুকাইয়া থাকিত।

তখন মিঃ ওয়ার্ড নামে একজন ইংরেজ হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার উপর কঠোর আদেশ হইল—যে-কোন উপায়ে হোক নিমচাঁদকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। বীরু মাঝি কেন নিমচাঁদ নামে নিজের পরিচয় দিত তাহার একটি কারণ ছিল। হাওড়ার একজন দোকানদারের নাম ছিল নিমচাঁদ। সে দোকানী হইয়াও চোরাই মালের কারবার করিত। পরে কিন্তু আসল নিমচাঁদ ডাকাত দলে মিশিয়া ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। বিচারে তাহার সাজাও হইয়াছিল।

বীরু মুসলমান এবং তাহার দলের লোক তরুণ মাঝির কাছে জানিতে পারিয়াছিল হালিশহরের এক ধনী মহাজন কয়েক হাজার টাকা লইয়া তাহার মুহুরিকে বরিশালে চাউল কিনিতে পাঠাইবে। কবে যাইবে, কখন রওনা হইবে সব খবর তরুণ মাঝির কাছে জানিতে পারিয়া সেও উদ্যোগ আয়োজন শুরু করিল। অবশেষে একদল ডাকাত দুইখানি ছিপ নৌকা লইয়া উহাদের রওনার দিন পিছন পিছন চলিল। তরুণ মাঝি শুধু খেয়া পারাপার করিত না—সেও ডাকাতি করিত, নানা খবর দিত ডাকাতদলকে।

হালিশহরের মহাজনের নৌকা চিনাইয়া দিবার জন্য বীরুর দল তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিল।

মহাজনের নৌকা সারাদিনের পর শান্তিপুরের অনতিদূরে অন্য কয়েকখানি যাত্রী নৌকার সঙ্গে নোঙ্গর করিয়াছে। নদীর খাড়াই পাড়, ঠিক যেন পাহাড়। পাড়ে উঠিয়া নিকটবর্তী দোকান হইতে মাঝি-মাল্লারা জিনিসপত্র কিনিয়া রান্না করিতেছে, নিজেদের মধ্যে সুখদুঃখের কথা বলিতেছে। অন্যান্য মাঝিরাও তাহাদের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত—এমন সময় দুইখানি ছিপ নৌকা অতি দ্রুত মহাজনী নৌকার পাশে আসিয়া ভিড়িল এবং মহাজনী নৌকা আক্রমণ করিল। নৌকার ভিতরে তখন মুহুরী মহাশয় একাই ছিলেন। শিয়রের নিকটে দুইটি বড় বড় থলিয়ায় টাকা ছিল।

নৌকার সামনে গলুইয়ের কাছে পাহারাদার বন্দুক হাতে পাহারা দিতেছেন, দস্যুরা যেমন নৌকা আক্রমণ করিল অমনি সদাজাগ্রত প্রহরী বন্দুক ছুঁড়িল। একজন ডাকাতের মাথায় বন্দুকের গুলি লাগায় সে তৎক্ষণাৎ নৌকা হইতে জলে ছিটকাইয়া পড়িল। ওদিকে পাড়ে মাঝি-মাল্লারা যেখানে রান্না করিতেছিল, তাহারা বন্দুকের শব্দে চমকিয়া উঠিল। অতঃপর তাহারা রান্নাবান্না ফেলিয়া নিচে গঙ্গার বুকে যেখানে নৌকাগুলি বাঁধা ছিল সেখানে ছুটিয়া আসিল।

মহাজনের নৌকার প্রহরীকে কোনক্রমেই ডাকাতরা পর্যুদস্ত করিতে পারিল না, সে পর পর গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। নির্জন গঙ্গার তীর বন্দুকের আওয়াজে কাঁপিয়া উঠিল। ডাকাতদল ভয়ে ছিপ লইয়া পলাইতে শুরু করিল।

ইতিমধ্যে কয়েকজন সুচতুর ডাকাত কৌশলে নৌকার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা মুহুরীকে আক্রমণ করিয়া একটি থলিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। তাহারা যে থলিটা লইয়া গিয়াছিল উহা টাকার থলি নহে, পয়সার থলি।

যথাসময়ে মহাজনের নিকট ডাকাতির সংবাদ পৌছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিলেন। পুলিশ, দারোগা আসিল—সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বাড়ী খানাতল্লাশি হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এইবার খোঁজ পড়িল তরুণ মাঝির—তরুণ মাঝির কোন সন্ধান মিলিল না।

যেদিন মহাজনী নৌকা বাখরগঞ্জের দিকে রওনা হইয়া যায়—সেই দিন হইতে তরুণ মাঝি হালিশহর হইতে নিখোঁজ হইয়াছিল। গ্রামের লোকেরা সব খবরই জানিত···কিন্তু ভয়ের জন্য কেহই কিছু বলিল না। মাঝি আর দেশে ফিরিল না। ডাকাতেরা পয়সার থলি খুলিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, হায়রে অদৃষ্ট।

সেই সময় প্রত্যেক বন্দরের ও শহরের ঘাটমাঝিদের সঙ্গে ডাকাতদের যোগ-সাজস ছিল। তরুণ মাঝি ডাকাতিতে আশানুরূপ ফল না পাইয়া চুঁচুড়ার ঘাটমাঝিদের নিকট উপস্থিত হইল এবং জানিতে পারিল এই ঘাটে যে-বড় নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, উহাতে দুই হাজার বস্তা কাপড় বোঝাই রহিয়াছে। এই মাল মুর্শিদাবাদ যাইবে। তরুণ মাঝি এই সংবাদ পাইয়াই ডাকাত দলের কাছে ছুটিল। ডাকাতদল মহা আনন্দে ঐ নৌকাকে অনুসরণ করিয়া পিছু পিছু চলিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের এক নির্জনস্থানে ডাকাতেরা লুঠ করিল। লুঠের মাল চুঁচুড়া শহরের জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল।

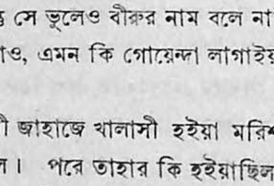
বিধির এমনই বিধান, যে মহাজনের মাল লুঠ হইল···তাহার সহিত ঐ ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লেন দেন ছিল দীর্ঘ দিনের। সে একদিন ঐ ব্যবসায়ীর দোকানে তাহার লুণ্ঠিত মাল দেখিয়া বিস্মিত হইল। ব্যাপারীকে সব কথা বলিল। সে খুবই প্রমাদ গণিল। অবশেষে দারোগা-পুলিশের হাঙ্গামা না করিয়া দোকানী ব্যাপারটি আপোষে মিটাইয়া ফেলিল।

পুলিশের কাছে খবরটি গোপন রহিল না—তাহারা অনুসন্ধান করিয়া ব্যাপারটির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিল। কিন্তু মহাজন ও দোকানী কাহারও নাম প্রকাশ করিল না।

তখন ডাকাতি দমন বিভাগের কমিশনার ছিলেন মিঃ ওয়ার্ড। আর সহকারী ছিলেন এলফিনস্টোন জেকসন—ঐ বিভাগের একজন সুকৌশলী ও সুদক্ষ অফিসার। তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তরুণ মাঝি ও তাহার দলবলকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। বিচারে তাহার কঠোর শাস্তি হইয়াছিল। তরুণ মাঝির স্বীকারোক্তির ফলে অনেক ডাকাত ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু সে ভুলেও বীরুর নাম বলে নাই। ওয়ার্ড সাহেব নানা চেষ্টা করিয়াও, এমন কি গোয়েন্দা লাগাইয়াও বীরুকে ধরিতে পারেন নাই।

শুনা যায়, বীরু এক সমুদ্রগামী জাহাজে খালাসী হইয়া মরিশাস ও বোম্বাই হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিল। পরে তাহার কি হইয়াছিল—সে দেশে ফিরিয়াছিল কিনা তাহা আদৌ জানা যায় নাই।

৪৩ বাঁশবেড়িয়ার কালাচাঁদ বাবু



বাঁশবেড়িয়ার কাছে একটি পল্লী। পল্লীর মধ্যে প্রকাণ্ড একটি বাড়ী। বাড়ীর পাশ দিয়া একটি পথ—তাহার কিছু দূরেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। গ্রামের নাম বেনেপুর। গ্রামের বড় বাড়িটি একজন জমিদারের। চকমিলান বাড়ী—সামনেই একটি দীঘি। কাল জলে কাল ঢেউ তুলিয়া নাচিতেছে। দীঘির পাড়েই বাগান। আম, নারিকেল, তাল প্রভৃতি নানা জাতীয় গাছ ও ঝোপঝাড়ের অবধি নাই। দীঘির উত্তর পাড়ে জমিদারের বৈঠকখানা। জমিদারবাবু সেইখানেই বসেন। বাড়ীর ভিতরে খিড়কির প্রাচীরের বাহিরে কয়েকটা এঁদো পুকুর। নানা জলজ উদ্ভিদে ঢাকা। মাঝে মাঝে জল দেখা যায়।

জমিদারের নাম কালাচাঁদবাবু। অতি ধার্মিক বৈষ্ণব, মালা জপ করেন। সর্বদা মুখে রাধে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, জয় গুরু শব্দ। তাঁহার বাড়ীর পাশ দিয়া বেলা শেষে যদি কোন পথিক যায়, জমিদারের চোখে পড়িলে তিনি তাহাকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া আনেন, বলেন—'মহাশয়' এই পথে ভর সন্ধ্যেবেলা যাওয়া নিরাপদ নয়—রাস্তাঘাট ভাল নয়, দস্যু-ডাকাতের ভয় আছে। রাত্রে আমাদের অতিথিশালায় থাকুন। সকালবেলা জলখাবার খাইয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবেন। নিরীহ পথিক কিছুই বুঝিতে পারে না। রাজী হইয়া যায়। মনে করে ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব। এমন সজ্জন ব্যক্তির আশ্রয় পাওয়া ভাল।

কালাচাঁদবাবু রাত্রিতে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করেন। বৈঠকখানা ঘরে যাহারা যখন আসে—তাহারা সকলেই দুর্দান্ত দস্যুসর্দার ও তাহাদের বিশ্বস্ত অনুচর। দিনের বেলা ধর্মচর্চা নিছক ভড়ং ছাড়া আর কিছুই নহে। বিভিন্ন জেলার ডাকাতের দলের লোকই আসে তাঁহার বৈঠকখানায়। নৈহাটি, হুগলী, বৈদ্যবাটি, পাণ্ডুয়া, চন্দননগর, হরিপাল, রাজাপুর, সালকিয়া, কলিকাতা ও বালিগঞ্জের ডাকাতের সর্দাররাও কালাচাঁদবাবুর বৈঠকখানায় জড়ো হয়। কালাচাঁদবাবুর পরামর্শ লইয়া তাহারা কাজে নামে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক দলের গুপ্তচরগণ আসিয়া কোথায় গিয়া ডাকাতি করিলে 'মাল' মিলিবে তাহার সন্ধানও দিয়া যাইত এবং পথের নিশানাও বলিয়া দিত। কালাচাঁদবাবু যেমন ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক, তেমনি স্বয়ং ছিলেন ছদ্মবেশী জমিদার ডাকাত। তাঁহার বাড়ীতে যাহারা অতিথি হইত—রাত্রিতে ভুরিভোজনের পর যখন তাহারা সুখে নিদ্রা যাইত—তখন কালাচাঁদবাবুর নির্দেশে তাহাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া হত্যা করা হইত এবং লাশ বাড়ির পিছনে এঁদো পুকুরে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

বাড়ীর এক কোণে ছোট মন্দির। সে মন্দিরে ভীষণা কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ডাকাতরা সেই শ্যামামায়ের পূজা আর নরবলি দিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। কালাচাঁদবাবুর বাড়ীতে অতিথিদের আর প্রিয়জনদের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য হইত না। বাহিরের লোকেরা কিন্তু জমিদার বাবুর আসল রূপটি দেখিতে পাইত না। তাহারা বরং মনে মনে বলিত—আহা! কী সাধু-সজ্জন মহৎ লোক। কি অতিথি-সেবা-পরায়ণ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনখানি গরুর গাড়ী কালাচাঁদ বাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। দুইখানি গাড়ী একেবারে কানায় কানায় ঠাসা। একখানায় আরোহী ছিলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাহার স্ত্রী, একটি পুত্র, ও একটি কন্যা। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। বেলা অপরাহ্ণ। গাড়ীর পিছনে দুইজন বলিষ্ঠ পশ্চিমা পালোয়ান প্রহরী। তাহাদের হাতে লাঠি, পিঠে বোঝা। গাড়ীর আরোহী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কমিশেরিয়েটের গোমস্তাগিরি করেন। সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি মালপত্র লইয়া নিজের বাসপল্লী শান্তিপুরে চলিয়াছেন। তাহাও প্রায় কুড়ি বৎসর পর।

ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ। নাম অম্বিকাচরণ গোস্বামী। বয়স পঞ্চাশ। দেখিতে সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ। পশ্চিমের জলবায়ুর গুণে এইরূপ শরীর হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর বয়স বড় জোর পঁয়ত্রিশ। কাশীর মেয়ে পরমাসুন্দরী। স্বাস্থ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী। উহাদের ছেলেটির বয়স দশ। মেয়ের পাঁচ। ছেলেমেয়ে দুইটি অতি সুশ্রী। অম্বিকাবাবুর গায়ে বেশ জোর—তিনি ছাউনির গোরা ও কাল সিপাহীদের নিকট হইতে কুস্তী, লাঠিখেলা, তলোয়ার চালনা শিখিয়া সুদক্ষ হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া অম্বিকাবাবু প্রত্যহ ব্যায়ামও করিতেন।

অম্বিকাবাবুকে দেশ হইতে তাঁহার আত্মীয়েরা পত্র দিয়াছিলেন —'খুব সাবধানে আসবে। এ অঞ্চলে দস্যু ডাকাতের বাসভূমি। পদে পদে বিপদ।'

চিঠি পাইয়া দুজন শক্তিশালী পশ্চিমদেশীয় দেহরক্ষী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ভগবানের অপার করুণা—পথে এ পর্যন্ত কোন বিপদ ঘটে নাই।

কালাচাঁদবাবু পূর্বেই গুপ্তচরের মুখে খবর পাইয়াছিলেন, একজন মালদার লোক গরুর গাড়ীতে অনেক টাকাকড়ি ও রকমারি জিনিসপত্র লইয়া দেশে যাইতেছেন। কালাচাঁদবাবু মনে করিলেন একটা মস্ত বড় সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগ কোনমতেই হাতছাড়া করা যায় না। তিনি নিজে অম্বিকাবাবুর কাছে আসিয়া বিনয় করিয়া বলিলেন—'নমস্কার! আপনি কোথায় যাবেন।'

সাধুবেশী মালা হাতে একজন বিরূপাকৃতি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে ওই ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া অম্বিকাবাবু অবাক হইলেন। তিনি প্রতি-নমস্কার জানাইয়া বলিলেন—'আজ্ঞে আপাততঃ শান্তিপুর তারপর যাব নিজের দেশের বাড়িতে। জানেন, প্রায় কুড়ি বছর পরে দেশে ফিরছি।'

'জয় রাধে কৃষ্ণ! অতি উত্তম—আহা জননী জন্মভূমি, যেখানে থাকুন মশাই। মাটির টান, স্বদেশের টান বড় কম নয়। তা তো বটেই। শ্রীহরি আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। উঃ! সঙ্গে যে মা-জননী রয়েছেন—ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তাইতো এমন অসময়ে আর যাওয়া ঠিক হবে না, এখানে খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রিটা কাটান। ভোরবেলা রওনা হবেন···পথঘাট তো ভাল নয় বললেন কালাচাঁদবাবু।'

অম্বিকাবাবু বললেন—'সেজন্য আপনার ভাবনা করতে হবে না। আমার সঙ্গে দু'জন পশ্চিমে পালোয়ান আছে। দেখছেন কি রকম যমদূতের মতো চেহারা।'

কালাচাঁদবাবু দুইজন পালোয়ানের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—'জানেন তো, আমরা কীভাবে বাস করি। চারদিকে ডাকাতের আড্ডা। কোম্পানির সাহেবেরা কিছু করতে পারছে না। শত শত ডাকাতের কাছে দু'জন প্রহরী কি করবে?'

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী বলিলেন—'বেশ কথা। আজ রাতটা এখানেই থেকে যাই না কেন? ছেলেমেয়েরা একটু বিশ্রাম করুক। কাছাকাছি তো এসে পড়েছি। কাল খুব ভোরবেলা রওনা হলেই হবে।

কালাচাঁদবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'মা আমার বুদ্ধিমতী। আপনাদের পায়ে শতকোটি প্রণাম। প্রণাম!'

অম্বিকাবাবু অপ্রসন্ন মনে রাজী হইলেন। এইবার কালাচাঁদ বাবু মা-জননীকে ও পুত্রকন্যাদের লইয়া অন্দর মহলে যাইতে অনুরোধ করিলেন। অম্বিকাবাবু বলিলেন—'না আমরা সব এক ঘরেই থাকবো। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরাই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে নেবো।'

কালাচাঁদবাবু ভৃত্যকে অতিথিশালার দুইটি ঘর খুলিয়া দিতে বলিলেন। অম্বিকাবাবু তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতির থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গাড়ীর জিনিসপত্র আর নামান হইল না, গাড়ীতেই রহিল। তাহাদের পাশেই মির্জাপুরী পালোয়ান রামদীন ও রামভজুয়া ঘরে কম্বল বিছাইয়া লণ্ঠন জ্বালাইয়া, 'শুধু-জয় সীতাপতি —রাঘব রাজারাম' গানের সুর ভাঁজিতে লাগিল।

অম্বিকাবাবুর সঙ্গে কালাচাঁদবাবু নানা গল্প জুড়িয়া দিলেন। চাকরির কথা, সাহেবদের কথা, লড়াইয়ের কথা, উপার্জনের কথা আর ঘর-গেরস্থালীর কথা। এমন সময় অম্বিকাবাবু লক্ষ্য করিলেন—এক কৃষ্ণকায় ভীষণ-দর্শন মূর্তি দরজার পার্শ্বে উকিঝুঁকি মারিয়া চলিয়া গেল। কালাচাঁদবাবু মুখ ফিরাইয়া কী যেন ইংগিত করিলেন।

রাত্রি তখন এক প্রহর। এমন সময় আর একজন অতিথি সেখানে আসিলেন। হাতে তার পুরু মোটা লাঠি। অসুরের মতো দীর্ঘকায়। তিনি কালাচাঁদবাবুর গৃহে আশ্রয় চাহিলেন। কালাচাঁদবাবু তাঁহাকে প্রথমে ইতস্ততঃ করিলেও পরে নানা চিন্তা করিয়া আশ্রয় দিতে রাজী হইলেন।

অম্বিকাবাবু আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলেন তিনি শান্তিপুরের খাস অধিবাসী। তিনি বর্ধমান রাজার সদর কাছারি হইতে খাজনা টাকা লইয়া কৃষ্ণনগর যাইতেছেন। পথে আসিতে রাত্রি হইয়া গেল। অম্বিকাবাবুর পরিচয় জানিয়া আগন্তুক সন্তুষ্ট হইলেন। একই দেশের লোক তাহারা।

অতিথি একাই দুই সের চাউলের ভাত খাইলেন। এই সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইলে যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িলেন। ক্লান্ত পথিকেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। নবাগত অতিথি বাহিরের একটি বারান্দায় শয়ন করিলেন।

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—'গতিক সুবিধের নয়। জানালা দিয়ে দেখ—বাড়ির চারদিক ডাকাতের দল ঘিরে ফেলেছে।'

ভীষণ হা-রে-রে চিৎকারে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে দেখিল, সম্মুখে কাল মুখোশ পরা একদল ডাকাত মশাল জ্বালিয়া তোলপাড় করিতেছে।

বাহির হইতে দরজা বন্ধ। অম্বিকাবাবু জোরে চিৎকার করিয়া ডাকিলেন—রামদিন! রামভজুয়া!

তাহারা ডাক শুনিয়া দুইজনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। বলিল—'হুজুর'।

অম্বিকাবাবু বলিলেন—'বাইরের কেয়ারি খুলে দাও।' রামদিন হুঙ্কার দিয়া বলিল—'বাবু, ডাকুকা কুঠি, হুঁশিয়ার সে বাহার আইয়ে।' ইহা বলিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিল। এমন সময় কে যেন রামদিনের মাথায় এক বিরাট লাঠির ঘা মারিল। রামভজুয়া সঙ্গে সঙ্গে লাঠিয়ালকে সহসা এমন লাঠির আঘাত করিল যে, সে দশ হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

অম্বিকাবাবু তাঁহার গুপ্তি হইতে তলোয়ার বাহির করিয়া মালকোচা মারিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী ছেলেমেয়ে দুইটিকে আগলাইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, কাঁদছো—কেন দুর্গা! তুমিও তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে এসো। কীসের ভয় দেবী ভগবতী আমাদের সহায়। তুমি ছোরা চালাতে অমনি শিখেছো। আসুক না ডাকাত—দেখি বেটারা কী করতে পারে।

আগন্তুক পথিক বারান্দায় শুইয়াছিলেন। তিনি সোরগোল শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন—দারুণ অবস্থা। তিনি তাড়াতাড়ি অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর কাছে আসিয়া করজোড়ে বলিলেন—মা জননী! তুমি ভয় করিও না। আমি থাকিতে তোমার কেশাগ্রেও কেহ হাত দিতে পারিবে না। দেখিবে, তোমার এই দামাল ছেলে কী করিয়া বেটাদের হটাইয়া দেয়। হ্যাঁ, তবে তৈয়ারী থাকিতে হইবে।

দুর্গাদেবী বলিলেন—'বাবা! আমিও হাতিয়ার ধরতে জানি। তারপর.........।'

দেখিতে দেখিতে দুই দলে তুমুল লড়াই বাধিয়া গেল। একদিকে বহু ডাকাত, আর অন্যদিকে আগন্তুক ভদ্রলোক, রামদিন, রামভজুয়া, অম্বিকাবাবু, স্ত্রী দুর্গাদেবী। দুর্গাদেবী রণরঙ্গিনী চামুণ্ডা বেশে ডাকাতদের সম্মুখীন হইলেন।

অন্যদিকে শতাধিক ডাকাত। ডাকাদলে নেতৃত্ব করিলেন স্বয়ং জমিদার কালাচাঁদবাবু। তাঁহার ইশারায় বাঘ যেমন শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, তেমনি ডাকাতেরা দলে দলে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ধন্য!—তরবারি ও লাঠি চালাইবার শক্তি অম্বিকাবাবুর, রামভজুয়া ও রামদিনের। দুর্গাদেবীও আটশাট করিয়া শাড়ী পরিয়া চুলের খোঁপা ঝুঁটির মত বাঁধিয়া বীরাঙ্গনা বেশে ডাকাতদের আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ডাকাতদের দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া গেল, তবুও তাহারা পিছু হটিল না, আঘাতের পর আঘাত হানিতে লাগিল। তাহাদের মাথায় যেন খুনের নেশা চাপিয়া গিয়াছিল।

সকলে বিস্মিত হইয়া এই ভীষণ দৃশ্য দেখিল।

বোঁ-বোঁ বন্-বন্ শব্দে মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড ঢেঁকি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই বলিষ্ঠ অতিথি ডাকাতদের আক্রমণ করিল। ঝড়ে যেমন গাছের ডাল-পালা ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ ঘূর্ণায়মান ঢেঁকির আঘাতে একের পর একটি ডাকাত ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বলিষ্ঠ লোকটি কুমারের চাকার মত ঢেঁকি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক একটা প্রকাণ্ড লাফে ডাকাতদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঘাতের পর আঘাত হানিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—'জানিস ব্যাটারা আমি কে? আমি শান্তিপুরের সেই বীর আশানন্দ ঢেঁকি।'

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া কালাচাঁদবাবু থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি কোনক্রমে একটি ঘরের মধ্যে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

জয় মা কালী। ব্রহ্মময়ী মা! জয় মা তারা শব্দে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অম্বিকাবাবু, দুই শক্তিশালী প্রহরী ও দুর্গাদেবীর আক্রমণে ডাকাতরা ভয়ে হতভম্ব হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু কাহার সাধ্য পলায়ন করে। আশানন্দের ঢেঁকির আঘাতে কোন ডাকাতের মাথা ফাটিল, কাহারও হাত বা পা ভাঙ্গিল। আশানন্দ কালাচাঁদবাবুর বাড়ীর মধ্যের ঢেঁকিশাল হইতে ঢেঁকিটি লইয়া এই আক্রমণ রচনা করিয়াছিল। আশানন্দের আক্রমণেই ডাকাতরা ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে দেখিতে দেখিতে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া পূবের আকাশ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। গ্রামের লোকেরা দলে দলে আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। নিকটবর্তী থানায় খবর গেল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মন্ট্রেসর (Mr Montresor) একজন ডাকাত-সর্দারকে ধরিবার জন্য বাঁশবেড়িয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন সিপাই ছিল। তিনি সংবাদ পাইবা মাত্রই চলিয়া আসিলেন। ডাকাত ও ডাকাত-সর্দাররা সকলেই ধরা পড়িল। ভণ্ড বৈষ্ণব জমিদার কালাচাঁদবাবুর হাতে হাতকড়া লাগাইয়া প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া থানায় লইয়া গেল। কালাচাঁদবাবুর বাড়ী তল্লাসী করা হইল। বহু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল। ইহা ভিন্ন খিড়কির তিনটি পুকুরের মধ্যে বহু নরকঙ্কাল পাওয়া গেল।



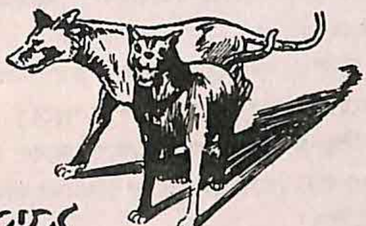
অতিথি ঢেঁকি ঘুরাইয়া ডাকাতদের আঘাতের পর আঘাত হানিতে লাগিল।

কালাচাঁদবাবু আর কি করিবেন! হাতেনাতে ধরা পড়িয়া তিনি

সকল অপরাধ স্বীকার করিলেন। অনেক দস্যু-ডাকাতের নামও বলিয়া দিলেন। বিচারে অনেকের ফাঁসী হইল, অনেকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কালাচাঁদবাবুর যাবজ্জীবনের মত দ্বীপান্তর দণ্ড হইল।

অম্বিকাবাবু, তাঁহার স্ত্রী, রামভজুয়া, রামদিন এবং আশানন্দ ঢেঁকি কোম্পানি হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিলেন। আশানন্দ ঢেঁকি লইয়া লড়াই করিয়াছিলেন বলিয়া সেইদিন হইতে তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল আশানন্দ ঢেঁকি। সেকালের অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হয় ডাকাত, না হয় ডাকাত-সর্দার।*

৪৪



রামঠাকুর

এক

একশত বৎসর পূর্বে কলিকাতার বিখ্যাত ডাকাত ছিল রামঠাকুর। রামঠাকুরের প্রধান সঙ্গী ছিল সিন্ধু মাইতি। এই দুই ডাকাতের জীবন ছিল অদ্ভুত ও বিচিত্র। কি ভাবে তাহারা ডাকাত হইয়াছিল এবং কতকগুলি লোমহর্ষক ডাকাতি করিয়াছিল তাহার একটি কাহিনী বলা হইতেছে।

সিন্ধু মাইতি প্রথমে ছিল কুলি। সে বাড়ী বাড়ী মোট বহিয়া বেড়াইত। কুলিগিরি করিয়া সে কিছু অর্থ জমাইয়াছিল। একসময় এক চাউল ব্যবসায়ীর আড়তে মাল ওজন করিবার কাজও লইয়াছিল। মহাজন তাহাকে ঠনঠনিয়া, চিৎপুর, বড়বাজার প্রভৃতি স্থানে বাকী টাকা আদায়ের জন্য পাঠাইতেন। এই সময় সিন্ধু মাইতি কিছু কিছু ব্যবসাও করিত। সিন্ধু মাইতির পার্শ্বের বাড়ীতে থাকিতেন রামঠাকুর মহাশয়। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহার সহিত সিন্ধু মাইতির আলাপ হয়। পরে সর্বদা মেলামেশার ফলে দুইজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠে। একদিন রামঠাকুর সিন্ধু মাইতির কাছে পাঁচটি টাকা ধার চায়। কিন্তু প্রথমে সে দিতে রাজী হয় নাই। পরে তাহাকে বলিল—'আমাকে যদি কিছু জিনিস বাঁধা দাও—তাহলে ধার দিতে পারি।'

টাকার ভীষণ প্রয়োজন তাই রামঠাকুর অগত্যা পাঁচ ভরি ওজনের একটি রূপার জিনিস বন্ধক রাখিয়া পাঁচ টাকা ধার লইলেন।

কিছুদিন পরে রামঠাকুর পাঁচ টাকা ও সুদের এক টাকা দিয়া বন্ধকী রূপার জিনিসটি ঘরে আনিলেন।

আবার রামঠাকুরের টাকার প্রয়োজন হইল। তখন রামঠাকুর সিন্ধু মাইতিকে বলিল—'তুমি বন্ধক চাইছো কেন? আমি কি টাকা দেব না?' সিন্ধু মাইতি টাকা দিতে গররাজি হইল। অতঃপর রূপার বালা ও হার বন্ধক রাখিয়া রামঠাকুর পাঁচ টাকা লইলেন। কিন্তু বেশী দিন বন্ধকের জিনিস ফেলিয়া রাখিলেন না। অল্পদিনের মধ্যে ঘরের জিনিস ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন।

ঠিক এক মাস পরে রামঠাকুর সিন্ধুকে নির্জন গঙ্গার ধারে ডাকিয়া লইয়া বলিল—'আমরা ডাকাতি করতে যাব—তুমি কি যাবে ভাই?'

'না ভাই'—আমার খুব ভয় করে।

'ভয় কি, আমাদের কিছু টাকার দরকার। জানত ব্যবসা করতে হলে কিছু টাকা পুঁজি লাগে। আমাদের কিছু টাকা ধার দাও না। তুমি টাকা তো ফেরত পাবেই। তা ছাড়া লুটের মালের একটা অংশ তোমাকে দেবো।' রাজী?

সিন্ধু রাজী হইল।

এক সপ্তাহ পরে রামঠাকুর সিন্ধু মাইতির কাছে আসিয়া বলিল—'আমাকে জলখাবারের জন্য তিন আনা পয়সা দাও। আমার বালীগঞ্জে যাবে? আমাদের সব ঠিক আছে।'

সন্ধ্যার সময় রামঠাকুরের সঙ্গে সিন্ধু মাইতি বালিগঞ্জে চলিল। উহাদের সঙ্গে গোপাল মুখার্জী, সদানন্দ ঠাকুর, স্বরূপ ঢুলি, কালি কৈবর্ত ছিল। তাহারা কলিকাতা হইতে বৈঠকখানা লেনের পথ ধরিয়া বালিগঞ্জের ময়দানে পৌছিল। সেকালে বালিগঞ্জের ময়দান ছিল এক ভয়াবহ স্থান। যেমন ঘন জঙ্গল তেমনি চোর-ডাকাত ও লুটেরার আড্ডা। কাজেই ঐ স্থানে দিন দুপুরেও লোক ভয়ে যাইত না। বনের মধ্যে ধান ক্ষেত, নালা, পুকুর ও ডোবা। রামঠাকুরের দল ঠিক রাত্রি নয়টায় সেখানে পৌছাইল। অন্যান্য দলেরা রাত্রি দশটার মধ্যে হাজির হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ আসিল জোড়াবাগান, কেহ পোস্তা, আবার কেহ বা চিৎপুর হইতে। এইভাবে সেখান জড় হইল শীতল ঘোষ, ফকির উড়িয়া, যদু ডোম, কেষ্ট কৈবর্ত্ত, ঠাকুরদাস বাগদী, রাজকৃষ্ণ বাঙ্গাল, বিহারী সিং, মহেশ মাইতি, রামঠাকুর, চিন্তামণি কৈবর্ত্ত, রামপ্রসাদ উড়িয়া, মহেশ নাপিত, দুর্গা ডোম প্রভৃতি বিভিন্ন ডাকাত দলের লোকেরা। ইহাদের মধ্যে কাহারও হাতে ছিল দা, কাহারও হাতে তলোয়ার, কাহারও হাতে বর্শা, কুড়াল—কেহ আনিয়াছিল বড় বড় মশাল, লাঠি, বন্দুক, আরও নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। ভৈরব কেওরা ও তাহার দুইজন সঙ্গী পাশের বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া লাঠি বানাইল। শুকনা লতাপাতায় পুরাতন নেকড়া জড়াইয়া বড় মশাল প্রস্তুত করিল। অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও তাহারা করিল। দেওয়াল টপকাইবার জন্য লম্বা লম্বা বাঁশও তাহারা সঙ্গে লইল।

বনের পার্শ্বে অতি নির্জন জায়গায় ছিল একটি কালীমন্দির। সেই মন্দিরে সকলে মিলিয়া ভক্তিভরে গভীর রাত্রিতে কালিপূজা করিল। কোথা হইতে ক্ষুদিরাম একটি পাঁচ বৎসরের শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়াছিল। পূজা করিয়া তাহাকে মায়ের কাছে বলি দিল। শিশুর রক্তে মন্দিরতল প্লাবিত হইল। পূজা করিল রাম

---

*রেভারেণ্ড লং সাহেব তাঁহার শতবর্ষ পূর্বের বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাহাতে বাঁশবেড়িয়ার ওই জমিদার-দস্যুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলা-সরকারের প্রকাশিত ডাকাতদের কাহিনীতে এই ঘটনার বিষয় লিপিবন্ধ আছে। বাঁশবেড়িয়ার স্বর্গতঃ কুমার মনীন্দ্র দেব মহাশয়ও এই ডাকাতির বিষয় আমাকে একাধিকবার বলিয়াছেন। তাঁহার নিকটেই বাঁশবেড়িয়ার জমিদার পরিবারের পরিচয় শুনিয়াছিলাম। এখানে কাহারও প্রকৃত নাম উল্লেখ করা হইল না।

ঠাকুর। সেই সঙ্গে আনিয়াছিল একটি শাণিত খড়্গ। এইরূপ নৃশংস নরবলি তাহারা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত। ওই জন্য তাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না। জয় মা কালী, জয় মা কালী ভীষণ শব্দে নির্জন বনভূমি মুখর করিয়া ভয়াল ডাকাতের দল চলিল বীর-বিক্রমে ডাকাতি করিতে। কোথায় ডাকাতি করিবে তাহা পূর্ব হইতেই ঠিক ছিল। দলের লোকেরা পূর্ব হইতেই এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল।



দুই

বালিগঞ্জের ঘন অরণ্যের মধ্যে যে সরু রাস্তা ছিল—সেই পথ ধরিয়া এক খোলা জায়গায় তাহারা আসিল। সেখানে প্রশস্ত রাস্তার ধারে ছিল এক বিরাট বাগানবাড়ী। বাগানের ভিতরে একতলা একটি দালান। দালানে বড় বড় কয়েকখানা ঘর। ওখানে থাকিতেন একজন আর্মেনিয়ান পাটের ব্যবসায়ী। নাম নেহাপিট সাহেব। তিনি গিয়াছিলেন সিরাজগঞ্জে পাট কিনিতে। বাড়িতে ছিল তাঁহার স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে। অন্যান্য লোকজন ও চাকর-বাকর। আর্মেনিয়ান সাহেবের বাড়ীর আশেপাশে কোন বাড়িঘর ছিল না। দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত পল্লী অঞ্চল। সেখানে বাস করিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান। নেহাপিট সাহেবের বাগানের চারিদিক উঁচু প্রাচীরে ঘেরা ছিল।

রাত্রি বারোটার সময় পঁচিশ-ত্রিশজন ডাকাত সাহেবের বাড়ীর চারিদিকে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

দলের বাঞ্ছারাম নাপিত দুইটি বাঁশ দেওয়ালে ফেলিয়া তাহার সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল। নদীর তোড়ের মত ডাকাতরা প্রায় পনর জন ভিতরে প্রবেশ করিল। মহেশ নাপিতের ইশারায় সুদক্ষ রামঠাকুর, রামপ্রসাদ উড়িয়া ইত্যাদি পনর জন সাহেবদের মালঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই মালঘরেই থাকিত সাহেবের অস্ত্রশস্ত্র ও বন্দুকাদি।

বাহিরে ছাড়া কুকুরগুলি প্রথমে ঘেউ ঘেউ করিতেছিল। কিন্তু ডাকাতদলের দুর্গাচরণ বুদ্ধি করিয়া আগেই কিছু মাংসের টুকরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। মাংসের টুকরাগুলি খাইয়া তাহাদের চিৎকার বন্ধ হইয়া গেল। আশ্চর্য কৌশল ছিল রামঠাকুরের। সে তাহাদের সঙ্গীদের লইয়া একটি লোহার সিন্দুক, কাপড়-চোপড়, অলংকারের বাক্স এবং হাতের কাছের জিনিস লইয়া বালিগঞ্জের ঘন বনের মধ্যে আসিয়া আত্মগোপন করিল।

মেমসাহেবের ঘরে লণ্ঠন জ্বলছিল। কুকুরগুলির চিৎকারে তিনি জাগিয়া গেলেন।

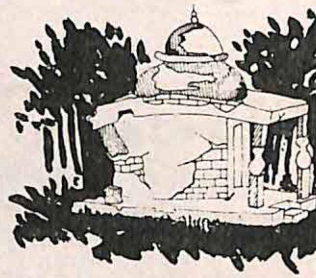
জানলা হইতে সেই অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন মেমসাহেব। কিন্তু ঠিক নিশানা না হওয়ায় কেহই আহত হইল না। তাহারা পূর্বেই নিরাপদ স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। লোহার সিন্দুক ডাকাতরা কিছুতেই খুলিতে পারিল না। তাই সিন্দুকটি সামনের ডোবায় ফেলিয়া দিল।

লুণ্ঠিত দ্রব্য, অলংকার সব এক জায়গায় জড়ো করা হইল। রামঠাকুর ও স্বরূপ বেওয়া বেশীর ভাগ চোরাই মাল গ্রহণ করিল। রামঠাকুর বলিল—'আমরা সব মালপত্র বাজারে বিক্রয় করব। এতে যে টাকা হবে তা সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দেব।' সিন্ধু মাইতি বলিল—'এ কী অন্যায় কথা! আমার ভাগের অংশ এখুনি দিয়ে দেও।'

রামঠাকুর ধমক দিয়া বলিল—'তুমি ডাকাতিতে সবে হাতেখড়ি দিয়েছো। তোমার ভাগে কি-ই বা পড়বে?'

সিন্ধু মাইতি দলের লোকদের মনের ভাব দেখিয়া টুঁ শব্দটি করিল না। রামঠাকুর তাহাকে ডাকাতির লাভ হিসাবে পাঁচ টাকা দিয়া দিল।

তিন



লুটের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ওই টাকা সকলকেই অংশ মত ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। শিবু ও ফকির নামে দুই ডাকাত লুটের মাল কিছু কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি মূল্যবান সোনার আংটি এবং মেমসাহেবের গলার নেকলেস ছিল। যে পোদ্দারের দোকানে উহারা ঐ জিনিস দুইটি বিক্রয় করিতে গিয়াছিল—সে চিৎপুর অঞ্চলের একজন ধনী পোদ্দার। তাহার নাম নবীন। নবীন চোরাই মাল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করিত। দারোগা ও গোয়েন্দারা তাহাকে জানিয়াও ধরিতে পারিত না।

ওদিকে নেহাপিট সাহেব সিরাজগঞ্জে খবর পাইলেন, তাঁহার বাড়িতে ডাকাতি হইয়াছে। তখনই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং থানায় ডাকাতির খবর দিলেন।

চিৎপুরে নবীন পোদ্দারের দোকান। সে শিবু ও ফকিরের সঙ্গে দেনাপাওনার কথা বলিতেছিল…এমন সময় দ্বারিক দারোগার আবির্ভাব ঘটিল। তিনি চিৎপুরে নবীন পোদ্দারের দোকানে এই প্রথম আসিলেন। অতি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তিনি। জাতিতে ব্রাহ্মণ—পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায় বাড়ী। দুর্জয় সাহসী। সেকালের দারোগার মত অসাধু প্রকৃতির নহে। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নবীনের সঙ্গে ডাকাতদের ষড়যন্ত্র আছে। চোরাই মাল কেনাবেচা সেখানে হয়। তাই তিনি মণিকারের ছদ্মবেশে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরণে ঢিলে

পায়জামা, ঢিলে লম্বা কোট, চোখে নীল চশমা, লম্বা দাড়ি। একেবারে চিনিবার উপায় নাই। ফকির ও শিবুর মুখোমুখি এক পার্শ্বে রাখা একখানা চৌকির উপর তিনি বসিলেন।

নবীন ফকির ও শিবুকে ইশারায় উঠিতে বলায়, নবাগত মণিকার বাধা দিলেন। বলিলেন—'বৈঠিয়ে বাবুসাহেব। হাম পরদেশিয়া।' তবু ফকির ও শিবু কাঁচুমাচু করিতে লাগিল। দ্বারিকবাবু পূর্ব হইতেই সন্দেহ করিয়া উহাদের অনুসরণ করিতেছিলেন। এবার বুঝিতে পারিলেন—এই দুইজনই ডাকাত। উহাদের ধরিবার সুবর্ণ সুযোগ হাতের মধ্যে আসিয়াছে। মণিকার সাহেব পকেট হইতে একটি ছোট বাঁশি বাজাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলির ভিতর ও রাস্তার দুই দিক হইতে দশজন কনস্টেবল এবং স্বয়ং নেহাপিট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নেহাপিট সাহেব 'N' অক্ষরে খোদিত আংটি এবং তাঁহার মেমসাহেবের নেকলেস সনাক্ত করিলেন। এতদিন পরে নবীনও ধরা পড়িল।

ফকির ও শিবুকে ভীষণ পীড়নের ফলে তাহারা দলের অনেক ডাকাতের নাম বলিয়া দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ধরা পড়িয়াছিল। তাহারা নাম-ধাম, বাড়ি ঘর, পোশাক পরিচ্ছদ এমন ভাবে বদল করিয়া নানা জায়গায় আশ্রয় লইত যাহাতে উহাদের ধরা সহজ ছিল না। শিবু ও ফকিরের বিচারে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল। রামঠাকুর ও সিন্ধু মাইতি ধরা পড়ে নাই।

ভাগ্যবান নেহাপিট সাহেব শিবু ও ফকিরের কাছে লোহার সিন্দুকের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। পুলিশের সাহায্যে বালিগঞ্জের সেই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর ডোবা হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। ডাকাতেরা ঐ সিন্দুক কিছুতেই খুলিতে না পারিয়া তাহা ডোবায় ফেলিয়া দিয়াছিল। অপহৃত সিন্দুকের ভিতর ছিল ষাট হাজার টাকা। অনেক দামী অলংকার ও দরকারী কাগজপত্র।

৪৫



মজনুসা ফকির ও নাগা সন্ন্যাসী

...আমরা ফকির মানুষ। ফকিরি করে দেশে দেশে ঘুরি। কোম্পানি বাহাদুর আমাদের ডাকাত বলিয়া ধরিতে চাহিতেছেন। গোয়েন্দা পুলিশ লাগাইয়া আমাদের ধরিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, মহারানী আমাদের এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

মহারানী ভবানী মজনু ফকিরের নিকট হইতে এইরূপ আবেদন পাইয়া চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, কোম্পানী বাহাদুরের কর্তাদের কাছে ও সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করিবেন কিনা তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সত্যই যদি সাধু-সন্ন্যাসী ফকিরদের প্রতি কোম্পানির লোকেরা জুলুম করে তাহার প্রতিবাদ অবশ্যই করিতে হইবে।

রানী ভবানী তাঁহার লোকজন ও দেওয়ানকে দিয়া খবর লইলেন —মজনু ফকির প্রকৃত ফকির নয়, একজন দুর্দান্ত দস্যু। তাহার অত্যাচারে উত্তরবঙ্গের লোকেরা প্রাণ ও মান লইয়া সর্বদা শশব্যস্ত।

মুসলমান রাজত্বকালে বাংলাদেশ ও ভারতের নানাস্থান সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ছিল অবাধ বিচরণক্ষেত্র। নবাব আলিবর্দীর রাজত্বকালে (১৭৪০-১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ফকিরদের প্রতি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের যথেষ্ট ভক্তি ছিল। ওই সময় ওড়িষ্যার শাসনকর্তা দুর্লভরাম, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের খাদ্য সরবরাহ করিতেন। কোম্পানির আমলে ইংরেজরা যখন এই ফকির ও সন্ন্যাসী-নামধারী দস্যুদের দমন করিতে যত্নবান হইতেছিলেন, সেই সময়ে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মজনুসা রাজসাহীর বিখ্যাত রানী ভবানীর নিকট আবেদন করেন যে, ফকিরদের মারিলে ইংরেজদের এমন কি বাহাদুরি হইবে। ওই সব সন্ন্যাসী ও ফকির বাঙলার এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে না তাহারা যাতায়াত করিত। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ধনী লোকের বাড়ী আক্রমণ করিয়া ধন-সম্পত্তি লুঠ করিত।

দেড়শত বৎসর পূর্বের কথা। বগুড়া সেরপুরের নিকটবর্তী সর্দারগঞ্জ নামক স্থানে সাধারণতঃ মজনুসা ফকিরের আড্ডা। মজনুসার দলে ছিল অনেক দস্যু ও ডাকাত। সে এমন দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিল যে, দিনের বেলায় ডাকাতি করিতেও তাহার বাধিত না। গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করিয়া, বাড়ী ঘরে আগুন লাগাইয়া সব পোড়াইয়া ফেলিত। দলের লোকেরা বন্দুক, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিত তাহার ভয়ে লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইত। স্ত্রীলোকেরা মান-সম্ভ্রম বাঁচাইবার জন্য বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাইত। তবু কেহ রক্ষা পাইত না। দিনের পর দিন তাহার অত্যাচারে উত্তরবঙ্গ, তাহার নিকটবর্তী সব গ্রাম ও নগরের লোকেরা ভয়ে ভয়ে বাস করিত। আনুমানিক ১২২০ সালের লিখিত গ্রাম্য ছড়াতে তাহার অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ছড়ার প্রথম কয়টি পঙক্তি—

শুন সভে একভাবে নোতুন রচনা।
বাঙ্গলা নাশের হেতু মজনু বায়না॥
কালান্তক যম বেটাক্ কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥
সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডা বাণ বাউল নিশান॥
উট গাধা ঘোড়া হাতি বোগদা সঙ্গতি।
জোয়ান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি॥
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥
দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম্।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধূম॥

মজনুসা ফকিরের দলে কিরূপ লোকজন ছিল, কিরূপ ছিল তাহার ডাকাতির ব্যবস্থা—কিরূপ ছিল তারা দুর্দান্ত, এই প্রাচীন ছড়া থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা যখন শুনিত—ফকিরের দল আসিতেছে তখন তাহাদের কি অবস্থা হইত—নিচের ছড়া হইতে তাহা জানা যায়।

মন দিয়ে শোন সঙ্গে লোকের অবস্থা।
যেদিন যেখানে যা'রা করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া॥
সহজে বাঙ্গালী লোক অবশ্য ভাগুরা।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া।
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
গাছুয়া বেপারি পলায় গাছে ছাইড়্যা গুড়॥

*　　*　　*

থাল লোটা লইল না পাইল উদ্দিশ।
টাকার লালচে চিরে শিওরের বালিশ॥
আল্দা মাইট দেখি ফকির করে পেটপোট।
টাকার লাগি সে মারে বাক্সর খোট॥
মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাকা লইল ঝাড়া।
আগে লুটে বাড়ী-ঘর পাছে আড়াপাড়া॥

*　　*　　°

সর্বস্ব ঘরে থুয়া পাথারে দেয় নড়া॥
হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল।
বড় মানুষের নারী পলায় সঙ্গ লয়া দাসী।
জটার মধ্যে ধন লয়া পলায় সন্ন্যাসী॥

*　　*　　*

ধর্ম সাক্ষী করে সবে মজনুকে শাপে।
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক॥,
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক।
কোন দেশ হইতে আইল অধম।
ইহাকে ভারতে থুয়া পাশরিছে যম॥

এই ছড়া হইতে মজনুর অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা সম্যক্‌ভাবে অবগত হওয়া যায়। এই দুর্দান্ত দস্যু মজনুকে পরিণামে অতি শোচনীয়ভাবে মরিতে হইয়াছিল।

ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় দেশের অবস্থা ঐরূপই ছিল। ঐ সময়ে ১৭৭২ সালে একদল নাগা সন্ন্যাসী সংখ্যায় প্রায় দুইশত, ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়া স্নান এবং আসামের কামাখ্যা দেবীর দর্শনে পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়াছিল। নাগা সন্ন্যাসীরা মাঝে মাঝে ওইরূপ ভাবে আসিত। পাঞ্জাবে ইহাদের বলিত 'লুটেরা নাগা।' কিন্তু বাংলাদেশে বগুড়া অঞ্চলে তাহারা লুটতরাজ করিয়াছে এমন কথা জানা যায় নাই। মজনুসা'র অত্যাচারে যখন উত্তরবঙ্গের লোকেরা বিপন্ন—কোন উপায়ই ছিল না—দুর্দান্ত দস্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার, এমন সময়ই নাগা সন্ন্যাসীর দল উত্তরবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের হাতে ছিল দীর্ঘ তরবারি। যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা ছিল সুনিপুণ।

একদিন প্রভাতে নাগা সন্ন্যাসীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে অশ্বারোহণে এক গ্রামের পথ দিয়া চলিতেছে, এমন সময় তাহারা দেখিত পাইল দূরে এক আগুনের লোহিত শিখা—শুনিতে পাইল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের হাহাকার ও করুণ ক্রন্দন। তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর দলের যিনি গুরু তাঁহার আদেশে নাগা সন্ন্যাসীর দল সে গ্রামের দিকে অশ্বারোহণে দ্রুত ছুটিয়া চলিল। হঠাৎ ইহাদের দেখিতে পাইয়া 'মজনুসা' ফকিরের অনুচরদল আক্রমণ করিল। প্রত্যুষ হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দস্যুদের পক্ষে 'মজনুসা' ফকিরের শিশু-পুত্রদের জীবনরক্ষা হইয়াছিল। নাগা সন্ন্যাসীদের তরবারির আঘাতে ডাকাতদলের লোকগুলি একে একে প্রাণ হারাইল।

এইরূপ জানা যায়, 'তাহারা কদলীবৃক্ষের ন্যায় দস্যুদলের মস্তক ছেদন করিয়াছিল। নাগারা কোন লুঠতরাজ করে নাই। তাহারা বগুড়া হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করে এবং পরে পূর্ব-দক্ষিণ হইয়া ময়মনসিংহ এবং গোয়ালপাড়া যায়। তাহার পর তাহারা কোথায় গেল জানা যায় নাই। উত্তরবঙ্গের লোকেরা মজনুসা ফকিরের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বলিত, ফকিরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান নাগাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন।



৪৬ ব্রজবাসীর বীরত্ব

একশত পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। ইংরাজী ১৮২৪ আর বাংলা ১২৩০ সালের কাহিনী। বিষ্ণুপুরে রামধন দাস বাবাজীর আখড়া। বৃহৎ মন্দির মঠ, আখড়া বাড়ি, অতিথিশালা। রামধন বাবাজী ভক্ত হইলেও বেশ ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

তাঁহার আখড়ার কাছে অনেক লোকজন, তত্ত্বতালাশ করিবার জন্য সর্দার পাইক ও কর্মচারী। দেবোত্তর সম্পত্তি অনেক। রাধা-কৃষ্ণের সেবার জন্য কয়েকজন ব্রজবাসীও আছেন। ব্রজবাসীরা বেশ পালোয়ান, শক্তিশালী লোক।

তাহারা প্রতিদিন ডন কুস্তি করে। আর বৃদ্ধ মোহন্ত বাবাজী বার্ধক্যের জন্য পূজার্চনা করিতে পারেন না—তাই সে ভার ব্রজবাসীদের উপরই ন্যস্ত ছিল।

সেকালে বাঁকুড়া জেলায় সর্বত্র ডাকাতি হইত। ওই জন্য সম্পন্ন গৃহস্থেরা ও জমিদার তালুকদারেরা সর্বদা সতর্ক প্রহরী রাখিতেন। তাহারা রাত দিন পাহারা দিত।

চারিদিকে সবাই জানিত যে, রামধন বাবাজীর উপাস্য রাধামাধব জীউর প্রচুর ধনসম্পত্তি। আর ওই সব এক স্বতন্ত্র কোষাগারে রক্ষিত আছে। বিরাট প্রাচীর ঘেরা মন্দিরে সতর্ক প্রহরীদের চোখ এড়াইয়া প্রবেশ করা সহজ ছিল না। বাবাজীর ধনসম্পত্তির প্রতি ডাকাতদের দারুণ লোভ ছিল।

সেদিন দোলের উৎসব। কীর্তন গান ও আবির-কুমকুমের ছড়াছড়ি। মহোৎসবের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে। সহস্র সহস্র পুরুষ ও নারীর আগমনে আশ্রম মুখর। তাহারা মহোৎসাহে উৎসবে যোগদান করিতেছে। উৎসবানন্দে সারাদিন ও দ্বিপ্রহর কাটিয়া

গেল। লোকজন যে যাহার পল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছে। যাহারা অতিথিশালায় ছিলেন—তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রহরীরা শ্রান্ত ক্লান্ত। চোখ ঢুলুঢুলু। এখানে সেখানে বিশ্রামের সুযোগ খুঁজিতেছে। কোথাও কোন গোলমাল নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ।

এমন সময় শোনা গেল—দূর পল্লী হইতে ভীষণ চিৎকার কান্নার রোল। যাহারা ঘুমাইয়াছিল, তাহারা জাগিয়া উঠিল এবং যেইরূপ হয়—সকলে ভীত ভাবে এ-দিক ও-দিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

বুঝা গেল—কোন এক গাঁয়ে একদল ডাকাত পড়িয়াছে। গাঁয়ের লোকের আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করিয়াছে।

বিষ্ণুপুর বর্ধিষ্ণু পল্লী। রাজাদের বাড়ী। গ্রাম নয়—যেন শহর। সহস্র সহস্র লোকের বাস। কাছের অদূরবর্তী পল্লীতে ডাকাতি হইতেছে। গ্রামবাসীরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? তাহারাও হৈ হৈ রবে 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া গ্রামবাসীদের রক্ষা করিবার জন্য ছুটিল। চারিদিকে পূর্ণিমার রাত্রিতে জ্যোৎস্না হাসিতেছে। ফুটফুটে আলোয় কী ডাকাতি করা সহজ কথা! ডাকাতদের বুকের পাটাও ত কম নয় নয়। কিন্তু সেকালের ডাকাতরা এমন দুর্দান্ত এবং দুঃসাহসিক ছিল যে, অনেক সময় দিনের বেলাও ডাকাতি করিতে তাহাদের বাধিত না। ভয় বলিয়া তাহাদের কোন জিনিস ছিল না। রাত্রিতে তো কথাই নাই। ডাকাতদের সঙ্গে থানাদারদের সাট থাকিত—তাই তাহাদের ঐ প্রকার বেপরোয়া ভাব ছিল।

রামধন বাবাজীর আখড়া বিষ্ণুপুর শহরের এক প্রান্তে। প্রকাণ্ড এক দীঘির দক্ষিণ পাড়ে···আশে পাশে বনজঙ্গল। পূর্বে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মধ্য দিয়া একটি খাল। খালের পাড়ে বিশেষ কোন বসতি নাই। কয়েক ঘর সাঁওতাল পরিবার চাষবাস করে—আর কুঁড়েঘরে বাস করে। ইহারা তীর ধনুক লইয়া শিকার করে। তীর ধনুক ছুঁড়িতে সাঁওতালরা বেশ দক্ষ। কিছু কিছু সাঁওতাল ডাকাতদলে যোগ দিয়াছিল। দেশের সর্বত্র দস্যু ডাকাত ও বর্গীর ভয়ে লোক সন্ত্রস্ত হইয়া বাস করিত। শতবর্ষ পূর্বে এমনি ছিল দুর্দিন।

পার্শ্বের গ্রামে ডাকাতি হইতেছে—সাহায্য করিবার জন্য মোহন্তর আখড়ায় লোকজন অনেক আসিয়া গিয়াছিল। রামধন বাবাজী ডাকাতির কথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন এবং ঘন ঘন মালা জপিতেছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইতেছিল না। চারিজন ভোজপুরী, মির্জাপুরী পালোয়ান সদরে পাহারা দিতেছিল। দুইজন ব্রজবাসী মন্দির প্রাঙ্গণে টহল দিয়া ফিরিতেছিল। বাবাজী বলিলেন—'সাবধান! যদি আমাদের এইদিকে আসে, তাহা হইলে বাঁচিবার কোন উপায় থাকিবে না। তোমরা সর্বদাই সজাগ থাকিবে জানি না রাধামাধব জীউ-র কি ইচ্ছা।

মোহন্ত বাবাজীকে একজন ব্রজবাসী বলিল—'মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। কার সাধ্য আমাদের মঠে ডাকাতি করে।'

বাবাজীর চোখমুখ হইতে তখনও ভয়ের ভাব কাটে নাই। তিনি বলিলেন—'ঠাকুর আমাদের রক্ষা করুন। তবে কি জান, এ আখড়াটা খুব ভাল নয়, শহরের বাইরে আমরা আছি! কোন বিপদ ঘটলে রক্ষা পাবে না। মন্দিরের লোকজনেরা চলে গেল। তাইতো ভয়।'

সত্যই ভয়ের কারণ ঘটিল। বাবাজীর কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রায় একশত দস্যু ঢাল তলোয়ার বর্শা লইয়া আসিয়া মন্দির আক্রমণ করিল। হা-রে-রে-রে ও মার মার কাট কাট শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চারিজন ভোজপুরী পালোয়ান যথাসাধ্য বাধা দিল কিন্তু অতগুলি ডাকাতের কাছে তাহারা আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। ডাকাতেরা তাহাদের বেদম প্রহার করিয়া হাত মুখ বাঁধিয়া দেউড়ির কাছে ফেলিয়া রাখিল। তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া রহিল।

দুইজন নিরীহ যাত্রী উৎসবে যোগদান করিয়া বাড়ি ফিরিতে পারে নাই। তাহারা মঠেই ছিল। তাহারা ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। দস্যুদের চিৎকারে এবং মার মার কাট কাট শব্দে কেহই আর সাহায্যের জন্য আগাইতে সাহস করিল না।

একজন ব্রজবাসী রাধামাধব মন্দির সংলগ্ন ভিতরকার প্রাচীরের দিকের দরজায় পাহারা দিতেছিল। মন্দিরের নিকটেই কোষাগার। কোষাগার রক্ষাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। ডাকাতেরা বাহিরের সদর দরজা দিয়া নির্বিঘ্নে ভিতরকার দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিল—তখন ব্রজবাসী ভীষণ চিৎকার করিয়া উঠিল—জয় কিষণ জী কী জয়! জয় কিষণজী কী জয়! দরজা ভাঙ্গিয়া যেমনি একটা ডাকাত মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইবে—অমনি ব্রজবাসী তাহার গলায় তলোয়ারের কোপ মারিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথা দেহচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ডাকাতেরা প্রথমে বাধা পাইল—ভয়ে চমকিয়া উঠিল। তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল—আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। ওইভাবে ডাকাতেরা আক্রান্ত হইবে—এইরূপ ভাবে নাই। মৃত সঙ্গীর মাথা তুলিয়া লইয়া যেমনি তাহাদের একজন পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল অমনি ব্রজবাসী হুঙ্কার দিয়া উঠিল। সকলের পিছনের একটা ডাকাতকে এমনভাবে বর্শা ছুঁড়িয়া মারিল যে, সে মোটেই দৌড়াইতে পারিল না—বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ব্রজবাসী তখন উন্মত্তের মতো 'জয় কিষণ জী কী জয়!' জয় 'রাধামাধব জী কী জয়!' রবে চিৎকার করিয়া অসি হস্তে উল্লম্ফন করিতেছিল, ছোটাছুটি করিতেছিল। তাহার মাথার বাবরি চুল দুলিতেছিল। বলিষ্ঠ দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছিল। চোখ দুইটি অগ্নিপিণ্ডের মত জ্বলিতেছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে দারোগা আসিলেন। দারোগা রামসদয়বাবু ঐ সময় দস্যুদমনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বর্শা-বিদ্ধ দস্যুর দেহ হইতে বর্শা খুলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহাকে ভয় দেখাইয়া অন্যান্য সঙ্গীদের নামধাম বাহির করিয়া লইলেন। অতঃপর দারোগা সাহেব বহু প্রহরী সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামের প্রায় সকল ডাকাত ধরিয়া বাঁকুড়ার বিচারপতির নিকট চালান দিলেন। বিচারের সময় প্রকাশ পাইল, ওই ডাকাতদলের মধ্যে অনেকে সমাজের নামজাদা বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন। বিচারে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইয়াছিল।

ব্রজবাসী তাহার সাহস ও বীরত্বের জন্য সরকার হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। একমাত্র তাহার বীরত্ব ও সাহসিকতায় বাবাজীর

আখড়া, মন্দির ও বিগ্রহ, ধনসম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল। একজন মাত্র ব্যক্তির সাহস, বিক্রম ও বুদ্ধির নিকট একশত ডাকাত পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

৪৭

সাহেব ডাকাত ও দেশী ডাকাত



এক

জেলা ময়মনসিংহ। রতনপুরের নীল কুঠি। কুঠির দেওয়ান নবকুমার বসু। নবকুমারবাবুর মত লোক সেকালে বড় একটা দেখা যাইত না। তিনি অনেকদিন দেওয়ানি কাজ করেন···প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার হয় না। পয়সা-কড়ি তাহারা ঠিকমত পায়।

ওই সময়ে নীলকুঠির সাহেব ছিলেন মিঃ ম্যাকেঞ্জি নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। তিনি প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় প্রজাদের ডাকিয়া বাইবেল পড়াইয়া শুনাইতেন। বলিতেন—'যীশুর আদেশ ও উপদেশ শুন টোমরা। সট্‌পঠে চলো। সট্‌কথা বলো। ঈশ্বরকে ভক্তি করো। সব ধর্ম সমান।'

সাহেব রোগীর সেবা, দরিদ্র মানুষদের অর্থ সাহায্য করিতেন। ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পোশাকটা ছিল অনেকটা পাদ্রীদের মতো। ঢোলা লম্বা জামা পরিয়া, কোমরে ফিতা বাঁধিয়া লম্বা লাল দাড়ি ঝুলাইয়া সাহেব পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেন। পাড়ার হিন্দু মুসলমান ছোট-ছোট ছেলেরা সাহেবের হাত ধরিয়া চলিত—পয়সা চাহিত, খাবার চাহিত। সাহেব হাসিমুখে সবই উহাদের দিতেন। ওই সরল হৃদয় সাধু-চরিত্র ম্যাকেঞ্জি সাহেব দেওয়ান নবকুমারবাবুকে বলিতেন—'বড় দুঃখী, বড় গরীব, এই দেশের লোক। কোনো অট্টাচার করো না।'

নবকুমারবাবু মহাপ্রাণ সদাশয় সাহেবের আদর্শে কাজ করিতেন —কুঠির কাজও ভাল হইত। ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে নীলকুঠির অন্যান্য সাহেবরা এমন কি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হাকিম দারোয়ানরাও সহ্য করিতে পারিত না।

দাঙ্গা নাই, হাঙ্গামা নাই, কোন গোলমাল নাই। প্রজারা ভাল কাজ করে, ফলে নীলের চাষও ভাল হয়।

একদিন সাহেব নবকুমারকে বলিলেন—'আমি ডেশে চলে যাব। টুমি যদি পার কাজ ছেড়ে ডিও। আমি ডেশে ডেশে ঢর্ম প্রচার করে বেড়াবো।'

তিনি কাজেও তাহাই করিলেন। কিন্তু নবকুমার কাজ ছাড়িলেন না। তিনি কুঠির দেওয়ানই রহিলেন। ···বড় পরিবার—চাকরি না করিলে চলিবে কী করিয়া। যদি কাজ ছাড়িতেন, তাহা হইলে ভালই হইত। ম্যাকেঞ্জি বিলাত চলিয়া গেলেন। রতনপুরের নীলকুঠির নূতন অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন মিঃ ল্যাডলি। বয়স তেইশ বৎসর। দুর্দান্ত স্বভাবের তরুণ। এক ইংরেজ চাষার ঘরের ব্রিটিশ সন্তান।

দুই

ল্যাডলি শুনিয়াছিল—নীলকুঠির সাহেবরা এই দেশ হইতে অজস্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যায়। তাই প্রথম হইতে ল্যাডলি সাহেবের এইদিকে দৃষ্টি রহিল। কয়েকদিন পরেই ল্যাডলি নবকুমারকে বলিল—'দেওয়ান! তুমি আমাকে দু' হাজার টাকা দাও —যেমন করেই পার।'

নবকুমার বলিলেন—'তা কেমন করে হবে, সাহেব। কুঠি-তহবিল ভেঙ্গে আমি টাকা দিতে পারবো না।'

—সাহেব বলিল—'সে দায়িত্ব আমার।'

নবকুমার বলিলেন,—আমি দেওয়ান। তহবিল ভেঙ্গে আমি কিছুতেই টাকা দিতে পারবো না।'

—'তবে চাষী মজুরদের কাছ থেকে টাকা আদায় কর, দাদন কমিয়ে দাও।'

—'তা হয় না সাহেব। আমি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের আমলের লোক। আমি পারবো না—গরীব চাষীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করতে।'

সাহেব বলিল—'অল রাইট।'

একদিন কুঠির উত্তর পশ্চিম দেশীয় লেঠেল ও বরকন্দাজদের লইয়া ল্যাডলি সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া দেওয়ানের বাড়ী আক্রমণ করিল। কুঠি হইতে দেওয়ানের বাড়ি ছিল মাইলখানেক দূরে।

সাহেব লেঠেল বরকন্দাজদের সাহায্যে দেওয়ানের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিল। অবশেষে বন্দুক ছুঁড়িয়া, মশাল জ্বালিয়া, ঘরবাড়িতে আগুন লাগাইয়া, ধানের মরাই, খাদ্যশস্য ভস্মীভূত করিয়া শয়তান ল্যাডলি সাহেব নবকুমারকে ধরিয়া লইয়া গেল। অবশেষে সাহেব নবকুমারকে দরিয়ানগরের কুঠির এক মালগুদামে বন্দী করিয়া রাখিল। গুদামের দরজায় তালা চাবি লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দরজায় পাহারা বসান হইল। কাহারও সাধ্য হইল না সে দিকে যায়। বন্দী অবস্থায় নবকুমারের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। সাধারণ লোকে এই বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিল না।

ঐ সময় ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ ল্যান্স। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তিনি মফঃস্বল সফরে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে রতনপুরের কাছে বহু লোক জমায়েত হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে মিঃ ল্যাডলি রতনপুরের দেওয়ান নবকুমারের বাড়ী লুঠতরাজ করিয়া তাঁহাকে দরিয়ানগরের এক গুদামে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই প্রজারা ইহার প্রতিকারের জন্য জোট বাঁধিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট এই খবর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া দরিয়ানগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ওখানেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত ল্যাডলির দেখা হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ল্যাডলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মিঃ ল্যাডলি, এই মালগুদামে তুমি দেওয়ান নবকুমারকে বন্দী করে রেখেছো—এ ঘটনা কি সত্য? বলো!'

ল্যাডলি উদ্ধতকণ্ঠে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, সত্যি।'

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—'ওকে তুমি এখুনি গুদাম থেকে ছেড়ে দাও।'

ল্যাডলি মিথ্যা করিয়া বলিল—'কেন ছাড়ব? সে তহবিলের টাকা তছরূপ করেছে। টাকা আদায়ের জন্যই তাকে আটকে রেখেছি।'

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—'সে অধিকার তোমার নেই। আদালত রয়েছে। সেখানেই বিচার হবে। নালিশ করে প্রমাণ করা উচিত ছিল। দরজা খোল।'

শেষটায় বাধ্য হইয়া ল্যাডলি মালগুদামের দরজা খুলিয়া দিল। গুদামঘর হইতে মৃতপ্রায় নবকুমারকে বাহির করিয়া আনা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন—নবকুমারের সারা শরীর কাঁপিতেছে। কথা বলিতে পারিতেছে না। কদর্য খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাহার শরীরের এমন হাল হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নবকুমারকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন। ল্যাডলিক গ্রেপ্তার করিলেন। কিন্তু নবকুমারের পক্ষে কোন সাক্ষী মিলিল না। নীলকুঠির চারিদিকের প্রাচীর-ঘেরা মালগুদামে তিনি বন্দী ছিলেন—কে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? কুঠির সকলেই সাহেবের অনুগত। ল্যাডলি সাহেবের ভয়ে মালগুদামের মধ্যে বন্দী নবকুমারের করুণ বিলাপে কাহারও প্রাণ কাঁদিত না।

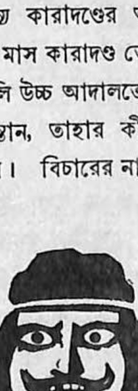
ম্যাজিষ্ট্রেট ল্যাডলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি খাঁটি ইংরেজের সন্তান হয়ে এত বড় নৃশংস অত্যাচার করতে পারলে? জাতির কলঙ্ক তুমি। তুমি নবকুমারের বাড়ী লুঠ করেছো?'

ল্যাডলি বলিল—হ্যাঁ! করেছি।'

'বন্দী করেছো, অত্যাচার করেছো?' কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দুর্দান্ত ল্যাডলি উত্তর দিল—'করেছি।'

ম্যাজিষ্ট্রেট ল্যাডলিকে দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। এক মাসের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। টাকা দিতে না পারিলে আরও দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ল্যাডলি উচ্চ আদালতে আপিল করিয়া মুক্তি পাইল। স্বাধীন ব্রিটিশ সন্তান, তাহার কী সাজা হইতে পারে? সে যুগের এইরূপ ছিল বিচার। বিচারের নামে বিচারের প্রহসন।



তিন

ব্রজবাসী ডাকাত।

ব্রজবাসী দস্যু। দস্যু হইলেও ব্রজবাসী ছিল মহৎ।

ডাকাত হইলেও সে ডাকাতি করিত ধনীর বাড়ী। সুদখোর মহাজনদের বাড়ী।—যাহারা প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া উহাদে ভিটেমাটি উচ্ছেদ করিত। ডাকাতির টাকায় সে প্রজাদের ঋন শোধ করিত। ব্রজবাসী ডাকাতি করিত, আবার চাষ-আবাদও করিত। বড় বড় জমিদারগণ জমি দখল ও লুটতরাজের সময় ব্রজবাসীর সাহায্য লইত। আবার ওদিকে ব্রজবাসী ছিল খাঁটি গৃহস্থ।

অতিথি সেবা, পূজা-পার্বণ সবদিকেই ব্রজবাসীর দৃষ্টি ছিল। সে ছিল পরম বৈষ্ণব। ডাকাত হইলেও তাহার বাড়ীতে নিত্য মহোৎসব ও অহোরাত্র কীর্তন হইত। ব্রজবাসীর অনেক সাকরেদ ছিল। লাঠি, সড়কি, কুস্তি—সকল বিষয়ে সে ছিল ওস্তাদ। ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ! মাথাভরা ঝাকড়া চুল। হাড়মাংসে গড়া দেহ। শরীরের কোথাও এতটুকু মেদবাহুল্য নাই। তাহার হুঙ্কারে গাঁয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইত। ভয় বলিয়া তাহার কিছুই জানা ছিল না।

এদিকে ল্যাডলি মুক্তি পাইয়া জোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। সে ঘোড়ায় চড়িয়া নীলক্ষেতে যায়। বিনা দোষে চাষীদের বেত মারে। লাথি মারে, অকথ্য নির্যাতন করে। নবকুমারের স্থলে এক নূতন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছে সে সাহেবের অপেক্ষা বেশী শয়তান।

ল্যাডলির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া একদিন চাষী মজুর সকলে জোট বাঁধিয়া ব্রজবাসীর কাছে আসিল। ব্রজবাসী বাহিরের ঘরে বসিয়া কৃষাণদের সহিত কথা বলিতেছিল।

চাষী-মজুরদের মোড়ল অনুনয় করিয়া ব্রজবাসীকে বলিল—'ব্রজদাদা, আমাদের বাঁচান।'

'কী হোল তোমাদের? শীঘ্র বলো।' ব্রজবাসী জিজ্ঞাসা করিল।

চাষীদের মোড়ল রামমোহন ব্রজবাসীকে সব কথা খুলিয়া বলিল। ব্রজবাসী শুনিয়া বেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করিয়া বলিল—'আচ্ছা, শোধ নিচ্ছি। এতদিন ধরে তোমরা এত অত্যাচার সহ্য করেছ! দেখি কেমন সে লালমুখো।'

এক পক্ষকাল গত হইল। তাহার পর একদিন অন্ধকার রাত্রে ব্রজবাসী নিজের দলের চাষি-মজুরদের লইয়া রতনপুর ও দরিয়ানগরের নীল কুঠি আক্রমণ করিল।

ল্যাডলি সাহেব এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ সাহেবের বাংলোয় প্রবেশ করিল ব্রজবাসী ও তাহার অনুচরগণ। ব্রজবাসী ল্যাডলি সাহেবকে কাঁধে তুলিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। নীলকুঠি লুঠ হইল। সাহেবকে এক নিবিড় জঙ্গলে লইয়া যাওয়া হইল। ওদিকে ব্রজর দলের লোকেরা হল্লা করিয়া নীল কুঠির গুদাম ঘর, সাহেবের কুঠিতে আগুন লাগাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। দূর হইতে লোকে দেখিতে পাইল আগুনের লেলিহান শিখায় দরিয়ানগর ও রতনপুরের ধ্বংসাবশেষ।

এদিকে ল্যাডলি সাহেবকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের এক চড়ায় ফেলিয়া রাখা হইল। ব্রজবাসীর নির্দেশে দলের লোকেরা নির্জন স্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

এই লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড লইয়া দারোগা,পুলিশ হাঙ্গামা অনেক কিছুই হইল। কিন্তু কেহই ধরা পড়িল না। সাক্ষীও মিলিল না। বরং ল্যাডলি সাহেব যে ভয়ানক অত্যাচারী ছিলেন···দেওয়ান নবকুমারের প্রতি নিপীড়নের বিষয় ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারের

অজানা ছিল না। কাজেই ঘটনার তদন্তের ফলও কিছুই হইল না। ল্যাডলি সাহেব খঞ্জ অবস্থায় এই দেশ ত্যাগ করিল।

সেই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আর নাই। কিছু নদীতে ভাঙ্গিয়াছে —কিছু অংশ পাট ও ধান ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। সাহেব ডাকাত ও দেশী ডাকাতদের লড়াইয়ে দেশী ডাকাত ব্রজবাসীরই জয় হইয়াছিল।

৪৮

সিঙ্গুরের ডাকাত কালী



তারকেশ্বরের কাছে সিঙ্গুর নামক পল্লীতে ডাকাত কালী অবস্থিত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হুগলী জেলার পথঘাট ছিল দুর্গম ও জনাকীর্ণ। সিঙ্গুর হুগলী জেলার এক প্রাচীনতম পল্লী। দুইদিকে নিবিড় জঙ্গল, পথঘাট নাই। পথ চলিতে পড়ে পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা। তাহার সংখ্যাও কম নহে। দুই পা হাঁটিলেই দেখা যায়, পানা পরিপূর্ণ ডোবা এবং বড় বড় পুষ্করিণী। গ্রামের লোকজন যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত। গ্রামবাসীরা দীন দরিদ্র। অন্নাভাবে জীর্ণ ও শীর্ণ। গ্রামগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয়। গ্রামের যাহারা ছিলেন ধনী সন্তান তাহারা শহরবাসী, কলিকাতা বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থানে।

অনেকদিন পূর্বের কথা। আমার এক বন্ধু হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বৈদ্যবাটি গ্রামবাসী। তিনি ছিলেন বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং কলিকাতায় বাস করিতেন। তখনকার দিনে আমাদের মিলন স্থান ছিল স্বর্গত খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমলা স্ট্রীটের বৈঠকখানায়, কিংবা মানিকতলার এডওয়ার্ড স্কুল গৃহে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ওখানে—প্রতি সপ্তাহে তখনকার ঐ দিনগুলির কথা মনে পড়িলে কত না আনন্দ হয়। সে আসরে মিলিত হইতেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উকিল চারুচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সময় সময় রাখালদাসও আসিতেন।

দীর্ঘকায় সৌম্যশ্রী হরিদাস আসিয়া গল্পের আসর জমাইতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে তিনি ডাকাতের কাহিনী বলিলেন। তিনি সিঙ্গুরের ডাকাতের কালীবাড়ীর কথা বলিলেন। ঐখানকার ভীষণাকার বাগদী ডাকাতের গল্প শুনিতে শুনিতে শিহরিয়া উঠিলাম। ঐদিনকার আসরে আমি বলিলাম, 'হরিদাস ভায়া, আমাকে সিঙ্গুরে কালীবাড়ী—ডাকাতদের বাস্তুভিটা দেখাইতে পার ?'

সে বলিল—'পারি বৈকি ?'

তাহার সঙ্গে এক দ্বিপ্রহরে বৈদ্যবাটী গেলাম। ওখানে তাহাদের বৃহৎ বাড়ী। রাত্রিতে সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইল। সিঙ্গুরের অধিবাসী তারাদাস ভট্টাচার্য নামক এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত পল্লী ত্যাগ করিয়া ওখানে বাস করিতেন। তিনি ছিলেন হরিদাসবাবুর বিশেষ বন্ধু। ছুটির দিনে ঐ বাড়ীতে যে আড্ডা বসিত সেখানে তাস পাশা খেলা, গান বাজনা ও যাত্রা থিয়েটারে তিনি মহড়া দিতে আসিতেন।

হরিদাসবাবু পরদিন প্রাতে বলিলেন,—'কাল তো আমাকে সকালেই অফিস যাইতে হবে। তোমাকে জিম্মা করে দিচ্ছি তারাদাস, তুমি ওকে সিঙ্গুরের ডাকাত কালী দেখিয়ে আনবে। তুমি ফিরে এসে রাত্রিটা আমার এখানে থেকে পরদিন কলকাতায় ফিরো, কেমন ? আমি সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাচ্ছি।'

কোন কথা বলার পূর্বেই তারাদাসবাবু বলিলেন—'গুপ্তমশাই, হরিভায়ার কথা শুনে আর কী লাভ হবে,—কেন আমার বাড়ী দুটি অন্নব্যঞ্জন জুটবে না।' হরিদাস হাসিলেন। আমিও হাসিলাম। আমি সিঙ্গুরের ডাকাতকালী বাড়ী দেখিবার ও ওখানকার বিবরণ জানিবার জন্য ভয়ানক উৎসুক ছিলাম। পরদিন রবিবার প্রাতে তারাদার সঙ্গে সিঙ্গুর রওনা হইলাম। তাহা ছাড়া বৈদ্যবাটীর নিকটবর্তী তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলির গল্প বলিতে বলিতে আমাকে লইয়া স্টেশনে আসিলেন। তাহার নিকট শেওড়াপুলির নিস্তারিণী কালীর কথাও শুনিলাম। আমাদের যাত্রা শুরু হইল।

ডাকাত কালী সিঙ্গুরে অবস্থিত। শেওড়াপুলির পথে চলিলাম সিঙ্গুর। সিঙ্গুরের পথ বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কীভাবে গিয়াছিলাম— সব কথা মনে নাই।

পথে লোকজন যাহা দেখিলাম, তাহারা চলিয়াছে তারকেশ্বর। শীর্ণ সংকীর্ণ সর্পিল পথ। চৈত্রমাস। শুষ্ক পথের পাশে স্থানে স্থানে জঙ্গল ঘেরা ডোবা। অতি কষ্টে মন্দিরের কাছে আসিলাম। ডাকাত কালীর মন্দির ভগ্ন ও জীর্ণ। ইট খসিয়া পড়িতেছে। এদিকে ওদিকে সাপ ছোটাছুটি করিতেছে। দিনের বেলায়ও অন্ধকার। মন্দিরে ভীষণাকৃতি কালীমূর্তি। ভিতরে আবর্জনাপূর্ণ। তারাদা সেই স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে লুটাইয়া পড়িলেন—মাগো! মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ধ্যান ধারণা করিলেন। তাঁহার এই চিৎকারে লোকজনের কোন সাড়া মিলিল না। একপাশে একটি বড় হাড়িকাঠ ভূমিতে পড়িয়া আছে। চারিদিকে পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা জঙ্গলাকীর্ণ। আমি ডাকাত কালীকে দেখিতে আসিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলাম। মন্দিরের গায়ে আগাছা জন্মিয়াছে। বট অশ্বত্থ দেবদারু গজাইয়াছে। নানা আগাছায় পূর্ণ—ভয়াল স্থান। দিনের বেলায়ও ভয় করে।

তারাদা বলিলেন—ঐ যে পশ্চিম দিকে বড় বাস্তুভিটা দেখিতেছ ওখানে ছিল সনাতন বাগদীর বাড়ি। সে ছিল কুখ্যাত ডাকাত। তারকেশ্বরের আশেপাশের লোক উহার নাম শুনিয়া আতঙ্কে, ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। কত নিরীহ যাত্রীকে তাহার বাড়ীতে আনিয়া সে এই কালীবাড়ীতে হত্যা করিত। তাহার দল ছিল বড়। নানাস্থানে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। হুগলী জেলার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চল, ত্রিবেণী অঞ্চল, গঙ্গার তীরবর্তী ও দূরবর্তী পল্লী ও বন্দরে তাহাদের ছিল অবাধ গতি।

তাহাদের সম্পর্কে একটি গল্প বলিতেছি—

একদিন সনাতন বাগদী ডাকাতি করিতে বাহির হইবে। দলে দলে লোক আসিতেছে। নিশীথে মায়ের পূজা হইবে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দেবী কালী। নানা পূজার উপচারে মন্দির সুসজ্জিত। প্রদীপ জ্বলিতেছে দীর্ঘ উচ্চ দীপাধারে। ডাকাতেরা কেহ

বাহিরে কেহ মন্দিরে বসিয়াছে। সবাই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সজ্জিত। সুরাপানে মত্ত।

নিস্তব্ধ নির্জন অরণ্য—ঐ অরণ্যে ডাকাত ভিন্ন অন্য কেহই অমাবস্যার রাত্রে আসিতে সাহস পাইত না।

সনাতন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'বলি কোথায়?' ডাকাতরা বলিল—'সংগ্রহ হয়নি। কোথায় মিলবে বলি!'

—'সে কী, মা কি আজ অনাহারে থাকবেন? রক্ত পাবেন না?'

সুরমত্ত ডাকাতেরা বলিল—'চৈত্র মাস! দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে চলছে প্রচণ্ড ঝড়। সব ওলট-পালট করে দিচ্ছে। ঘরের বের হতে পারিনি কেউ, কোথায় জুটবে শিকার। আমাদের লুটের মাল দিলে না—আজ কাল করে।'

সর্দার গর্জিয়া উঠিলেন—'সে হবে না! শ্যামা মা অভুক্ত থাকবেন—যে-ভাবে পারিস, বলি আন।'

অন্য ডাকাতরা বলিল—'তুমি আন না সর্দার। তুমি যাও, বলে তারা ক্রোধভরে উঠে দাঁড়ালো।'

'কি আমার উপর এত বড় কথা! তোদের সবাইকে আজ কালী-মায়ের কাছে বলি দেবো। দেখি কার সাধ্য বাধা দেয়। হা! হা! হা! অট্টহাসি হাসিল।'

উন্মত্ত সর্দার এলো মুক্ত তরবারি হাতে···হা-রে-রে-রে শব্দে বনভূমির মন্দির প্রাঙ্গণে, তখনো বাহিরে ঝর ঝর ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বিভ্রান্ত ডাকাতদল বলিতেছিল—'ভাগের টাকা দেবে না! আবার চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবে। শুনব না কোন কথা। দে-দে-দে টাকা।' দেখিতে দেখিতে ডাকাতদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল। ঐ গ্রামের অপর প্রান্ত দিয়া ঐ সময়ে একদল যাত্রী চলিতেছিল বাবা তারকেশ্বরের কাছে হত্যা দিতে, পূজা দিতে। বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যেও তাহারা মশাল জ্বালাইয়া চলিতেছিল। ওই মশালগুলি ঝড়-জলে নিভিতেছিল না। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দলে ছিল চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শেওড়াপুলি ও অন্যান্য স্থানের সঙ্গতিশালী যাত্রীদল। তাহাদের সঙ্গে ছিল লাঠিয়াল ও সর্দার, জমিদার বাড়ির লোকজন। হর্ হর বম্ বম্, জয় বাবা তারকেশ্বর।

এদিকে চলিতেছে মারামারি কাটাকাটি। ওদিকে যাত্রীর দল সেই ভীষণ ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র ও মেঘের গভীর গর্জনের মধ্যে বলিতে লাগিল—জয় প্রভু, তারকেশ্বরের জয়! জয় বাবা তারকেশ্বরের জয়! মশালের আলোয় যাত্রীদল দেখিল ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে কলহ, মারামারি, কাটাকাটি করিতেছে।

গাজনের দল উন্মত্ত উল্লাসে গান গাহিতেছে—

জয় শিব শঙ্কর
হর্ হর্ বম্ বম্ মহেশ্বর।
বম্ বম্ বম্ ভোলা মহেশ্বর।
জয় বাবা তারকেশ্বর বম্ বম্—
শিব শঙ্কর মহেশ্বর ভোলা।

সনাতন তাহাদের দেখিয়া বলিল—'ওই দেখ, মা তাঁর শিকার পাঠিয়ে দিয়েছেন। মা তাঁর বলি নিজে নিয়ে এসেছেন। জয় মা কালী, আয় মা, আয় মা। চল্ চল্ চল্—আজ মার গলায় দোলাব নর-শির মালা। দ্যাখ—চেয়ে দ্যাখ মার জিহ্বা লক্‌লক্ করছে, ওরে ধর ধর হাতিয়ার ধর। হা-রে-রে-রে! কেউ শুনলো—কেউ শুনলো না। কেউ বাগদীর সঙ্গী হোল—কেউ হোল না।'

যাত্রীদল তারকেশ্বর চলিয়াছে। মানত পূজা ও চৈত্র মাসের গাজন উপলক্ষে। কাজেই তাহারা ঝড়, বৃষ্টি, কোন বাধাই মানিল না। ধর্মপ্রাণ নরনারী চলিয়াছে। এই যাত্রীদলকে ডাকাতরা আক্রমণ করিল। আরম্ভ হইল ভীষণ কলহ ও লড়াই। এই ভয়াল নিশীথে ডাকাতদলের সঙ্গে যাত্রীদলের ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামায় ডাকাতরা হারিয়া গেল—উহাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেল, আবার কেহ কেহ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। সনাতন বাগদী মন্দিরের সম্মুখেই নিহত হইল।

পরদিন প্রভাতে সকলে দেখিল ডাকাতদল নিহত হইয়াছে। কালী বাড়ী বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। মা কালী ভূপতিতা। ঐদিন হইতে সিঙ্গুরের ডাকাত কালীবাড়ী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এখনও লোকমুখে সিঙ্গুরের ডাকাত কালীবাড়ীর কথা শুনা যায়। সে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে দেখা কালীবাড়ী। ভীষণ অরণ্য মধ্যে লোকচক্ষুর আড়ালে একটি পুষ্করিণীর তীরে নিকটবর্তী শ্মশানের কাছে ছিল এই কালীমন্দির। ভগ্ন জীর্ণ উপেক্ষিত। তারাদাস ভট্টাচার্য মহাশয় যে কাহিনীটি বলিলেন তাহা গ্রামের আরও কয়েক জন বৃদ্ধ সমর্থন করিলেন।



সাহসিকা বধূ

৪৯

এক

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে। বাংলাদেশের সব জায়গায় রেলগাড়ির চলন হয় নাই। কোম্পানির আমল। দেশের সর্বত্র জলে ডাঙ্গায় ডাকাতদের আধিপত্য। যাহাকে কথায় বলে 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' আর পথঘাট বলিতে কিছুই নাই। নিবিড় অরণ্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস। আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই। প্রখর সূর্যতপ্ত মাঠ ঘাট পথ। বর্ষা আশায় লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। এইরূপ খরতর রবি করোদ্ভাসিত দিনে, একটি বাঙালী-ঘরের বধূ তাহার স্বামীসহ চলিয়াছে পিত্রালয়ে দ্বিরাগমন করিতে। সে রীতি অনুযায়ী নূতন বধূ চলিয়াছে বাপের বাড়ী। কাজেই শাশুড়ী তাহাকে নানা মূল্যবান অলংকারে সাজাইয়া দিয়াছেন। বধূ গলায়, বাহুতে, হাতে পরিয়াছে বহুমূল্য স্বর্ণ অলংকার। রকমারী গহনা আর মূল্যবান বেনারসী শাড়ী পরিয়া সে চলিয়াছে স্বামীসহ পাল্কি চড়িয়া। বৃহৎ ও সুন্দর পাল্কি। যাহাতে পুত্র ও পুত্রবধূ বৈবাহিকের বাড়ি রাত্রির পূর্বে তাড়াতাড়ি পৌঁছাইতে পারে—সেই উদ্দেশ্যে ধনী শ্বশুর সঙ্গে দিয়াছেন ষোলজন বাহক। কেননা তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে পথে দস্যু, ডাকাত, ঠেঙ্গাড়ের ভয় আছে। বেশীসংখ্যক বাহক পালাক্রমে পাল্কি বহন করিয়া তাড়াতাড়ি পৌঁছাইতে পারিবে। সঙ্গে চারিজন সাহসী

ও বলিষ্ঠ দারোয়ান দিতেও শ্বশুর কার্পণ্য করেন নাই। তাহারা মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া চলিয়াছে পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে। তাহাদের দুইজনের হাতে তলোয়ার, দুইজনের হাতে লাঠি। দারোয়ান চারিজন পশ্চিমদেশীয় এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী। কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা প্রাণ দিয়াও পুত্র ও পুত্রবধূর জীবন রক্ষা করিবে। তাহারা নির্ভীক ও সাহসী। 'জয় রামজী কি জয়' ধ্বনি করিতে করিতে সকলে শুভযাত্রা করিল।

অবশেষে তাহারা একটি নির্জন পথে আসিয়া পড়িল। পথের দুই ধারে ধানক্ষেত। দূরে বাঁশবন, আমবন প্রভৃতির আড়ালে দেখা যায় দুই-একখানি গ্রাম। মাঠের কোথাও কোন লোকজনের দেখা নাই। ঐভাবে যাইতে যাইতে অবশেষে তাহারা একটি গ্রামের কাছে গিয়া পৌঁছাইল। একটি বট গাছের ছায়ায় তাহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইল। তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিল। ভীষণ রৌদ্রে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে দিবা অবসান হইল। তাহারা দেখিতে পাইল একটি দীঘির পাড়ে বেশ বড় বড় আম তেঁতুল গাছ ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শান্ত শীতল বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে। পাল্কি বাহকেরা বলিল 'বাবুমশাই, আর ত চলতে পারি না। এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া লই। কিছু মুড়ি-মুড়কি খাইয়া আসি।'

দারোয়ানরা, পুত্র ও পুত্রবধূ কোন আপত্তি করিল না। সকলে ছায়া-শীতল দীঘির উচ্চ পাড়ে বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। পাল্কি নামানো হইলে, দারোয়ানরা সেখান হইতে একটু দূরে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।



দুই

সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল, সে পাল্কির ঢাকনাটা সরাইয়া দিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে বধূটির সারাদেহ ঘামিয়া জল বহিতেছিল। এখন গাছের শীতল ছায়ায় পাল্কি হইতে নামিয়া সে বাহিরে দীঘির পাড়ে একটু বেড়াইতে লাগিল। স্থানটি নির্জন। কাছেই দারোয়ান ও পাল্কিবাহকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পাহারা দিতে লাগিল। এইরূপ স্থির হইবার পর কয়েকজন দীঘির ঢালু দিকে জলের ধারে নামিল। আর কয়েকজন উপরে রহিল।

ক্রমে সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়। কিন্তু যাহারা নিচের দিকে দীঘির পাড় ধরিয়া জলের ধারে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিতেছে না দেখিয়া তাহাদের খোঁজ লইবার জন্য দারোয়ানরা ঝিকে বলিল—'আর তো দেরী করা চলবে না, সূর্য তো ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকারে যেতে কষ্ট হবে। এখনও অনেকটা পথ বাকী আছে দিদি।'

পুত্র ও পুত্রবধূর চমক ভাঙ্গিল। তাহাদের নির্দেশে ঝি পাল্কিবাহকদের ডাকিতে গিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল কয়েকজন পাল্কিবাহক দীঘির জলের ধারে মরে পড়ে আছে, আর কয়েকজন অর্ধমৃত অবস্থায় জলে ভাসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি পাড়ের পাল্কিবাহকদের ডাকিতে গিয়া একবার চীৎকার করিয়া বলিল—ডাকাত! ডাকাত!...তাহার পর বধূ ও তাহার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—বৌমা! বৌমা! বাবু! বাবু! যদি প্রাণে বাঁচতে চান, পালান, পালান।' বুদ্ধিমতী বধূ তাহার গায়ের সকল অলংকার অতি দ্রুত খুলিয়া পাল্কির নিচে রাখিয়া দিল এবং সেই ঝির সঙ্গে স্বামীর হাত ধরিয়া ঝি-র দেখানো নির্জন নিবিড় অন্ধকার জঙ্গলের পথে ছুটিতে লাগিল। তখন রাত হইয়াছে, চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাহারা ছুটিতেছে, কোন দিকে লক্ষ্য নাই। কিন্তু ভয়ার্ত চীৎকার শুনিয়া দুইদল দারোয়ান বলিতে লাগিল—'দিদি! দিদি! বৌমা! বৌমা! ভয় নাই। আমাদের যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমরা জান দিয়ে লড়বো। আমরা রক্ষা করবো। কোন ক্ষতি করার সাধ্য হবে না কারো।' তাহাদের কথায় উৎসাহিত হইয়া বৌ ও ছেলে দুইজন আরও দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। কিন্তু পদে পদে বাধা—কাঁটাবন জঙ্গল লতা পাতায় ঘেরা পথ। তাহারা কখনো কখনো আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—আবার উঠিতেছে—আবার ছুটিতেছে।

দারোয়ানেরা চীৎকার করিতেছে—'দিদি, বৌমা পালাও, ডাকাতরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে।' ডাকাতদের সঙ্গে দারোয়ানদের হাতাহাতি দাঙ্গা হইতে লাগিল। এদিকে ঝি, পুত্র ও পুত্রবধূ একান্ত ক্লান্ত অবস্থায় দেখিতে পাইল, অদূরে একটি দালানের জানলা দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। ওদিকে শুনা যাইতেছে—হা-রে-রে-রে চীৎকার, অস্ত্রে-অস্ত্রে ঝনঝনা—লাঠিতে লাঠিতে ঠকাঠক শব্দ। ক্রমে সে শব্দও মিলাইয়া গেল।

তিন



দালানের দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা দিতে দিতে তিনজনে বলিল—দরজা খুলুন। আমরা ডাকাতের হাতে পড়েছি। রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! সদাশয় গৃহস্বামী অমনি দরজা খুলিয়া দিলেন। তিনজনে ঘরে ঢুকিলে বাহিরের সদর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই বধূটি মূর্ছিত হইয়া পড়িল। গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহার কন্যাগণ আসিয়া বধূটির সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেবা যত্নে অল্পক্ষণের মধ্যেই বধূটির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। বধূটি বাড়ীর কর্তা ও কর্ত্রীকে প্রণাম করিয়া বলিল—'বাবা-মা, আমাদের বাঁচান।'

গৃহস্বামী সব শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে গোপন পথে পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

খানিকক্ষণ পরে একখানা পাল্কি আসিয়া ঐ বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পাল্কির আরোহীরা ডাকিল—'কে আছেন মশায় দরজা খুলুন।'

গৃহস্বামী উত্তর করিল—'কে তোমরা?'

'আরে মশায় আগে দরজা খুলুন, তারপর শুনবেন কথা।'

গম্ভীর স্বরে গৃহকর্তা বলিলেন—'ওখান থেকেই সব কথা বল।'

মিলিতকণ্ঠে উত্তর আসিল—'আমাদের গাঁয়ের জমিদারবাবু তাঁর পুত্রবধূকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বৌটি এমন দুষ্টু যে আমাদের অলক্ষ্যে পাল্কী থেকে নেমে এদিকে পালিয়ে এসেছে। দরজাটা খুলুন না মশাই, দেখে নি বৌটা এসেছে কিনা!

'জমিদারের নাম কি বল শুনি।'

'না বলবো না। দরজা খুলুন।'

তাহার পর কয়েকটা লোক পাল্কী হইতে নামিয়া আসিয়া দরজায় ভীষণ আঘাত করিতে লাগিল। লৌহদণ্ডের আঘাতে একটি দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। গৃহস্বামী ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'খবরদার এগোবে না, যে-যে ভাবে আছ থাক। যে এগুবে তলোয়ার দিয়ে তার মাথা নেব। দেখি কার সাধ্য আমার ঘরে ঢোকে।

ওইভাবে যখন উভয়পক্ষে ভীষণ আপত্তি, গোলযোগ, বিকট চীৎকার ও হা-রে-রে-রে ধ্বনি হইতেছিল···ঠিক সেই সময়ে স্বয়ং দারোগা দশ বার জন পুলিশ ফৌজসহ উপস্থিত হইলেন। বাঁশী বাজান মাত্র গ্রামের লোকেরা আসিয়া জড়ো হইল। ডাকাতেরা সকলে ধরা পড়িল। পাছে আবার কোন বিপদ ঘটে এই আশংকায় দারোগাবাবু স্বয়ং পুলিশ সহ পাহারায় রহিলেন। দারোগাবাবু সেই বধূ এবং তাহার স্বামী ও ঝিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'ভয় কি মা, ভয় কি বাবা, বৌমার বুদ্ধিও সাহসের বলে সকলের প্রাণ বেঁচে গেল।'···

* * * *

এই ঘটনার পরে অনেক ডাকাত ধরা পড়িল এবং বিচারে তাহাদের কঠোর সাজা হইল। ঐ বধূটির গায়ের সব অলংকারও উদ্ধার হইয়াছিল।

এই দারোগাবাবুর নাম ছিল রামকিঙ্কর বসু। ইহার সাহস, বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে হুগলী জেলার অনেক দুর্ধর্ষ ডাকাত ধরা পড়িয়াছিল। রামকিঙ্করবাবু ডাকাত ধরিবার জন্য ও তাঁহার অসীম বীরত্বের জন্য কোম্পানি কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

(৫০)



শূন্য পিঞ্জর

এক

বারাসাত মহকুমার অল্প দূরে একটি গ্রাম। গ্রামের নাম ভাহুড়া। ভাহুড়া যে এক সময় বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, তাহা এখনও দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। শহর হইতে অনেক দূরে। প্রাচীন গ্রাম। বাঁশবনের মধ্য দিয়া পথ। সংকীর্ণ পথ বন-জঙ্গলে ভরা। গভীর বাঁশবন, চারিদিক অন্ধকার করিয়া থাকে দিনের বেলায়ও।

পথের অনেকটা দূরে শিবমন্দির। তাহার মাথার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মন্দিরের গায়ে নানা জাতীয় গাছপালা গজাইয়াছে। দেওয়াল অর্ধেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শিবমন্দিরের কাছে একটি পুকুর। তাহার বুকে জলজ শেওলা। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ। কেহ পূজা করে না। সন্ধ্যায় শাঁখ ঘণ্টা বাজে না। মন্দিরের আশেপাশে লোক-জন নাই। দূরে দূরে দুই চারিজন ঘর গৃহস্থ বাস করে। মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা সরাইখানা। ওখানে লোকজন আসে—রাত্রিতে থাকে, আবার দূর-দূরান্তে চলিয়া যায়। সরাইয়ে খাদ্য মিলে, রাত্রে শুইবার ঘরে বিছানাও মিলে।

সরাইয়ের পাশে একটি দোকান। ঐ দোকানে চাল-ডাল-তেল নুন সবই পাওয়া যায়। পথিকেরা প্রয়োজন মত জিনিসপত্র কেনে। রাত্রিবেলায় কেহ বড় একটা থাকে না। বড় ভয়, কেননা ভাহুড়া গ্রামে ডাকাতদের প্রধান আড্ডা। দুর্দান্ত দস্যুদল এখানে বাস করে। মস্ত বড় দল। গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে গঙ্গা। গ্রামের অল্প দূরে একটি খাল। খালটি খুব সংকীর্ণ নহে। খালে বার মাস জল থাকে। খালের পথে পাশাপাশি নৌকা চলাচল করে। ওই গ্রামের নামকরা ডাকাতের নাম অর্জুন বাগদী। বেঁটে খাটো মোটাসোটা লোকটি। বলিষ্ঠ দেহ খুবই শক্তিমান। গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। চোখ দুইটি জবা ফুলের মত লাল।

গ্রামের এক পার্শ্বে অর্জুনের বাড়ী। গ্রামের লোকেরা ভালমতই জানে যে, সে একজন দুর্দান্ত ডাকাত। ঐজন্য সবাই অর্জুনকে সমীহ করিয়া চলে। কেহ কোন কথা বলে না। অর্জুনের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব হইল যে, সে কখনও গ্রামের লোকের উপর কোন অত্যাচার করে না, বরং বিপদে অসময়ে সাহায্য করে। অর্জুনের জীবন ছিল রহস্যময়। তাহার স্ত্রী তাহারই মত যেন মহিষমর্দিনী। যেমন কাঁসা কণ্ঠ, কর্কশ স্বর তেমন কলহে নিপুণা। কিন্তু বাড়ীতে এমন কোন লোক নাই যাহার সহিত সে কলহ বিবাদ করে। অর্জুনের আর একটি কারবার ছিল,···সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করিয়া গোপনে চালান দিত নানা দেশ-বিদেশে। ওই খবর কেহ জানিত, কেহ বা জানিত না। তবে যাহাদের পুত্রকন্যা হারাইত—তাহারা খোঁজ করিতে আসিত ঐ গ্রামে।

একবার এক ধনী যুবক, আত্মীয় বাড়ী যাইবার পথ ভুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ গ্রামে আসিল—অর্জুনের বাড়ীর কাছে। রূপবান যুবক—সুশ্রী।

ওই গ্রামের তিন-চারি ক্রোশ দূরে সোনারপুর গ্রাম। ওই গ্রামের ধনাঢ্য মুখার্জী বাড়ী যুবকের গন্তব্য স্থল। যুবকের সঙ্গে ছিল একজন নৌকোর মাঝি। ও যে ডাকাতদলের লোক তাহা যুবক জানিত না। সে খালের পাড়ে নৌকা লাগাইয়া বলিল—'কর্তা এই গাঁয়ের পথ দিয়ে হেঁটে গেলে—সোনারপুর যেতে দেরী হবে না। চার পাঁচ দণ্ড পরে চাঁদ উঠবে। চলুন হেঁটেই যাই, উভয়ে হেঁটে চললো।'

সহসা একটা ঘন নিবিড় জঙ্গলের পার্শ্বে আসিয়া মাঝিটি অদৃশ্য

হইল। যুবকের নাম মোক্ষদাচরণ। সে পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল, মাঝি নাই। অন্ধকার রাত্রি। তাহাতে ভীষণ দুর্যোগ। আকাশ জুড়িয়া কালো মেঘ। হঠাৎ আরম্ভ হইল অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

মোক্ষদাচরণ কোন পথে কোথায় যাইবে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দূরের এক বাড়ীর জানালা দিয়া আলোক-রশ্মি বাহিরে আসিতেছে দেখিতে পাইয়া সে যথাসম্ভবদ্রুত হাঁটিয়া গিয়া ওই বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীতে পৌছাইয়া বার বার দরজায় আঘাত দিতে দরজা খুলিয়া গেল। দরজা খুলিয়াই মোক্ষদাচরণ এক নারীকে দেখিল। কি মূর্তি। যেন প্রেতিনী। সে দুই পা পিছাইয়া গেল।

কে? কে?

'বড়ো বিপদে পড়ে এসেছি,—উত্তর করিল মোক্ষদাচরণ।

ওঃ। আইস বাবু—কর্কশ কণ্ঠে আহ্বান করিল অর্জুনের স্ত্রী। ঘরে ঢুকিবামাত্র দরজা বন্ধ করিয়া দিল।



দুই

ঘরে মিটিমিটি কেরোসিনের প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটা তক্তপোষের উপর অর্জুন বসিয়া আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—'কে বাবু আপনি? আহা-হা কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। জামা কাপড় ছাড় বাবু···ওগো কাপড় দাও। আহা-হা বাবুর গা দিয়ে জল ঝরছে। গামছা দাও গো।' মোক্ষদা আশ্বস্ত হইল। তাহার ভয় ভাঙ্গিল। তখন একে একে কোথায় কাহার বাড়ীতে কি জন্য যাইবে ও কথা সে অর্জুনকে বলিল।

ভয় নাই বাবু। পাশের ঘরের বিছানায় শুইয়া থাকুন। আচ্ছা রান্না-বান্নার যোগাড় করিয়া দিতেছি—···ওগো, অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া দাও।

কুরূপা স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল। যেন একটি চলন্ত প্রেতিনী অদৃশ্য হইল।

অর্জুন মোক্ষদার হাত ধরিয়া বলিল—বস বাবু বস! উঃ আজ দেবতারা রাগ করেছে। দেবতারা আজ মাতামাতি কচ্ছে। পাশের বন থেকে একটা গাছ ভেঙে পড়ল···কড় কড় মড় মড় শব্দে'।

এমন সময় অন্নপূর্ণা মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করিল। সুন্দরী কিশোরী মূর্তি। বয়স ষোল সতেরো হইবে। পরণে ময়লা শাড়ী। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা আর মুখখানি লাবণ্যখচিত। শোভন শ্রী-টলটল্ করিতেছে।

অন্নপূর্ণা বলিল,—বাবা, আমাকে ডেকেছেন।

গম্ভীর কণ্ঠে অর্জুন বলিল—'হাঁরে বেটি হাঁ। দেখ ঐ বাবু আজ বিপদে পড়ে এসেছেন। জানিস ত অতিথিকে না খাইয়ে রাখতে নেই। যা যা তাড়াতাড়ি খিচুড়ি পাক করে দে। পাশের ঘরে বিছানা করে দে। বুঝলি সব সাবধান! সাবধান।'

অন্নপূর্ণা কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

অর্জুন নেশায় মশগুল হইয়া পড়িয়া রহিল। সত্যিই কি তাই···



তিন

মোক্ষদাচরণ আহার করিল। আহারান্তে পাশের যে ঘরে তাহার শুইবার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল সেখানে শুইয়া পড়িল। অজ্ঞাতভাবে বিপদকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইল। সে জানিত না যে, অর্জুন ডাকাত। এইটা গৃহস্থের বাড়ী নয়, এক ডাকাতের আড্ডা। এই বাড়িতে আসিবার পূর্বে অর্জুনের দলের ওই যে মাঝি যে পথের ধারে সরাইতে খবর দিয়াছিল—তাহারাই শিকার পৌছাইয়া দিয়াছে। সরাইয়ের দস্যুদল ওই ঝড় বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া একটা বড় বটগাছের তলা হইতে সব লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিল।

মোক্ষদাচরণের সঙ্গে কোন টাকাকড়ি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি না থাকিলেও ভদ্রঘরের সন্তান। পোশাক-পরিচ্ছদ খুবই দামী, উহাকে হত্যা করিলে কিছু না কিছু মিলিবে ইহাই ছিল অর্জুনের ধারণা।

কিন্তু হায়! কি এক অজানা কারণে সাধে বাদ সাধিল। অন্নপূর্ণা মোক্ষদাচরণের ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে বলিল—'বাবু এখন বাঁচতে হলে পালানো ছাড়া উপায় নেই। এই সুযোগ। সহজে এমন সুযোগ মিলবে না। ভাববার সময় নেই। ডাকাতের বৌ দরজায় আগল দিয়ে ঝড় বাতাসের ঠাণ্ডা হাওয়ায় নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। অর্জুন ডাকাত বেরিয়ে গেছে দলের লোকজনদের যোগাড় করতে। এই সুযোগ চল চল এক লহমা দেরী করো না।'

অন্নপূর্ণা ও-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদাচরণের হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। তাহারা ঝোপঝাড় ও বাঁশবনে ঢাকা পথে পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে অগ্রসর হইল অজানা পথে। তখনও আকাশে মেঘের গর্জন হইতেছিল—ঝড়ের হাওয়া বহিতেছিল প্রচণ্ড বেগে। মুষলধারে বৃষ্টিও পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। তবুও কোথাও বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সারারাত পথ চলিয়া কলিকাতার কাছাকাছি এক গ্রামের এক বাড়ীতে আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—আকাশও ফর্সা হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর কর্তা ভোরে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় দুইটি কিশোর-কিশোরীকে বাড়ীর রোয়াকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বাড়ীর সকলকে জাগাইয়া তুলিলেন।

ধনী গৃহস্থের বাড়ীর লোকেরা তাহাদিগকে প্রথমে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। পরে অন্নপূর্ণার মুখে সকল কথা শুনিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে সংবাদ দিয়া নিরাপদে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা

করিলেন। তাঁহারা যথাসময় থানায় খবর দিতে কসুর করেন নাই।

*   *   *   *

ঐদিন রাত্রিতে মহানন্দে মোক্ষদাকে হত্যা করিবার জন্য সদলবলে আসিয়া ডাকাতরা দেখিল—শূন্য পিঞ্জর···পাখী খাঁচা ছাড়া···অন্নপূর্ণা, মোক্ষদাচরণ কেহই নাই। বলা বাহুল্য অন্নপূর্ণা অর্জুনের কন্যা নহে। পূর্বে ডাকাতি করিতে গিয়া অর্জুন তাহাকে অপহরণ করিয়াছিল—অতঃপর বাড়ীতে আনিয়া পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল।

ডাকাতদের একটি রীতি ছিল—তাহারা স্ত্রী-জাতির প্রতি কোন অত্যাচার করিত না; হত্যাও করিত না। তাই অন্নপূর্ণার গায়ে অর্জুন কোনদিন হাত তোলে নাই।

(৫১) মেয়ের বুদ্ধি



এক

বর্ধমান জেলার একটি ভদ্রপল্লী। পল্লীর নাম বল্লবপুর। ওই গ্রামে সদানন্দ চৌধুরীর বাড়ী। পিতার একমাত্র পুত্র তিনি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রভূত পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করেন। সদানন্দ ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সুন্দরভাবে সম্পত্তি পরিচালনা করিয়া ধীরে ধীরে দশজনের একজন হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার একমাত্র কন্যার নাম বিভা। বেশ সঙ্গতিপন্ন ঘরে সদানন্দবাবু তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিভা ছিল বাবা-মার একমাত্র সন্তান—এইজন্য সে ছিল পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয়। বিবাহের পরেও বিভা অনেক সময়ে বাপের বাড়ী আসিয়া একনাগাড়ে তিন-চারি মাস থাকিত। তাহার বৈবাহিকের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্তাই হইয়াছিল। বিভা তাহার একমাত্র কন্যা—তিনি যেন কোন আপত্তি না করেন। ধনী অপুত্রক বৈবাহিকের এই প্রস্তাবে বিভার শ্বশুর কোন আপত্তি করেননি।

বিভার সবে একটি পুত্র হইয়াছে। তাহার বয়স তিন বৎসর। সদানন্দবাবু ছিলেন ভীষণ কৃপণ। কিন্তু দৌহিত্রের সুখ-সাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহা কিছু অর্থ ব্যয় নাতির জন্য হইত। তাহা ছাড়া লোহার সিন্দুকে হাত পড়িত না। তাঁহার কৃপণতার কথা এবং সিন্দুক-ভরা টাকার কথা দেশের সবাই জানিত।

ঐ সময় বিশ্বনাথ ছিল একজন প্রধান ডাকাত সর্দার। তাহার নামে তখন সমস্ত দেশবাসী ভয়ে কাঁপিত। বিশ্বনাথের অধীনে অনেক ছোট ডাকাতদল ছিল। তাহাদের উৎপাতে কেহ সুখে শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারিত না। অনেক সময় তাহারা চিঠিপত্র দ্বারা পূর্বেই খবর পাঠাইয়া ডাকাতি করিত। বিশ্বনাথের ছোট ছোট দলের লোকেরা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল দল সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যাইত। এইরূপ একটি ছোট দলের এক সর্দার সদানন্দবাবুকে এক পত্রে লিখিয়া জানাইল—'আমরা আগামী সপ্তাহে সোমবার আপনার বাড়ীতে ডাকাতি করিতে আসিব। প্রস্তুত থাকিবেন।'

সদানন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রী ঐ পত্র পাইয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। হায় হায়! কী ভীষণ বিপদ! এবার তাদের সব টাকাকড়ি দস্যুহস্তে যাইবে। কিন্তু উপায় কি? সদানন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রী মনের দুঃখে বলিতেছিলেন—'আমাদের ধনদৌলত সব যাবে যাক। কিন্তু আমাদের মেয়ে ও নাতিটির দশা কি হবে? ভগবান, এই বিপদে রক্ষা করো। মুখ তুলে একবার চেয়ে দেখ দেবতা।'

ঐভাবে ভয়ে ভয়ে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। একদিন রাত্রিতেই সত্য সত্যই ডাকাতেরা আসিয়া সদর দরজায় জোরে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল—'দরজা খোল। দরজা খোল।'

প্রমাদ গুণিলেন সদানন্দবাবু! সত্যই তাহা হইলে ডাকাতের দল হানা দিয়াছে। তিনি সর্দারের চিঠি পাইয়া কিছুদিন বাড়ীতে লোকজন মোতায়েন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখিতে পাইলেন, ডাকাতের নামগন্ধ নাই—সর্দারের চিঠি কোন শত্রুর কাজ মনে করিয়া লোকজন বিদায় দিয়াছিলেন।

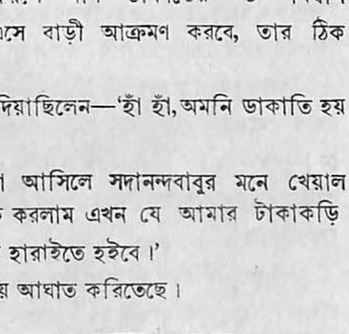
কৃপণ মানুষ। ভাবিলেন, লোকজন রাখিয়া অত টাকা খরচ করিবার কোন মানে হয় না। তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'কাজটা ভাল করলে না। ডাকাতের ত বিশ্বাস নাই। কে কোন্ ছলে এসে বাড়ী আক্রমণ করবে, তার ঠিক আছে?'

সদানন্দবাবু স্ত্রীকে ধমক দিয়াছিলেন—'হাঁ হাঁ, অমনি ডাকাতি হয় আর কী!'

কিন্তু সেদিন ডাকাতরা আসিলে সদানন্দবাবুর মনে খেয়াল হইল—'হায়! হায়! কি করলাম এখন যে আমার টাকাকড়ি পুঁজিপাটা যাহা আছে, সবই হারাইতে হইবে।'

ডাকাতরা ঘন ঘন দরজায় আঘাত করিতেছে।

দুই



তাহাদের কন্যা বিভা পাশের ঘরে শিশুটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল। সমন সময় ডাকাতদের হা-রে-রে চীৎকারে, দুমদাম শব্দে; ঘর দরজা ভাঙ্গিবার শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল—'বাবা আপনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিলে আর হা-হুতাশ

করিলে কি হইবে? আপনি খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া পাড়ার লোকজন ডাকিয়া আমুন। এতটুকুও দেরী করিবেন না।'

সদানন্দবাবু কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলেন—'না, তোমার খোকাকে, তোমাকে ও তোমার মাকে এইভাবে বাড়িতে ফেলিয়া কেমন করিয়া যাই? যদি কোন বিপদ ঘটে তখন কি হইবে? তোমাদের ফেলিয়া যাইতে পারিব না। ডাকাতদের হাতে প্রাণ দিতে হয় তাহাও দিব। ডাকাতেরা পাঁচ-সাতজন একত্রে দরজায় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। দরজা রক্ষা হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অতি ভয়ানক অবস্থা।

এমন সময় বিভা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ডাকাতেরা না শুনিতে পায় এইভাবে বাবার কানে কানে কি বলিল এবং মায়ের কাছে সে কথা বলিয়া মনে সাহস সঞ্চয় করিতে বলিল।

শেষ পর্যন্ত কন্যার কথা অবহেলা না করিয়া সদানন্দবাবু তাড়াতাড়ি খিড়কির পথ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ডাকাতরা সদর দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই ছিল বিকট কালো, কুৎসিত চেহারা। তাহাদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল ও হাতে বর্শা, তলোয়ার। ডাকাতদের এই বীভৎস চেহারা দেখিয়া বিভার মা ও বিভা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল।

ডাকাতদের ভীষণ আকৃতি ও কর্কশ ভাষা শুনিয়া বিভার মা ও বিভা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। একজন ডাকাত হাতের লাঠি উঁচু করিয়া সদানন্দবাবুর স্ত্রীকে বলিল—'দে বুড়ি চাবি দে। লোহার সিন্দুকের চাবি দে।' ভদ্রমহিলা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—'আমার কাছে তো চাবি নাই। জানি না কর্তা কোথায় রেখে গেছেন।'

'ওসব চালাকি চলবে না। যদি চাবি না দিস, তবে তোকে, তোর মেয়ে ও ছেলেটিকে মেরে ফেলব। ভাল চাস তো বের করে দে।—দে—দে। দু' তিনজন ডাকাত এসে তলোয়ার তুলে তাঁকে কাটিতে উদ্যত হোল! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রমহিলা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।'

এই দৃশ্য দেখিয়া ডাকাতদের সর্দার হা···হা···করিয়া হাসিয়া বলিল—'দেখরে, ! বুড়িটা মূর্ছা গেল।'

'এবার মেয়েটাকে শক্ত করে ধর। চাবি আপনা থেকে বেরোবে।'

সর্দারের হুকুমে অন্য ডাকাতরা প্রত্যেক ঘরের দরজা জানালা, বিছানা পর্যন্ত সব ওলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিল। কোথাও চাবি আছে কিনা।

সদানন্দ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী ছিল গ্রামের এক প্রান্তে। সুতরাং কন্যা ও তাহার মায়ের করুণ আর্তনাদ প্রতিবেশীরা শুনিতে পায় নাই। ভীষণ অবস্থা, বুঝি বা কাহারও প্রাণ আর রক্ষা হইবে না।

এমন সময় বাহির হইতে 'ধর ধর ধর—ডাকাত পড়েছে' এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বহু লোক সদানন্দবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। লাঠি, ছড়ি, তলোয়ার প্রভৃতি যে যাহা পাইল তাহা লইয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ডাকাতরা কিন্তু তখনও নিরস্ত হয় নাই। 'দে দে চাবি দে'—বলে ভীষণ হুঙ্কার দিয়া বিভাকে শাসাইতেছিল।

'দোহাই তোমাদের, আমাদের যা আছে সব দিয়া দিচ্ছি। আমাদের প্রাণে বাঁচান।' এইভাবে ডাকাতদের কাছে মিনতি করছিল বিভা।

'তা বোঝা যাবে, কিন্তু লোহার সিন্দুকের চাবি না পেলে যে আসল মাল বেরুবে না। চাবি কোথায় দাও। বুড়ো তো আর সিন্দুকের চাবি নিয়ে বেরোয়নি। নিশ্চয়ই তুমি জান—দাও, দাও চাবি দাও।'

কী চীৎকার, কী গর্জন, বিভা মুস্কিলে পড়িল। চাবির খবর সে সত্যই জানিত না। তাহার পিতা সর্বদা সতর্কভাবে চাবি কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন। ডাকাত সর্দার নানাভাবে পীড়াপীড়ি করা সত্বেও বিভা চাবি দেখাইয়া দিতে পারিল না।



তিন

তখন সর্দার এক ভয়ানক কাজ করিল। সে একটা চুলা জ্বালাইয়া একটা বড় কড়াইয়ে তেল চাপাইয়া দিল। একটা লম্বা লোহার শিক সে চুলার আগুনে গুঁজিয়া দিল। তাহার পর যাহার গায়ে যে সব জিনিসপত্র ছিল তাহা সংগ্রহ করিতে বলিল দলের লোকদের।

এবার বিভার দিকে চাহিয়া দুই রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া ডাকাত সর্দার বিকট স্বরে বলিল—'দেখ ঠাকরুণ, বুঝতেই পারছ ব্যাপারখানা কি? ঐ পোড়ানো ডগডগে শিক দিয়ে তোমার সারা শরীরে ছেঁকা দেব। তারপর তোমার ঐ কচি ছেলেকে দেবো গরম তেলের মধ্যে। যদি ভালো চাও চাবি বার করে দাও।'

ও-কথা শুনে বিভার প্রাণ শুকাইয়া গেল। হায় হায়। অবশেষে তাহার প্রাণ তো যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে কচি শিশুরও।

সে মনেপ্রাণে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল—'দয়াময় প্রাণে বাঁচাও, সব রক্ষা করো দয়াময়।'

এত বড় বিপদের মধ্যে বাহিরে ভীষণ গোলমাল শোনা গেল। চারিদিক হইতে বাড়ীর মধ্যে ইট পাটকেল পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ডাকাতরা তখন বুঝিতে পারিল গ্রামের লোকেরা সব একত্রিত হইয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেলিয়া ডাকাতেরা পালাইতে শুরু করিল।

ডাকাতদের পলাইতে দেখিয়া বিভার প্রাণে বলের সঞ্চার হইল। সে মায়ের চোখে মুখে জল দিলে তাঁহার মূর্ছা ভাঙ্গাইল?

পলাইবার সময় ডাকাতদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল। ডাকাতদের মধ্যে কেহ পলাইতে পারিল, কেহ বা পারিল না। পাঁচ-ছয়জন ডাকাত গ্রামবাসীদের কাছে ধরা পড়িল। তাহাদের

পুলিশের হাতে দেওয়া হইল। পরে তাহারা বিচারে দণ্ডিত হইয়াছিল।

বিভা যে তাহার বাবাকে গ্রামের লোকদের নিকট ডাকাতির সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছিল সে কথা মিথ্যা নহে। সেদিন গ্রামের বারোয়ারি তলায় যাত্রা গান হইতেছিল। সেইজন্য বহু লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহারা ডাকাত পড়ার সংবাদ শুনিয়াই দলে-দলে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

সেইদিন বিভার বাবা কন্যাকে আদর করিলেন এবং নাতিকে কোলে লইয়া বলিলেন—'মা তোর বুদ্ধির বলেই আজ আমরা ধনে-প্রাণে রক্ষা পেলাম।'

বিভা বলিল—'বাবা বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকুন। তাঁর কৃপায়ই আমরা রক্ষা পেয়েছি।'

যাত্রার দলের অধিকারী বলিলেন—'কর্তামশাই মা যা বলেছেন, তাই ঠিক। আপনি একদিন ঠাকুরের সেবা করুন।'

বিভা ও তাহার মা বলিলেন—'সে তো খুব ভালো কথা।' তখন যাত্রার দলের একটি ছেলে গাহিয়া উঠিল—"বিপদ··· বারণ, তুমি নারায়ণ···।"

(৫২)



ডাকাত রামজীবন ও অদ্বৈত বণিক

কলিকাতার উপকণ্ঠে মাতলা নদী। নদীর পারে সমৃদ্ধ পল্লী। বহু লোকের বাসভূমি। তাহার পাশেই বানপোস গ্রাম। ঐ গ্রামে অদ্বৈত বণিক নামে এক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে ছিল অদ্বৈত বণিকের বিশাল কারবার। কারবারে যেমন প্রচুর আয়, তেমনি কর্মচারীর সংখ্যাও প্রচুর। বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজনদের লইয়া তিনি বাস করিতেন।

অদ্বৈত বণিক প্রতি শনিবার সকাল সকাল দোকান বন্ধ করিয়া গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া আসিতেন। রবিবার দিন বাড়ীতে থাকিয়া সোমবারে কলিকাতায় ফিরিতেন। এইভাবে নিরাপদে নির্ভাবনায় তাঁহার দিন চলিতেছিল।

ষাট বৎসর পূর্বের কথা। ঐ দিন ছিল শনিবার। অমাবস্যা তিথি। ভয়ানক দুর্যোগের রাত্রি। এত বড় দুর্যোগের মধ্যেও সর্দার রামজীবন সদলবলে অদ্বৈত বণিকের বাড়ী আক্রমণ করিল। ঐ দিনই অদ্বৈত বণিক বাড়ী আসিয়াছেন।

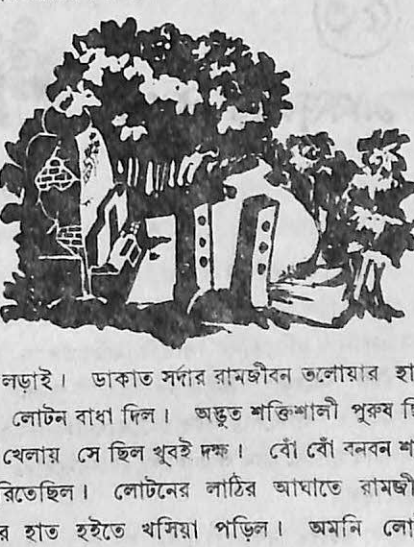
বণিকের গ্রামের পাশেই একটি গ্রাম ছিল—সে গ্রামের নাম বাবুপাড়া। বাবুপাড়াতে বাস করিত রামজীবন বাগদী। সে ছিল কুখ্যাত ডাকাত। তাহার দলে সাঁওতাল ও কতিপয় মুসলমানও ছিল। রামজীবন ও দলের লোকজন দীর্ঘদিন ধরিয়া অদ্বৈত বণিকের বাড়ী আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। এবার অমাবস্যার দুর্যোগের রাত্রিতে সুযোগ মিলিল।

ডাকাতের দলে ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। সকলের হাতে মারাত্মক অস্ত্র—তলোয়ার, লাঠি, সড়কি, তীর, বন্দুক ইত্যাদি। সকলের মুখ কালিমাখা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল ঝুঁটি বাঁধা।

বণিকের বাড়ী ছিল এক বড় দীঘির পাড়ে। তাল, সুপারি, হিজল, নারিকেল প্রভৃতি গাছে দীঘির পাড় অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। একে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার, ওদিকে আবার ঝড়-বৃষ্টি সহ ঘন মেঘের গর্জন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

দীঘির পাড়ে ফাটল। ওখানে বসিয়া ডাকাতেরা কোন চীৎকার করিল না। কোন হৈ চৈ করিল না। পাড়ে ছিল দুই তিনটি বিচালির স্তূপ। ডাকাতেরা সেই সব বিচালির স্তূপে আগুন ধরাইয়া দিল। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে আশেপাশের চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। এই সুযোগে দস্যুদল নানা দিক দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বর্ষণমুখর তিমির রাত্রে গৃহস্বামী ও তাঁহার বাড়ীর অন্যান্য সকলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন এবং কি যে করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অদ্বৈত বণিক ছিলেন সাহসী এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি। তিনি সকলকে জোরে চীৎকার করিয়া জাগাইয়া দিলেন। তিনি নিজে অস্ত্র ধরিলেন। বাড়ীতে ছিল বহু লোকজন। ভৃত্য, পাহারাদার এবং লোটন নামে একজন পালোয়ান ছিল তাঁহার নিত্য সহচর। লোটনকে বলিলেন—'লোটন! হুঁশিয়ার হয়ে লড়াই করো। ধর হাতিয়ার।' লোটন বলিল—ভয় নেই হুজুর। আমি একটা লোককেও উপরে উঠতে দেব না।'



দুই

আরম্ভ হইল লড়াই। ডাকাত সর্দার রামজীবন তলোয়ার হাতে ছুটিয়া আসিল। লোটন বাধা দিল। অদ্ভুত শক্তিশালী পুরুষ ছিল লোটন। লাঠি খেলায় সে ছিল খুবই দক্ষ। বোঁ বোঁ বনবন শব্দে লোটনের লাঠি ঘুরিতেছিল। লোটনের লাঠির আঘাতে রামজীবন সর্দারের তলোয়ার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। অমনি লোটন মুহূর্তমধ্যে রামজীবনের পায়ে নিদারুণ ভাবে লাঠির আঘাত করিল। অবশেষে তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বারান্দায় ফেলিয়া রাখিল।

সর্দারের ঐ অবস্থা দেখিয়া ডাকাতেরা ভীষণ আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোনক্রমে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, আবার অনেকে আহত অবস্থায় ধরা পড়িল। ইতিমধ্যে গ্রামের কতিপয় সাহসী যুবকও বণিক-বাড়ি ডাকাতি হইতেছে জানিতে পারিয়া সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহারা এবং বণিকের

চারি-পাঁচজন ভৃত্য দেউড়ির সম্মুখে এবং খিড়কির দরজার কাছে ডাকাত ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। যুবকদের হাতে ছিল লাঠি সোটা প্রভৃতি নানা প্রকারের হাতিয়ার। ডাকাতরা মূল্যবান জিনিসপত্র লইয়া যে মুহূর্তে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে-ছিল, সেই মুহূর্তেই তাহারা খিড়কির দরজার কাছে অপেক্ষমান যুবকদের লাঠি-সড়কির আঘাতে ধরাশায়ী হইল।

অদ্বৈত বণিক মহাশয় ছিলেন প্রৌঢ়বয়স্ক। কিন্তু তাঁহার ও লোটনের অদ্ভুত সাহসের ফলে ডাকাতরা হার মানিল। এই হাঙ্গামায় বণিক মহাশয়ের দশ-বারো জন লোকের মধ্যে চারিজন ভৃত্য সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছিল। ডাকাতদলের আটজন লোক আহত ও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন থানায় সংবাদ পাঠান হইল।

পুলিশ সদলবলে আসিয়া সর্দার রামজীবন ও আহত ডাকাতদের গ্রেপ্তার করিল। রামজীবনের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল কিন্তু উঠিবার শক্তি ছিল না।

পুলিশের কঠোর নিপীড়নে সে দলের কয়েকজনের নাম বলিয়া দিয়াছিল। পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করিল। বিচারে প্রত্যেকের শাস্তি হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অদ্বৈত বণিককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—'আপনি বড় সাহসী আছেন—আপনাকে ধন্যবাদ!' বেঁটেখাঁটো জোয়ান লোটনকে দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন—'টুমি সাহসী আছ, ধন্যবাদ জানবে।' ধৃত ডাকাতদের প্রত্যেকের সাজা হইবার পর ঐ অঞ্চলের অনেক ডাকাত ধরা পড়ল।

৫৩



মাকড়সার জাল

এক

সিপাহী বিদ্রোহের সময় উত্তর ভারতে যেমন ছিল ডাকাতদের ভয় তেমনি ছিল বিদ্রোহী সিপাহীদের। লোকজন ভয়ে ভয়ে থাকিত। তখন একদিকে চলিতেছিল সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ানক গোলমাল। সিপাহীরা ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে সিপাহীরা ঐ সময় নির্দোষ ও অসহায় সাহেব, মেম ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নির্মমভাবে হত্যা করিতেছিল।

ঢাকা শহরের নিকটবর্তী একটি বড় গ্রামে একজন ধনী ব্যবসায়ী বাস করিতেছেন। তাঁহার ছিল পাকা বাড়ী। বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর। তাহার মধ্যে একটি ছোট ঘরে চারিজন স্ত্রীলোক বসিয়া সন্ধ্যার পরে গল্পগুজব করিতেছিলেন। বাড়ীতে একটি তের-চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম গৌরী। সে ছিল পরমা-সুন্দরী। বাড়ীতে পুরুষদের মধ্যে ছিল শুধু এক বৃদ্ধ। বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটি হাইস্কুলে মেয়েটি পড়িত।

সেদিন সন্ধ্যার একটু পূর্বে গৌরী পুকুরের ঘাটের দিক হইতে ...

এমন সময় একটি জঙ্গলের আড়াল হইতে তিনজন ইংরেজ বাহির হইয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। ভয়ে আতঙ্কে গৌরীর কাখ হইতে কলসীটি পড়িয়া গেল। তখন ঝনাৎ করিয়া কলসী পড়িবার শব্দ হইল।

গৌরী চমকিত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সাহেবদের মধ্যে ছিল একজন আধাবৃদ্ধ লোক। সে গৌরীর পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। সাহেব বাংলা ইংরাজী ও হিন্দী মিশাইয়া বলিল—'হামারা বড় বিপডে পড়িয়াছে। বড় বিপড। রাত্রের মটো টোমাদের বাড়িতে আশ্রয় দাও। বিদ্রোহী সিপাহীরা হামাডের মারটে আসছে। হামাডের বাঁচাও। কোন ভয় কোর না।'

গৌরীর একটু সাহস হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমরা কে?'

—'আমরা মার্চেন্ট আছি। নারায়ণগঞ্জের পাটের সাহেব। গড খুব ভাল করবেন। হেস্ট হেস্ট—জলডি করো—জলডি করো।'

গৌরীর কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। সে বলিল—'এসো। কাম উইথ মি।'

একজন ইংরেজ কলসীটি হাতে লইল। গৌরী হাসিয়া কলসীটি কাখে তুলিয়া লইল। মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতী। বিপদে রক্ষা করা মহৎ ধর্ম। সাহেবদের সঙ্গে লইয়া অনেক বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া লতা-পাতা, ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের লইয়া পিছনের খিড়কি দরজা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সাহেব তিনজন ভীষণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনভ্যস্ত বনের মধ্যে দিয়া চলিতে চলিতে কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত কাটিয়াছে। তাহারা বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। গৌরী বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহাদের বড় ঘরের পাশের ছোট কুঠরীতে সাহেবদের আশ্রয় দিল। ঘরটিতে থাকিত মজুত শস্য। ঘরে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র পথ। দরজা। মাথা নিচু করিয়া কোন প্রকারে একজন একজন করিয়া ঢুকিতে পারে। বিপন্ন সাহেব তিনজন অতি কষ্টে দেওয়াল ধরিয়া এই শস্যের গুদাম ঘরে প্রবেশ করিল। এইভাবে নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া দুই হাত তুলিয়া গৌরীকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ছিল বৃদ্ধা। তিনি ইহা দেখিয়া গৌরীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

গৌরী কিন্তু ভয় পাইল না।

ওদিকে বাহিরে তখন ভীষণ বেগে ঝড় বহিতেছিল। সে কী ভীষণ শব্দ। সে কী বিভীষিকা! গৌরী ভাবিল—'প্রকৃতির এই দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে এমন দুর্যোগের রাত্রে আর ভয় নাই।' সেই সময় এই অঞ্চলে চোর ডাকাতের খুবই ভয় ছিল। সেইজন্য বাড়িতে নানা প্রকার ছোটবড়ো কুঠরী থাকিত। আত্মরক্ষার জন্যও ঘরে ঘরে নানা প্রকারের অস্ত্রও থাকিত। যে বাড়ীর কথা বলিতেছি ঐ বাড়ীর কর্তা বাড়ীতে ছিলেন না। বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি দূরদেশে গিয়াছিলেন। এমন কি বাড়ীতে যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসী দারোয়ানরা ছিল তাহারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল! বাড়ীতে নিরাশ্রয় ঐ কয়জন স্ত্রীলোক ও একজন মাত্র বৃদ্ধ ছাড়া আর



দুই

গৌরী নজর করিয়া দেখিল কুঠুরীর দরজার সবটা খোলা যায় নাই। কতকটা ফাঁক রহিয়াছে। যাহাই হোক সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া সেই সাহেব তিনজন কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়াই 'গুড নাইট, এবং গৌরীকে 'গড ব্লেশ ইউ' বলিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে ঘরের মধ্যে যে সকল বিচালী ছিল, তাহার উপরই সেই রাত্রির মত বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে শুইয়া পড়িল। তাহারা গৌরীকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিয়াছিল যদি সিপাহীরা এই দিকে আসিয়া পড়ে তবে তাহাদিগকে আসিয়া যেন খবর দেওয়া হয় এবং পলায়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে সাহেবদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া গৌরী ঘরে আসিল তখন সেই বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিল 'দেখ, তোর জন্য আজ আমাদের সমূহ বিপদ ঘটবে।'

এই কথায় গৌরী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। অপর যে বিধবা মহিলা ছিলেন তিনি গৌরীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'খুব ভালো কাজ করেছো ভাই। বিপন্নকে রক্ষা করার মত আর কী ধর্ম আছে?'

এই বাড়ীর মালিকের প্রচুর অর্থবিত্ত আছে এই খবর ঐ অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত ভবানী সর্দারের অজানা ছিল না। ভবানী এক সময়ে ছিল ইংরেজের রেজিমেণ্টে। কিন্তু বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই সে ডাকাতি করিতেছিল। একবার ডাকাতি করিতে গিয়া সে মহাবিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেবারে তাহার পা কাটা গিয়াছিল। সেই হইতে লোকে তাহাকে বলিত পা কাটা ভবানী। কিম্ভূত-কিমাকার অতি কুৎসিত খোঁড়া পা লইয়া সে দূর গ্রামে এবং সুযোগ পাইলে শহরে ডাকাতি করিত। তাহার দলে-মুসলমান, বাগদী, কোর, কিরাত, বেদে, ভোজপুরী, মণিপুরী প্রভৃতি বহু দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিল। তাহাদের দলের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। যখন যেখানে পারিত সেখানেই ডাকাতি করিত। জমিদার বাড়ী, ধনী মহাজন, তালুকদারের বাড়ী সে বেশী ডাকাতি করিত। ভবানী ভবানী-মাতার পূজা করিয়া তলোয়ার হাতে খোঁড়া পায়ে ঘোড়ায় চড়িয়া ডাকাতি করিতে যাইত।

শীতলক্ষার পারের এক পাটের গুদাম ও অফিস লুঠ করিয়া ভবানী ডাকাত জানিতে পারিল যে ওখানকার সাহেবরা প্রাণের ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। সব সংবাদ সঠিক জানিয়া সে দ্রুত রওনা হইল ধর্মারণ্যের দিকে। এই ধর্মারণ্য প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং বহু পণ্ডিত এবং ধনী গৃহস্থ ও বণিকের বাস। সেখানকার দেবমন্দির ছিল প্রসিদ্ধ। এই দেবমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাড়ী ছিল অযোধ্যা। তিনি এমন সাহসী ও তেজস্বী লোক ছিলেন যে, বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার বাহুতে ছিল অসীম বল এবং লোকে বলিত উনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। কিছুদিন পূর্বে একদল বিদ্রোহী সিপাই সেখানে আসিলে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন 'ইয়ে দেউখানা হ্যায়, এনসাজি এতকে ওয়াস্তা নেহি।' অর্থাৎ, এ মনুষ্যের উপযুক্ত বাসস্থান নয়—দেবতার থাকবার স্থান।' কিছুদূর চলিবার পর ঐ তেজস্বী পুরোহিতের কথা মনে করিয়া খোঁড়া ভবানী তাহার সঙ্গীদের কাহাকেও সেদিকে না লইয়া বরাবর চলিল ঐ ধনী বণিকের বাড়ী ডাকাতি করিতে। সেই ঝড়জল ও বৃষ্টির মধ্যেও তাহাদের হা-রে-রে-রে শব্দ শোনা যাইতেছিল।



তিন

ক্রমে রাত্র শেষ হইয়াছে। গৌরীদেরও ভয়ও যেন ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল। রাত্রি ভোর হইলেই ইংরাজরা পলাইয়া যাইবে। কিন্তু আশ্চর্য, একটু পরেই তাহারা চারিদিক হইতে খট-খট-খট ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। ঘোড়াগুলি একেবারে তাহাদের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে শোনা গেল মানুষের কণ্ঠস্বর। দ্বারের শব্দ শুনিয়া গৌরী ধীরে ধীরে দরজার কাছে আসিয়া দরজা খুলিল। দরজা খুলিয়া দেখিল একজন বিদ্রোহী সর্দার ও কয়েকজন সিপাহী দাঁড়াইয়া আছে।

সর্দার জিজ্ঞাসা করিল—'রাত্রিতে এ-বাড়িতে এসে কয়েকটি ফিরিঙ্গি আশ্রয় নিয়াছে কিনা? সত্য বল, শীঘ্র বল, নইলে……।'

সর্দার বখৎ খাঁ তাহার হাতের তলোয়ারখানা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল—'সাচ্ বেলো, ঝুটা বাৎ বলনেছে, তুমলোককো সব কাটলেঙ্গে। ইহাদের দেখিয়া এবং ইহাদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ভীত হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌরী একটুও ভীত না হইয়া বলিল—'যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকে, তবে সব ঘর খুঁজে দেখ।'

সর্দার বলিলেন—'পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।'

এদিকে ভয়ে গৌরীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল—সে আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহার মনে হইল—'কেন ঘর খুঁজে দেখতে বললাম, যদি ঐ লোক তিনটিকে দেখতে পায়, তবে তো ওদের প্রাণ যাবে।'

সর্দার বখৎ খাঁর সঙ্গে চারি-পাঁচজন সেপাই চলিল। সর্দার লোকটি বেশ স্থূলকায়। সেই সরু পথ দিয়া তাহার আর অগ্রসর হইবার ইচ্ছা ছিল না। তবুও অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে গৌরীর পিছনে অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল।

অর্ধেক পথ যাইয়া বেশ দেখা গেল যে, দরজা কতকটা খোলা রহিয়াছে। গৌরীর বুকের রক্ত যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। আতঙ্কে ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে শুধু মনে মনে করুণাময় ভগবানকে ডাকিতেছিল।

এদিকে স্থূলকায় বখৎ খাঁ সর্দার সেই কুঠুরির অল্প দূরে দাঁড়াইয়া কুঠুরির দিকে চাহিয়া একজন অনুচরকে বলিলেন—'দেখ হে মরসুম আলি—দেখ, দেখ দরজার মুখে একটা মাকড়শার জাল দেখা যাচ্ছে না?'

মরসুম আলি উত্তর দিল—'হ্যাঁ হুজুর।'

সর্দার তখন হাসিয়া বলিলেন—'মরসুম আলি ঝুটমুট, তকলিফ করে লাভ নেই। আর কেন! মাকড়শার জাল দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দরজাটা শীঘ্র খোলা হয়নি—অন্ততঃ এক মাসের মধ্যে কোন লোক এ-কুঠুরির মধ্যে প্রবেশ করেনি।'

সর্দারের কথা সৈনিকেরা যুক্তিযুক্ত মনে করিল এবং নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল! তাহারা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শোনা গেল—হা-রে-রে-রে আর বন্দুকের গুডুম্ গুডুম্ শব্দ। ভবানী জানিত না যে বিদ্রোহী সিপাহীরা এদিকে আসিয়াছে তাহা হইলে হয়তো সে এদিকে আসিত না। কিন্তু যখন দেখা গেল বিদ্রোহী সিপাহীরা ডাকাতদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন আরম্ভ হইল এক খণ্ডযুদ্ধ। সিপাহীরা মনে করিয়াছিল, গোরা সৈন্যরা আসিয়া পড়িয়াছে—তাই তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল—'ভাই সব হুঁশিয়ার। গোরা আয়ে—গোরা আয়ে।' কিন্তু কে কোথায় যাইবে। ডাকাতদের সঙ্গে বখৎ খাঁর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উভয়পক্ষ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে করিতে গ্রামের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবলমাত্র শোনা যাইতেছিল—সিপাহী ও ডাকাতদের মিলিত শব্দে—দিল্লী চলো ভাই। দিল্লী চলো ভাই! হা-রে-রে-রে।



॥ এক ॥

কোম্পানির আমলে এই ভাবে যখন খুব সতর্কতার সহিত ডাকাতি দমনের কাজ চলিতেছিল, তখন বীরভূমে কোন এক ধর্মপরায়ণা ধনবতী মহিলা পুরী বা জগন্নাথ ধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নানা কারণে আমরা গ্রামের নাম বলিলাম না।

বিধবা মহিলা ছিলেন প্রচুর ধনের অধিকারিণী। অনেক দিন হইতেই পুরীতীর্থে গিয়া রথযাত্রা দেখিবেন এই ছিল তাঁহার কামনা।

সেকালে রীতি ছিল, পুরীতে রথের দড়ি মাথায় দিয়া যাত্রীদের রাস্তার উপর শুইতে হইত। মহিলার সঙ্গে যাইবে বহু দাসদাসী, একজন মুহুরী ও কয়জন দারোয়ান। যাত্রার দিন রাত্রিতে কয়েকজন স্থানীয় ডাকাত আসিয়া বাড়ির কর্মচারীকে বলিল—'রাণীমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

—এ অসময়ে কেন? কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিল। ডাকাতদের সর্দারের নাম ছিল কালী বাগদি। সে জোড়হাত করিয়া বলিল—'আমরা এখানে ডাকাতি করতে আসিনি। রাণীমার কাছে আমাদের একটা প্রার্থনা আছে। সে কথা নিবেদন করতে এসেছি।'

তখন রাণী সর্বমঙ্গলা দেবীর কাছে কর্মচারী সংবাদ দিতে প্রস্তুত হইল।

সর্বমঙ্গলা দেবী আসিলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কালী বাগদি বলিল—'রাণীমা আমাদের বাঁচান। দারোগা পুলিশ আমাদের ধরবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোতলপুর গাঁয়ে আমাদের বাড়ি। শুনেছি মা জগন্নাথ যাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। তা' হলে মা আমরা প্রাণে বাঁচব। নইলে পুলিশ দারোগা আমাদের ধরে নিয়ে একেবারে দ্বীপান্তরে চালান দেবে।'

কথা যে সত্য তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। রাণী সর্বমঙ্গলা মনে মনে ভাবিলেন—দুর্গম পথ, দস্যু-ডাকাতদের ভয় আছে। এইসব সাহসী জোয়ান লোক সঙ্গে থাকিলে ডাকাতের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইতে পারি।

তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—'একটা কথা কালী, ঠগী, ডাকাত, চোর-দস্যুদের হাত থেকে পারবি ত আমাদের রক্ষা করতে? কালী এবং তাহার সঙ্গী ডাকাতরা 'হা-রে-রে' শব্দে লাঠি ঘুরাইয়া একটি পাক খাইয়া বলিল—'কালীর নামে শপথ করছি, আমরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করব। কোন ভয় করবেন না মা।'

বাংলার ডাকাতদের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এ-কথা সত্য জানি যে, তাহারা নারী জাতির প্রতি কোনদিন কোন অত্যাচার করিত না। তাহারা মনে করিত, নারী কালীমায়ের জাত। নারীকে দেখিত মায়ের মত। কোন ডাকাত দিনের বেলায় হউক কিংবা রাত্রি বেলায় হউক কোন ভদ্রঘরের বা নিম্নশ্রেণী নারীর প্রতি কোন-রূপ অপমান করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। বাংলার ডাকাতদের এই চরিত্রবল ছিল একান্ত প্রশংসনীয়। ডাকাতেরা শপথ করিলে রাণী সর্বমঙ্গলা বলিলেন—'তোরা যে যাবি, তোদের পরিবার পরি-জনদের খাবার কি ব্যবস্থা হবে রে?'

কালী গদগদ কণ্ঠে বলিল—সে মায়ের দয়া। রাণী সর্বমঙ্গলা তাহাদের হাতে এক মাসের উপযোগী টাকাকড়ি দিলেন এবং বলিলেন, 'কাল খুব সকালে চলে আসবি। এ তল্লাটের সব লোকজনকে বলবি—তাঁরা যেন আমাদের বাড়িঘর সব দেখাশোনা করে।'

কালী বলিল—'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন মা।' আবার সর্বমঙ্গলা দেবীকে প্রণাম করিয়া তাহারা পরদিন সকালে আসিবে, এই প্রতি-শ্রুতি দিয়া চলিয়া গেল।

॥ দুই ॥

পরদিন সকালবেলা পুরীর দিকে যাত্রা আরম্ভ হইল সর্বমঙ্গলা দেবীর। তখন জগন্নাথ ধামে যাওয়া বড় নিরাপদ ছিল না। তখন ছিল পদে পদে বিপদের আশংকা।

কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগে শ্রীরামপুরে এক পাদ্রী ছিলেন তাঁহার নাম সকলেই হয়তো জান। তাঁহার নাম ছিল উইলিয়াম কেরী। কেরী সাহেব লিখিয়াছেন যে, পুরুষোত্তম ধামে বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই ছিল। রথের সময় যাত্রীর সংখ্যা কখনও এক লক্ষের কম হইত না, কোন বার ছয়-সাত লক্ষ হইত। নানা স্থানের নানা বর্ণের লোক জগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরুষোত্তমে আসিত। সুদূর কাবুল অঞ্চল হইতেও লোক আসিত পুরীধামে। সর্বমঙ্গলা দেবী যাত্রা করিয়া প্রথম দিন সন্ধ্যার একটু আগে মেদিনীপুরের সীমানায় এক চটির কাছে আসিয়া রাত্রির মত থাকিবার জন্য বাসস্থান ঠিক করিলেন। ঐ সময়ের কিছু আগে আনুমানিক ১৮০৯ খৃস্টাব্দে চার্লস বুনার নামে এক সাহেব পুরীর যাত্রীদের উপর যে ট্যাক্স ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কাজেই যাত্রীর সংখ্যা খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। পথে যাত্রীদল দেখিতে দেখিতে প্রায় সন্ধ্যায় সর্বমঙ্গলা দেবী ও তাঁহার সঙ্গীরা একটি ছোট নদীর ধারে নিজেদের থাকিবার জন্য তাঁবু ফেলিল। সেখানে পাল্কীর বেহারারা পাল্কী রাখিয়া গাছের তলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। মুহুরী বৃদ্ধ কালীকমল চারি-পাঁচজন দারোয়ান ও বরকন্দাজদের সঙ্গে লইয়া থাকিবার স্থান নির্দেশ করিলেন। সঙ্গের ঠাকুর, চাকর, পরিচারিকারা ও তাদের বাসের জন্য ছোট ও মাঝারি রকমের তাঁবু ফেলিয়া রাত্রে থাকিবার মত ব্যবস্থা করিয়া লইল। কেহ বা নদীতে স্নান করিয়া রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ঝিরঝির করিয়া গাছের পাতায় পাতায় ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল।

রাণী সর্বমঙ্গলা তাঁবুতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সারদা দাসী কাছে বসিয়াছিল। এমন সময় কালী বাগ্‌দি দল বল-সহ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিল—'মা, আমরা সঙ্গে এসেছি। জয় মা কালী। জয় রাণীমা।'

সর্বমঙ্গলা বলিলেন—'খুব ভাল কথা। তোদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করগে। সরকার মশায় সব ঠিক করে দেবেন। খুব সাবধান! খুব সাবধান! দেখছিস্ ত কত দেশের কত লোক আসছে। খুব হুঁশিয়ার থাকবি। কাকেও বিশ্বাস করবি নে। আমরা পাশে ঐ বড় তেতুঁল ও অশ্বথ গাছের তলায় ব্যবস্থা করে নেব।' 'আচ্ছা রাণীমা। জয় মা কালী।'—বলিয়া তাহারা প্রায় দশজন নিজেদের থাকিবার জায়গা ঠিক করিয়া লইল। একজন দোকানে গেল প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের জন্য।

অন্ধকার রাত। দলে দলে যাত্রীরা মাঠে মাঠে আলো জ্বালিয়া রান্নাবান্নার আয়োজন করিতে লাগিল। মুহুরী কালীকমল ঘোষ মহাশয় দুইজন বরকন্দাজসহ গিয়া বসিলেন, চটির দোকানে। দোকানী পরম আদরের সহিত তাঁহাদের দোকানে বসাইয়া নানা গল্প করিতে লাগিল। কোথা হইতে আসা হইয়াছে, কোথায় যাওয়া হইবে—এইসব খবর জানিয়া লইল।

ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—দোকানী মহাশয়? আমরা রথযাত্রার আগে পুরী গিয়ে পৌঁছাতে পারবো তো?

কেন পারবেন না? জগন্নাথদেবের কৃপায় সব হবে মোশাই। কোম্পানির আমল। কোন ভয় নেই।

বরকন্দাজ জগমোহন কোন কথা বলিল না। সে বহুদিন হইতে জমিদার বাড়িতে আছে। বাংলা সে বোঝে বেশ। ঘোষ মহাশয় নানা কথা বলিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রথমে একজন, পরে একজন, তারপর বহুজন লোক আসিল সেই দোকানে। সকলেই বলিল—জয় জগরনাথ! রাম রাম বাবুজি।

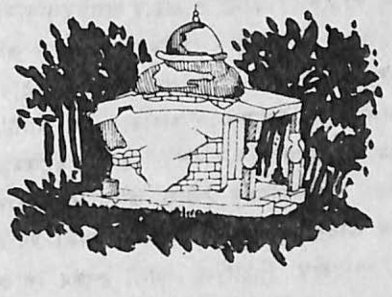
দোকানীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে কহিল—'আপনারা কোথা থেকে এলেন? জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছেন ত।'

ঠিক বলেছেন মোশাই—এবার বহুৎ বহুৎ যাত্রীর ভিড় দেখছি। আমাদের কিন্তু আটা মিষ্টি দিতে হোবে। পাশের ঘরটা ভি দিতে হোবে। কুথাও জায়গা মিলে না। জয় জগরনাথ জি কী জয়!

রাত্রি গভীর হইলে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—'খাবার সব ঠিক আছে। চলুন।'

ঘোষ মহাশয় ভৃত্যসহ চলিয়া গেলেন। ঐ চারিজন লোকের ব্যবস্থা করিতে দোকানদারকে বেশ ব্যস্ত দেখা গেল। এমনকি স্পষ্টভাবে বলিল—'এবার বিশ্রাম করুনগে আপনারা। রাত হয়েছে। এদের সব ব্যবস্থা করতে হবে ত? কি মুশকিল। একটু বিশ্রাম করতে পারার যো নেই!'

ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক চারিজন ছাড়া আর সকলে চলিয়া গেল।



॥ তিন ॥

রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন সর্বমঙ্গলা দেবী যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পাল্কি আগে আগে চলিয়াছে। পেছনে, দৌড়াইয়া চলিয়াছে কালী বাগদি। সে সংকীর্ণ পথের ধারে দেখা যাইতেছিল শতশত অসহায় নরনারী, কেহ বা রোগাক্রান্ত হইয়া পথের পার্শ্বে পড়িয়া ধুঁকিতেছে। অনেক ভদ্রপরিবারের নারীরাও পুরুষের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছে। পাল্কির মধ্য হইতে সর্বমঙ্গলা দেখিলেন—ছইয়ে ঢাকা গোরুর গাড়ির মধ্যে কোন তীর্থযাত্রী সপরিবারে চলিয়াছেন তীর্থের পথে। কত দিল্লীওয়ালা পাঞ্জাবী মহিলারা চলিয়াছেন পায়-জামা পরিয়া। চারিদিকের নানা দৃশ্য ও দুঃখদুর্দশা দেখিয়া চলিতে লাগিলেন সর্বমঙ্গলা দেবী ও তাঁহার পাল্কি বাহকেরা। এইভাবে তাহারা বালেশ্বর পার হইয়া একটি নদীর ধারে বনভূমির মধ্য দিয়া চলি-য়াছেন। লোকেরা পেছনে পড়িয়া আছে। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে পাল্কি বাহকেরা এক স্থানে পাল্কি নামাইল এবং তাড়াতাড়ি সর্বমঙ্গলার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

এ-পর্যন্ত তাহাদের কোন বিপদ ঘটে নাই। প্রায় দেড় প্রহর

রাত্রের সময় ঘোষ মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আসিয়াই শুইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে ঐ যে পূর্বদিনকার চারিজন লোক আসিয়াছিল চটিতে, তাহারা ছুটিয়া আসিল রাণী সর্বমঙ্গলা দেবীর তাঁবুর কাছে। আসিয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি কিনিয়া রান্নাবান্নার যোগাড় করিতেছিল।

কালী বাগ্‌দির প্রথম হইতেই উহাদের উপর সন্দেহ হইয়াছিল। সে উহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

ক্রমে রাত্রি বাড়িল। চাঁদ ডুবিয়া যাইতেছিল। কালী দেখিল ঐ চারিজন লোকের মধ্যে একজন চুপি চুপি একটা রুমাল হাতে করিয়া তাঁবুর কিনারার কানাৎটা সরাইয়া ধীরে ধীরে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁবুর ভিতরে রাণীমা ও পরিচারিকারা ক্লান্ত দেহে শুইয়া আছেন। লোকটি ঢুকিয়াই তাঁবুর কোণে যে আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবাইয়া দিল। তারপর রুমাল হাতে করিয়া একটা ফাঁস জড়াইয়া যেমন রাণীর গলায় জড়াইতেছে, অমনি বাঘের মতো লাফ দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল কালী বাগ্‌দি। সে উচ্চৈস্বর 'হা-রে-রে-রে' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। কালীর সঙ্গীরা যাহারা আশে পাশে ছিল তাহারাও হল্লা করিতে করিতে তাঁবুর দিকে ছুটিয়া আসিল। যাহারা গাছের তলায় বা চটিতে ছিল তাহারাও ছুটিয়া আসিল। সর্বমঙ্গলা দেবীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি ভয়ার্তভাবে চারিদিকে তাকাইয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। কালী ও তাহার দলের লোকদের সঙ্গে আরম্ভ হইল ঠগীদের কাটাকাটি। ঠগীরাও দলে বড় কম ছিল না। চারিদিক হইতে বন-জঙ্গলের এ-পাশ ও-পাশ হইতে তাহারা আসিল। ঠগীরাও কালী মায়ের উপাসক। তাহারাও 'মা কালী', 'মা কালী' রবে চেঁচামেচি করিতে শুরু করিল। এইবার রীতিমত লড়াই চলিতে লাগিল। চার-পাঁচজন ঠগীকে কালী ও তাহার সঙ্গীরা একেবারে নাশ করিয়া ফেলিল। যে ঠগী সর্বমঙ্গলা দেবীর গলায় রুমাল ফাঁস লাগাইতে গিয়াছিল, কালী পেছন থেকে তলোয়ারের ঘায়ে তাহার পা দুইটি কাটিয়া ফেলিয়াছিল। সে দুম করিয়া পড়িয়া গেল। অন্য ঠগীরা দেখিল ব্যাপার বড় সহজ নয়, তাহারা যে যেদিকে পারিল ছুটোছুটি করিতে লাগিল। তখন লোকজন সকলেই জাগিয়াছিল এবং জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিল ঠগীদের কীর্তি। তখন সকলেই তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। কালী ডাকাতের লোকেরা ঠগীদের একেবারে নাজেহাল করিয়া তুলিল। ঠগীদের কেহ মরিল, কেহ পলাইয়া বাঁচিল!

বৈতরণীর তীরে—নিবিড় বনের ধারে ঘটিয়াছিল এই ঘটনা। সর্বমঙ্গলা দেবী একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কালী ডাকাত তলোয়ার হাতে করজোড়ে দাঁড়াইয়া ভূপতিত ঠগী দস্যুকে এবং রুমালখানা দেখাইয়া বলিল—'এই ঠগী আপনাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো মা।" তারপর কি ভাবে তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল সেই সব বলিল।

* * *

দুইদিন পরে গোলযোগ ও অশান্তি কাটিয়া গেল। সর্বমঙ্গলা দেবী পুরী যাত্রা করিলেন। রথযাত্রার পূর্বেই তাঁহারা নিরাপদে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনে তাঁহাদের সমুদয় তীর্থকার্য সম্পন্ন হইল।

এইরূপে যথাবিহিতরূপে তীর্থের কার্য শেষ করিয়া সর্বমঙ্গলা দেবী সদলে নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছিলেন। দেশের লোক কালী ডাকাত ও তাহার দলের লোক কিভাবে ঠগীদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল সে-কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কালী তারপর আর ডাকাতি করে নাই। দেবী সর্বমঙ্গলা তাহাদের অনেক জমি ও বাস্তু-ভিটা দিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এখনো সেই অঞ্চলের লোক কালী ডাকাতের বংশধরদের বাড়ি-ঘর দেখাইয়া বলে—কালী ডাকাতের ভিটা।



নীলকর সাহেব কেরী

॥ এক ॥

আমরা অনেকদিন আগের কথা বলেতেছি—প্রায় একশত বৎসর পূর্বের। সেই সময়ে নদীয়া জেলার কুমারখালী ছিল একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। সেখানে বহু ভদ্রলোকের বাস ছিল। আমরা আজকাল গোয়াড়ি, কুষ্টিয়া, রাণাঘাট প্রভৃতিকে নদীয়া জেলার প্রধান প্রধান স্থান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এই সকল স্থানের নাম ছিল লোকের অজানা। তখনকার দিনে রাণাঘাট "রাণা" নামে এক কুখ্যাত ডাকাতের নামে পরিচিত ছিল। 'রাণা' ডাকাতের 'ঘাঁটি' ছিল বলিয়া রাণাঘাট ছিল খ্যাত। 'রাণা' ডাকাতের এই 'ঘাঁটি'—বা আড্ডা হইতে নিত্য হইত ডাকাতি।

এমন একদিন ছিল—আমরা নিজেরাও অনেক সময়, শুনিয়াছি কৃষ্ণনগরের উত্তর দিকে খড়িয়া নদীর পারে ছিল গোয়াড়ি—এক বিশাল অরণ্যপূর্ণ স্থান। সেই ভীষণ জঙ্গলে থাকিত সেকালের বিখ্যাত দস্যু-দলপতি বিশ্বনাথবাবু ও তাঁহার অনুচর বৈদ্যনাথ প্রভৃতি। তাহাদের ভয়ে ঐ-পথে কেহ যাতায়াত করিত না। দুই-চার জন সাধারণ কোল—যেমন চাষী, মজুর প্রভৃতি লোকেরা—ছোট ছোট কুটির বাঁধিয়া সেখানে বাস করিত। তাহারা বড় একটা ডাকাতের ভয় করিত না। কেননা কিই বা তাহাদের আছে যে নেবে। তবে ছিল বাঘ-ভালুকের ভয়। তাহারা ঐ সব জানোয়ারের ভয়ে এক প্রহর বেলা থাকিতেই গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিত।

কিছুদিন পরে রেল লাইন হওয়ার পর কুষ্টিয়াতে রেল লাইন স্থাপিত হইল। স্কুল হইল। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া স্থানটি ধীরে ধীরে উন্নত হইতে লাগিল। তা' ছাড়া কুষ্টিয়া নদীর তীরবর্তী স্থান বলিয়া

উহা ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা থাকায় নানা দিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া এখানে বাস করিতে লাগিল। এখানকার হাট-বাজার, দোকান-পাট—সর্বত্র লোকজনের ভিড়, নদী তীরে অসংখ্য নৌকা, সকল সময়েই হৈ-চৈ লাগিয়া আছে। কিন্তু বুনিয়াদী অধিবাসী তখন কেহ বড় একটা ছিল না সেখানে। কেবল মাত্র ছিল দুর্দান্ত 'ডাকাত কুঠিয়াল কেরী সাহেবের' প্রকাণ্ড কুঠি এবং অসংখ্য লাঠিয়াল। কেরী সাহেবের নাম সাধারণের কাছে পরিচিত ছিল সাহেব ডাকাত কেরী। কেন তাঁহার এইরূপ নাম ছিল সে-কথা বলিতেছি। মনে রাখিতে হইবে তখন কৃষ্ণনগর ছিল নদীয়ার রাজধানী—এক কথায় লক্ষ্মীর কুঞ্জবন। আর কুমারখালি ছিল নদীয়া জেলার ম্যাঞ্চেস্টার। সেখানে অনেক তাঁতি নানারকমের বস্ত্র তৈয়ারি করিত। তা' ছাড়া সেখানে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠি। সেখানকার নীল শাড়ির মনোরম নীল রংয়ের জন্য সাহেবদের লোভ হইত।



॥ দুই ॥

ঐ সময়ে আমাদের দেশে নীলের চাষ প্রচলিত ছিল। মেঘের মতো ঘন সন্নিবদ্ধ নীলবন শত শত বিঘা জমির উপর বায়ু ভরে দুলিত। গরীব চাষীরা দাদন লইয়া নীল বুনিত। কেরী সাহেব ছিলেন কুঠিয়াল। কোন কৃষক যদি নীল চাষের জন্য দাদন লইতে অস্বীকার করিত, তবে আর রক্ষা ছিল না। কেরী তাঁহার লাঠিয়াল দল লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিতেন। ঘরবাড়ি লুঠ করিতেন, গরীব নীল চাষীদের বাড়িতে বাড়িতে আগুন জ্বালাইয়া দিতেন। চারিদিকে পুরুষের ও নারীর হাহাকার দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। তাহারা যে যে-দিকে পারিত ছুটিয়া পলাইত। কাজেই কেরী সাহেবের দুর্ব্যবহারে ও অত্যাচারে কুষ্টিয়ার ঐ অঞ্চল ছিল বিপন্ন। কেরীর নাম শুনিলে লোকে শিহরিয়া উঠিত।

একবার জলতি নামে একটি গ্রামের লোকদের উপর ডাকাত কেরী সাহেব অতি ভীষণভাবে-অত্যাচার করেন। গ্রামবাসীরা দল বাঁধিয়া সাহেবের লাঠিয়ালদের আক্রমণে মিলিত ভাবে বাধা দেয়। তাহারা বলে—"আমরা মরব, তবু সাহেবের দাদন নিয়ে জুতা, লাঠি খাব না—কি করবি কর তোরা।" তাহারা সকলে দা, কুড়ুল, লাঠি, বর্শা লইয়া বাধা দিল কেরী সাহেবের লাঠিয়ালদের। লাঠিয়ালরা পারিল না উৎপীড়িত সেইসব নীল চাষী প্রজাদের কুঠিতে ধরিয়া নিতে। কেরী সাহেব প্রজাদের এতবড় স্পর্ধা সহিবেন কেন? তাঁহার লাঠিয়াল সর্দারের নাম ছিল জয়রাম। জাতিতে সে ছিল ডোম, ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত অধম। তাহার হাতে, কোন চাষী ধরা পড়িলে কেরীর এই পাষণ্ড অনুচর তাহার গায়ের চামড়া টানিয়া তুলিতে মাত্র বাকী রাখিত। সে ছিল সাহেবের একান্ত অনুগত। এমন অন্যায় কাজ ছিল না যা সে সাহেবের আদেশে করিতে পারিত না বা করিত না। সেদিন সন্ধ্যায় কেরী সাহেব বারান্দায় বসিয়া চাষীদের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলেন। নদীর পাড়ে প্রায় একশত বিঘাতে চাষ হয় নাই—চাষীদের দাদন দিয়া চাষের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার টেবিলের উপর থরে থরে টাকা সাজান ছিল। চাষীদের নাম এবং কাহাকে কত টাকা দিবেন তাহা পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন সময় জয়রামকে ও তাহার অনুচরদের ম্লান মুখে ফিরিতে দেখিয়া কেরী সাহেব বলিলেন জয়রাম, কি খবর আছে?

—'হুজুর তারা আমাদের কথা শুনল না।' সাহেব চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন—'ইউ' ড্যাম স্টুপিড ফুল, ঝুটা বাত বলতা কাহে। ইউ রোগ্‌।'

—'নেই হুজুর, আমি মিছে কথা বলিনি। এই দেখুন পিঠে মারের দাগ।'

সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে হাসিয়া বলিলেন—হা—হা—হা! 'সব ঝুটা, টোম আপনাকে এ্যায়সা কিয়া! বি রেডি। চল হামরা সাথ। হাম দেখ ল্যাঙ্গে এ্যায়সা বেয়াদপি হুয়া। ...এই সহিস্‌, ঘোড়া লেকে আও, ক্যায়সা ইউ ম্যান জলদি কর। জয়রাম—চলো সব লাঠিয়াল লেকে হামারা সাথ।' কেরী প্যান্টের দুই পকেটে দুইটি পিস্তল লইয়া দ্রুতবেগে চলিলেন প্রজাদের দমন করিবার জন্য। ঘোড়া দ্রুতবেগে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিল সেই নিরীহ চাষীদের পল্লীর দিকে।

সাহেব আসিয়া দেখিলেন পল্লীখানি একেবারে নীরব নিস্তব্ধ—জনপ্রাণী কেহ নাই। অস্ফুট কল্লোলে গড়াই নদী বহিয়া যাইতেছিল। সাহেব নৌকার ঘাটে গিয়া দেখিলেন একখানি নৌকাও নাই। ক্রুদ্ধ মহিষের মতো তর্জন গর্জন করিয়া জয়রামের পিঠে দুই ঘা বেত মারিয়া সাহেব বলিলেন—'জয়রাম টুমি লায়ার আছে! জলদি চল কুঠিমে।'

এই বলিয়া সাহেব শূন্যে দুই চারিটি গুলি ছুড়িয়া মনের দুঃখে ক্রুদ্ধ মনে হতাশ হৃদয়ে কুষ্টিয়া কুঠির দিকে চলিলেন।

পরদিন সংবাদ পাইলেন চাষীরা দলে দলে নৌকায় করিয়া, গাড়ি করিয়া ও পায়ে হাঁটিয়া মেহেরপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সাহেব শুনিয়া চিন্তায় পড়িলেন—কি করিবেন? তাঁহার একমাত্র চিন্তা—মেহেরপুর—মেহেরপুর!



॥ তিন ॥

সেই সময় মেহেরপুরে ছিলেন এক মহাপরাক্রান্ত জমিদার। তাঁহার নাম ছিল বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়। তাহার প্রতাপে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাইত। তাঁহার লাঠির চোটে দুর্দান্ত নীলকর সাহেবরা মেহেরপুরের ত্রিসীমানায় ঘেঁষিবার সাহস করিত না। সকলে তাঁহাকে ভয় করিত। মথুরানাথ একদিকে যেমন ছিলেন পরাক্রান্ত জমিদার, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন প্রজাবৎসল মহানুভব

জমিদার। পূজাপার্বণে দানধ্যান এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার স্নেহ ও মমতা—তাহাদের কল্যাণে ছিলেন তিনি মুক্ত হস্ত। তাঁহারা তাহার নাম দিয়াছিল 'রাজাবাবু'!

সেদিন অপরাহ্ণে তিনি সেরেস্তায় বসিয়া জমিদারি কাজকর্ম দেখিতেছেন, এমনি সময় জলতি গ্রামের নীল চাষীরা দলে দলে আসিয়া তাহার কাছারিতে লুটাইয়া পড়িল—আমাদের বাঁচান, আমাদের রক্ষা করুন। আপনি আমাদের মা-বাপ। মথুরানাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'তোরা খেয়েছিস।' একজন বলিল—'কে খেতে দেবে রাজাবাবু।' তারপর তাহারা যে কেরী সাহেবের অত্যাচারের ভয়ে নীলের দাদন না লইয়া প্রাণরক্ষার জন্য এখানে তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছে, সে কথা বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিল।

মথুরাবাবু বলিলেন—'যা, যা আগে খেয়ে নে, তারপর ব্যবস্থা হবে। কোন ভয় করিস নে। যা যা এখন যা।'



॥ চার ॥

দুর্দান্ত কেরী ওই অপমান সহজে ভুলিবে কেন? পরদিন মথুরা বাবুর কাছে চিঠি দিয়া একজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। চিঠিটির মর্ম ছিল এইরূপ—

'মথুরাবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নাই। আমার প্রজারা বিদ্রোহ করে এবং আমাকে অপমান করে আপনার আশ্রয়ে গিয়েছে। আপনি যদি তাদের ফিরিয়ে না পাঠান তবে অনর্থক একটা বিভ্রাট ঘটছে। কাজেই আপনি বিবেচনা করে যথাকর্তব্য করবেন। এজন্য যদি পরে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে সে হবে আপনার জন্য। আপনি কি করবেন জানাবেন।

—কেরী, কুষ্টিয়া কুঠি।

উত্তর দিলেন মথুরানাথ বাবু—

'কেরী সাহেব, আমার কথা এই যে, যারা আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের আমি আশ্রয়ে রাখবো। যদি আপনার সঙ্গে দাঙ্গা বাধে তবু আমি এই দরিদ্র প্রজাদের আপনার দুর্দান্ত লাঠিয়ালের কাছে পাঠাব না।'

—মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, মেহেরপুর।

সাহেব যখন এই চিঠি পাইলেন, তখন একেবারে রাগিয়া অগ্নি-শর্মা হইলেন। জয়রামকে ডাকিয়া দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন—'রেডি হও জয়রাম। মথুরাবাবুকো বাড়ি লুঠ করেঙ্গে। হামি টাকে পিবে মারবো! বি রেডি! বি রেডি!'

জয়রাম নতজানু হইয়া বলিল—'সাহেব এ-কাজটি করবেন না। মেহেরপুরের রাজাবাবুর হাজার হাজার লাঠিয়াল আছে।'

"কুচ ডর নেই" ক্রোধে উত্তেজনায় কেরী সাহেবের লাল মুখ আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

'চল জয়রাম। বোলাও লাঠিয়ালদের।' মেহেরপুরে সাহেব নিজে চলিলেন ঘোড়সোয়ার হইয়া মথুরাবাবুর বাড়ির দিকে।

মথুরাবাবু প্রতাপশালী জমিদার। লোকজনে পরিপূর্ণ বৃহৎ সুন্দর বাড়ি সর্বদা গমগম করে। তিনি জানিতেন দুর্দান্ত কেরী সাহেবকে। তিনি ঐ বিপন্ন নীল চাষীদের ডাকিয়া বলিলেন—শোন তোরা, তোদের বাঁচাতে গিয়ে আমাকে কেরীর মতো নীলকর সাহেবের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। তোরা যদি সাহেবের তল্লাটে যেতে চাস, তবে তোদের বাধা দেব না। যদি থাকতে চাস, তবে তোদের চাষের জমি দিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেব। বল কি করবি?"

সকলে উত্তর করিল—'আমরা আপনার চরণ ছেড়ে কোথাও যাব না রাজাবাবু।"

—'বেশ তবে থাক গিয়ে নিরাপদে। এই হাঙ্গামা মিটলেই তোদের সব বিলি-ব্যবস্থা করে দেব।'

…হুজুর আমাদের মা-বাপ। আপনার কথা অমান্য করে আমরা চলবো না।'

সত্য সত্যই দাঙ্গা বাধিল।

কেরী সাহেব তাঁহার সমুদয় লাঠিয়াল, লোকজন এবং চৌকিদার নিয়া আসিলেন।

মথুরানাথ পূর্ব হইতেই এ আশংকা করিতেছিলেন। মেহেরপুরের খালের অপর পাড়ে দুই দলে হইল ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বন্দুক, বর্শা তলোয়ার চলিল। লাঠিয়ালদের মধ্যে চলিল ভীষণ লাঠালাঠি। মথুরানাথবাবু তাঁহার দলের সর্দার লাঠিয়ালদের বলিয়া দিলেন—"দেখ ভীম সর্দার—কেরী সাহেবের মাথা চাই। ও বড় বাড় বেড়েছে।"

ভীম সর্দারের আকৃতি যেমন ছিল ভীমের মতো, প্রকৃতিও ছিল তেমনি ভয়ংকর। ভীম সর্দার ভীমের মতো বিক্রমে গিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া টানিয়া কেরী সাহেবকে লাঠির ঘায়ে মাটিতে ফেলিয়া দিল। কেরী সাহেব চাল কুমড়ার মতো গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

যদি জয়রাম ও তাহার কয়েকজন সঙ্গী আসিয়া সাহেবকে লইয়া পলাইতে না পারিত, তবে সাহেবের জীবন সেখানেই শেষ হইত। তবু ভীম সর্দারের লাঠির ঘায়ে সাহেবের একটি হাত ও একটি পা একেবারে জখম হইয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরে কেরী সাহেব শেষটায় কুষ্টিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাঁহার লাঠিয়াল দলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কুষ্টিয়া শহরের এক প্রান্তে অনেকদিন পর্যন্ত কেরীর কুঠির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। মথুর বাবুর দুর্দান্ত সাহস ও বীর বিক্রমের জন্য তাঁহার জীবিতকালে নীলকর সাহেবেরা মেহেরপুরের অঞ্চলের দিকে ঘেঁষিতে সাহস করিত না—ঘেঁষেও নাই। নীলকর সাহেবেরা তাঁহার নামে ভয় পাইত এবং বলিত—"ডেনজারাস্ জমিদার মথুরাবাবু।"

সত্য সত্যই মথুরানাথবাবু ছিলেন মহৎ ও সাহসী এবং মহা-পরাক্রান্ত জমিদার।

নীলকর সাহেব কেরী—ডাকাতি করতেন না। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ কুঠিয়াল। কিন্তু তার অত্যাচার ছিল ডাকাতের চাইতেও বেশী। সেই জন্য গল্পটি সংকলিত হল।



বৈশাখী ঝড়ের রাতে

৫৬

॥ এক ॥

রামপাল ছিল বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রামপাল ছিল ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ—নানা জাতীয় বড় বড় গাছে ঢাকা। কোন প্রশস্ত পথ ছিল না। সঙ্কীর্ণ বন-জঙ্গলের পথে দস্যু-ডাকাতের ভয়ে লোকেরা অতি সর্তক ভাবে পথ চলিত। সে প্রায় একশত বর্ষের আগের কথা। তখনও রামপালের গজারি গাছটা বাঁচিয়া ছিল। তাহার উচ্চশির, সবুজবর্ণের পাতা লোকের মনোরঞ্জন করিত। দূর হইতে দেখা যাইত শ্যামলপত্র-পল্লবের সুন্দরশ্রী।

একদিন সেই রামপালের পার্শ্বস্থ খাল দিয়া এক ভদ্রলোক চলিয়াছেন তাঁহার বাড়ি—চিকনিসার গ্রামে। সঙ্গে তাঁহার কন্যা। কন্যার বিবাহ হইয়াছে ত্রিপুরা জেলার কুলুপুর গ্রামে। কন্যার সঙ্গে এক বছরের শিশু। অনেক দূর হইতে নদী পাড়ি দিয়া আসিয়াছেন। মাঝি বিক্রমপুরের ঐ-অঞ্চলের পথ-ঘাট চিনে না। তাহার বাড়ি ত্রিপুরা জেলার ঐ কুলুপুর গাঁয়েই।

বৈশাখ মাসের শেষ। আকাশ ঘন কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বড় নদীর মুখ হইতে খাল দিয়া নৌকা চলিয়াছে। ক্রমে রাত বাড়িল, ঝড়ও উঠিল। খালের তুই পাশের বাঁশের ঝোপগুলিতে —বড় বড় গাছে লাগিল দোলা। মাঝি অজানা পথে নৌকা চালাইতে পারিতেছিল না। বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিল—কর্তা আর কতদূর? এদিকে কর্তা মহাশয়ও অন্ধকার রাতে পথঘাট চিনিতে পারিতেছিলেন না। ভদ্রলোকের নাম রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চাঁদপুরে ওকালতি করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা নয়নতারাকে শ্বশুরবাড়ি হইতে বাড়ি নিয়া চলিয়াছেন। নৌকার ভিতর ক্যাশবাক্সে যথেষ্ট অলংকার-পত্র আছে। নয়নতারার গায়েও অলংকার বড় কম নয়। রাজেন্দ্রবাবুর অপেক্ষা কন্যার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা বিশেষ ধনী—তালুকদার। কাজেই পুত্রবধূকে মূল্যবান অলংকার ও শাড়ী ইত্যাদিতে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। এক শুভদিনে তাঁহাদের বিশ্বস্ত নৌকার মাঝি শুকুর মোল্লাকে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে তালুকদার বাবুদের খাস তালুকের প্রজা। ভাল লোক এবং বিশ্বাসী।

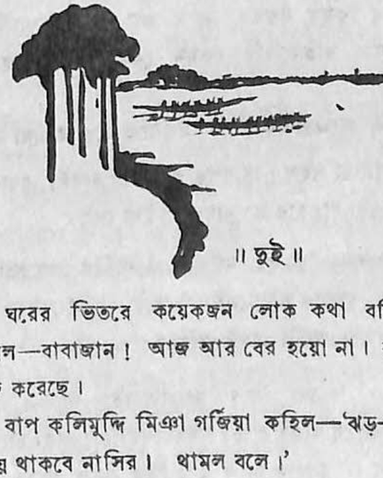
রাজেন্দ্রবাবু, তাঁহার কন্যা নয়নতারা এবং শুকুর মোল্লার একটি কিশোর বয়স্ক ছেলে ছিল মাত্র নৌকায়। নৌকাখানি খুব মজবুত। দো মাল্লাও বেশ বড়। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চিকনিসার নিজ গ্রামে পৌঁছিতে পারিবেন। কিন্তু নদীর বিপরীত স্রোতে নৌকা চালাইয়া তাহা পারিয়া উঠিলেন না। গাঁয়ের পথে তাঁহারা খালি লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রামপালের পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি খাল দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

সংকীর্ণ খাল। কোথাও এমন যে একেবারে পাড় ঘেঁষিয়া নৌকা চলিতেছিল, আবার কোথাও বেশ একটু চওড়া। মাঝি সারাদিন নৌকা চালাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিশোর পুত্র আবছুল নৌকার পাটাতনে ছইয়ের পাশে শুইয়া আছে। নয়নতারা মাঝে মাঝে বলিতেছে বাবা, এ-কোন্ পথে এলাম, আর কতদূর? রাজেন্দ্রবাবু আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—আর বেশি দূর নয় মা। এই আর তু-চার দণ্ডের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

এমন সময় সন্ধ্যার অল্প পরেই আরম্ভ হইল কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডব নৃত্য।

মাঝি ভয় পাইল। ঝড়ে খালের বুকে ঢেউ উঠিয়াছে। নৌকা আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতেছে। শুকুর মোল্লা 'আল্লা, জান প্রাণ বাঁচাও', বলিয়া চিৎকার করিতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেয়েকে বলিলেন—মা, দাতুকে বুকে ধরে রাখ। যেন ঝড়-ঝাপটা ওর গায়ে না লাগে···নারায়ণ নারায়ণ! রক্ষা কর।'

ক্রমে ঝড়ও দৈত্য দানার হুঙ্কার দিয়া অত্যন্ত ভয়ংকর হইয়া উঠিল। আকাশের সবখানি অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। ঝড়ে নৌকাটি এমন বেগে ভাসাইয়া নিল যে, নৌকাখানি একটা ডাঙ্গায় আসিয়া পড়িল। বাঁ দিকের বনের ভিতর হুড়মুড় করিয়া বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সামনেই একখানা বাড়ি—বেশ মাঝারি রকমের—একখানি দালান। জানালার ফাঁক দিয়া দেখা গেল ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। সকলের একটু আশার সঞ্চার হইল। বাতাস ও ঝড় তেমনি দাপাদাপি করিতেছে। নৌকা হইতে রাজেন্দ্র বাবু ও মাঝি প্রাণপণে চিৎকার করিতেছিল—কে আছেন আমাদের রক্ষা করুন। শিশুটি মায়ের কোলে থাকিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল আর কাঁদিতেছিল।



॥ তুই ॥

ঘরের ভিতরে কয়েকজন লোক কথা বলিতেছিল। একজন বলিল—বাবাজান! আজ আর বের হয়ো না। ঝড়টা বড় মাতামাতি শুরু করেছে।

বাপ কলিমুদ্দি মিঞা গর্জিয়া কহিল—'ঝড়-বাদল কি আর সব সময় থাকবে নাসির। থামল বলে।'

[বিক্রমপুর এখন স্বাধীন বাঙলা দেশের অন্তর্গত। লেখকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' রামপালের গজারি গাছের ছবি ও বর্ণনা আছে।]

রহিমা কহিল—'দেখ, কারা যেন ডাকছে। দেখত কোন নৌকা কি ঘাটে এসে লেগেছে!'

কলিমুদ্দি জানালা খুলিয়া দিল। ঝপাট করিয়া বৃষ্টির একটা ঝাপটা ঘরের মধ্যে আসিয়া সব জিনিসপত্র ভিজাইয়া দিল।

কলিমুদ্দি কহিল—'সত্যিই রে, কারা যেন ডাকছে।' তা হলে যাও একবার! নিয়ে এস না ঘরে। কোকা কাঁদেগো।

কলিমুদ্দি সাহসী পুরুষ। সে কোন কথা না বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইল এবং সেই বাদল ও ঝড়-জল উপেক্ষা করিয়া সকলকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। নৌকার ভিতরেই আরোহীরা ঝড়-জলের ঝাপটায় ভিজিয়া গিয়াছিলেন, আর খাল হইতে ঘরে আসার পথে সকলের সর্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। কাপড়-জামা ও মাথার চুল হইতে টপটপ করিয়া জল ঝরিতেছিল।

রহিমা তাড়াতাড়ি নয়নতারাকে কহিল—'কোকাকে আমার কোলে দেও। তুমি গিয়া পাশের ঘর থেইকা কাপড় বদলে আস। সারা গা ভিজে ঢোল হইছে।'...তারপর কলিমুদ্দিকে কহিল—'তুমি মিঞা পূবের ভিটায় যাও। আমি মাইয়াকে লইয়া এ-ঘরে থাকি। ঝড়টা থামলে যাইবে 'খন।'

নয়নতারা কাপড় ছাড়িয়া ঘরে আসিতেই শিশুকে তাহার কোলে দিয়া রহিমা বলিল—'বাছাকে কোলে লও। আমি দুধ গরম করছি। খাওয়াও।'

নয়নতারা তাহার আদেশ পালন করিল। রহিমা প্রৌঢ়া মহিলা। নিপুণ হস্তে তাড়াতাড়ি সে পাটশলা দিয়া মাটির উনুন ধরাইয়া দুধ গরম করিল এবং বাটিতে করিয়া শিশুকে খাইতে দিল।

নয়নতারা খোকাকে নূতন কাপড়-জামা পরাইয়া দিল। শিশু মায়ের হাতে ঝিনুকে করিয়া রহিমার জ্বাল দেওয়া গরম দুধ চক্‌চক করিয়া খাইল, তারপর হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলিতে লাগিল। রহিমাবিবি অপলকে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল—কি মধুর সরল হাসি! তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। সে আকুলি-ব্যাকুলি ভাবে শিশুকে কোলে লইতেছিল, আদর করিতেছিল। বিচিত্র তাহার স্নেহ-পূর্ণ ব্যবহার। বিস্মিত হইয়া নয়নতারা বলিল—'তুমি ত খোকাকে এই অল্পসময়ের মধ্যে ভালবেসে ফেললে—আশ্চর্য ত!' রহিমা কহিল খোদার দুনিয়ায় সব কিছুই সম্ভব। ক্রমে ঝড় কমিয়া আসিতে লাগিল—মাঝে মাঝে রহিমাবিবি কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়িতেছিল।

এদিকে কলিমুদ্দি রাজেন্দ্রবাবুকে ও মাঝিকে প্রশ্ন করিয়া একে একে সব পরিচয় জানিয়া লইল। তারপর কহিল এ-রাতটা এখানেই থাকুন। আমি খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা কইরা দেই।

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন—'তা হয় না ভাই। বাড়ির লোকেরা সব উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে। সময়ও আর নেই। ভাই, ঝড়টা কমলে যদি দয়া করে আমাকে গাঁয়ের পথটা একটু দেখিয়ে দেও—'

হুঁ, দিমু অখন। ভাবনা কি? চুপচাপ বইসা থাকেন বাবু। কলিমুদ্দির ছেলে কখন যে ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা রাজেন-বাবু লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার মাঝি ও মাঝির ছেলে ঘরের এক কোণে বসিয়া একমনে তামাক টানিতেছিল।

* * *

ঃ মা শোনত একবার।

মা ঘরের বাহির হইয়া বলিল—'কি রে নাসির?'

ঃ আয় ত বাইরে।

রহিমা বাহির হইয়া আসিল।

নাসির বলিল মা, বাবাজান এদের সকলকে সাবাড় কইরা ফালাইতে চায়।

অ্যাঁ। অ্যাঁ সে হইব না। তারে কোন ফ্যাসাদ করতে দিচ্ না!

তারপর একটু ভাবিয়া কহিলঃ আইচ্ছা, আমিও যাই।

নয়নতারা ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শিশুটিও মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল।

ঐ ঘরের মধ্যে ডাকাত কলিমুদ্দি নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিল—সঙ্গে কি আছে সব বাইর কর বামুন! যদি না দেও তবে সকলকে কাইটা বিলের জলে ফালাইয়া দিমু। রাজেনবাবুর মনে এক মুহূর্তের জন্যও এমন একটা অস্বাভাবিক ভয়ের উদয় হয় নাই। হঠাৎ কলি-মুদ্দির মুখে এই কথা শুনিয়া আতংকিত হইয়া বলিলেন—'এ কি কথা ভাই। এ কি বলছো?'

ঃ আরে মশয়, বলছি কথা ঠিক। এ-অঞ্চলে কলিমুদ্দি ডাকাতের নাম কেনা জানে? সব দেও, নইলে এখনি নিমু গার্দানা।

কি ভীষণ কর্কশ স্বর, কি রক্ত চক্ষু! কি চিৎকার! ঝড়ের গর্জনও বুঝি সেই স্বরে কাঁপিয়া উঠে।

বিস্মিত হইলেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! কাতর স্বরে বলিলেন, আপনি একি বলছেন! আপনি এই বিপদে আশ্রয় দিয়েছেন, এখন এমন কথা বলছেন কেন? আপনি কি আমাদের পরীক্ষা করছেন?

উদ্ধত কণ্ঠে কলিমুদ্দি—'না-না, জানেন না আমি কে?'

ঃ জানি আপনি একজন মহৎ ব্যক্তি। আমাদের এ ঝড়-জলের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছেন। এবার আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেন।

ঃ মনে হয় আমার নাম শোননি? এ-গির্দের সবাই জানে কলিমুদ্দি মিঞা ডাকাতের নাম। তৈরি হইয়া—

কাঁদিতে লাগিলেন রাজেন্দ্রবাবু।

বাহিরে সেই বৃষ্টির জলের মধ্যেও শোনা গেল অনেকগুলি লোকের পায়ের শব্দ।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। সে আলোকে দেখা গেল বাহিরে একদল সশস্ত্র লোক লাঠি, খাঁড়া, বর্শা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একজন বলিল—'সর্দার, আর কত দেরী?'

ঃ চলে আয়!

এক নিমেষ মাত্র। প্রায় দশজন ডাকাত প্রবেশ করিল ঘরের মধ্যে। রাজেন্দ্রবাবু কাঁদিতে লাগিলেন। নৌকার মাঝির দেখা নাই। সে কোন ফাঁকে পলাইয়াছে কেহ টের পায় নাই। বৃষ্টি তেমনি পড়িতেছে। তেমনি ঝড়ো হাওয়া—তেমনি ঝম্ ঝম্ শব্দ।

তবু পাশের ঘরে নয়নতারা ও রহিমাবিবি শুনিতে পাইতেছিল একটা গোলমাল। একটু অস্বাভাবিক রকমের।

মা কিসের শব্দ—কিসের গোলমাল? আমার বড় ভয় করে। ডাকাত পড়েনি ত?

কলিমুদ্দি রহিমাকে না বলিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছিল।

কোন ভয় নেই বাছা। দেইখা আসি ও ঘরে কি হইতাছে।

রহিমা লাফাইয়া পড়িল উঠানে। বিস্রস্তবসনা—উন্মাদিনীর মত। সেই ঘরে রাজেন্দ্রবাবুকে কলিমুদ্দি ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গোরা মারিতে উদ্যত। সেই ঘরের দরজায় যাইয়া রহিমা দেখিল দরজা বন্ধ। ভিতরে হুঙ্কার। দুর্ধর্ষ দস্যুদলের বিকট চিৎকার। রহিমা উচ্চঃস্বরে কহিল—'খোল দরজা মিঞা'।

চিৎকার শুনিয়া উত্তর হইল—যা তোর ঘরে যা।

: ঘরে যা বেতরিবৎ।

রহিমার শরীরে যেন রণ-রঙ্গিণী দানবদলনী দেবী চামুণ্ডার শক্তি আসিয়াছিল। সে সজোরে পদাঘাত করিল দরজার উপর।

দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল একপাশে।

মিঞার মুখে কথা নাই। সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল রহিমাকে ধরিবার জন্য। রহিমা পলকমধ্যে দুই হাত পিছাইয়া গেল এবং রাজেন্দ্রবাবুকে তাহার পেছনে রাখিয়া মুহূর্ত মধ্যে ঘরের এক কোণে পড়িয়া থাকা একটা বঁটি দা হাতে লইয়া কহিল—

'খবরদার মিঞা, যদি এ লোকের কোন অন্যায় করিস তবে এ বঁটি দিয়া তোর গলা কাইটা ফালাবো···তারপর আমি নিজে মরবো।'

কি ভীষণা সে মূর্তি। হাতে বঁটি দা। চোখে জ্বলিতেছে আগুন। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। দৃঢ় হস্তে ধরিয়াছে দা।

দেখিয়া স্তম্ভিত হয় সেই পাপিষ্ঠ দল।

মিঞা কহিল—'তুই কি পাগল হলি নাকি? যা যা ঘরে যা—'

দৃপ্তা সিংহিনীর মতো রহিমা বলিল, যামু না। সেদিন তোর এত বড় পোলাটারে কবর দিয়া আইলি। আজ এই অতিথি বামুন। তার মাইয়া আর শিশু পোলারে চাস মারতে। খোদা এ পাপ সইবে না। যদি ভদ্রলোক আর তার মাইয়াকে ছাইড়া না দেচ্—তাদের গাঁয়ে পৌছাইয়া না দেচ্, তবে তোর একদিন কি আমার একদিন।

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল রহিমা। রাজেন্দ্রবাবু নির্বাক। রহিমা লোকদের বলিল জোয়ান বেটারা, খেত-খামারে খাইটা খাইতে পার না মানুষ মাইরা ডাকাতি কইরা খাও। তোরা কিসের মরদ—যা বেটারা যার যার ঘরে যা।

আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল।

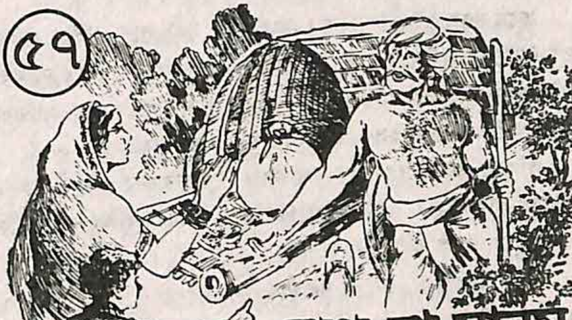
লোকগুলি একটি কথাও বলিল না! ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কলিমুদ্দির দিকে ফিরিয়া রহিমা বলিল—দেখ মিঞা, ঝড় ঝাপটা কইমা আসছে। চল বাবুকে আর তার মাইয়াকে পৌছে দিয়ে আসতে চল নৌকা নিয়ে। মাইয়াটার কোলে একটা ছা। মাইয়াটা আমারে মা ডাকছে। ভদ্রলোকদের তুই নিজে গিয়া নৌকা থাইকা তুইলা আনছিলি, আর তারে মাইরা চাস টাকা পয়সা লুটতে, মাইয়ার সর্বনাশ করতে। তুই মানুষ না জানোয়ার? চল মিঞা।

চুপ করিয়া রহিল কলিমুদ্দি। খানিক পরে কহিল—'হা আল্লা।' গর্জিয়া উঠিল রহিমা। কতদিন তোরে কইছি ভিক্ষা কইরা চাষবাস কইরা খা, তবু রাহাজানি কইরা—মানুষ মাইরা 'গুনা' করবা না। আয় মিঞা আয়।...রাজেনবাবুকে কহিল—আহেন, ভয় করবেন না। আমি আমার মাইয়ারে পৌছাইয়া দিমু। খোদা মেহেরবান।

রহিমার সঙ্গে কলিমুদ্দি এবং রাজেনবাবু আসিলেন। তার পর রহিমা নিজে নয়নতারাকে ও তাহার শিশুটিকে লইয়া নৌকায় উঠিল। মাঝি নৌকায় আসিয়া পাটাতনের নিচে শুইয়াছিল; তাহাকে টানিয়া তোলা হইল।

তারপর নৌকা চলিল গন্তব্য পথে। বৈশাখী ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। কালো মেঘের ফাঁক দিয়া আকাশে চাঁদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিরাপদে পৌছিল সকলে নির্দিষ্ট গ্রামে।



৫৭ সাপ না মানুষ

॥ এক ॥

বৌ চলিয়াছে বাপের বাড়ি, অনেক দিন পরে। সঙ্গে ছোট একটি চারি বৎসরের ছেলে। বাঁশবেড়ে হইতে সাঁতগা যাওয়ার পথের কাছে একটি ছোট গ্রাম। সেখানে কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বাস। ধনী না হইলেও দরিদ্র নয়; সকলেরই খেত-খামার আছে গরু, বাছুর আছে; আম কাঠালের বাগান, দীঘি-পুকুর, সম্পন্ন গৃহস্থ তাঁহারা। বিদেশেও কেহ চাকরি-বাকরি করেন না। শস্য-শ্যামল মাঠে গরু চরে, রাখাল বালকেরা ছুটাছুটি করে। এক শীর্ণকায়া স্বচ্ছ সলিলা নদী গ্রাম ও পল্লীর গলা জড়াইয়া আদর করিয়া ঝিরঝির তিরতির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সেই নদীর শোভা নাই। নদীর পাড়ে গভীর বনজঙ্গল। গ্রামের নাম বংশীঘাট। নদীর নাম কংসাবতী। গ্রামের মধ্যে আছে কয়েকটি শিব মন্দির ও কালী মন্দির। মেয়েটির নাম ললিতা। বংশীঘাট গ্রাম ললিতার পিত্রালয়। পিতা অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ। বংশীঘাট বাঁশবেড়ে হইতে দশ মাইল দূরে। ললিতার পিতা পৌত্রের উপনয়ন করিবেন—তাই মেয়ে-জামাই আত্মীয়-কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পুত্র শহরে সওদা করিতে গিয়াছে। ললিতার স্বামী কলিকাতার এক পাটের অফিসে কাজ করে। ছুটি পায় নাই। বাড়িতে তাহার প্রাচীনা মা আছেন। বাবা জীবিত নাই। মা ছেলেকে আনিবার জন্য পত্র দিয়াছিলেন। সে উত্তর দিয়াছে—আমি সাহেবের অফিসে কাজ করি। সাহেব বলেছেন—শালার ছেলের পৈতেতে তোমার কি বাবু। ভোজ খেতে চাও? আই উইল গিভ ইউ এ গুড ফিস্ট? ছেলে আরো লিখিয়াছে, তোমার

বৌমা খোকাকে নিয়ে একাই যেতে পারবে। গাঁয়ের মেয়ে ভয় কি?

ললিতা সাহসী মেয়ে। স্বামীর পত্রে পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি পাইয়া সে শাশুড়ীকে বলিল—'আপনি অনুমতি দিলে একাই যাব মা! আপনার অসুবিধা…দু' চারদিনের জন্য।'

শাশুড়ী বলিলেন—'না-না-যাও। বেয়াইমশাই নিজে এসে বলেছেন। যাবে বৈ কি মা—যাও ঠাকুর আছেন…তবে সাবধানে যেও। আর পাড়াগাঁ চোর ডাকাতের ভয়ও আছে।'

বৌ বাপের গাঁয়ের নিন্দা শুনিবে কেন? সে বলিল—'না মা, সে-সব আপদ বালাই নেই।'

তারপর একদিন পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া সে ছেলেটির হাত ধরিয়া একখানি গোরুর গাড়ি করিয়া সামান্য কিছু জিনিসপত্র লইয়া রওনা হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল! কংসাবতী নদী পার হইয়া মাইল দুই হাঁটিলেই বংশীঘাট গ্রাম দেখা যায়। ললিতা গাড়ী হইতে নামিয়া নদীর পাড় হইতে যেমনি পথে নামিয়াছে, অমনি গাড়োয়ান আসিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে কহিল—'দে তোর গায়ের সব গয়না খুলে দে।'

ললিতা এতটা দূর পথ আসিতে গাড়োয়ানের কোন অন্যায় ব্যবহার পায় নাই। এইবার তাহার কথা শুনিয়া বলিল—'এ কি বাবা, তুমি এ কি বলছো?'

ঃ ঠিক বলেছি। দে, দে সব খুলে দে, নইলে তোর গা থেকে আমি সব ছিনিয়ে নেবো।

নিরুপায় হইয়া ললিতা তাহার হাতের চুড়ি খুলিয়া দিল। ছেলেটি বলিল—'আমার মাকে তুমি গাল-মন্দ দিচ্ছ কেন? মা, দেবে না তোমায় গায়ের অলংকার।'

তখন বেশ রাত হইয়াছে। দূরে শিয়াল ডাকিতেছে। ঘন বন জঙ্গলে নিস্তব্ধ গ্রাম। ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া গাড়োয়ান বলিল—শুনেছিস চাঁদপাড়ার নাম? আমি চাঁদাপাড়ার নিমাই বাগদি। তোর এই ছেলেটাকে আগে কাটবো। তারপর তোকে কেটে ওখানে ওই শিমূল গাছটার তলে পুঁতে ফেলবো। নর পিশাচের হা-হা অট্টহাসি নিস্তব্ধ নদীতীরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ললিতার মতো সাহসী মেয়েও ভীতা হইয়া সব অলঙ্কার খুলিয়া দিল। খুলিয়া দিল সব জামা-কাপড়। ডাকাতের একটা গামছা মাটিতে পড়িয়াছিল, সেই গামছাটা গায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়া বসিয়া পড়িল।

বালক ডাকাতকে বলল—'তুই আমার মার অলংকার আর কাপড় নিয়েছিস। দাঁড়া একবার দাদুর বাড়ি যাই তখন টের পাবি—পাবি সাজা।'

দস্যু নিমাই চিৎকার করিয়া কহিল—'যাই ওই ভাঙা মন্দির থেকে কয়েকটা ইট কুড়িয়ে নিয়ে আসি। তারপর তোকে আর তোর মাকে খুন করবো। খুন করবো!'

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। মা ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া করুণস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। নিমাই আর ফিরে না।



॥ দুই ॥

মা আর ছেলের চিৎকার এবং ক্রন্দনধ্বনি নদী ও নদীতীরস্থ বন জঙ্গল পার হইয়া দূরে বনে ও প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কে শুনে কাহার কথা।

সেই সময়ে গ্রামের চৌকিদার চলিয়াছিল রোঁদে—হাতে তাহার লণ্ঠন। তাহার কানে গিয়াছিল সেই চিৎকার। সে প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কোথায় কে কাঁদিতেছে। যতই নদীর তীরের দিকে আসিতে লাগিল ততই সে শুনিতে পাইল স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর—বাঁচাও আমাদের বাঁচাও। সে কান্না আর থামে না। চৌকিদার বিভ্রান্তভাবে এদিকে-ওদিকে ঘোরাফেরা করিয়া দেখিতে পাইল বিপন্ন ললিতাকে। সে কাছে আসিয়া কহিল, ঃ মা, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে মা?

ললিতার শুধু এক কথা—আমার খোকাকে বাঁচাও! খোকাকে বাঁচাও!

ললিতা দস্যু হস্তে পড়িয়া এইরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল শুধু একটি কথা —আমার খোকাকে বাঁচাও—খোকাকে বাঁচাও। চৌকিদার তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'মা, কোন ভয় নেই তোমার! আমি এ-গাঁয়ের চৌকিদার কোন ভয় করো না।'

…আমার যে পরবার মতো কিছুই নেই বাবা! চৌকিদার তাহার মাথার পাগড়িটা ফেলিয়া দিল। ললিতা সেই পাগড়িটা শাড়ীর মতো পরিয়া ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইল। তাহার সাহস ফিরিয়া আসিল। বলিল তাহাকে সব কথা।

…আয় মা, সঙ্গে আয়…বলিয়া সে এক হাতে লণ্ঠন লইল, অপর হাতে শক্ত করিয়া ধরিল লাঠি। তারপর খোকাকে কাঁধে তুলিয়া বলিল—'শক্ত করে ধর আমার মাথা ও কাঁধ। ডরো মৎ।' এইভাবে খানিকটা দূর আসতেই দেখিল একটা ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ির গাঁয়ে ডাকাত পড়িয়া আছে। এক ভীষণাকৃতি ভয়াল গোখরা সাপ জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহার দুই হাত, আর ফোঁস ফোঁস করিতেছে। সামনে পড়িয়া রহিয়াছে শাড়ীর পুঁটলিতে সমুদয় গয়নাপত্র।

লণ্ঠনের আলো পড়ায় সাপটা তীরবেগে গহন বনের আড়ালে গিয়ে লুকাইল।

চৌকিদার বাঁশি বাজাইবা মাত্র আরোও কয়েকজন পাহারাওয়ালা ছুটিয়া আসিল। ডাকাত ধরা পড়িল। সাপের কামড়ে সে একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে বংশীঘাট গ্রামে রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন ললিতার পিতা ইন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ব্রাহ্মণী ব্রহ্মময়ী। আত্মীয়-স্বজন লোকজন সকলের মুখে এক কথা—ললিতার খবর কি!

এমনি উদ্বেগের সময় চৌকিদার হাঁক দিল—ঠাকুর মশাই, জাগেন ? —কে, কে ?

উত্তর হইল—আমি রঘুবর সিং আছে।

ললিতা কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল। বাবা-মা দৌড়িয়া আসিলে সে মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নাতিকে বুকে টানিয়া লইলেন ব্রাহ্মণ।

রঘুবরের মুখে সব শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

রঘুবর তাহার এই বীরত্বের ও মহত্বের জন্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মন্তব্য করিয়াছিলেন—বাঙালী মেয়েরা বড় অলংকার প্রিয়। অলংকারের জন্যই পথে-ঘাটে এমনি বিপদের মুখে পড়িতে হয়। কথাটা সত্য নয় কি ?



উত্তরবঙ্গের কুলপি গ্রামের জমিদার রামজীবন সান্যাল। একদিকে জমিদারি, অন্যদিকে ডাকাতি ছিল তাঁহার বৃত্তি। মানুষ যে এমন বিভিন্ন প্রকৃতির হয় এমন ধারণা কেহ কোনদিন করে নাই। সান্যাল মহাশয় ছিলেন এমন মাতৃভক্ত সন্তান যাঁহার মুখে সকলে সর্বদা শুনিত "জয় মা তারা"। তারা, শঙ্করী, দয়া কর মা ! ব্রহ্মময়ী 'তারা ! তারা !' সান্যাল মহাশয় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক। বাড়িতে দেবী ভদ্রকালী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, জপে-তপে সময় কাটে। তাঁহাকে অতিথি-বৎসল, সাধু সজ্জন বলিয়া লোকে জানে। জমিদারির আয়ও প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

রামজীবন, কালোবরণ, শ্যামজীবন তিন ভাই। জমিদারি চালান হয় এক সঙ্গে, ভাই ভাই ভিন্ন হয় নাই। একান্নবর্তী পরিবার। একদিকে যেমন আছে জমিদারির আয়, তেমনি অপর দিকে আছে ডাকাতি-ব্যবসা। তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাসী বড় দুই ভাই মিলিয়া ডাকাতি করেন। ডাকাতি করেন মাস-বিশেষে ও তিথি-বিশেষে। বিশ্বাস করেন মন্ত্র-তন্ত্রের অসাধারণ ক্ষমতায়, বিশ্বাস করেন মায়ের পূজা করিয়া ডাকাতি করিলে সফল হয় সেই ডাকাতি। মঙ্গল এবং মুক্তি প্রদায়িনী ভবানী—এই বিশ্বাস লইয়া তাঁহাদের দিন যায়। ঐশ্বর্য আছে, শক্তি আছে, কুলীন বলিয়া বারেন্দ্র সমাজে তাঁহারা সম্মানিত ও পূজিত। পুত্র ও কন্যার বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নানা জেলা হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আসা-যাওয়া চলে। নানাদিক দিয়াই রামজীবনের নাম খ্যাত। সে খ্যাতি, সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি দুই-ই বলা যায়।

রামজীবন পরিবারের প্রধান কর্তা। ভাইয়েরা তাঁহাকে মান্য করে—করিবার কারণও আছে।

কালোবরণের বুদ্ধি মোটা রকমের, প্রবৃত্তি ও দেহের বল অসুরের মতো। প্রজা পীড়ন ও অন্যান্য উৎপীড়ন করিতে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। শ্যামজীবন এ-সকলের ধার ধারিতেন না। পড়াশোনা করিতে ভালবাসিতেন। সাংসারিক ব্যয় দেখাশুনা, অতিথি-অভ্যাগত ও আত্মীয়-স্বজনের অভ্যর্থনা করা ছিল তাঁহার কাজ। ছেলেমেয়েদের দেখাশুনাও ছিল তাঁহার একটি প্রধান কাজ। সংসারে বাস করিতেন, পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ছিল প্রীতির সম্বন্ধ। এক কথায় বলা চলে শ্যামজীবন ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন দস্যুবৃত্তির বিরোধী। রামজীবন ছিলেন বুদ্ধিমান ও সুচতুর। নিজ স্বার্থই ছিল তাঁহার লক্ষ্য —ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত করিয়া একাই সমুদয় জমিদারির মালিক হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষাও তিনি অন্তরে পোষণ করিতেন। বিষয়কর্ম বুঝিতেন ভাল। কিন্তু অন্তরের নৃশংস প্রবৃত্তি তাঁহাকে পরিচালিত করিত অন্য পথে। রামজীবন ছিলেন দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ। ব্যায়াম ও কুস্তি করিবার ফলে তাঁহার দেহ ছিল সুগঠিত। গুলি চালাইতে, শিকার করিতে, নরহত্যা করিতে তাঁহার হাত কাঁপিত না। মাথায় ছিল সেকালের প্রথামতো লম্বা বাবরি চুল। বাহু-প্রকোষ্ঠে সোনার তাবিজ, হাতে বালা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর সোনার হার। বৃহৎ গোলাকার দুইটি চক্ষু সর্বদাই রক্তবর্ণ থাকিত। কালী মন্দিরে প্রতিদিন হইত বলি। অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে, বিশেষতঃ প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে পাঁঠা বলি হইত একশত দুইশত পর্যন্ত।

রামজীবনের বুদ্ধির গুণে ও শাসন দক্ষতায় জমিদারির আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। দুই দিকের আয় তাঁহাকে সে-অঞ্চলের প্রবল প্রতাপশালী জমিদারির উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এ গ্রামের সান্যালদের দস্যুবৃত্তির বিবরণ ভদ্রসমাজে অজ্ঞাত ছিল না। এজন্য সাবধানে যতটা দূরত্ব রাখিয়া চলিতে পারা সম্ভব সবাই সেভাবে চলাফেরা করিত। সান্যাল জমিদারদের সঙ্গে কলহ করিলে পরিণাম যে ভীষণ হইবে সে-কথা তাহাদের জানা ছিল। ওদিকে সান্যালেরাও স্থানীয় লোকদের উপর প্রজাদের উপর কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিতেন না। বরং অধিকাংশ স্থানে আপদে-বিপদে সাহায্য করিতেন।

একদিন কাছরিতে বসিয়া রামজীবন সেরেস্তার কাগজ পত্র দেখিতেছেন। পার্শ্বে বসিয়া ছিল বিশ্বস্ত কর্মচারি এবং সম্মুখে লাঠি হস্তে বসিয়া ছিল লোকাই বা লোকনাথ সর্দার। লোকাই করিত সংবাদ সরবরাহ, যোগাইত ডাকাতির সুযোগ-সুবিধা। রামজীবন সেদিন একখানা পত্র পড়িতে পড়িতে বলিলেন—'লোকাই বিক্রমপুর থেকে আমার জামাই ক্ষীরোদ লাহিড়ী সংবাদ দিয়াছে অমাবস্যার দু'দিন আগে সে আসবে—সাবধান। সেদিন যেন কোন ডাকাতির দিকে না যাই, তোরাও যাস্‌নি।'

লোকাই বলিল—আচ্ছা, মনে রাখব মহারাজ।

ঃ না না শুধু মনে রাখলে ত চলবে না। তার সঙ্গে লোকজন থাকবে। তুই নৌকা দেখলেই বন্দুকের আওয়াজ করবি। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তাকে সমাদরে নিয়ে আসবি বাড়িতে। বিয়ের পর

এই সে আসছে প্রথম শ্বশুর বাড়ি। দেখিস্ যেন সব দিকে লক্ষ্য থাকে। জানিস ত তোদের দিদিমণি জামাইয়ের সঙ্গে চলে যাবে পূজায়। আমিও এ কয়দিন আর বেরোব না রে লোকাই, বুঝলি ?

: যে আজ্ঞা মহারাজ।

লোকাই হুকুম তামিল করিতে চলিয়া গেল। রামজীবনও কাছারি হইতে উঠিলেন। আর দিন কয়েক পরেই তাঁহাদের একমাত্র কুলীন জামাতা আসিতেছেন। আনন্দোৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। অপর দুই ভাই ছিলেন নিঃসন্তান। রামজীবন সান্যালের একটি পুত্র ও একটি কন্যা মাত্র। কন্যা শিবসীমন্তিনীর বয়স ছিল ষোল বৎসর। পরমাসুন্দরী গৌরবর্ণা ষোড়শী মেয়ে।



॥ দুই ॥

দিন যায়। তিথি ঘুরিয়া আসিল। লোকাই সর্দার আসিয়া নিত্যই বলে— কই মহারাজ ! জামাইবাবু ত এলেন না। হাত যে নিশপিস করছে। একেবারে যে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কি করি বলুন ত ?'

: তাই ত রে, আমিও তাই ভাবছি।

: কাল ত চতুর্দশী। চলুন না একবার অমাবস্যার রাত্রিতে কাতলা মারতে বার হই।

কাতলা মারা' শব্দটা সে অঞ্চলে ডাকাতি অর্থ বুঝাইত। রামজীবন কিছুকাল ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—'তাই চল। যেন খালি হাতে ফিরতে না হয়।' খোঁজ নে—খোঁজ নে ! সন্ধ্যাবেলা এসে খবর দিস। জাল ফেলতে বেরুব। হাতিয়ার সাজ-সরঞ্জাম সব ঠিক রাখিস। মশাল সব তৈরী করা আছে ত ? সব ঠিক ত ?

—হাঁ মহারাজ, সব ঠিক। তলোয়ার, লাঠি, ঢাল, সড়কি, বল্লম সব ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যারাতে আইসা হুজুরকে খবর দিমু— তারপর হা-রে-রে-রে করে বাহির হইমু, লুঠ করবার লাগি।

সেদিন সন্ধ্যায় লোকাই আসিয়া খবর দিল যে সাজসরঞ্জাম সব ঠিক করা হইয়াছে।

কয়েকখানা ছিপ নৌকা, একখানা বড় বজরা সজ্জিত হইল।

একজন অনুচর আসিয়া বলিল—'কর্তা, খুব বড় একটা কাতলা ভেসে উঠেছে চলন বিলে।'

রামজীবন গোঁফ চুমরাইয়া বলিলেন—'বহুৎ আচ্ছা। রাত্রে আসিস্ সব দলে দলে ! মায়ের পূজা দিয়ে যাত্রা করব।'

পূজা—সে কি ভীষণ পূজা ! কালী মন্দিরে মিলিল সকলে। মহাধুমধামের সহিত হইল দেবীর পূজা। রক্তপিপাসিনী মাতা যেন জীবরক্তে প্রসন্ন হইয়া হাসিলেন লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া। তাহার মুখে বিকশিত হাঃ হাঃ অট্টহাসি।

রণবেশে বাহির হইতেছেন এমন সময় বাধা দিলেন রামজীবনের স্ত্রী রামরঙ্গিনী দেবী। বলিলেন—'দেখ, জামাই আসবার কথা আছে, সাবধান যেন কোন বিপদ না ঘটে। কতদিন বলেছি, এ অভ্যেস ছাড়। সাবধান। খুব খোঁজ না করে কোন কাজ করো না যেন।'

পা বাড়াইয়াছেন রামজীবন বিলে যাইবার খালের মুখে। একটু পরে নৌকায় উঠিবেন, এমন সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামজীবন আসিয়া বলিলেন—'দাদা, আজ না গেলে হয় না ? জামাতা বাবাজীর আসবার দিন যে ঘনিয়ে আসছে।'

রামজীবন তখন নেশায় উন্মত্ত। বলিলেন বিকট স্বরে—'যা যা, সব মায়ের ইচ্ছা। জয় মা ভবানী।'

শ্যামজীবন বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন। তখন চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। আকাশে ফুটিয়াছে শত সহস্র উজ্জ্বল তারার মালা।



॥ তিন ॥

সেকালের চলন বিল। বিল ত নয়, যেন সীমাহীন সাগর। সাগরের মতো তাহার বুকে উঠে ঢেউ। চারিদিকে জল-জল আর জল—অথৈ জল। মাঝে মাঝে ছোট পাথরের মত টিলা তাহাতে অনেক বাড়ি-ঘর। সেখানে যাহারা বাস করে তাহারাও ডাকাত। সেই প্রলয়ঙ্কর বিলের পাশে পাশে গ্রাম। সে-সব গ্রামে অনেক জমিদার বাস করেন। রামজীবন সান্যালের বাস-গ্রামও চলন বিলের পাশে। সেখানেই তাঁহার জমিদারি। এই পথে সান্যালেরা যে কতবার ডাকাতি করিয়াছেন তাহার দিন তারিখ কে গণনা করিবে ! নৌকাযাত্রীরা ভয়ে ভয়ে এই পথে দলবদ্ধ হইয়া যায় দস্যু ডাকাতদের আক্রমণের আশংকায়।

রামজীবনের জামাতা যে তারিখ শ্বশুরালয়ে রওয়ানা হইবেন বলিয়া কথা ছিল, সেদিন তাঁহার যাত্রা করা হয় নাই। নির্দিষ্ট তারিখের দুই দিন পরে দেশ হইতে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বেশি লোকজন নেওয়া সম্ভব হইল না। কেননা দেশের পূজা-পার্বণ ছাড়িয়া কেই বা যায় সুদূর দেশে দস্যু ডাকাতের ভয়ে ভীত মনে। সঙ্গে ছিল মাত্র দশ-বারো জন লোক। ক্ষিরোদ নির্ভয় ছিলেন কেননা তিনি তাঁহার শ্বশুর জমিদার রামজীবনকে সব কথা খুলিয়া লিখিয়াছিলেন—চলন বিলে তিনি যেন উপযুক্ত লোকজন রাখিবার ব্যবস্থা করেন, কেননা এদিকের মাঝিরা ঐ অঞ্চলে যাইতে বড় ভয় পায়।

নানা ভয় ত আছে। তবে জামাতার বিশ্বাস আছে, শ্বশুর-

মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার কোন বিপদ ঘটিবে না। এ বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার শ্বশুরের উপর ছিল। তাই বিক্রমপুর হইতে এক শুভ দিনে তিনি যাত্রা করিলেন কুলপি গ্রামে শ্বশুরালয়ে।



॥ চার ॥

ক্ষিরোদকুমারের নৌকা বেশ নিরাপদে পূর্ববাংলার বড় বড় নদী-নালা উত্তীর্ণ হইয়া চলন বিলে আসিয়া পড়িল অমাবস্যা রাত্রিতে। বেশ বড় পান্‌সি নৌকা। সে রাতটা ক্ষিরোদের নৌকায় থাকিতে আর ইচ্ছা হইল না, যদি নৌকা জোরে চালাইয়া লওয়া যায়, তবে রাত্রি শেষেই নৌকা গিয়া শ্বশুরালয়ের কাছে ভিড়িতে পারিবে এই ছিল তাহার নিশ্চিত ধারণা। তারপরে একেবারে আরামে করিতে পারিবেন নিশি যাপন।

* * *

এদিকে আকাশে মেঘ করিয়াছে। একে অমাবস্যার রাত্রি। তারপর ঝড়-জলের আশংকা ত আছেই। হইলও তাই। আকাশের মেঘ ক্রমশঃ ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ হইল। ওদিকে প্রবল বেগে ঝড়ের হাওয়া বহিতে লাগিল। ক্ষিরোদকুমারের নৌকা ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। দূরে দেখা যাইতেছে কুলপি গ্রামের আলো। জমিদার বাড়ির বড় আলোটির জ্যোতিও যেন জলের বুকে পড়িয়া ঝিকিমিকি খেলিতেছে। সে আলোতে মাঝিদের হয় দৃষ্টিভ্রম। ঢেউয়ের উত্তাল তরঙ্গে নৌকা উঠিতেছে, নামিতেছে—এই ডোবে, এই ভাসে। সঙ্গের লোকেরা প্রাণভয়ে—ঠাকুর, রক্ষা কর—রক্ষা কর, বলিয়া চেঁচাইতেছে।

একদিকে একটা টিলা বা দ্বীপ। তাহার পাশে একটা জঙ্গল। এখান হইতে বাহির হইলেই একটা বাঁকের পরই ক্ষিরোদকুমার তাহার শ্বশুরালয়ে পৌঁছিতে পারেন। যখন সেইখানে নৌকাখানি প্রবেশ করিয়াছে, অমনি তাঁহাদের নৌকাখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল কয়েকখানি ছিপ। ছিপের বুক হইতে হাতে তলোয়ার লইয়া লাফাইয়া পড়িল কয়েকজন জোয়ান ডাকাত। কাছে ছিল একখানি মাঝারি রকমের বজরা।

'হা—রে—রে—রে' করিয়া বিকট শব্দে যখন দস্যুরা অপূর্ব কৌশলে ক্ষিরোদকুমারের পানসিতে লাফাইয়া পড়িল, তখন ক্ষিরোদ বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—এ কি! তোমরা কারা?

—আমরা কে বুঝতে পাচ্ছ না? আমরা এসেছি তোমার নৌকো লুট করতে।

—আমার নৌকো লুঠবে! এমন সাধ্য কার?

ক্ষিরোদ উদ্যত তলোয়ারের সম্মুখে, বল্লমের একেবারে কাছে দাঁড়াইয়া নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন।

—জান আমি কে?

—কে তুমি?

—আমি রামজীবন সান্যালের জামাই। সে বাড়ি যাব। কর লুঠ, পাবে মজা।

—ডাকাতেরা একটু চুপ করিল। লোকাই সর্দার বলিল, —মহারাজ, এ যে বলে আপনার জামাই। নৌকো আপনার ঘাটে যেতে দিব কি?

রামজীবন সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও উচ্চকণ্ঠে বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন—'নে নে, লুঠ কর! সব বেটাই বিপদে পড়লে জামাই বলে—বাবা বলে।'

—এ যে বামুন গো!

গলায় পৈতে, সোনার হার, হাতে অঙ্গুরি—কর্তা মশাই যা করতে হয় আপনি এসে করুন। বামুনের গায়ে হাত তুলব না।

সরিয়া দাঁড়াইল লোকাই-এর দল।

'—যা যা সব মেনি মুখোর দল!'...বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন রামজীবন পানসির উপর। তারপর নিমেষ মধ্যে তলোয়ারখানি ঝলকিয়া উঠিল—ক্ষিরোদকুমারের ছিন্নমুণ্ড চলন বিলের জলে ঝপ্‌ করিয়া পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্তে ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে গম্ভীর শব্দে হইল বজ্রের গর্জন।...এই দিকে হইল সব শেষ।

চলন বিলের কালো জল রক্তে রাঙা হইয়া গেল।



॥ পাঁচ ॥

পরের দিন মধ্যাহ্ন। সেই নৌকার সমুদয় লুণ্ঠিত জিনিসপত্র বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিল লোকাইরা। বিবিধ সাজসজ্জা তোষক মূল্যবান দ্রব্যাদি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল একটি ঘরে। কন্যা শিবসীমন্তিনীকে আদর করিয়া ডাকিলেন রামজীবন—দেখ, দেখ, কেমন সুন্দর এই হীরের আংটি। এই দেখ আর একটি সোনার আংটি—নে নে তোর হাতে মানাবে ভালো। নে নে, পর দেখি—পর দেখি। ছেলেটা বড় ঘরের হবে। জানিস বেটারা কেউ সাহস করেনি কেটে ফেলতে। কিন্তু আমি এক নিমেষে বেটার গলা কেটে, চলন বিলের বুকে ভাসিয়ে দিয়েছি—হা-হা-হা। আবেগ জড়িত কণ্ঠে সে কি অট্টহাসি—হা-হা-হা করিতে লাগিলেন রামজীবন।

কন্যা আংটি দুইটি হাতে লইয়া চমকিয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাতর কণ্ঠে বলিল—এ কি! এ কি করেছো বাবা! দেখ একবার চেয়ে দেখ—এ কার আংটি বাবা? এ যে তোমার জামাই-এর আংটি।

একথা বলিতে বলিতে শিবসীমন্তিনী মূর্ছিত হইয়া পড়িল—নিমেষে হইল জ্ঞানহারা।

কান্নার রোলে বাড়ির সকলে কোনও ভীষণ বিপদের আশংকা করিয়া ছুটিয়া আসিল। মূর্ছিত কন্যার হাতে তখনও হীরক ও সোনার আংটি দুইটি জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল।

রামজীবন অটলভাবে দাঁড়াইয়া নির্ভীক নিস্পন্দভাবে বলিতে-

ছিলেন কন্যার মাতাকে, ভাইদের এবং বাড়ির সকলকে—শোন্ শোন্ আমি—আমি, আমি নিজের হাতে আমার নিজের জামাতাকে কেটে ফেলেছি। কত রক্ত ছিল। উঃ, চলন বিলের জল লাল হয়ে গেল।

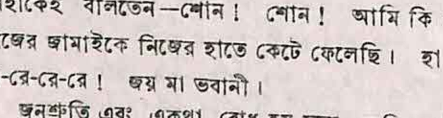


দেখ, একবার চেয়ে দেখ—এ কার আংটি বাবা!

মায়ের পায়ে রক্তজবার মালা গেঁথে করলাম পূজা! কেমন! আমায় ধরিয়ে দে—তোরা আমায় ধরিয়ে দে থানার দারোগার কাছে।—দে-দে!

সেদিন হইতে রামজীবন উন্মাদ হইয়া গেলেন। যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই বলিতেন—শোন! শোন! আমি কি করেছি জান? নিজের জামাইকে নিজের হাতে কেটে ফেলেছি। হা! হা! হা! হা-রে-রে-রে! জয় মা ভবানী।

জনশ্রুতি এবং একথা বোধ হয় সত্য, সেদিন হইতে কুলপির সান্ন্যালেরা ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দস্যুবৃত্তির কথা সমুদয় উত্তরবঙ্গে সুবিদিত।





॥ এক ॥

বৈদ্যনাথ ডাকাত ছিল বিশ্বনাথ ডাকাতের অনুচর। বিশ্বনাথের আদেশে সে করিত ডাকাতি। তারপর বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর সে হইল নদীয়া জেলার ঐ অঞ্চলের ডাকাতদের সর্দার। দলে ছিল অনেক লোক। বৈদ্যনাথের আড্ডার চারিদিকে ছিল গভীর জঙ্গল। সাপ-বাঘের ভয়। সেই জঙ্গলের পাশে ছিল একটি ছোট নদী। নাম খড়িয়া। খড়িয়ার পারে সেই ভীষণ অরণ্যানীর বুকে ছিল এক মন্দির। মন্দিরে ছিল ভীমা মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি বিরাজমানা। ভগ্ন জীর্ণ মন্দির। গাছপালা লতায় এমন করিয়া চারিদিক বেড়িয়াছিল যে, মন্দিরের সংবাদ খুব অল্প লোকেই জানিত। ঐ অঞ্চলে দস্যুভয় ছিল অত্যন্ত প্রবল। এজন্য মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পথে দিনরাত্রে কেহ বড় যাইত না। নিরাপদে সেখানে যাতায়াত ছিল অতি কঠিন। বৈদ্যনাথ তাহার গুরু বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার নির্মম অত্যাচারে ও উৎপীড়নে সেকালে নদীয়াবাসীরা ভয়ানক সন্ত্রস্ত ছিল। আবার পাশের কোন বড় জমিদারও ডাকাতদের সাহায্য করিত।

একদিন সেই পথে চলিয়াছেন এক ব্রাহ্মণ। সঙ্গে একজন মোটবাহী। পণ্ডিত মহাশয়ের নাম রামনিধি স্মৃতিতীর্থ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। পণ্ডিত মহাশয় প্রতি বৎসর পূজার সময়ে আর বৈশাখ মাসে শিষ্য বাড়ি যান। ঐ দুই সময়ে শিষ্যেরা ভক্তিভরে যা দেয়, তাহাই তিনি সংগ্রহ করেন। ঐ সময়ে অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হয় নূতন শিষ্য। বিখ্যাত কথক হিসাবেও তাঁহার নাম আছে। ধনী ও বড়লোকের বাড়িতে পুরাণ পাঠ ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন তিনি। তাছাড়া দেশের চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ছাত্রদের অধ্যাপনা করেন।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় চলিয়াছেন নিজের বাড়ি—নবদ্বীপে। রাণাঘাটের ঐ পথে একটু কাজ ছিল। কেননা একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—'দেশে ফিরিবার সময় তাঁহাদের যেন সপরিবারে দীক্ষা দিয়ে যান।' পণ্ডিত মহাশয়ও সম্মত হইয়া পত্র দিয়াছিলেন। কাজেই ঐ পথেই বাড়ি ফিরিতে হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথের বাসস্থান—সেই ভীষণ পল্লীর প্রান্ত দিয়া যে-পথ গিয়াছে, স্মৃতিতীর্থ সেই পথেই শিষ্যের বাড়ি যাইতেছিলেন। নিজে চলিয়াছেন অগ্রে অগ্রে। পশ্চাতে পেটারা মাথায় করিয়া চলিয়াছে

তাঁহার অনুচর। রৌদ্র উঠিয়াছে। প্রখর তাপে চারিদিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ছায়ায় ঢাকা পথ বলিয়া তেমন রৌদ্রেও কাতর হন নাই স্মৃতিতীর্থ মহাশয়। বেলা বাড়িতেছে, তখনও চারিক্রোশ পথ চলিতে হইবে। পথের পাশে বিরাট মাঠ। এই মাঠ পার হইলে যে গ্রাম পাওয়া যাইবে সেখানে তাঁহার ধনী শিষ্য পাল মহাশয়ের বাড়ি।

॥ দুই ॥

দুইজনে পথ চলিতেছেন। এমন সময় যমদূতের মত আট-দশজন লোক তাঁহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের হাতে লাঠি, ঝাঁকড়া চুল, ভীষণ আকৃতি। হাতের লাঠি উঁচু করিয়া তাহারা সেই দ্বিপ্রহর বেলাতেই হা-রে-রে করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

স্মৃতিতীর্থ অবাক বিস্ময়ে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোটবাহী মাধব তো পেটরা ফেলিয়াই ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

সেই দলে ছিল বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ গম্ভীর স্বরে বলিল—'তুমি কি ব্রাহ্মণ?'

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাবে?

—যাব বাড়ি—দেশে।

—দেশ কোথায়?

—নবদ্বীপ।

বৈদ্যনাথ তাঁহার বাঁহাত তুলিয়া ইশারা করিলে সকলে চুপ করিল।

তারপর হা-হা-হা উচ্চহাস্য করিয়া বৈদ্যনাথ কহিল—'সঙ্গে তোমার মাল কত আছে? মাল কত আছে বুঝলে না ঠাকুর? টাকা। —টাকা গো টাকা। আমাদের টাকাটা দিয়ে বিদায় হউন।'

ঠাকুর মশাই পেন্নাম হই! মা কালীর নাম নিয়ে বলছি আপনাদের দু'জনকে প্রাণে মারব না। দিন দিন দয়া করে···!

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ভীত হইলেন না। প্রাণের ভয়ও করিলেন না। বলিলেন—'আমি পারব না। দেব না—দেব না—'

এবার বৈদ্যনাথ বিকট মুখভঙ্গি করিয়া লাঠি তুলিয়া বলিল—'ঠাকুর দিবি তো দে, নইলে এবার লাঠি দিয়ে তোকে আর তোর সঙ্গী লোকটাকে খুন করব—করবই করবো।'

এই বলিয়া সে দিল বিকট হুঙ্কার।

ডাকাতেরা এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল: হা-রে-রে-রে-রে নির্জন প্রান্তর কম্পিত হইল। প্রতিধ্বনি উঠিল—হা-রে-রে-রে।

ব্রাহ্মণ নির্বাক। নিস্তব্ধ। গায়ে তাহার নামাবলি। গায়ে উপবীত দোদুল্যমান। তাঁহার শ্যাম দেহে সেই উপবীত হীরক-হারের মতো ঝলমল করিতেছিল। চোখে জ্বলিতেছিল তীব্র তপোদৃষ্টি।

—কেন দিবি না—বল। মেরে কেড়ে নেব। জয় মা কালী! জয় মা কালী। হা-রে-রে-রে-রে বলিতে বলিতে লাঠি হাতে ডাকাতেরা লাফাইয়া উঠিল।

স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—'তুমি মানুষ, শোন আমার কথা। এ-টাকা আমার প্রতিশ্রুত দানের টাকা। এ-টাকা দান না দেওয়া পর্যন্ত আমার প্রাণে শান্তি হবে না' তোমরা যদি শোন, তবে আমি সে-কথা বলিতে পারি।

বৈদ্যনাথের মন যেন একটু বিগলিত হইল। সে নিজে বসিল এবং সঙ্গী দস্যুদের বলিল—'ওরে সব বোস। শোন, তোরা ঠাকুরের গল্প। তারপর আমাদের হাতে ত লাঠি আছেই। জয় মা কালী!'

স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—'আমি বর্ধমান গিয়াছিলাম। সেখান থেকে আমার প্রণামী নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। গরীবপুর গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর। দেখতে পেলাম গ্রামের এক পাশে একটি পুকুর। পুকুরের পাশে রয়েছে আমের বাগান। ভাবলাম ওখানে স্নান-আহ্নিক করে দুটো চাল ফুটিয়ে খাবো।

—তারপর কি করলি ঠাকুর?

স্মৃতিতীর্থ বলিতে লাগিলেন—'দেখতে পেলাম প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক শুষ্ক রৌদ্রতপ্ত মাঠের ভিতর দিয়ে সে-দিকে চলে আসছেন। সকলেই শ্রান্ত ও ক্লান্ত। তাঁদের কাঁখে কলসী, জলের ঘট। তাঁরা ঐ অবস্থায় পুকুরপাড়ে এলেন কেন?—একথা জিজ্ঞেস করলাম।'

তারা কি উত্তর দিল?

'···তারা বললে: তাদের পাঁচ-দশখানা গ্রামের মধ্যে এমন কোন দীঘি বা পুষ্করিণী নেই—যাতে জল থাকে। প্রাচীন দীঘিগুলি ফাল্গুন মাসেই শুকিয়ে যায়। গ্রামের যারা জমিদার ছিলেন, তাদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাঁরা এর কোন প্রতিকার করতে পারেন না। এজন্য বিভিন্ন গাঁয়ের মেয়েরা ওখানে এসে স্নানাদি করে পানীয় জল নিয়ে যান। বড় কষ্ট তাঁদের।'

—তারপর?······

শোন বন্ধু—'দেখলাম' কোন গাঁয়ে দু-চারটা ডোবা আছে বটে তাতেও জল নেই। আবার কোন গাঁয়ের তাও নেই।'

ডাকাতেরা শিহরিয়া উঠিল—বলিস কি ঠাকুর?

···সত্যি বলছি।

···তুই কি করবি?

আমি তাদের বলে এসেছি। আমি ভিক্ষে করে যে টাকা পাব সেই টাকা তাদের আমি দীঘি কাটাতে দেব।

এইবার কৌতূহলী হয়ে বৈদ্যনাথ বললো—'জমি কোথায় পেলি?

স্মৃতিতীর্থ হাসিয়া বলিলেন—'এই 'দেখ—'

পেটারা খুলিয়া স্মৃতিতীর্থ দেখাইলেন—একখানি তুলোট কাগজে লেখা দলিল। স্মৃতিতীর্থ জমি কিনিয়াছেন এবং সেখানে দীঘি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন—'গাঁয়ের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা হিসেব করে দেখেছেন—দু'হাজার টাকার কমে হবে না দীঘি কাটা।'

—টাকা কত আছে তোর হাতে?

—এই এক হাজার টাকার কাছাকাছি।

বাকী টাকা কোথায় পাবি?

ভিক্ষে করে নেব ভাই। ঐ গাঁয়ের লোকেরা একমাস পরেই

আসবে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে।

বৈদ্যনাথ সব দেখিল—সব শুনিল।

তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কহিল—'যাও ঠাকুর। তোমার কোন ভয় নেই। চল তোমাদের এগিয়ে দিই।'

ডাকাতেরা তাঁহাকে শিষ্যবাড়ি পেঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বৈদ্যনাথ ডাকাত নবদ্বীপের কোন্ পাড়ায় ব্রাহ্মণের বাড়ি সব জানিয়া লইল। আরও জানিয়া লইল কবে বর্ধমানের সেই গ্রামের লোকেরা টাকা নিতে আসিবে। ব্রাহ্মণের সেই পালবংশীয় শিষ্যও সব কথা শুনিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিলেন।

॥ তিন ॥

এক নির্দিষ্ট দিনে বর্ধমানের সেই পল্লী হইতে পাঁচজন লোক আসিল। তাহারা স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে জানাইল যে এখন অর্থের প্রয়োজন। স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—'কোন ভাবনা করো না। কাজ আরম্ভ করেছো তো।'

—হু।

স্মৃতিতীর্থ অতি আনন্দিত হইলেন।



কেন চিনব না? তুই তো……

তাহাদের উপযুক্তরূপ খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া তাহাদের টাকা দিতেছেন… ঠিক সেই সময়ে একজন বলিষ্ঠকায় ভীষণাকৃতি লোক আসিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল—'ঠাকুর, পেন্নাম হই। চিনতে পারেন তো?'

—কেন চিনব না? তুই তো——

চুপ কর ঠাকুর—নাম বলতে হবে না। এনাদের টাকা দিয়েছো?

—দিয়েছি।

—সব হয়েছে। ও মশাইরা তোমাদের?

—আর কিছু টাকার দরকার হবে?

নবাগত লোকটি গম্ভীর স্বরে বলল—'বল-না কত টাকা।'

—এক হাজার।

—কি বল ঠাকুর?

—হাঁ। ভাই, এই দেখ হিসেব।

—আমি কি ছাই হিসেব বুঝি। টাকা নাও! টাকা নাও! এক হাজার টাকা স্মৃতিতীর্থের চরণতলে দিয়া সে তীরবেগে চলিয়া গেল।

স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—'শোন কথা।'

কে শুনে কাহার কথা? সে ততক্ষণে অদৃশ্য হইয়াছে।

একশত বছর আগেকার কথা, কিংবা তাহারও বেশি হইবে। সেই প্রাচীন দীঘি স্মৃতিতীর্থের পুণ্য-অবদানে আজিও স্বচ্ছসলিলা। আজিও তাহার নির্মল কালো জলে ঢেউ খেলিয়া চলে। পারে পারে ঘাট। তাহার কতক ভাঙিয়াছে—কতক ভাল আছে।

বৈদ্যনাথ তাহার নাম চাহে নাই। তাই তাহার সেই যে গোপন-দানের কথা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কিন্তু কাহারো কাহারো কাছে নাম বলিয়াছিলেন। এজন্য অনেকেই তাহা জানে।

শোনা যায়, ঐ ঘটনার দুই-তিন বৎসর পরে একবার বৈদ্যনাথ ডাকাত সেই দীঘির জলে স্নান করিয়া সেখানকারই এক শিব মন্দিরে পূজা করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, যে খবর কেহ বলিতে পারে না।

স্মৃতিতীর্থের মতো পুণ্যবান ব্রাহ্মণের নাম এখনও ঘরে ঘরে শোন যায়,

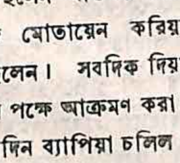


বর্ধমান জেলার মেমারি একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। সেই গ্রামে দুই ভাই ছিল বিখ্যাত ডাকাত।—সোনা আর গুণা (গুয়ে)। তাহারা এমন দুর্দান্ত ডাকাত ছিল যে, রণপায়ে করিয়া একদিনের মধ্যে প্রায়

পঞ্চাশ মাইল দূরে গ্রামে ডাকাতি করিয়া আবার নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিত। উহারা ছিল জাতিতে বাগ্দি। যেমন ছিল অসুরের মত বলবান, তেমনি ছিল বিখ্যাত লাঠিয়ালও। মাথাভরা বাবরি চুল নাড়িয়া যখন লাঠি তলোয়ার ঘুরাইয়া কোন গ্রাম আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করিত, তখন তাহাদের কেহ ধরিতে পারিত না। আমরা জানিতে পারি যে, ইহাদের দুই ভাইকে আবার গ্রামের জমিদারেরা এবং বর্ধমানের মহারাজা তিলক চাঁদও বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন। এজন্য তাহারা বড় সহজে ধরা পড়িত না।

একবার দুই ভাই এক বড় জমিদার বাড়ি লুঠ করিতে যায়। গ্রামটির নাম ছিল আউসগ্রাম। গ্রামখানি খড়ি নদীর উত্তরে এবং বর্ধমানের গুসকরা রেল স্টেশনের অল্প দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের গোস্বামী জমিদারবংশ অতি প্রাচীন। এ গ্রামের বলভদ্র গোস্বামী ছিলেন বিখ্যাত জমিদার। সেবার বলভদ্র গোস্বামীর পুত্রের উপনয়ন। গোস্বামী মহাশয় একমাত্র পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-বান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বাড়িখানি লোকজনে গম্ গম্ করিতেছে। শহরের ধনী বড়লোকেরাও অনেকে আসিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের বহু শিষ্য ও শিষ্যা ছিল। সকলে নানা উপহার নিয়া আসিয়াছে। বাড়িতে মোদকেরা ভিয়ান বসাইয়াছে। অন্ধ, আতুর, দরিদ্র কাঙ্গালীরা আসিয়া ভিড় করিতেছে। সারা গ্রামের লোকজন, আশেপাশের নরনারী আসিয়া জড়ো হইয়াছে। এই উৎসব-বার্তা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছে। বলভদ্র গোস্বামী মহাশয় ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি চারিদিকে পাইক-বরকন্দাজ মোতায়েন করিয়াছিলেন এবং গোপনে পুলিশ ফৌজও রাখিয়াছিলেন। সবদিক দিয়া এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে চোর-ডাকাতের পক্ষে আক্রমণ করা সহজ ছিল না।

সারাদিন ব্যাপিয়া চলিল আমোদ-প্রমোদ। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিল নিমন্ত্রিতদের ভোজন, আর গরীব, দুঃখী ও কাঙ্গালী বিদায়। সকলে গোস্বামী প্রভুর বিজয় গান গাহিয়া নিজ নিজ বাড়ি ও গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বাদ্য-বাজনা থামিয়া গিয়াছে। বাড়ির সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় যে যেখানে পারিল শুইয়া পড়িল এবং গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল। গোস্বামী মহাশয়ও দ্বিতলে নিজ গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছেন।



॥ দুই ॥

সোনা আর গুণা দুই ভাই বলভদ্র গোস্বামীর বাড়ির এই উৎসবের কথা জানিত। তবে কেহ মনেও করিতে পারে নাই যে, দীনদুঃখী ভিখারী কাঙ্গালীর দলে সাধারণ ভাবে মিশিয়াছিল সোনা আর গুণার ডাকাতের দল। তাহারাও উহাদের সঙ্গে বসিয়া তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়াছে। সোনা আর গুণা দুই ভাই অন্য স্থানে বসিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সঙ্গে পংক্তি ভোজন করিয়াছিল।

পুরী নিস্তব্ধ। কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। স্তব্ধ শান্ত প্রকৃতি। এমন সময় চারিদিকে মশাল জ্বলিয়া উঠিল। এবং হা-রে-রে-রে শব্দে পল্লীর নীরবতা ভঙ্গ হইল। ডাকাতদলের চিৎকারে এবং হা-রে-রে-রে শব্দে বলভদ্র গোস্বামী ও বাড়ির অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষ সকলে জাগিয়া উঠিল। হল্লা, চিৎকার, কাঁদাকাটিতে বাড়ির লোকজন যেমন জাগিল, তেমনি গোঁসাই বাড়ির প্রহরীর দল,পুলিশ, দারোগা প্রভৃতিও জাগিয়া উঠিল। উভয় দিক হইতে চলিল আক্রমণ। বন্দুকের ঘন ঘন গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি, বর্শা ও তলোয়ারের ঝন্ঝন্ শব্দ, হাতাহাতি, ছুটাছুটিতে সমস্ত গ্রাম সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

একদল ডাকাত একটি আমগাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল অন্দর মহলে। বলভদ্র গোস্বামী যখন একজন দস্যুকে মারিবার জন্য বন্দুক তুলিয়াছেন এমন সময় অপর দস্যুরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। তাহারা গোস্বামী মহাশয়ের হাত-পা বাঁধিয়া যেমন দোতালার সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছে অমনি পুলিশ ফৌজ তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। একজন ডাকাত পুলিশদের বাধা দিতে গিয়া বন্দুকের আঘাতে আহত হইয়া পড়িয়া গেল। উগ্র প্রকৃতির দুর্বৃত্ত ডাকাত সোনা তলোয়ার ঘুরাইয়া দশজন বরকন্দাজকে হত্যা করিয়াছিল। সোনা, গুণা উভয়ে নিজের দল লইয়া পুলিশ ফৌজ এবং পাইক বরকন্দাজদের সঙ্গে যুঝিতেছিল।

ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। সতর্ক পুলিশ ফৌজ অসাধারণ বিক্রমের সহিত সোনা ও গুণাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার দলের লোকেরা অনেকে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পলাইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইল। দিকে দিকে দিনের আলো ছড়াইয়া পড়িল। গ্রামের লোকেরা যার বাড়িতে যেমন ছিল—বর্শা, কুড়াল, দা, তলোয়ার প্রভৃতি লইয়া ছুটিয়া আসিল এবং ডাকাতদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা আর পলাইতে পারিল না। পুলিশ তাহাদের ধরিয়া এক একজনকে এক মণ ওজনের বেড়ি প্রত্যেককে পরাইয়া দিল এবং শহরে লইয়া গিয়া হাজতে রাখিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক সপ্তাহ মধ্যেই সোনা আর গুণা দুইজনে সেই গুরুভার বেড়ি ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে।

গোয়েন্দা পুলিশ বাঙলার সর্বত্র এই দুইজন ডাকাতের সন্ধানে হুলিয়া পাঠাইতে থাকে। অবশেষে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি অজ্ঞাত পল্লী হইতে দুইজনে ধরা পড়ে। বিচারের পর তাহাদের দুইজনকে কালাপানি পারে আন্দামানে পাঠান হইয়াছিল।

সমুদ্রবেষ্টিত আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত সোনার প্রাণ দেশের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। সেই নির্জন দ্বীপ—অসভ্য জাতির অধ্যুষিত দেশ তাহার ভাল লাগিল না। কেমন করিয়া সে ফিরিয়া আসিবে তাহাই হইল তাহার লক্ষ্য।

তাহার প্রাণ কাঁদিত বাংলা দেশের জন্য। কাঁদিত বর্ধমানের বাসপল্লী মেমারির জন্য। সে কাঁদিত—ব্যাকুল হইত, দেশে আসিবার জন্য। যদি সে পাখী হইত তবে কে তাহাকে ধরিয়া রাখিত। মাঝে মাঝে সে দেখিতে পায় দূর সমুদ্রের বুকে উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে নাচিতে জাহাজ ধোঁয়া উড়াইয়া চলিয়াছে দূর-দূরান্তরে।

এমন করিয়া মনের দুঃখে দুই ভাই দিন কাটায়। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে সোনা। সে একদিন দেখিতে পাইল একখানি বেশ প্রশস্ত বড় কাঠ তীরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দুই ভাই সেই কাঠখানির উপর বসিল এবং ভাসিতে ভাসিতে আন্দামানের সীমা পার হইল।



॥ তিন ॥

সোনা, গুণা নদীবহুল বাংলা দেশের লোক। নানা অঞ্চলে তাহারা দস্যুবৃত্তি করিয়াছে, কাজেই তাহারা সমুদ্র তরঙ্গে ভীত হইল না। কাঠখানাকে চালাইবার জন্য একটি লগি, বৈঠা এবং খাদ্য-সামগ্রীও কিছু কিছু তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল। কাঠখানি ভাসিতে ভাসিতে চলিল। অনেক দিন পরে একদিন সেই কাঠখানি আসিয়া ভিড়িল ব্রহ্মদেশের এক প্রান্তে নিবিড় অরণ্যসংকুল তীরে। ক্লান্ত-শ্রান্ত দুই ভাই। পাছে আবার কোন বিপদ ঘটে সেজন্য তাহারা দুই ভাই তীরে আসিয়া দুইজনে চলিল দুই দিকে। সোনা কিছুদূর গিয়াই পাইল লোকালয়। সেখানে বেশির ভাগ ব্রহ্মদেশীয় লোকের বাড়ি ঘর। তাহারা তাহাকে বাঙালী বুঝিয়া বনের এক পাশে যে বাঙালী ব্যবসায়ী কাঠের ব্যবসা করিতেছিলেন, তাহার কাছে লইয়া গেল। সোনাকে সেই ভদ্রলোক পরম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি ছিলেন চাটগাঁয়ের একজন ধনী ব্যবসায়ী।

সোনা বলিল—'বাবু, আমাকে বাঁচান, তবে আমাকে আশ্রয় দেবার আগে আমার সব কথা শুনুন।'

ভদ্রলোক বলিলেন—'সে কথা পরে হবে। আগে খেয়ে দেয়ে সুস্থ হন, বিশ্রাম করুন, পরে সব কথা শুনব।'

সদাশয় ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী তাহাকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইল। ভদ্রলোকের স্ত্রী দয়াবতী কুসুমকুমারী ছিলেন শিক্ষিতা। তিনি তাহার বেশ পরিবর্তন করাইলেন। শুনিতে পাইলেন তাহার মুখে ডাকাতির কথা, ডাকাতির ইতিহাস, আন্দামানে দ্বীপান্তর হইবার কথা অকপটে সোনা বলিল—তাহার জীবনের ইতিহাস, এতটুকুও গোপন করিল না।

সে বলিল—কর্তাবাবু, এ-হাতে মানুষ মেরে হাত রাঙ্গা করেছি। বল্লম মেরেছি, লাঠি খেলেছি! পুলিশ নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজবে বাবু। আমার মরাই ভালো।

ভদ্রলোক শুনিলেন সব কথা।

যখন সোনা বলিল কেমন করিয়া সে আন্দামান দ্বীপ হইতে একখানি কাঠের উপর বসিয়া তাহা চালাইয়া এদেশে আসিয়াছে, তখন ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র (সে কলিকাতার কলেজে বি. এ. পড়িত) হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি দেখছি রবিনসন ক্রুশো।

ভদ্রলোক ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক এবং আশ্রিত-বৎসল ব্যক্তি।

সোনা বলিল—'কর্তা, তবে আমি যাই—নইলে আপনারা বিপদে পড়িবেন।'

গম্ভীরভাবে কহিলেন তিনি—না—না, কোন ভয় নেই তোমাকে আমি আমার সেগুন বাগানে কাজ দেব। আর তুমি আমার ছেলেমেয়েদের লাঠি খেলা, ছোড়া খেলা শিখাবে—কেমন পারবে ত?

: হুজুর পারবো। কিন্তু পুলিশ দারোগা যে আপনাকে জড়িয়ে ফেলবে নানা বিপদে।

: সে ভাবনা তোমার নেই।

সোনা সেখানে রহিয়া গেল। বহুদিন পর্যন্ত পুলিশ, দারোগা, গোয়েন্দা তাহার সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধান পাইল না। ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে সে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সকলের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে সে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং ভদ্রলোকের পুত্র কন্যাদের স্নেহময় "সোনাদাদা" নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহাকে পুলিশ আর ধরিতে বা বিচার করিতে পারে নাই। শেষ জীবন তাহার স্নেহময় পরিবেশে শান্তিতে কাটিয়াছিল। সে যে কোনদিন দস্যু ছিল একথা কেহ জানিত না এবং কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এবার গুণা বা গুয়ের কথা বলিতেছি। সোনা ত ঐ-ভাবে আশ্রয় পাইল। এদিকে গুয়ে ধরিল ভিন্ন পথ। সে হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া পড়িল বেসিন শহরে। সেখানে সে মোট বহিয়া কিছুদিন কাটাইল। তারপর একদিন রাজপথের পাশে একটি দোকানে বসিয়া যখন চা পান করিতেছিলেন, তখন সেখানে পূর্ব পরিচিত এক পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। পুলিশ কর্মচারি ও তাহার সঙ্গী পুলিশেরা গুয়ের হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়া তাহাকে জাহাজে করিয়া লইয়া আসিল। হুগলী শহরে তাহার বিচার হইল। তাহাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও তাহার কাছ হইতে সোনার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

সোনা ও গুণার আন্দামান হইতে পলায়নের কথা বাঙলা দেশের পুলিশের নিকট পৌঁছিয়াছিল।

ডাকাতি ও আন্দামান হইতে পলায়নের অপরাধে তাহার গুরুতর শাস্তি হইল। বিচার শেষে গুণা আবার আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হইল। তাহার সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ জানা যায় নাই। পরে শোনা গিয়াছিল যে, আন্দামানেই তাহার মৃত্যু হয়। সোনার কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি। সোনার সন্ধান কিন্তু বাঙলার পুলিশ আর পায় নাই। দুর্দান্ত দস্যু সোনার জীবন একজন সদাশয় নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তির আশ্রয় পাইয়া শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই অতিবাহিত হইয়াছিল।



৬১



ডাকাতের কৃতজ্ঞতা

॥ এক ॥

গ্রামের নাম বিদগ্রাম—সহজ কথায় বিদগাঁ। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী।

সে অনেকদিন আগের কথা। শ্রীহট্ট শহরে ওকলাতি করিতেন শ্যামকিশোর সেন মহাশয়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত উকিল। সেন মহাশয়ের বাড়ি ছিল বিদগাঁ গ্রামে। কর্মস্থলে তাঁহার যেমন বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল, অর্থ উপার্জনও তেমনি করিতেন। লোকজনের উপকারে, দান-ধ্যানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। প্রতিবৎসর শারদীয় পূজা উপলক্ষে দেশে যাইতেন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পূজা করিতেন—জগন্মাতা শ্রীদুর্গার। সেই কয়দিন তাঁহার বাড়িতে ও গ্রামে আনন্দ উৎসব লাগিয়া থাকিত। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় রেলগাড়ি ছিল না, স্টীমার চলিত না। সুদূর শ্রীহট্ট হইতে দেশে আসিতে হইত নৌকাযোগে।

দেশে ফিরিতে সময় লাগিত অবস্থা বিশেষে পাঁচ-সাত দশ দিন। সময় সময় একপক্ষও লাগিত। মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি ছোট-বড় অনেক নদী পার হইয়া আসিবার সময় নদীর স্রোত, আবহাওয়া ও ঝড়জলের জন্যও বিলম্ব হইত। পথে অনেক সময় বন্দর, হাট-বাজারে নৌকা লাগাইয়া যাত্রীরা রান্না বান্না করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেন—তাড়াহুড়ো না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বাড়ির পথে চলিতেন; কিন্তু সর্বদা ছিল ভয়ভীতি। কবে কখন ডাকাতের হাতে পড়েন, কখন ঝড় উঠে, নৌকাডুবি হয়। সেজন্য এ অঞ্চলের যাঁহারা শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে থাকিতেন, তাঁহারা চেষ্টা করিতেন পরিচিত কয়েকজন একসঙ্গে মিলিত হইয়া শক্তিশালী মাঝি-মাল্লাসহ বাড়ি যাইতে। কখন কি বিপদ ঘটে তাহার ত কোন স্থিরতা নাই! একদিকে যেমন এই-যাত্রা নৌকাযাত্রা পথে আনন্দ ছিল—নদীর দুই পাড়ের মনোরম দৃশ্য, দূরে নানা পল্লী, গাছপালার অপূর্ব শোভা, শরতের আকাশের নির্মল সুষমা, তেমনি রাত্রিবেলা পাশাপাশি নৌকায় মাঝিদের ভাটিয়ালি গান প্রাণে দিত অপার আনন্দ। তখনকার দিনে জিনিসপত্র ছিল অত্যন্ত সুলভ। কাজেই হাটে, বন্দরে, কেনা-কাটা করিতে আসা ছিল আনন্দপ্রদ। দাসদাসীরা রান্নার যোগাড় করিয়া দিত। গৃহিণীরা নৌকা হইতে নামিয়া ভাল স্থান দেখিয়া আনন্দের সঙ্গে রন্ধন করিতেন। তারপর হইত নৌকারোহী সকলের ভোজন।

সেবার পূজা আশ্বিন মাসের শেষাশেষি। সেন মহাশয় চলিয়াছেন বাড়ির-পথে। সঙ্গে তাঁহার প্রৌঢ়া স্ত্রী, দুইটি ছেলে ও একটি কিশোরী মেয়ে। কনিষ্ঠ ছেলেটির বয়স ছিল তিন-চারি বৎসর মাত্র। সে ছিল ভয়ানক দুর্দান্ত। তাহাকে সামলাইয়া রাখা বড় সহজ ছিল না। সঙ্গে দুইজন ভৃত্য, দুইজন দাসী এবং একজন ছিল সাহসী লাঠিয়াল। আগেই বলিয়াছি, সেকালের যাত্রীরা যাতায়াতের সময় সর্বদা সতর্ক ভাবে থাকিতেন, কখন কোন বিপদ ঘটে তার ত কোন স্থিরতা নাই। সেন মহাশয়ের নৌকা চলিয়াছে দেশের পথে। দেশ ত কাছে নয়—দূর বিক্রমপুরে। একখানি পানসি নৌকাতে কর্তা গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের নিয়া চলিয়াছেন। আর দুইখানি নৌকাতে ছিল পূজার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র। আর অন্য একখানি নৌকাতে ছিল দাসদাসীরা ও খাদ্যদ্রব্যাদি। মাঝে দুই এক বার ঝড় আসিয়াছিল, তবে কোন বিপদ ঘটে নাই। তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন মেঘনা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমস্থলে। এখানকার নদীর দৃশ্য সাগরের মতো—পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী আসিয়া মিশিয়া একেবারে সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে শুধু জল আর জল—অথৈ জল। সে জল কিন্তু স্থির শান্ত। শ্যামকিশোর বাবু উৎসাহভরে চিৎকার করিয়া বলিলেন—'সনাতন মাঝি, এবার পাড়ি দাও।'

এ-সময়ে ঈশান কোণে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল। বাতাসও জোরে বহিতেছিল। মাঝি বলিল, বাতাসের অবস্থা না দেখে নদী পাড়ি দেওয়া চলে না। কর্তামশাই, এখানে রাত্রির মতো নৌকো ভেড়াই। কাল সকালের দিকে পাড়ি দিয়ে বেলাবেলি গিয়ে বাড়ি পেঁৗছে দেব।

কর্তা বলিলেন 'তাই করো। বাড়ির কাছে এসে পড়ে থাকব, তাইত মন কেমন কেমন করছে।'



॥ দুই ॥

মেঘনা নদীর পূর্বতীরে নৌকা ভিড়ান হইল। পশ্চিম পাড় ঘেঁষিয়া ছিল বিরাট এক চর। চরের অপর দিকে আর একটা নদী। পদ্মার আর একটি শাখা। সেই নদী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মেঘনায় মিশিয়াছে। মেঘনা নদী পার হইয়া ঐ নদীর ভেতর দিয়া গিয়া পদ্মার কাছে পেঁৗছানো যায়। সেই পথেও শ্যামকিশোর বাবুর বাড়িতে যাওয়া যায়। ঐ পথ সনাতন মাঝিরও অজানা ছিল না। কিন্তু সে সেইপথে যাইতেও অস্বীকার করিল। কারণ মেঘনার সেই

পাড়টা নিরাপদ নয়। দস্যু-ডাকাতের বিলক্ষণ ভয় আছে—সে কথা শ্যামকিশোর বাবু মাঝিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

মাঝি বলিল—'কর্তা, এতটা পথ নিরাপদে এলাম, শেষটায় কি ঘরের দুয়ারে এসে নৌকোডুবি হবে। কোন ভয় নেই। সাবধানে থাকব। কোন ভয় করবেন না।'

সত্য সত্যই রাত্রিটা নিরাপদে কাটিল। পরদিন সকাল সকাল নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। সে দিন প্রকৃতি ছিল শান্ত। সূর্য উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রাতঃকালীন শোভা চারিদিকে বিকাশমান। চরে কাশ গাছের অপূর্ব শোভা। কাশ ফুল বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন চামর ঢুলাইতেছে। নদী বিরাট প্রশস্ত নিস্তরঙ্গ। ছোট ছোট ঢেউগুলি উঠিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে। ঢেউয়ের বুকে নাচিতে নাচিতে নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন বেলা অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় রাজবাড়ীর বিখ্যাত মঠের পাশে একটি হাটের কাছে নৌকা ভিড়ান হইল। হাটের নাম দীঘির পাড়—বিখ্যাত হাট। রাজবাড়ীর মঠ সেই প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি বুকে করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের চূড়াটিকে নানা গাছে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

বেলা শেষে পদ্মার বুকে ক্রমশঃ ঢেউ উঠিয়াছে। আকাশে অল্প অল্প মেঘ উঠিয়াছে। সকলের নিরাপদে আহার ইত্যাদির পর নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে—কখনও কোন খালের মধ্য দিয়া, কখনও পদ্মার বুকের উপর দিয়া। খানিক পরে নদীর বুকে বেশ একটু জোরে ঝড়ো হাওয়া বহিতে লাগিল। সেন মহাশয় আশা করিয়াছিলেন সন্ধ্যা নাগাদ গিয়া গ্রামে পৌঁছিবেন, কিন্তু নদী ও খালের উজান স্রোতে নৌকা দ্রুত চালান সম্ভবপর হইল না। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল। তীব্র হাওয়া বহিতেছিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমন সময় পশ্চিম দিক হইতে দুইখানি ছিপ নৌকা অতি দ্রুতবেগে আসিয়া সেন মহাশয়ের নৌকাখানি ঘিরিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিপ নৌকা হইতে চার-পাঁচ জন লোক দুপ্ দুপ্ শব্দ করিতে করিতে নৌকার উপর লাফাইয়া পড়িল। নির্জন স্থান—আশে পাশে মুসলমান পল্লী, পদ্মার চরে নূতন বসতি। এ অঞ্চলটি ডাকাতির জন্য বিখ্যাত।

হা-রে-রে-রে শব্দে নৌকায় উঠিয়াই লোকগুলি চিৎকার করিয়া বলিল—'দে তোদের যা আছে দে।'

বাতাসের দাপাদাপি, মেঘের গর্জন, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি, তাহার মধ্যে ডাকাতদের ভীষণ চীৎকার শুনিয়া শ্যামকিশোর সেন মহাশয় বাহিরে আসিলেন। নৌকার গলুইতে ডাকাত উঠিতেই তাহার স্বর শুনিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন—কে রে? তুই কে রে? কলিমুদ্দী নাকি রে? কলিমুদ্দী সেই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। শ্যামকিশোর বাবুর গলা শুনিয়া ডাকাত কহিল—'কে? কে? বাবু নাকি। বাড়ি চলেছেন? হ্যাঁ আমি, কলিমুদ্দী।'

কলিমুদ্দী মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া ছিপওয়ালাদের ইশারা করিল প্রস্থান করিতে।

কলিমুদ্দী নৌকায় রহিল দুইজন সঙ্গী লইয়া। সেন মহাশয়কে সেলাম করিয়া সে কহিল—সেলাম কর্তা। খোদার দোয়ায় আপনার রক্ষা হলো!

তখন শ্যামকিশোর বাবু হাসিয়া বলিলেন—'মায়ের দয়ায় মা-ই রক্ষা করলেন।'

কলিমুদ্দী জিজ্ঞাসা করিল—'নায়ে কে কে আছেন?'

উত্তর দিলেন সেন মহাশয়—'তোমার মা, আর ছেলেমেয়েরা আর দাসদাসী, মাঝি মাল্লারা।'

কলিমুদ্দী তাহার সঙ্গীদের বলিল—'ওরে খেতে এখনও জল আছে। সে পথে নৌকা চালা; তাড়াতাড়ি বাবুর বাড়ি পৌঁছা যাবে।'

আকাশ তখন মেঘশূন্য। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাঙা মেঘ ছড়াইয়া পড়িয়াছে সারা আকাশে। চল-চল ছল-ছল শব্দে নৌকা চলিল।

সেন মহাশয় আনন্দে বিভোর। কতকাল পরে আবার দেশে আসিতেছেন।

শোনা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও কীর্তন। ক্রমশঃ নৌকা আসিয়া ভিড়িল সেন মহাশয়ের বাড়ির ঘাটে, উৎকণ্ঠিত বাড়ির লোকেরা আনন্দের ধ্বনি করিয়া মাতিয়া উঠিল। সে কি আনন্দ।

কলিমুদ্দী ও তাহার সঙ্গীরা গ্রামের লোকজনদের সহিত সমুদয় দ্রব্যাদি নামাইয়া দিল। পূজা মণ্ডপে শ্রীদুর্গার মূর্তি শোভা পাইতেছে। পরদিন বোধন।

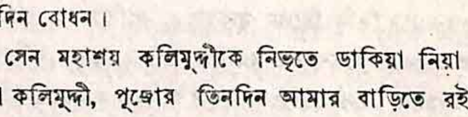
সেন মহাশয় কলিমুদ্দীকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন—বাবা কলিমুদ্দী, পুজোর তিনদিন আমার বাড়িতে রইলো তোদের নিমন্ত্রণ। আসতে হবে—

—আসবো কর্তা আসব, পুজো দেখবো। খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন। নইলে কি যে করে ফেলতাম।

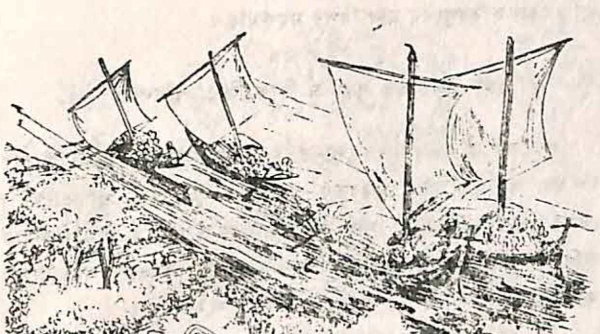
* * *

এই কলিমুদ্দী এক ডাকাতির মোকদ্দমায় ধরা পড়িয়া মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হাকিমের এজলাসে বিচারাধীন হয়। সেই সময় শ্যামকিশোর সেন মহাশয় তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমায় তাহাকে খালাস করিয়া আনেন। সেদিন হইতে বরাবর কলিমুদ্দী ছিল তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে ডাকাতি ছাড়ে নাই।

দৈবাৎ সেদিন তাহার হাতে পড়িয়াও শ্যামকিশোর বাবু রক্ষা পাইয়াছিলেন। ডাকাত হইলেও সে অকৃতজ্ঞ ছিল না। দেখিলে ত ডাকাতদেরও কৃতজ্ঞতা আছে।



অবিভক্ত বাঙলার ঢাকা জেলার একটি বর্ধিষ্ণু পরগনা বিক্রমপুর। বিক্রমপুর এখন স্বাধীন বাঙলাদেশের অন্তর্গত।



৬২ নদীর বুকে ডাকাতি

॥ এক ॥

মাদারিপুর—জেলা ফরিদপুর। আড়িয়লখাঁ নদীর তীরে মহকুমা শহর।

কাছারি, স্কুল সব নদীর পাড়ে। আড়িয়লখাঁ বেশ বড় প্রশস্ত নদী। নদীর ওপারে গ্রামের পর গ্রাম, চরাভূমি, শস্য শ্যামল ক্ষেত্র। এই নদীর বুক দিয়া নৌকাতে ও স্টীমারে আমি কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছি। নদী বেগবতী, স্রোতশালিনী। কুমীর, হাঙর প্রভৃতি ভয়ানক জলজন্তুর বাস। কিন্তু স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। হইলে হইবে কি—মাদারিপুর ডাকাতের দেশ। এ অঞ্চলে ছিল দুর্দান্ত ডাকাত-দলের বাস। তাহারা এতদূর দুঃসাহসী ও নির্ভীক ছিল যে, কিছু পূর্বেও ফৌজদারি কাছারির সম্মুখে আড়িয়লখাঁ নদীতে দুপুর বেলা ডাকাতেরা একবার এক নৌকা আক্রমণ করিয়া আরোহীদের প্রতি বন্দুক চালাইয়া সমস্ত মাল লুটিয়া, নিরাপদে চলিয়া যায়।

মাদারিপুরের নমঃশূদ্ররা দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতি করিত। নৌ-ডাকাতদের ভয়ে নৌকা-যাত্রীরা সর্বদা ভীতভাবে আড়িয়লখাঁ এবং কুমার নদের বুকে নৌকা চালাইত।

ওই ডাকাতরা অত্যন্ত কৌশলী ছিল। তাহারা কি ভাবে ডাকাতি করিত তাহার একটি গল্প বলিতেছি।

ঐ ডাকাতেরা হাঁড়ি কি কুমড়া বিক্রয়ের ছল করিয়া দলবদ্ধ ভাবে ডাকাতি করিত।

একদিন সন্ধ্যার সময় কুমার নদের বাঁধা ঘাটের পাশ দিয়া একখানা নৌকা হাঁড়ি ও কুমড়া বোঝাই করিয়া চলিয়া গেল। নৌকাখানি বেশ বড়। তাহার ভিতরে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ জন লোক শয়ন-ভোজন করিতে পারে। ঝড়-জলেও এই নৌকা সহজে ডুবিবার নয়। নৌকাযাত্রী প্রত্যেকেরই ভীষণ মূর্তি। তাহাদের দলের মধ্যে যে গোয়েন্দা ছিল সে খবর দিয়াছিল যে, তাহাদের পাশের গ্রামের অধিবাসী একজন মহাজন চলিয়াছেন বরিশালের দক্ষিণে এক গঞ্জে। সেখানে তাঁহার মস্ত কারবার। তাঁহার সঙ্গে অনেক টাকার সোনা-রূপা, কাপড় এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্য। মহাজনের নাম জগদীশচন্দ্র দত্ত। তাহার কাজ ছিল নিজ মোকামে যাইবার পূর্বে পথে নদী মধ্যস্থ চরে চরে, হাটে হাটে নৌকায় করিয়া বেড়ানো। সঙ্গে থাকে চার-পাঁচখানা বড় নৌকা। তাহাতে থাকে সমুদয় পণ্যদ্রব্য। প্রহরী থাকে দুই-চারিজন সাহসী বন্দুকধারী সেপাই। জগদীশ দত্ত এমন সাবধানী এবং চতুর লোক যে, ডাকাতেরা তাঁহার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া কিছুতেই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। দত্ত মহাশয় সর্বদা সতর্ক থাকেন, সেপাই বরকন্দাজেরাও চারিদিক লক্ষ্য করিয়া চলে। রাত্রি হইলে কোন চরে, জন-বসতিপূর্ণ স্থানে কিংবা কোন বড় হাটে সব নৌকা নঙ্গর করিয়া রাখে। কাজেই ডাকাতদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বহুদিন তাঁহার পেছনে পেছনে ঘুরিয়াও তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। তাহাদের নৌকা ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল। নমঃশূদ্রদের দলের সর্দার কানাই বা কিনু মণ্ডল সঙ্গীদের বলিল—'দেখ, যে করেই হোক এইবার দত্তবাবুর নৌকা লুঠ করবো। জয় মা কালী।'

দলের সকলে 'জয় মা কালী' বলিয়া উল্লসিত হইয়া দত্ত বাবুর নৌকা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।



॥ দুই ॥

এইবার একটি গঞ্জের হাট হইতে জগদীশবাবুর নৌকার বহর চলিয়াছে। মহাজনের নৌকায় রহিয়াছে স্ফূর্তিবাজ মাল্লার দল। কাজেই নৌকা চলিয়াছে সোরগোল করিয়া। আর তাহার আগে পিছে চলিয়াছে চার-পাঁচখানা কুমড়া ও হাঁড়ি বোঝাই নৌকা। কি মহাজন দত্ত মশায়, কি সঙ্গের লোকেরা, কি অভিজ্ঞ প্রৌঢ় মুহুরী মহাশয় কাহারও মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। ডাকাতদলও মহাজনকে আক্রমণ করিবার কোন সুযোগ পায় নাই।

একুশ দিন চলিয়াছে ক্রমাগত মহাজনের নৌকা, ডাকাতের দলও ছুটিয়াছে আগে পাছে।

এই ভাবে দিন যায়। মহাজনের খুব সাবধানতা। আর একটা পাড়ি দিলেই তাঁহারা পৌঁছিয়া যাইবেন আড়তে বা মোকামে। এইরূপ নিরাপদ যাত্রায় সকলেরই মনে আনন্দ।

একদিন একটা চরের গঞ্জের ধারে—নদীতীরের একটি ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলে পরিষ্কার জায়গায় বসিয়া সকলে মিলিয়া মহানন্দে পরিতোষ সহকারে আহার করিয়াছেন। আহারান্তে সকলে নৌকায় গিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সেই সময়ে কুমড়া ও হাঁড়ি বোঝাই নৌকার সর্দার কানাই মণ্ডলের সঙ্গে জগদীশবাবুর নৌকার একজন মাঝির কি কথা হইল জানি না। মাঝিটির নাম মদন। গোপনে চলিয়াছিল তাহাদের আলাপ। কেহ বড় এটা লক্ষ্য করে নাই।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

মদন মাঝি আসিয়া বলিল—'কর্তামশাই নৌকো খুলবো?'

জগদীশ বাবু বলিলেন—'বেলা নেই, সন্ধ্যার পূর্বে আড়তে পৌঁছুতে পারব না। আজ রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে দিয়ে কাল

প্রভাতে নদী পাড়ি দেব।'

মদন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—'কর্তা একুশ দিন ঘুরে আর এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই।'

: কোন ভাবনা করবেন না, খুব জোরে বেয়ে সন্ধ্যার মধ্যে আড়তে পৌঁছব।

জগদীশবাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝি নৌকা খুলিল।

নৌকা যখন চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যার সময় নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই সময়ে ডাকাতদের নৌকা গিয়া জগদীশবাবুর নৌকার কাছে পৌঁছিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন দত্ত মশাই—'এরা কে?'

মদন বলিল—'এরা আমাদের গ্রামের লোক। কুমড়ার ব্যাপার করতে এসেছে।'

: আমাদের নৌকার সঙ্গে নৌকোগুলো লাগাল কেন?

: তারা আগুন চায়—উত্তর করিল মদন।

এ অঞ্চলের নদী। নদী ত নয় যেন সাগর বিশেষ। কোনও দিকে কূল-কিনারা কিছুই দেখা যাইতেছিল না। মদন তেজের সহিত কহিল—'দেখ্‌ছিস্ কি এ সময়? তখন অকস্মাৎ সেই বিশাল নদীর বুকে জাগিয়া উঠিল ভীষণ রব—হা-রে-রে-রে—হা-রে-রে-রে—'

তারপর নক্ষত্র বেগে ডাকাতদের একখানি নৌকা যে নৌকাতে ছইয়ের মধ্যে মহাজন জগদীশবাবু এবং মুহুরী নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল এবং ডাকাতেরা তলোয়ার ও বর্শা দিয়া জগদীশ বাবু ও মুহুরীকে কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিল। পলকের ঘটনা।

মহাজনের সঙ্গী নৌকা ছিল দূরে দূরে। অন্ধকারের মধ্যে যে এমন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল সেই সব নৌকার লোকেরা তাহার কোন সংবাদও পাইল না। ভাটির টানে সেই নৌকা কয়খানা দূরে—বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

এদিকে ডাকাতেরা দলে দলে মহাজনের নৌকায় ঢুকিয়া কচু কাটার মত সকলকে মারিয়া কাটিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল।

নৌকার মধ্যে মহাজনের টাকাকড়ি, সোনারূপা, কাপড় যাহা কিছু ছিল তাহা ডাকাতেরা লুটিয়া লইল। বলা বাহুল্য মাঝি-মাল্লাদেরও মারিয়া জলে ফেলিয়া দিল।

রাত্রি বেশ গভীর হইল। যে হতভাগ্য মদন ডাকাতদের প্ররোচনায় এই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, সেই হতভাগাকে সর্দারের হুকুমে ডাকাতেরা কাটিয়া ফেলিল। ডাকাতেরা যখন তাহাকে কাটিতে যায় তখন মদন মিনতি করিয়া কহিল—'আমাকে কেন মারবে? আমিই ত তোমাদের মহাজনের নৌকা লুঠ করার সুযোগ দিয়েছিলাম। আমায় কোথায় ভাগ দিবে—তার বদলে আমাকে মেরে ফেলছ!'

চুপরাও শয়তান—নিমকহারাম! তুই ছাড়া পেলে আমাদের ধরিয়ে দিবি—বলিয়া তরোয়ালের এক কোপে তাহাকে কাটিয়া ফেলিল। তারপর নির্বিঘ্নে লুঠ করিয়া নৌকা ডুবাইয়া ডাকাত দল চলিয়া গেল। নদীর বুকে উঠিল কল-কল ছল-ছল রব। বাতাস বহিল তেমনি হা-হা সো-সো শব্দে।

এই নৌ-ডাকাতিটা হইয়াছিল বরিশালের এলাকায়। ডাকাতদের বাড়ি ছিল ফরিদপুরের মাদারিপুর মহকুমায়।

কাহিনী সংগ্রহের সূত্র ও ডাকাতির পরিণতি:

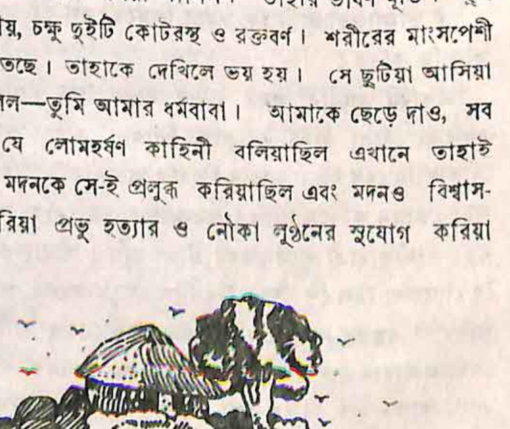
সকলেই কবি নবীনচন্দ্র সেনের নাম জানেন। কে না তাঁহার লিখিত 'পলাশীর যুদ্ধ' 'রৈবতক', 'প্রভাস' 'কুরুক্ষেত্র' পড়িয়াছেন? যেসব কিশোর-কিশোরী স্কুল কলেজে পড়ে তাহাদের প্রায় সকলেই কবিতার বইয়ে তাঁহার লেখা কোন-না-কোন কবিতা পড়িয়াছে। মনে পড়ে কি সিদ্ধার্থের 'করুণা' কবিতাটি—সেই যে···

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে।
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিল বসি অন্যমন।
শুভ্র মেঘখণ্ড মতো রাজহংস শত শত।
আনন্দ লহরীপূর্ণ করিয়া গগন॥

* * *

আমরা যে ডাকাতির গল্পটি বলিলাম সেই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি তাঁহার লিখিত 'আমার জীবন' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, আমি যখন মাদারীপুরে যাই,···আমি প্রথম বৎসর মাদারীপুরের খুন জখম ইত্যাদি নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপনের কার্যে অতিবাহিত করি। তাহাতে কৃতকার্য হইয়া আমি নৌকা-ডাকাতদের প্রতি দৃষ্টিদান করি। চৌকিদারেরা যেন গোপনে পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশ আমাকে সংবাদ দিয়া যেন তাহাদের কার্য অনুসন্ধান করিতে থাকে। এরূপে যখন যে-দল যে-দিকে যাইত, আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দিতাম। একদিন শিবচর থানার দারোগা আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন যে তাঁহার এলাকায় একজন নমঃশূদ্র ডাকাত কুমড়া বিক্রয়ের ছলে বরিশাল যায়। সেই দল ফিরিয়া আসিয়াছে। বাড়িতে খুব ধুমধাম। এদিকে খবর আসিয়াছে যে, একজন ধনী মহাজন চরে সোনা, কাপড় ইত্যাদি বিক্রয় করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আমি বলিলাম—ঐদলের একজনকে ধরে নিয়ে এস।

দারোগা লোকটাকে ধরিয়া আনিল। তাহার ভীষণ মূর্তি। স্থূল বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, চক্ষু দুইটি কোটরস্থ ও রক্তবর্ণ। শরীরের মাংসপেশী ফাটিয়া পড়িতেছে। তাহাকে দেখিলে ভয় হয়। সে ছুটিয়া আসিয়া হাকিমকে বলল—তুমি আমার ধর্মবাবা। আমাকে ছেড়ে দাও, সব বলব। সে যে লোমহর্ষণ কাহিনী বলিয়াছিল এখানে তাহাই বলিয়াছি। মদনকে সে-ই প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং মদনও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া প্রভু হত্যার ও নৌকা লুণ্ঠনের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল।



* কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।



ভিক্ষার চেয়ে ডাকাতি ভাল

॥ এক ॥

পদ্মাতীরে একটি গ্রাম। গ্রামের নাম সোনার দেউল। সেই
গ্রামে যদুপতি রায় নামে এক বিখ্যাত জমিদার বাস করিতেন।
প্রকাণ্ড বাড়ি—সেকালের জমিদারদের যেমন ছিল বৈভব তেমনি বৃহৎ
অট্টালিকা—যাকে বলে চক্‌মিলান বাড়ি। জমিদার যদু রায় ছিলেন
খুব অত্যাচারী। তাঁহার অত্যাচারে প্রজারা ভয়ে কাঁপিত। কাহারও
কাছে একটি পয়সাও পড়িয়া থাকিতে পারিত না। ছলে-বলে কৌশলে
যেরূপেই হউক প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ আদায় করিতেন তিনি। সে
সময়ে গ্রামের অধিকাংশ কৃষক গরীব গৃহস্থ ছিল। চাষীদের অনেকেই
ছিল এমন দরিদ্র যে, তাহাদের পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া যে
সামান্য অর্থ তাহারা বাঁচাইতে পারিত তাহা দিয়া ছেলেমেয়েদের
শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইত না। গ্রামে যে পাঠশালা আর মক্তব ছিল,
সেখানে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বালক-বালিকাদের শিক্ষারও সুযোগ ছিল
না। কেননা জমিদার মহাশয় মনে করিতেন যদি নিরক্ষর চাষাভূষোর
ছেলেরা লেখাপড়া শিখে, তাহা হইলে তাহারা কখনই জমিদারকে
নিয়মিতভাবে দিবে না।
মানিবে না এবং খাজনা ইত্যাদি গ্রামের গুরু মহাশয়

এজন্য তাঁহার অত্যন্ত কড়া শাসন ছিল। জমিদারের কাছ
ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই লোভী গুরুমহাশয় দুর্গোৎসব ও বিবিধ
হইতে যে সামান্য টাকা পাইতেন এবং দোল, তাহাতেই তাঁহার
পূজা-পার্বণ করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতেন বেতনের জন্য
সংসার চলিত। এজন্য তিনি পাঠশালার ছাত্রদের এবং জমিদার
লালায়িত হইতেন না। · জমিদারি বাড়ি যাওয়া-আসা
মহাশয়ের তোষামোদ করিয়াই তাঁহার দিন যাইত।

গ্রামে গ্রামে যাহাতে
তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। লেখাপড়া
পাঠাশালা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বালক-বালিকারা বিদ্যালয়
শিখিতে পারে—প্রত্যেক মহকুমায় যাহাতে প্রয়োজন মত গ্রামে
প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য সরকার বহু উপযুক্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে করিতে-
গ্রামে পাঠাইয়া বালক-বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিযুক্ত
ছিলেন। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রবান ও সুশিক্ষক এজন্যই
করিয়া বালক-বালিকাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। পাঠাশালা
রায় মহাশয় সরকাদের কাছে সুনাম পাইবার জন্য গ্রামে বিরোধী।
স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন শিক্ষার ইংরাজ
গোপনে গোপনে অশিক্ষিত প্রজাদের ডাকিয়া বলিতেন,—দেখ লেখাপড়া
সরকারের মতলব ভাল না, তারা তোমাদের ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া ত
শিখিয়ে খ্রীস্টান করবে। তোমাদের ছেলেমেয়েরা
শিখবেই না, মাঝ থেকে তোমাদের ধর্মকর্ম সব যাবে।

মূর্খ সরল প্রজারা তাহাই বুঝিত। সরকার হইতে কেহ স্কুল দেখিতে আসিলে রায় মহাশয় তাঁহাদের বলিতেন "দেখুন আমি চেষ্টা করলে কি হবে? সরকার অর্থব্যয় করলেও ফল হবে না। কিন্তু ভেতরের ব্যাপারটা যে ছিল অন্য রকমের তাহা বাহিরের লোক টের পাইত না। কাজেই জমিদার মহাশয় প্রজাদের উপর যথেচ্ছ অবিচার—অত্যাচার করিতে পারিতেন।

জমিদারের যিনি নায়েব ছিলেন তাঁহার নাম ছিল কাশীনাথ ঠাকুর। ঠাকুর মহাশয় ছিলেন তান্ত্রিক এবং অত্যন্ত অত্যাচারী। প্রজাদের খাজনা আদায় করিতে গিয়া তাহাদের বাড়িঘর লুঠপাট করিতে কিংবা আগুন জ্বালাইয়া দিতে তাঁহার কুণ্ঠা হইত না এজন্য নিরীহ প্রজারা আরও সন্ত্রস্ত এবং ভীতু হইয়া চুপচাপ থাকিত, নীরবে অন্যায় সহ্য করিত। অন্যায়ের প্রতিকার করিতে কেহ সাহসী হইত না। দিন এই ভাবেই যাইতেছিল। সহসা ঘটিল এক বিপরীত ঘটনা।



॥ দুই ॥

সেবার গ্রামের ওলাওঠা রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। চিকিৎসা হয় না। গ্রামে ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই। দশ মাইল দূরে ভাগ্যপুর নামক গ্রামে এক ডাক্তাখানা ছিল। সেখানে কোন রোগীকে নিয়া চিকিৎসা করা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই গ্রামের লোকেরা বিপন্ন হইয়া জমিদারকে বলিল—'হুজুর, আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করুন। আমরা শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসি। গরীবদের বাঁচান তাহলে আপনিও বাঁচবেন।'

নিষ্ঠুর জমিদার প্রজাদের গালি দিয়া—বরকন্দাজ, দারোয়ান, পাইকদের দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। দরিদ্র তাহারা, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

প্রজাদের মধ্যে উদয় নামে একজন কায়স্থ যুবক ছিল। সে গ্রামের শেষ সীমানাতে বাস করিত। সে অপমানিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল না। উদয় মনে মনে ঠিক করিল সে এই অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিকার করিবে। সে দৃঢ় পণ করিল যেমন করিয়া হয় ইহার প্রতিকার করিবে। তাহাদের গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে একজন লোক বাস করিত। তাহার নাম ছিল রামলাল। সে ছিল নামকরা ডাকাত। উদয় মনে মনে পণ করিল—আমরা মরিব আর ইনি সুখে-শান্তিতে বাস করিবেন সে হইতে পারে না। মনে মনে এই কথা ভাবিয়া উদয় রামলাল ডাকাতের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার সমবয়স্ক দশ-বারোজন যুবকসহ কাশীপুরে রামলাল ডাকাতের বাড়ি উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যার সময় রামলাল বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। সেখানে উদয়কে দেখিয়া রামলাল কহিল—'উদয় দাদা, তুমি কি মনে করে?'

উদয় তাহার বন্ধুগণকে দেখাইয়া কহিল—'রামলাল দাদা আমরা ডাকাতি করবো।'

রামলাল কহিল—'সে কি কথা দাদা!'

তখন উদয় একে একে গ্রামের অবস্থা, জমিদারের নির্যাতন—তিনি কিরূপ জঘন্য ব্যবহার করেন তাহা বর্ণনা করিয়া কহিল—'আমরা ডাকাতি করবো—জমিদার বাড়ি লুঠ করবো। যেভাবেই পারি আমাদের গরীব ভাইবোনদের জীবন বাঁচাব।'

কি তাহারা করিবে—কি তাহাদের সঙ্কল্প তাহা সবিস্তারে বলিয়া উদয় কহিল—'রামলাল দাদা। এখন তুমি আমাদের রক্ষা করো। তুমি হও আমাদের সহায়। তোমার সঙ্গে আমরাও ডাকাত হবো।'

রামলাল হাসিল। হা-হা করিয়া হাসিয়া কহিল,—দাঁড়াও ভেবে দেখি। তোমরা সব ভদ্রলোকের ছেলে। কি করে ডাকাতি করবে। এই কথা বলিয়া সে ঘরের ভিতর গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া উদয়ের হাতে দুইশত টাকা দিয়া বলিল—যাও ভাই, আজ রাত্রে গহনার নৌকায় চেপে চলে যাও। সেখান থেকে ডাক্তার কবিরাজ যাকে পাও নিয়ে আসবে। এ টাকা দিয়ে কিছু কিছু রোগীদের পথ্য কিনে দিবে। কয়েকজন, গ্রামের লোকজনদের দেখ, বাকি কয়জন ঢাকায় গিয়ে ডাক্তার কবিরাজ নিয়ে এস। টাকা পয়সার পরোয়া করো না। এখন চলে যাও—গাঁয়ে যেন আমার কোন কথা বলো না।

উদয় তাহার সঙ্গীদের লইয়া চলিয়া গেল নিজ গ্রামে।

॥ তিন ॥

কয়েকদিন পরের কথা। অমাবস্যার রাত্রি—ফাল্গুন মাস সহসা 'হা-রে-রে-রে' শব্দে গ্রামখানি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ডাকাতেরা দলে দলে জমিদার যদু রায়ের বাড়ি আক্রমণ করিয়াছে। প্রায় দুইশত ডাকাত। প্রত্যেকের হাতে মশাল। কাহারো হাতে বর্শা, বল্লম ও লাঠি। কাহারো হাতে তলোয়ার, কাহারো হাতে কুড়াল, দা। সকলের মুখ কালীমাখা। বীভৎস দৃশ্য। ভীষণ চিৎকার করিয়া তাহারা জমিদার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। জমিদার বাড়ির বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও পাইকেরা প্রাণপণ করিয়া লড়িতে লাগিল।

রামলাল সর্দার নিজে যদু রায়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল, তারপর চাবি ছিনাইয়া নিয়া বলিল—'দে টাকাকড়ি যা আছে, সব দে। লোক না খেয়ে খেয়ে মরবে—তাদের তুই কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দিবি—'সে হয় না, হতে পারে না।'

যদু রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'বাবা আমাকে ক্ষমা কর। বাহিরে লুটপাট চলিতেছিল। ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইতেছিল। সজোরে দরজা-কপাট ভাঙ্গিয়া 'হা-রে-রে-রে' রবে চারিদিক কাঁপাইয়া ডাকাতেরা প্রবল উৎসাহের সহিত চালাইতেছিল লুণ্ঠন। গ্রামের লোকেরা কেহ-ই আসে নাই জমিদারদের এ বিপদে সাহায্য করিতে।

যদু রায়ের উপর যখন অত্যাচার চলিতেছিল তখন জমিদারের স্ত্রী রামরঙ্গিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন—'বাবা আমার কর্তাকে বাঁচাও।'

রামলাল তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল মা, তুই এখানে কেন? তুই যা। মা ভবানীর অংশ তোরা। তোদের উপর আমি হাত তুলতে পারি না। এই যে তোদের গাঁয়ের লোকজন না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে তাদের বাঁচাবার জন্যই তোদের বাড়ি ডাকাতি করতে এসেছি। বুঝলি মা! যদু রায় এ-গ্রামের দুশমন—'শয়তান! মানুষের সে ভাল করতে চায় না। গরীব চাষী আমরা। আমাদের রক্ত সে চুষে খায়, মানুষ মেরে সে সিন্দুকে টাকা পোরে। সে টাকা নিয়ে সে কি স্বর্গে যাবে? কৃপণ পিশাচ সে। আমাদের চেয়েও তোর স্বামী ডাকাত। রক্ত চুষে খেতে জানে। রক্ত দিতে জানে না। তোর স্বামীকে বল্, মা বাক্স খুলে আমাকে টাকা দিক।'

যদু রায়ের স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—দাও—এদের সব দাও। যদু রায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাই করিলেন। বহু সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া রামলাল বলিল,—দেখ এই টাকায় শত শত লোকের প্রাণ বাঁচবে। আমি এ-টাকার এক পয়সাও রাখবো না—আমরা গরীব ভাইদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। সাবধান! দারোগা পুলিশ যদি খবর দাও তাহলে—শোন, যদুনাথ রায় তোমার মাথা কেটে তোমার দরজায় টাঙ্গিয়ে দেব।

তারপর তাহার ইঙ্গিতে সকল ডাকাত আর লুটপাট করিল না সকলে 'জয় মা কালী' 'জয় মা কালী' বলিয়া 'হা-রে-রে-রে' রবে চারিদিক সন্ত্রস্ত চলিয়া গেল।

* * * *

কয়েকমাস মধ্যে গ্রামবাসী সকলে দেখিতে পাইল গ্রামের অপূর্ব পরিবর্তন। বিরাট আরোগ্যশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। বহু চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। দীঘি, পুষ্করিণীর সংস্কার করা হইয়া হইল। বিদ্যালয় ও পাঠশালা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। এক কথায় বলিতে গেলে, গ্রামের আমূল পরিবর্তন হইল। সকলে বুঝিতে পারিল, ডাকাত হইলেও তাহারা মানুষ; তাহাদের মধ্যেও মনুষ্যত্ব আছে। রামলালের এই অসাধ্য সাধনে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এই ডাকাতির ফলে জমিদার যদুনাথ রায়েরও হইয়াছিল আশ্চর্য পরিবর্তন। তাঁহার চরিত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি লোকসেবায়, লোকের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শেষ জীবনে তিনি প্রজা-বৎসল জমিদাররূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন আর রামলাল তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

উদয় ছিল রামলাল ডাকাতের প্রিয় শিষ্য। সে তাহার কাছে লাঠিখেলা শিখিত। রামলালের এইরূপে অসাধ্য সাধনে সে আনন্দিত হইয়া বলিল—'রামদাদা, ভিক্ষার চেয়ে ডাকাতি করা ভাল।'



৬৪

পিতাওপুত্র

॥ এক ॥

মেদিনীপুর জেলার এক মস্ত বড় জমিদার-বাড়ি। বৃহৎ পাকা বাড়ি। চারিদিকে দেওয়ালে ঘেরা। এমন সুদৃঢ় দেওয়াল যে তাহা ভাঙ্গিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। নিচের তলায় বাহিরের দিকে একটিও জানালা নাই। পর পর দুইটি ঘর পার হইয়া উপরের শয়ন-ঘরে প্রবেশ করা যাইত। এই দুয়ের মধ্যে প্রথম ঘরের মুখে প্রথমে কাঠের কপাট, পরে লোহার মোট মোটা গরাদের টানা কপাট। প্রত্যেক দ্বার গাঁথিবার সময় পাশের দেওয়ালে নালি ও তাহার মধ্যে কাঠের অর্গল রাখিয়া গাঁথা। উপরে উঠিবার সিঁড়ি ছিল অত্যন্ত ঘুরানো। বাড়ি ছিল চকমিলান। গ্রামের নাম ময়নাগড়। সেই গ্রামে বাস করিতেন বিশিষ্ট জমিদার রাধারমণ হাজরা। রাধারমণ তেজারতির ব্যবসায়ও করিতেন। দেখিতে ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ এবং সজ্জন।

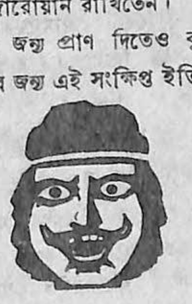
সেকালে প্রচলিত কথাই ছিল, জোর যার মুলুক তার। রাধারমণ সেকালের প্রথামত লাঠিখেলা, তলোয়ার চালানো ইত্যাদিও বেশ জানিতেন। গ্রামের দক্ষিণে ছিল কালীনদী। কালীনদীর পাড়ের সমুদয় ভূমি ছিল অরণ্যময়। দুর্ভেদ্য জঙ্গল থাকাব দরুণ সেখানে নানা বন্য জন্তু বাস করিত। সেখানে এই ময়নাগড়ের অধিবাসী রাধারমণ বাবু যাইতেন বরাহ শিকার করিতে। ঐ বনপ্রান্তে নদীর কিনারায় বাস করিত বাউড়ি, বাগ্‌দি খয়রা প্রভৃতি নানা জাতির লোক। এ-সমুদয় আদিম জাতি কৃষিকর্ম ভালবাসিত না। তাহাদের মধ্যে এক জাতি ছিল 'বনকাটি' নামে পরিচিত। তাহারা বনজঙ্গল কাটিত, নদী, ঝিলে-বিলে মৎস্য ধরিত এবং বন্যশূকর, এমন কি গোধিকা, সাপ প্রভৃতির মাংসও খাইত। উহাদের কোন শিক্ষা ছিল না। কোনরূপ বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল না এবং সামাজিকতা উহারা জানিত না। কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিতকায় এইসব জাতির প্রতি নিকটবর্তী গ্রামবাসীরাও ফিরিয়া চাহিত না। সাধুসজ্জনেরা জানিত না যে ঐ বনচরদিগেরও প্রাণ আছে। তাহারা ক্ষুধা ও তাড়নায় করিত দস্যুবৃত্তি। ক্ষুধার তাড়নায় এবং গ্রামবাসীদের ঘৃণা ও অবহেলার জন্যতাহারা ক্রমে ক্রমে হইল ভীষণ ডাকাত! তখন পর্যন্ত ঐসব অঞ্চল সম্যক ইংরাজ-শাসনে আসে নাই। মেদিনীপুর জেলার এক শ্রেণীর লোককে বলা হইত চুয়াড়! এই চুয়াড় শব্দটি বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। চৌর্যকার্যে দক্ষ, এই অর্থে চোয়াড় বা চুয়াড়! কিন্তু ইহারা তস্কর বা সাধারণ চোর ছিল না; ছিল দুর্দান্ত দস্যু।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা এই চোয়াড়দের ভয়ে শঙ্কিত থাকিত। অভিধান খুলিলে দেখিতে পাইবে চোয়াড় অর্থে দুর্বৃত্ত নীচ জাতি বা অসভ্য বর্বরকে বুঝায়। উহাদের ভয়ে ভদ্র সজ্জন জমিদার, তালুকদার ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। বাঘ যেমন পোষ মানে না, সাপ যেমন হিংসা ভোলে না, উহারা ছিল সেই জাতীয়। তাহারা তীর ছুড়িতে, বন্দুক প্রচলনের পর গুলি নিক্ষেপ করিতে ছিল বিশেষ দক্ষ। দয়া, মায়া, মমতা বলিয়া কিছু তাহাদের ছিল না। এই সব বর্বর চোয়াড়দের শক্তি, সাহস, হিংসা ও বর্বরতার সুযোগ লইয়া অনেক পথিকহন্তা ঠেঙ্গাড়ে এবং বর্গীদলের ও নবাবীফৌজের দুই-একজন সুযোগান্বেষী দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জনকারী রাজপুত আর পাঠান বীরও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া রীতিমত ডাকাত দল গড়িত। সেকালে এই ধরনের অনেক ডাকাত দল ছিল।

এইসব দলের নেতারা ছিল রণদক্ষ, সাহসী ও বীর। মানুষ মারিতে তাহাদের হাত কাঁপিত না। রক্ত দেখিলে তাহারা বাঘের মত আনন্দে নৃত্য করিত। এইসব আদিবাসী দস্যুদের পরিচালনায় রীতিমত ভাবে দুর্ধর্ষ ডাকাত দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা শুধু ময়নাগড়েই ডাকাতি করিত না, মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলেও ডাকাতি করিত। বর্গীরা যেমন হাঙ্গামা করিত—

"চন্দ্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগ-নগর।
খিরপাই বোস্তায় আর বর্দ্ধমান সহর॥"

তেমনি এই ডাকাতেরাও ঐসব অঞ্চলে ডাকাতি করিত। যুদ্ধসাজে আসিয়া গৃহস্থের ও গ্রামবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করিত। তখনকার দিনে ছেঁচকা চোর ও সিঁধেল চোর ছিল না। গোপনে আসিয়া পুকুর ঘাটের বাসন-কোসন, চুরি, ফাঁকে বাড়ি হইতে দূরের মরাইয়ের ধান চুরি ইত্যাদি বিরল ছিল। ঘর-শত্রু, জ্ঞাতি-শত্রু কিংবা গ্রামস্থ শত্রু চর না থাকিলে ডাকাতি হইত না। যাঁহারা ধনবান এবং ক্ষমতাশালী জমিদার বা তালুকদার ছিলেন তাঁহারা বাড়ি রক্ষার জন্য নবাবদের সৈন্যদলের কোন পাঠান বা রাজপুত বীরকে বাড়ির দারোয়ান রাখিতেন। এইসব দারোয়ান ছিল খুব বিশ্বাসী, মনিবের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সেকালের অবস্থা জানিবার জন্য এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু বলিলাম।



॥ দুই ॥

রাধারমণ হাজরার বাড়ির দারোয়ান ছিল জগমোহন সিংহ। প্রৌঢ় শক্তিশালী ব্যক্তি। জাতিতে ক্ষত্রিয় রাজপুত। খাঁটি উদয়পুরের

অধিবাসী। তাহার ছিল মস্ত বড় গোঁফ আর দাড়ি। সেই সযত্নে পোষিত গোঁফদাড়ি ছিল তুইদিকে কানের পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, একপাশে তলোয়ার ঝুলাইয়া বল্লম হাতে করিয়া যখন জগমোহন দেউড়ির সম্মুখে বসিত, তখন তাহার দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ আকৃতি দেখিয়া লোকে ভয় পাইত। জগমোহনের ছিল তুইটি ছেলে—শত্রুঘ্ন সিংহ ও তুর্জন সিংহ। জগমোহনের স্ত্রী জীবিতা ছিল না। রাধারমণ হাজরার বাড়িই ছিল যেন জগমোহনের নিজ বাড়ি। সে হাজরাকে বলিয়াছিল—'রাজাসাব, আপকা কুঠি হ্যায় মেরা ডেরা, জান হিয়াই ছুট যায়েগা। তুনো লেড়কা বড়া হুয়া, একটো তুষমন ঔর একটো বিয়াকুব হ্যায়। রামচন্দ্রজি ললাটমে যো লেখা লিখা ও জরুর হো যায়েগা।'

রাধারমণ বাবু আসিয়া জগমোহনের কাছে বসিতেন। শুনিতেন চারণ কবিদের বীরত্ব গাথা, রাণা প্রতাপের অসীম বীরত্ব ও হলদি-ঘাটের গিরি সংকটে চৈতকের মৃত্যু কাহিনী। শুনিতেন তাহার মুখে জহরব্রতের করুণ কাহিনী, শিহরিয়া উঠিতেন হাজরা যখন জগমোহন বীরকণ্ঠে বলিত—'দেশকো বড়া কুছ নেই রাজা সাহেব।'

হাজরা বলিতেন—'ঠিক হ্যায়।'

জগমোহন সিংহ ছিল সজ্জন। কিন্তু তাহার পুত্র শত্রুঘ্ন ও তুর্জন সিংহ ছিল প্রকৃতই তুর্জন। তুর্জন ও তাহার দাদা শত্রুঘ্ন সিংহ তুইটি ডাকাতদলে মিলিয়া নিকটে ও দূরে ডাকাতি করিত। ডাকাতি করিয়া তাহারা তাহাদের নিজ নিজ দলকে বেশ পরিপুষ্ট করিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি সেকালে লোকেরা খাইতে পাইত। অন্ন অভাব ছিল না। কিন্তু তুষ্কর্মের একটি প্রলোভন আছে। যখন মানুষের কাঁধে শয়তানি চাপে, তখন তাহারা তুষমন। কোন অন্যায় কার্যে অগ্রসর হইতে তাহাদের বাঁধে না। জগমোহনের পুত্রদেরও তাহাই হইয়াছিল। জগমোহন সিংহ পুত্রদের আচরণে মনে মনে অত্যন্ত তুঃখিত ছিল, কিন্তু কে শুনিবে তাহার কথা। পুত্রেরা যদি হয় বিপথগামী, পিতাকে না করে গ্রাহ্য, তখন হতভাগ্য পিতার ত কিছু করিবার থাকে না। শুধু মনের মধ্যে তুঃখ বেদনা পোষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। জগমোহন ও তাহার পুত্রদের ডাকাতি, চৌর্য ও নরহত্যার কথা শুনিয়া বড় তুঃখিত মনে থাকিত। রাধারমণ বাবুও তাহাদের চরিত্রের বিষয় জানিতেন।

একদিন রাধারমণ বাবু জগমোহনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন দপ্তরে। জগমোহন আসিলে বলিলেন—'জগমোহন বড় বিপদ। এ মাসের অমাবস্যা তিথিতে আমার বাড়ি ডাকাতি হবে।' আমাদের গ্রামের মুখ্য মোড়ল ভাঁড়ারি সব ডাকাতদের খবর দিয়েছে। ডাকাত ও ঠেঙ্গাড়িয়ারা এক সঙ্গে মিশেছে শুনেছি। আমার বাড়ি আক্রমণ করবার জন্য গ্রামের শত্রুরাও দলে দলে যোগ দিয়েছে। হুঁশিয়ার রহ।'

সে গ্রামে ছিল একজন ভাঁড়ারি। দিনে ছিল সে সাধু, তেজারতি মহাজনী করিত। রাত্রে চোর ডাকাতের অপহৃত স্বর্ণ রৌপ্য গলাইয়া আত্মসাৎ করিত। সেকালে কেহ কেহ অলংকার বন্ধক রাখিয়া লোককে টাকা ধার দিত। তাহাদিগকে বলা হইত পোদ্দার। ময়নাগড়ের হরি পোদ্দার বাহিরে মহাধার্মিক বলিয়া পরিচিত ছিল। তিলক ফোঁটা কাটিত। গলায় পরিত তুলসীর মালা। 'হরে কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ রাম রাম হরে হরে' ছিল তাহার মুখে সর্বদাই। চোর-ডাকাত ছিল তাহার বন্ধু। রাতে ডাকাতেরা ডাকাতি করিয়া সোনারূপা টাকা-পয়সা লুটিয়া আনিয়া হরি পোদ্দারের কাছে দিত। পোদ্দার মহাশয় সযত্নে ও নির্ভয়ে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ভাঁড়াতে রাখিয়া দিত। এই ভাবে সোনা রূপা অলংকার জমাইয়া হরি পোদ্দার ওরেফ হরি ভাঁড়ারি হইয়াছিল ধনী। জমিদারিও করিয়াছিল—কিন্তু হাজরা মহাশয়ের সমকক্ষ হওয়ার আশা তাহার ছিল না। এজন্য সে তাহার পোষা



'জগমোহন বড় বিপদ!—এ মাসের অমাবস্যা তিথিতে আমার বাড়ি ডাকাতি হবে

ডাকাতদের প্ররোচনা করিতেছিল রাধারমণ হাজরার বাড়ি লুঠ করিতে। হরি পোদ্দার ছিল ধূর্ত ও কৌশলী। ডাকাতদের লুণ্ঠিত টাকা-কড়ি সোনা-রূপা এমন ভাবে ভাগ করিয়া দিত যে, তুই চারি মাস তাহাদের সেই সম্বলে ডাকাতি না করিলেও চলিত। জগমোহন সিংহের তুই পুত্রই ডাকাতদের দলকে পুষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের দল নানা ভাবে নানা শ্রেণীর দ্বারা পুষ্ট হইতেছিল। মাঝি, ডোম, হাড়ি এমন কি মুসলমানও সেই দলে ছিল।

এখানে একটি কথা বলি। এত ডাকাতের দেশেও সেকালের লোক ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিত না। তখনকার লোকের সাহস ছিল, গায়ে বল ছিল। পাড়ায় পাড়ায় আড্ডায় লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, তীর বাটুল ছোড়া ইতর ভদ্র সকলেই শিখিত। হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, মেদিনীপুর, বর্ধমান ছিল ডাকাতের জেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ডাকাতেরা সাধারণতঃ রাত্রি তুপুরের শেষ দিকে আক্রমণ করিত। জমিদার ও বিশিষ্ট তালুকদারেরা সেজন্য রাত্রিকালে কাছারি করিতেন। জানিতেন যে এ সময়ে ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে আসিবে না। সকলে সজাগ থাকিলে কেহই আসিবে না। বাড়ির

কেহ জাগিয়া আছে টের পাইলেও ডাকাত পড়িত না। সাধারণতঃ রাত্রি একটার পর ডাকাতি হইত। এই কারণে সেকালে বিত্তশালীরা রাত্রি বারটা একটা পর্যন্ত কাছারি করিতেন। রাধারমণ বাবু রাত্রিতে কাছারি করিয়া বাড়ির ভিতর শুইতে গিয়াছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু মৃদু বাতাসে গাছের পাতা নড়িতেছে। নদীর কলকল শব্দ শোনা যাইতেছে। জগমোহন সিংহ বিকট শব্দে চিৎকার করিয়া পাহারা দিতেছে। এমন সময় কালীনদীর অরণ্য-পথে একদল ডাকাত চলিল হাজরার বাড়ি ডাকাতি করিতে। হরি পোদ্দার ওরফে হরি ভাঁড়ারি তাহাদের গোপন পথ দিয়া লইতে আসিতেছিল।

এই দলে ছিল ত্রিশজন ডাকাত। তিনজন ছিল যোদ্ধা। ডাকাতদের হাতে ছিল বিনানো খড়ের আগুন। সেকালে বিলাতী দিয়াশালাই ছিল না। বিনানো খড়ের আগুন দিয়া মশাল জ্বালাইত। ডাকাতদলের নেতারা কোমরে ঘুঙুর, হাতে লাঠি তলোয়ার লইয়া আসিয়াছিল।

নীরবে বাড়িতে আসিয়া তাহারা বাহির হইবার পথ-ঘাট আগলাইল, মশাল ধরাইল। তাহারা শাবল কাটারি, কুড়াল প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছিল বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ করিয়া লইতে। এইবার 'হা-রে-রে-রে' করিয়া ডাকাতেরা বিকট চিৎকার করিয়া ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিল।

ডাকাতেরা কুড়াল ইত্যাদি লইয়া দেউড়ির দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দমাদম শব্দ হইতে লাগিল। জগমোহন সিং বিকট চিৎকার করিয়া কহিল "জাগো! জাগো ভাই সব! হাতিয়ার ধর। ডাকু আয়া হ্যায়! ডাকু আয়া হ্যায়! ডাকু আয়া।'

রাধারমণ বাবুর ঘুম ভাঙ্গিল তিনি চিৎকার করিয়া কহিলেন 'জগমোহন সিংহ। হুশিয়ার রহো।'

সেকালের বড় লোকদের লাঠি তলোয়ার ধরিবার শক্তি ছিল। রাধারমণ বাবু ও তাঁহার ভাই, চাকর-বাকর লোকজনসহ মিলিত হইয়া লাঠি, বন্দুক, তলোয়ার লইয়া একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিলেন— 'জোয়ান সব লড়ো। ভাগাও ডাকু লোককো!'

জগমোহন সিংহ ও তাহার সঙ্গে আরো পাঁচজন সাহসী যোদ্ধা দেউড়ির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। হাজরার বাড়ি এমন ভাবে তৈয়ারী হইয়াছিল, যে, সেই উচ্চ প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা ছিল অসম্ভব।

যোদ্ধাদের কোমরে ঘুঙুর রুণ-রুণ ঝুন্-ঝুন্ করিয়া বাজিতেছিল। ডাকাতদলের নেতারা দেখিল এ বাড়ির সকলেই জাগ্রত। রাধারমণ হাজরা ও তাঁহার বাড়ির লোকজন আসিয়া দেউড়ির পেছনে দাঁড়াইলেন। হরি পোদ্দার দেউড়ির পাশে একটা বড় জামগাছের আড়ালে লুকাইয়াছিল। হাজরার দলের একজন লাঠিয়াল এত জোরে একটা বর্শা ছুড়িয়া মারিল যে, তাহা হরি পোদ্দারের পিঠের মধ্য দিয়া বুক দিয়া বাহির হইল এবং সে তৎক্ষণাৎ সেখানেই প্রাণ হারাইল।

দলের লোকেরা 'জয় মা কালী, জয় মা কালী' ও হা রে-রে-রে রবে চেঁচাইলেও কেমন যেন দমিয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোকেরাও প্রবলভাবে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা যাহার যেমন অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ডাকাত দলের লোকজনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ছুটাছুটি, লুটাপুটি, হাতে হাতে লড়াই চলিতেছিল।

বিকট চিৎকার আরম্ভ হইল। হা-রে-রে-রে ধ্বনি। জয় মা কালী! জয় মা কালী! চিৎকারে অরণ্যময় প্রদেশ, কালীনদীর তীরভূমি ভীষণ কলরবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

এদিকে দেউড়ির সম্মুখে জগমোহন সিংহ ও ডাকাত দলের তরুণ নেতাদের সহিত তলোয়ারে তলোয়ারে চলিতেছিল ভীষণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

কেহই হটিতেছে না। হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে জগমোহন সিংহ নেতার বুকে শূল বসাইয়া দিল। সে মাটিতে পড়িয়া গেল—গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে প্রাণ হারাইল মুহূর্তের মধ্যে। আর দুইজন যোদ্ধাও দেউড়ির দুই পাশের দুইজন নিপুণ দ্বাররক্ষীর হাতে ভীষণ-ভাবে আহত হইয়া পলায়ন করিল। ডাকাতের দল ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পলায়ন করিল নদীতীরের অরণ্যময় পথে। কে কোথায় রহিল বা কোন দিক দিয়া পলাইল, সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না।

পরদিন সকালবেলা গ্রামের লোকেরা এবং স্বয়ং কর্তা যখন জগমোহন সিংহকে ও লাঠিয়ালদের ধন্য ধন্য করিতেছেন, তখন রাধারমণ বাবু দেখিলেন জগমোহন সিংহ সবিস্ময়ে একটি মৃত দেহের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। হাজরা জিজ্ঞাসা করিলেন, জগমোহন তুমি কাঁদছে কেন?

সে অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে কহিল—'বাবুজী, মেরা লেড়কা শত্রুঘ্ন সিংকো আপনা হাতসে মার ডালা। মেরা দুষমণ লেড়কাকো আপনা হাতমে মারা হ্যায়।'

রাধারমণ বাবু দুঃখ করিয়া বলিলেন—'জগমোহন, আমার জন্যই এই দশা ঘটলো।'

জগমোহন চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—কুছ পরোয়া নেই। জানে দেও বাবুজি! হাম নিমকহারাম নেহি হ্যায়। জয় রামজী! জয় রামজী!'

জগমোহন পিতা হইয়াও কুবুদ্ধি ডাকাতের বুকে শূল বসাইয়া প্রভুর বাড়ি রক্ষা করিয়াছিল। দেশের লোকেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সেকালের প্রভুভক্ত দারোয়ানদের এইরূপ প্রভুভক্তি বিরল ছিল না



বর্ধমান শহরের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত রঞ্জিত চৌধুরী। শহরের উপর প্রকাণ্ড বাড়ি। ওকালতিতে যেমন প্রসার, তেমনি দয়ালু এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সুনাম ও সুযশ ছিল। তিনি প্রতিদিন যখন প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন, দেখিতেন কিছু দূরে একটা পুকুরের

পাশে গাছতলায় একটা লোক শুইয়া আছে। বেশ বলিষ্ঠ শরীর, কিন্তু সারা গায়ে কুষ্ঠ ব্যাধি, হাত-পা খসিয়া পড়িতেছে। কেহ তাহাকে দেখে না। সে কাঁদিতে থাকে—চোখ দিয়া জল পড়ে, কি যেন সে বলিতে চায়। রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে যে ভৃত্য থাকে সে বাবুকে বলে ওর কাছে বেশি বসবেন না। দাঁড়াবেন না। ওর মহাব্যাধি হয়েছে—সাবধান। রঞ্জিতবাবু একদিন ঐ লোকটাকে একটা গরুর গাড়িতে তুলিয়া নিয়া একজন কুষ্ঠ-চিকিৎসক কবিরাজের কাছে গেলেন। এবং কবিরাজের বাড়ির সম্মুখে একটি খড়ো ঘর ভাড়া করিয়া তাহাকে সেখানে রাখিয়া দিলেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যত্ন সহ তেল, বড়ি এবং বিবিধ ঔষধ দেওয়ার ফলে সে বেশ একটু সুস্থ হইল। দয়ালু মহাপ্রাণ রঞ্জিতবাবু অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। কেমন যেন তাঁহার মনে হইয়াছিল লোকটির পেছনে একটা ইতিহাস আছে। তাই তিনি একদিন কৌতূহল ভরে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে? তোমার এমন দশা হ'ল কেন? কি তোমার নাম? বাড়ি কোথায়?'

লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আমার পাপের ফল—পাপের ফল।' তারপর রোগগ্রস্ত হাত কপালে তুলিয়া বলিল, আমার নাম কালিচরণ বাগদি। বাড়ি কার্জুনা। ডাকাতি করে বেড়াতাম। একদিন কোন শিকার মিলল না। মাঠের মাঝে একটা গাছতলায় বসে আছি। দিনদুপুরে প্রখর রৌদ্র। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। এমন সময় দেখতেন পেলাম একটি লোক হন্‌হন করে এদিক পানে ছুটে আসছে। আনন্দ হলো, ভাবলাম একটা শিকার মিলল। সে ছুটে এলে দেখলাম লোকটা আমাদের পাশের গাঁয়ের হরিহর পুরুতের ছেলে মণি। হাতে তার ছোট একটি পুটলি—বেশ বড়।

সে আমার হাতে লাঠি ও আমাকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠল। বলল তুমি—তুমি কেন এখানে?

বললাম—'জানিস্ না বামুন এখানে কেন? তোর মাথা ভেঙ্গে সব লুঠ করবো বলে এখানে বসে আছি। দে বামুন কি আছে—দে—দে।'

মণিঠাকুর কেঁদে ফেলে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে—'আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না। তিন গাঁয়ে পূজা করে যা কিছু চাল-ডাল পেয়েছি তাই নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি মাকে দুটি রেঁধে খাওয়াব বলে।'

গর্জে উঠলাম—'রেঁধে খাওয়াবি। সব মিছে কথা।'

—চালাকি! খোল্ খোল্ কি আছে খুলে দে।

—সে বলল—আমার মা।

—চুপ রও। তোর মা! ভারি চালাকি শিখেছিস ঠাকুর।

মণিঠাকুর যত কাঁদে, আমার রাগ তত বাড়ে।

সে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললে—'বাবা! আমার মা যে না খেয়ে মারা যাবে। এই একমুঠো চাল, ডাল, আর দুটো কাঁচকলা নিয়ে কি হবে? দক্ষিণা পেয়েছি মাত্র দু'আনা পয়সা। আমায় ছেড়ে দে বাবা।'

এই পর্যন্ত বলিয়া কালীচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল বাবু আমার মাথায় খুন চেপেছিল। আমি বাবু......

হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল—'মণিঠাকুর বলেছিল, আমায় ছেড়ে দে বাবা!'...কিন্তু তাহার করুণ চিৎকার কে শুনবে? আমি এক লাঠির ঘায়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিলাম। সে মুহূর্ত মধ্যে মারা গেল। রক্তে সারা গা ভেসে গেল। আমার হ'ল উৎকট আনন্দ। নেড়েচেড়ে দেখলাম। ঠাকুরের দেহ অসাড় হয়ে গেছে। সব শেষ! সব শেষ! সব শেষ!

তারপর পাশের ছোট পুকুরটার ভেতর লাশটা ফেলে দিলাম। আমার মন কেমন হয়ে উঠল। ঠাকুরের পোটলা খুলে দেখলাম। ঠাকুরের কথা সত্যি। তাতে রয়েছে পো'টেকখানি চাল, কিছু ডাল আর কাঁচকলা। গামছার একদিকের কোণে বাঁধা আটটি পয়সা মাত্র।

তারপর বাবু আমি চললাম ঠাকুরের বাড়ি। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেখব বামুনের কথা সত্য কিনা। এক ক্রোশ দূরে ছিল ঠাকুরের বাড়ি। পাঁচ-সাতটি তালগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট একটা ডোবা। ডোবার পাড়ে একটি কুঁড়ে ঘর। ঘরের দাওয়ায় এক বুড়ি বসে আছে। চোখে সে ভাল দেখে না। আমার পায়ের শব্দ শুনে বুড়ি বললে—'কি বাবা মণি এলে? এত দেরী কেন বাবা? আমার যে খিদেয় প্রাণ যায়। দুটি ভাত রেঁধে দে।' কি বলব বাবু, আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না। ছুটে চলে এলাম।

মাঠ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, বুড়ি বলছে, মণি, কথা বলছিস না কেন? মণি, মণি!

তারপর একদিন রাত্তিরে হ'ল আমার ভীষণ জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে এইসব ফোঁড়া। তারপর আমার গাঁয়ের লোকেরা শহরের একটা মাঠের ধারে ফেলে দিয়ে গেল আমাকে। বাবু! পাপের ফল হাতে হাতে ফলল। এ সাজা আমার পাওনা ছিল। আমি দিনরাত দেখি চোখের সামনে ফুটে উঠছে—মণি ঠাকুরের চেহারা, আর কানে যেন শুনতে পাই তার মায়ের কথা—মণি। মণি কি এলিরে? দুটি ভাত রেঁধে দে বাবা।

এই কাহিনী বলার কয়েকদিন পর কালী ডাকাত প্রাণ হারাইল।



গোবিন্দ হালদার ও হরিচরণ মাঝি

॥ এক ॥

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল প্রায় সত্তর বৎসর আগে ফরিদপুর জেলায়। মাদারিপুর মহকুমায় পালং থানার অধীনে লোনসিং গ্রামে রজনীকান্ত

জেলার মঠবাড়িয়ায় পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন।

রজনীবাবুর স্ত্রী পুত্র এবং তাঁহার ছোট ভাই যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় থাকিতেন গ্রামের বাড়িতে। রজনীবাবুর পত্র পাইয়া যামিনীকান্ত, রজনীকান্তবাবুর স্ত্রী ও কতিপয় শিশুসন্তানসহ মঠবাড়িয়া রওয়ানা হইয়াছেন।

রাত্রিকাল। অগ্রহায়ণ মাসের সাতাইশে কি আঠাইশে তারিখ। আসন্ন শীতের রাত্রি। নৌকা চলিয়াছে নদীর বুকে। তীরে তীরে ঘন অন্ধকার। আচ্ছন্ন আকাশ। নদীপারের পল্লীগুলি মসীমাখা। আকাশে তারা ফুটিয়াছে। নদীর জল ছলছল কলকল করিয়া ছুটিতেছে। নৌকার ভিতর দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া শীতের বাতাস ঢুকিতেছে। হাটুরে নৌকা এবং যাত্রী নৌকা চলিয়াছে গন্তব্য পথে। সব নৌকার যাত্রীরা সতর্ক—কেননা নদীর তীরে পল্লীতে পল্লীতে চোর-ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশি। এজন্য ঐ স্থান দিয়া যাতায়াতের সময় যাত্রী নৌকা ও ব্যবসায়ীদের নৌকা সাবধানে চলিত।

ঐ রাত্রিতে যামিনীকান্তবাবুর নৌকা চণ্ডীপুর গ্রাম ছাড়াইয়া গেল। সেদিন পথে কোন বিভ্রাট ঘটে নাই। পরদিন প্রভাতবেলা নৌকা ছাড়িয়া সারাদিন নৌকা চালাইয়া সন্ধ্যায় তাহারা সেকালের ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত হাট মূলাদির ঘাটে নৌকা লাগাইল। মাঝিমাল্লারা ও নৌকাযাত্রীরা হাট হইতে মাছ তরিতরকারি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিয়া রান্না ও আহারকার্য শেষ করিল। তারপর যামিনীকান্তবাবু, তাঁহার ভ্রাতৃবধূ সকলে নৌকার ভিতরে হেমন্তের হিমানী রাতে পরম আনন্দে নিদ্রা গেলেন।

নৌকার মাঝি গোবিন্দ হালদারও শুইয়া পড়িয়াছিল নৌকার বাহিরে ছইয়ের নিচে। সে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল জানে না—সহসা কিসের যেন শব্দ শুনিয়া সে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া দেখিতে পাইল যে তাহাদের নৌকা মূলাদি ছাড়িয়া প্রায় অর্ধ মাইল দক্ষিণে আসিয়া পড়িয়াছে।

সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। ভয় হইল তাহার মনে—নিশ্চয়ই তাহারা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে।

সে ভীতভাবে ডাকিল—হরিচরণ, হরিচরণ! ওঠ্, ওঠ্।

হরিচরণ ঘুমের ঘোরে বলিল—অ্যাঁ অ্যাঁ! কি-কি-কি হইছে?

হালদার বলিল—'ওরে ওঠ্, ওঠ্, ডাকাত পড়েছে—ডাকাত পড়েছে।'

হরিচরণ এবং নৌকার অন্যান্য মাঝিরা জাগিয়া উঠিল।

গোবিন্দ হালদার, হরিচরণ এবং অন্যান্য মাঝিদের ভীত সন্ত্রস্ত কথাবার্তা শুনিয়া নৌকার সমস্ত লোক জাগরিত হইল।

সেই সময় মাদারিপুর মহকুমা 'নৌকা ডাকাতির' জন্য কুখ্যাত ছিল। ডাকাতদের প্রায় সকলেই ছিল নমঃশূদ্র। ডাকাতেরা এতদূর ভয়াবহ ছিল যে, দিন-দুপুরেও নদীতে ডাকাতি করিয়া সব কাড়িয়া লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিত। নৌকার আরোহীদের উপরও খুব অত্যাচার হইত। গুলি করিয়া কিংবা কেবল বন্দুকের ভয় দেখাইয়াই তাহাদের সমস্ত মাল লুঠিয়া লইয়া ডাকাতেরা নিরাপদে চলিয়া যাইত। পুলিশ, দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেটও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।



॥ দুই ॥

গোবিন্দ, হরিচরণ প্রভৃতি সকলে দেখিল যে নৌকাখানি রহিয়াছে নদীর মাঝখানে। নদীর দুই দিকে বিস্তৃত মাঠ। নদীর জলে স্রোত বহিতেছে অতি বেগে তর্‌তর্ সরসর রবে। মাঝিরা নৌকাখানি পাড়ে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিতে পাইল, নৌকার হাইলের সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা। দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা রহিয়াছে অদূরবর্তী একখানি নৌকার সহিত। বলা বাহুল্য উহা ছিল ডাকাতের



গোবিন্দ বলিল—যা যা আগুন নেই

নৌকা। ঐ রজ্জু গোবিন্দ মাঝি দ্রুত একখানি দা দিয়া কাটিবামাত্র নৌকা চলিল পাড়ের দিকে।

গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গীগণ সুকৌশলে নৌকাখানি দ্রুত পাড়ের দিকে বাহিয়া নিতেছিল স্রোতের বিপরীত দিকে।

এমন সময় চারি পাঁচখানা ছিপ নৌকা আসিয়া নৌকাখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল। ছিপ নৌকা হইতে একজন বলিল—'ও মাঝি আগুন দে।'

গোবিন্দ বলিল—'যা যা আগুন নেই।'

হরিচরণ, গোবিন্দ ও অন্যান্য মাঝিমাল্লারা লগি হাতে দস্যুগণকে এমন ভাবে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কোনরূপেই নৌকায় উঠিতে পারিতেছিল না। প্রথমে লাঠালাঠি পরে হাতাহাতি আরম্ভ হইল।

ডাকাতেরা সংখ্যায় প্রায় পনেরো-ষোল জন হইবে। তাহারা নৌকার চারিদিকে ঘিরিয়া হা-রে-রে-রে রবে হুঙ্কার দিতেছিল। আরম্ভ হইয়াছিল ভয়ানক লাঠালাঠি। ওদিকে নৌকা স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। হাতাহাতি লাঠালাঠি চলিয়াছে পুরোদমে।

এমন অবস্থায় বিপন্ন যামিনীবাবু বলিলেন—'গোবিন্দ, ডাকাতরা যখন আমাদের আক্রমণ করতে এসেছে, এই নে টাকা। এই টাকা দিয়ে এদের বিদায় করে দেও।'

গোবিন্দ, হরিচরণ এবং অন্যান্য মাঝি-মল্লারা চিৎকার করিয়া উঠিল—'সে হইব না বাবু! বেটাদের মাইরা লাশ কইরা দিমু। জন্মের মত ডাকাইতি করবার শখ মিটাইয়া দিমু।...হরিচরণ ধর লাঠি।'

গোবিন্দ মাঝি দস্যুদের কিছু দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দস্যুরা ক্রুদ্ধ হইয়া আবার আক্রমণ করিল। গোবিন্দ মাঝি ছিল সেই অঞ্চলের বিখ্যাত লাঠিয়াল। তাহার অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধি বলে, সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও দস্যুদের সহিত প্রাণপণে লড়িতে লাগিল। দস্যুরা যেমন নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল অমনি লাঠির ঘায়ে নদীর বুকে পড়িয়া যাইতেছিল।

গোবিন্দের লাঠি চালাইবার কৌশলে দস্যুদের বর্শা পর্যন্ত কাহারও গায়ে লাগিতে পারে নাই। দস্যুদের হাত হইতে খসিয়া ঝপাং-ঝপাং শব্দে জলে পড়িয়া যাইতেছিল।

উন্মত্তের মত গোবিন্দ ও হরিচরণ লাঠি চালাইতেছিল। বোঁ বোঁ বোঁ—বন্ বন্ বন্ শব্দে কুমোরের চাকের মতো লাঠি ঘুরিতেছিল আর দস্যুদের নিক্ষিপ্ত বর্শা, বল্লম প্রভৃতি লাঠির ঘায়ে ঠেকিয়া জলে পড়িতেছিল।

সমানে যুদ্ধ চলিতেছিল। এদিকে রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চারিদিক হইতে বহু লোকজন ও নৌকা আসিতে দেখিয়া দস্যুগণ বিফল মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিল।



॥ তিন ॥

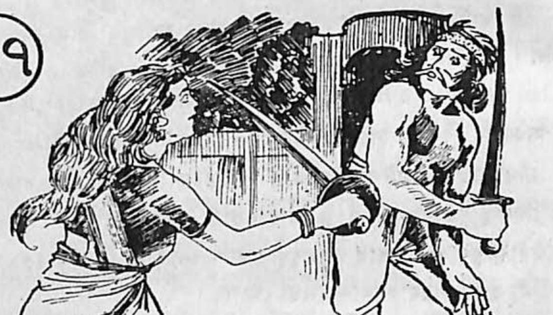
এইরূপ ভাবে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া গোবিন্দ এবং হরিচরণ সাব-ইন্সপেক্টর রজনীবাবুর ভ্রাতা এবং স্ত্রী পুত্রদিগকে মঠবাড়িয়ায় পৌঁছাইয়া দিল।

রজনীবাবু সব কথা শুনিলেন এবং ক্ষত বিক্ষত দেহে গোবিন্দ ও হরিচরণকে দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। তিনি তাহাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহারা আরোগ্য লাভ করিলে গৌরনদী ও মেহেন্দিগঞ্জের পুলিশ বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বাহির হইল।

সেকালের সংবাদপত্রে গোবিন্দ ও হরিচরণ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম—

'গোবিন্দ ও হরিচরণ তোমাদের অপরিসীম সাহসিকতা ও ভুজবলে ধন্য। ধন্য তোমাদের অমেয় প্রভুভক্তি। তোমাদের প্রভুর জন্য তোমরা আজ আত্মপ্রাণকে যেমন তৃণখণ্ডের ন্যায় কালস্রোতে ভাসাইতে উদ্যত হইয়াছিলে এমন আত্মত্যাগ আজকাল দেখা যায় কি? আজ তোমরা না থাকিলে দস্যু হস্তে পতিত কণ্ঠাগতপ্রাণ পরিবারবর্গের কি গতি হইত, তাহা ভগবানই জানেন। আমরা বরিশালের পথে দস্যুদের আক্রমণ বৃত্তান্ত অতি পূর্বকাল হইতে আবহমানকাল পর্যন্ত একভাবে শুনিয়া আসিতেছি। আমরা আশা করি বরিশালের সুযোগ্য ডিঃ সুপারিন্টেডেন্ট বাহাদুর এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি করতঃ জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দস্যু ডাকাত দমন করিতে যত্নবান হইবেন।'

৬৭



গোলাম সর্দার - রুদ্রা হাজরা

॥ এক ॥

বর্ধমান জেলার রায়না গ্রামে সেকালে একজন নামকরা ডাকাত ছিল, গোলাম সর্দার। অসাধারণ প্রতাপ ছিল গোলাম সর্দারের। ইহা হইতেছে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের কথা। সেই সময় উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেলি (William Butterworth Bayley) নামে একজন কালেক্টর ছিলেন। বিশেষ প্রতাপশালী এবং শাসনদক্ষ ছিলেন বেলি সাহেব। তিনি যখন বর্ধমানের কালেক্টর হইয়া আসেন, তখন জেলার সর্বত্র হইত ডাকাতি। ঠগীদের অত্যাচারও বড় কম ছিল না। সেই সময়ে বিখ্যাত ডাকাত গোলাম সর্দারের প্রতাপে বর্ধমান জেলার লোকেরা থাকিত ভীত ও সন্ত্রস্ত—জমিদার, তালুকদার এবং ধনী ব্যবসায়ীদের ত কথাই নাই। অনেক দস্যু-সর্দার ছিল গোলাম সর্দারের নিত্য সহচর।

অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন রায়না গ্রামে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও চাষীদেরও বাস ছিল।

গোলাম সর্দার তাহার বাসপল্লী রায়নাতে অন্য ডাকাতদের ডাকাতি করিতে দিত না। দুর্জয় সাহসের ও বীরত্বের সহিত সে বিপক্ষ দলকে তাড়াইয়া দিত।

একবার গোলাম সর্দার কিছুদূরে এক জমিদার বাড়ি লুঠ করিতে গিয়াছিল। জমিদার ছিলেন ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত ও বীরপুরুষ। নিজে যেমন ছিলেন সাহসী তেমনি তাঁহার পরিবার-পরিজনদেরও শিক্ষা

দিয়াছিলেন অস্ত্র ধারণ করিতে। জমিদারের বাড়ি ছিল চারিদিকে দেওয়াল ঘেরা। দামোদর নদীর অপর পাড়ে ছিল তাঁহার বাড়ি। তাঁহার জমিজমা-ক্ষেত-খামার ছিল অনেক। বাড়ির বাহিরে কাছারি ঘর ও অতিথিশালা ছিল। আপদে বিপদে রক্ষা করিবার জন্য পাহারাওয়ালা ও বরকন্দাজ ছিল অনেক। সেজন্য তাহার বাড়িতে ডাকাত আসিতে সাহসী হইত না। গ্রামের নাম ছিল দামোদর ঘাট আর জমিদারের নাম ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা।

আগেই বলা হইয়াছে, বর্ধমান জেলায় সেই সময়ে অনেক ঠগীও ছিল। কাজেই ডাকাতি, জীব হত্যা ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। বেলি সাহেব এজন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। এবং সর্বদা গোয়েন্দা পাঠাইয়া সৈন্য দিয়া সব সন্ধান লইতেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। সব সময়েই যে ব্যবস্থা করিতেন তাহা নহে, তবে তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও বীরত্বের জন্য লোকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। দামোদর ঘাট গ্রামের জমিদারের প্রতি গোলাম সর্দারের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। একবার সুযোগ বুঝিয়া গোলাম সদল বলে চলিল সেই জমিদার বাড়ি লুঠ করিবার জন্য। সঙ্গে লইল শক্তিশালী দস্যু সর্দারদের যাহারা বন্দুক, তলোয়ার ও বর্শা চালাইতে দক্ষ। গোলাম সর্দারের ডাকাতি ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। সে অতর্কিতভাবে গোপনে যাইত ডাকাতি করিতে।

জমিদারবাবু বর্ধমানে গিয়াছিলেন কার্যোপলক্ষে; ফিরিতে কয়েকদিন দেরী হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঐ খবর গোলাম সর্দারের অজানা ছিল না। সেজন্য সে আশা করিয়াছিল যে বিনা বাধায় কার্যসিদ্ধি করিয়া আসিতে পারিবে।

গোলাম সর্দার এক গভীর নিশীথে আসিয়া আক্রমণ করিল জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরার বাড়ি। তাহারা 'হা-রে-রে-রে' করিতে করিতে গ্রামখানি সচকিত করিয়া বাড়ির চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া, গাছে উঠিয়া—যেভাবে পারিল বাড়ির ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর মশাল জ্বালিল ও ভীষণ চিৎকার আরম্ভ করিল। বাড়ির বরকন্দাজেরাও প্রস্তুত হইয়া গোলামের দলকে বাধা দিতে লাগিল। দুই পক্ষে রীতিমত লড়াই আরম্ভ হইল। গোলাম তখন বিপদ গণিল। এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ; নিজে ছিলেন বীর সন্তান, বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার, আর তাঁহার বাড়ি রক্ষার জন্য দশ-বারোজন পাঠান সৈনিক ছিল প্রহরী। কাজেই গোলাম পড়িল মহাবিপদে। ভীষণ লড়াই চলিল দুই দলে।

গোলামের দলের অনেকে খিড়কির দরজা দিয়া, কেহ বা বাগানের গাছপালা ডিঙ্গাইয়া পলাইতে শুরু করিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের স্ত্রী রুদ্রা যখন দেখিলেন, যে তাহার পক্ষের বরকন্দাজ ও সৈন্যদল দস্যুদের আক্রমণ হইতে বাড়ি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ লড়িয়াও তাহাদিগকে হটাইতে পারিতেছে না, তখন তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিপদের সংবাদ জানাইয়া দুইজন পাঠান ঘোড়সওয়ারকে গোপনে বর্ধমান পাঠাইয়া দিলেন স্বামীকে সত্বর ফিরিয়া আসিতে; আর নিজে সাজিলেন রণবেশে এবং অতি দ্রুত একটি তলোয়ার হাতে লইয়া মাত্র চারি-পাঁচজন সশস্ত্র সৈন্যসহ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন দস্যুদলের উপর। রুদ্রা দেবী এমন দ্রুত তলোয়ার চালাইতে লাগিলেন, গোলামের দলের চারিজন সর্দার এই বীর্যবত্তা নারীর তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দিল। গোলাম এই বীর নারীর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এমন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল যে পলায়ন ছাড়া আর পথ ছিল না। এই ক্ষত্রিয় নারীর উগ্রতেজের কাছে মানিতে হইল তাহাকে পরাজয়। রুদ্রা অশ্বারোহণে, বর্শা নিক্ষেপেও ছিলেন নিপুণ। দস্যুগণ এই নারীর কাছে হার মানিল। কতক্ষণ লড়াই চলিয়াছিল বলা অসম্ভব। হঠাৎ রাত্রিশেষে শোনা গেল বিউগলের শব্দ। শহর হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের চেষ্টায় ছোটখাট একটি পুলিশ ফৌজ লইয়া পুলিশ সাহেব আসিলেন। গোলাম সর্দারের দল ভয়ে ভয়ে দামোদর নদের বালুকাকীর্ণ বুকের উপর দিয়া—নানা জাতির বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বন, কৃষকের ক্ষেত্র প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া বেগে ছুটিয়া চলিল রায়না গ্রামে।

লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা ও সরকারী সৈন্যেরা তাহাদের তাড়া করিয়া পিছু পিছু ছুটিল। প্রাণরক্ষার জন্য গোলাম সর্দারের দল এত দ্রুত পলায়ন করিল যে, কিছুতেই তাহাদের ধরা গেল না। নিরাশ হইয়া ফিরিল সকলে। রুদ্রার তলোয়ারের আঘাতে আহত হইয়া যে কয়েকজন দস্যু ধরা পড়িয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে পরে অনেক সংবাদ জানা গেল।



॥ দুই ॥

যে পাঠান দস্যুদল গোলাম সর্দারের ভয়ে তাহার গ্রামে কোনদিন আক্রমণ করিতে পারিত না, হাজরার বাড়িতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহারা হটিয়া আসার সংবাদ পাইয়া তাহারা জোট বাঁধিয়া আসিল রায়না গ্রাম আক্রমণ করিতে—গোলাম সর্দারের উপর প্রতিশোধ লইতে। গোলামের সঙ্গে লড়াই বাধিল সেই পাঠান দলপতি রহমতুল্লার। গোলাম নিজ গ্রামের উপর এই আক্রমণে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া দলবল লইয়া বাধা দিল সেই আক্রমণ, কিন্তু রোধ করিতে পারিল না। ভীষণ লড়াইয়ের সময় রহমতুল্লা পাঠান গোলামকে বর্শাবিদ্ধ করিল। বর্শাবিদ্ধ হইয়া গোলাম প্রাণ ত্যাগ করিল। মৃত্যু সময়ে সে বলিয়াছিল—'এতদিন পর্যন্ত গ্রাম রক্ষা করিয়া শেষটায় প্রাণ দিয়াও পারিলাম না গ্রাম বাঁচাইতে।'

প্রবাদ আছে, সেই পাঠান দস্যু দলপতি রহমতুল্লা একই সময়ে তিনটি পাঁঠার মাংস, আড়াই সের রুটি খাইত এবং তিন-চারি বোতল

বিলাতি মগু পান করিত।

গোলাম সর্দারের মৃত্যু সংবাদ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরার বাড়ির ডাকাতির সংবাদ পাইয়া কালেক্টর সাহেব বিশেষভাবে তদন্ত করিয়াছিলেন। তদন্ত হইলে, দুর্দান্ত দস্যু গোলামকে পরাজিত ও নিহত করিবার জন্য তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান দস্যুদলপতি রহমতুল্লাকে গভর্নমেণ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য বলয় উপহার দিয়াছিলেন।



॥ এক ॥

রামসন্তোষ ঘোষ নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাগবাজার কাঁটাপুকুর অঞ্চলে অসিয়া বাসভবন নির্মাণ করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেখানে ডাকাত-কালী নামে এক ভীষণা কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে বলিত সিদ্ধেশ্বরী দেবী। রামসন্তোষ ঘোষের বাড়ির নিকটেই ছিল এই সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি—বর্তমানে এই কালীবাড়ি বাগবাজারে রাস্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই কালীবাড়ির আশে-পাশে বাগবাজারের খালের পাশে, চিৎপুর অঞ্চলে সংকীর্ণ বন-জঙ্গলে ঢাকা পথের ধারে ধারে যেমন ছিল জলা, খালবিল, তেমনি সেখানে থাকিত সাপ, বাঘ, গণ্ডার, বন্য মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আর দুর্ধর্ষ দস্যু-ডাকাত, হারমাদ ও ঠেঙাড়ে। ডাকাতেরা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সম্মুখে নরবলি পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যাইত।

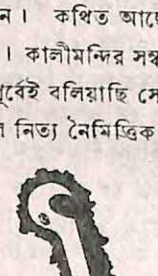
কাঁটাপুকুর অঞ্চলের প্রধান ডাকাত ছিল নন্দরাম ঘোষ—গোপ-বংশীয় ভীষণ ডাকাত। তাহার দলে ছিল বাগ্‌দি, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিবিধ জাতির লোক। এই দল সম্বন্ধে ও ইহাদের ভয়াবহ আচরণ সম্পর্কিত কথা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। ধনী ব্যবসায়ী, বণিক তালুকদার, জমিদার তাহার ভয়ে সর্বদা শংকিত থাকিতেন। এই নন্দরাম বাস করিত কালীবাড়ির নিকটবর্তী খালের পাশে। সেই খালের ধারে তাদের ছিপ নৌকা থাকিত। অতি সহজেই সেই খাল দিয়া গঙ্গা নদীর বুকে পৌঁছান যাইত। মহাজনী নৌকা, পালোয়ানী নৌকা, যাত্রী নৌকা, তীর্থযাত্রীর নৌকা সেই খাল দিয়া যাতায়ত করিত। কালীঘাটের কালীদর্শনকামী তীর্থযাত্রীরা নৌকাযোগে সেই খালের পথে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির পথ ধরিয়া কালীঘাটের কালীমাতাকে দর্শন করিতে গিয়া, হয় সাপ বাঘের কবলে প্রাণ হারাইত কিংবা ডাকাতের হাতে পড়িয়া সর্বহারা হইয়া প্রাণ দিত। রামসন্তোষ ঘোষ এবং নন্দ ডাকাত এমন দিনে পরস্পরের প্রতিবেশী রূপে বাস করিত।

এই সিদ্ধেশ্বরী কালীদেবী কতদিন আগের প্রতিষ্ঠিত এবং কে ইহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস আমরা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহা এইবার শোন।

এই মন্দিরটি হলওয়েলের সময়কার জমিদার গোবিন্দরাম মিত্তিরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হলওয়েলের নামের সহিত তাহার প্রতিষ্ঠিত অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভের স্মৃতি বিজড়িত। হলওয়েল (Jhon Zephanisah Holwell) ১৭১১ খৃস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর ডাবলিন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। নানা দেশ-বিদেশে শিক্ষা লাভ করিয়া এবং বিবিধ কার্যে ব্রতী থাকিয়া ১৭৩২ খৃস্টাব্দে চিকিৎসকরূপে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর জাহাজে বাস করিয়া ঢাকার কুঠিতে কিছুদিন সার্জন জেনারেলের কাজ করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন তিনি অন্ধকূপে নির্যাতিত হন। তৎপর ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। তিনি জাহাজে বসিয়া অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লিখিয়াছিলেন এবং নিজব্যয়ে অন্ধকূপের স্মৃতিরক্ষাকল্পে হত ব্যক্তিদের সমাধির উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে ঐতিহাসিক গবেষণায় অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হইয়াছে।

কথিত আছে হলওয়েলের সময়ে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। একসময়ে ইহার উচ্চতা অধিক ছিল। পরবর্তীকালে গোবিন্দরামের বংশধর অভয়চরণ মিত্র একটি ছোট দেবালয় নির্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে এক সন্ন্যাসী ছিলেন এই কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। কালীমন্দির সম্বন্ধে ইহার বেশী কোন প্রামাণিক ইতিহাস নাই। পূর্বেই বলিয়াছি সেকালে এখানে নরবলি ও ডাকাতি হইত। তাহা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।



॥ দুই ॥

নন্দ ঘোষ প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে নরবলি দিত এই মন্দিরের সম্মুখে। ঢাক বাজিত ভৈরব রবে হল্লা হইত অতি ভীষণ। পাড়ায় যাঁহারা অধিবাসী ছিলেন তাঁহারা ভয়ে কাঁপিতেন কখন কাহার বাড়িতে এই উন্মত্ত দস্যুদল আসিয়া আক্রমণ করে। কিন্তু কেহ সাহস করিত না কোন প্রতিবাদ করিতে। রামসন্তোষ সম্ভ্রান্ত এবং অর্থশালী জমিদার হইলেও কিছুই করিতে সাহসী হইতেন না। প্রতিদিন রামসন্তোষ ঘোষ এই লোমহর্ষক ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া

উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেলি প্রথমে বর্ধমানের কালেক্টর ছিলেন, পরে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে অস্থায়ীভাবে বড়লাট হইয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার পুত্র স্যার স্টুয়ার্ট বেলি (Sir Stuart Bayley) বাংলার ছোটলাট হইয়াছিলেন (১৮৮৭-১৮৯০ খৃস্টাব্দে)।

চমকিত হইতেন। এমন কি তাঁহার বাড়ির পাশ দিয়া এই দুর্ধর্ষ নরপশুর দল 'হা-রে-রে-রে' বিকট শব্দ করিয়া নরবলি দিয়া ডাকাতি করিতে যাইত।

এক অমাবস্যার রাত্রি। বর্ষণমুখর নিবিড় তিমির রজনী। দুইজন নিরীহ পথহারা পথিককে মাতা সিদ্ধেশ্বরীর নিকট বলি দিবার জন্য ডাকাতেরা ধরিয়া আনিয়াছে। মন্দিরে সেদিন মহা আনন্দ।

ডাকাতদল ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়াও সেই রাত্রে আসিয়াছে বেশ ভালভাবে মায়ের পূজা সম্পন্ন করিবার জন্য। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতেছেন। যূপকাষ্ঠের সামনে নরবলি প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন উদ্যত খড়্গ হতে যমদূত প্রায় মায়ের পূজারীর দুইজন সহকারী। উভয়ের দীপ্ত গৌর কান্তি, প্রশস্ত ললাট রক্তচন্দন চর্চিত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পেশী-বহুল ভীষণ-দর্শন মূর্তি। ঘন ঘোর রাত্রিতে মেঘের বর্ষণের ভিতর দিয়াও শোনা যাইতেছিল—'হা--হা-হা ধ্বনি,' আর বলির জন্য আনীত হতভাগ্য লোক দুইজনের করুণ চিৎকার।

সেদিন রামসন্তোষ ঘোষের পত্নী শিবানীদেবী করিতেছিলেন মাতৃপূজা—গৃহে প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যা সাধনের চতুর্থ মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরীর। শিবানী দেবী ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন—

উদ্য দিন দ্যুতিমিন্দু কিরীটাং
তুঙ্গ কুচাং নয়নত্রয়যু যুক্তায়।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশা
ভীতি করাং প্রভমে ভুবনেশাম॥
[ব্যাখ্যা ঃ রক্তবর্ণ ভক্তমনোমোহিনী শংকরী।
তুঙ্গ কুচা হাস্যমুখী মা ভুবনেশ্বরী॥
পাশাঙ্কুশ-বরাভয় ধরা চারিকর।
পাদপদ্ম শোভে ফুল্ল পদ্মের উপর॥
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট ফলকে
করুণাদায়িনী মাতা পলকে পলকে॥
মণিময় আভরণে শোভে কলেবর।
ভুবনে ভুবনেশ্বরী রূপ কি সুন্দর॥]

শিবানী দেবী যখন দেবী ভুবনেশ্বরীর ধ্যানে ধ্যানস্তিমিতলোচন নিমগ্ন, তখন শুনিলেন কে যেন তাহার উন্মুক্ত দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—

—মা! মা! রক্ষা কর।

শিবানী দেবীর ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন এক কিশোর বালক তাঁহার সামনে অগ্রসর হইয়া পদতলে পড়িয়া বলিতেছে—মা! মা! রক্ষা কর, বাঁচাও মা।

মাতৃস্নেহে বিগলিত মাতা শিবানী বুকে টানিয়া লইলেন তরুণ কিশোর বালককে। বলিলেন—'কি হয়েছে বল বাবা। কোন ভয় নেই।'

তখন কিশোর বালক বলিল, কিভাবে তাহাকে দুরন্ত দস্যুরা বলি দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল এবং সে পলাইয়া আসিতে পারিয়াছে। তাহাকে ও তাহার একজন সঙ্গীকে বলি দিবার জন্য যখন দস্যুরা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল গঙ্গার জলে স্নান করাইবার জন্য, তখনই সে পলাইতে পারিয়াছে। সে বলিল—'আমাদের দু'জনকে স্নান করাবার জন্য যেমন ওরা জলে নামছিল, এমন সময়ে ঘন গর্জনে দিক্‌বিদিক্ কাঁপিয়ে মুষলধারে বর্ষণ হতে লাগলো—গঙ্গার বুকে উঠতে লাগলো তুমুল তরঙ্গ। আমাকে যে ধরেছিল, সে পিছলে পড়লো গঙ্গার বুকে —আমি সুযোগ বুঝে বিদ্যুতালোকে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে এখানে এসেছি মা, আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান।'

তরুণ কিশোর কাঁদিতেছিল এবং কাঁপিতেছিল—রুদ্ধকণ্ঠে বারংবার বলিতেছিল, মা! মা! আমায় রক্ষা করুন।

শিবানীর মাতৃহৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝরিতেছিল শ্রাবণের ধারা। তিনি ডাকিলেন—'কৌশল্যা।'

তাহার প্রৌঢ়া দাসী কৌশল্যা আসিয়া কহিল—'কি মা।'

শিবানী কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—'যা যা ডাক তোর কর্তাবাবুকে, গিয়ে বল্ এখনি আমার এখানে চলে আসতে।'

কৌশল্যা চকিতে চলিয়া গেল।

শিবানী কিশোরকে বলিলেন—'কোন ভয় নেই বাবা। তুমি সুস্থ হও।'

ভৃত্যেরা কিশোরকে সযত্নে স্নান করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরাইয়া দিলে শিবানী দেবী তাহাকে আহার্য দ্রব্য দিলেন। তারপর শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'নরবলি, নৃশংস ভাবে ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি এই কি মা তোর ধর্ম। মা করুণাময়ী এ কি তোর পূজা? মা মা, তোর কি নর-রুধির না হলে তৃষ্ণা মিটে না।'

কর্তা রামসন্তোষ ঘোষ আসিলে শিবানী তাঁহার কাছে সব বলিলেন ও দেখাইলেন সেই কিশোর বালককে; বলিলেন—'এ দেশে কি মানুষ নেই? প্রতিদিন তোমাদের চোখের সামনে হয় নরবলি, ডাকাতি, রাহাজানি! এসব দেখেও কোন প্রতিকার হয় না তার। এই দেখ কি দৃশ্য! এই কিশোর বালকের ভাগ্য ভাল ছিল তাই নর-ঘাতক ডাকাতের হাত থেকে পেয়েছে উদ্ধার। তোমাকে এর প্রতিকার করতে হবেই। যে ভাবে পার কর। মানুষকে বাঁচাও, ধর্মকে বাঁচাও।' বলিতে বলিতে শিবানী স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন।

রামসন্তোষ ঘোষ মহাশয় কিছুক্ষণ ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—'তুমি শান্ত হও। নিশ্চয়ই এ অন্যায়ের প্রতিকার করবো…মা জগদম্বা, সবই তোমার ইচ্ছা।'

এই বলিয়া কর্তা শয়নাগারে চলিয়া গেলেন।



॥ তিন ॥

পরদিন পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সহিত রামসন্তোষ সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির ডাকাতি ও নরবলির সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিলেন। তাঁহারা কালীবাড়ির মন্দির প্রাঙ্গণে দেখিতে পাইলেন একটি মানুষের রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া আছে। কিন্তু মাথা

নাই। উঃ, কী ভীষণ দৃশ্য! সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। মন্দিরে পুরোহিত নাই, লোকজনও নাই। কেবল মন্দির মধ্যে লোলরসনা ভীষণা কালী দাঁড়াইয়া আছেন। দেবীর সম্মুখের পাত্র নররক্তে পরিপূর্ণ। ঘৃতের প্রদীপ নিবু-নিবু ভাবে জ্বলিতেছে। নন্দ ডাকাতের কোন সংবাদ নাই। তাহারা সেই ভীষণ দুর্যোগের রাত্রিতেও কে জানে কোথায় ডাকাতি করিতে বাহির হইয়াছে।

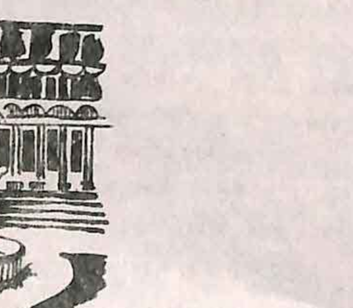
ঘোষ মহাশয় ধনী লোক। তিনি সাধারণ বাঙালীর মতন ছিলেন না—প্রস্তুত হইলেন ইহার প্রতিকার করিবার জন্য। নন্দকে বলিয়া কহিয়া বিনা গোলযোগে যদি এই ডাকাতি ও নরবলি বিদূরিত হয়, সেজন্য তিনি কয়েকবার তাহাকে ডাকিয়াও পাঠায়াছিলেন। কিন্তু সে আসে নাই। বরং তাহার একজন সহচরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল—'কর্তা মশাই, আমি কোন অন্যায় কাজ করি না। মায়ের পূজা করা অধর্ম নয়, আপনি নিজে সাবধান হবেন। আমাদের প্রয়োজন হলে আপনার বাড়িতেও ডাকাতি করতে ছাড়ব না।'

তেজস্বী রামসন্তোষ ঘোষ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বাড়ির চারিদিকে সতর্ক প্রহরী রাখিলেন। বন্দুক, গুলি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন। দেউড়িতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়া বন্ধু-বান্ধবকে সংবাদ দিলেন—প্রয়োজন হইলে বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিতে।

নন্দ ডাকাত সবই দেখিল এবং শুনিল! বলির জন্য যে কিশোরকে সে ধরিয়া নিয়াছিল সে যে কৌশলে পলাইয়া গিয়া ঘোষ মহাশয়ের আশ্রয়ে আছে, সে কথাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা রামসন্তোষ ঘোষ মহাশয় নন্দ ডাকাতের কাছ হইতে একখানি পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল—

'ঘোষ মহাশয়, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে—আগামী অমাবস্যা রাত্রিতে আমার উৎসর্গ করা বলির লোককে মায়ের মন্দিরে ফিরাইয়া না দেন তবে আপনার বাড়ি আক্রমণ করিব। প্রস্তুত থাকিবেন। —নন্দ ডাকাত'



॥ চার ॥

ঘোষ মহাশয়কে ভয় দেখাইয়া পত্র দিলে কি হইবে। তিনি সেই পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। সেকালের শাসকদের কাছে তাঁহার বিপদের কথা জানাইয়া দিলেন। তখন হইতে নগরপালের কাছ হইতে লোক আসিয়া রামসন্তোষের বাড়ি পাহারা দিতে লাগিল। কিন্তু ডাকাতের দেখা নাই। কেহ কেহ বলিল—'এই ভাবে চুপচাপ বসে থেকে ত কোন লাভ নেই। চলুন আমরাই নন্দর বাড়ি আক্রমণ করি।'

অনেকে সেই কথায় রাজী হইলেন। তখন দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল বাড়ি পাহারায় রহিল। অপর দল গেল মন্দিরের দিকে—নন্দের বাস পল্লীর দিকে। কিন্তু মন্দিরের আশে পাশে বনে জঙ্গলে বিরল বসতিপূর্ণ পল্লীতে কোথাও তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না। তখন তাহারা হতাশ হইয়া ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি কাঁটাপুকুরের দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন তাহারা শুনিতে পাইল ভয়ানক কোলাহল—'হা-রে-রে-রে-রে, শব্দে ডাকাতদের সোল্লাস চিৎকার। ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে মশাল জ্বলিতেছে। গুলি ছুটিতেছে দুই দিক হইতেই। অতি সংকটের সময়ে সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। একদিকে ঘোষ মহাশয়ের বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও তীরন্দাজ ডাকাতদের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছিল, অন্যদিকে আসিয়া পড়িল থানাদারের ফৌজ ও প্রহরিগণ।

নন্দ উভয়দিকের লোক দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিতে লাগিল। সারা কাঁটাপুকুর অঞ্চলের লোক ঘোষ মহাশয়ের বাড়ির দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। নিরুপায় নন্দ প্রাণরক্ষার জন্য যেমন খাল পার হইতে যাইতেছিল, সেই মুহূর্তে একজন প্রহরীর গুলির আঘাতে পড়িয়া গেল। দলের লোকেরা এই দৃশ্য দেখিয়া যাহারা পারিল পলাইয়া বাঁচিল। যাহারা পারিল না তাহারা কেহ প্রাণ দিল, কেহ ধরা পড়িল। এইভাবে বিখ্যাত নন্দ ডাকাত কাঁটাপুকুর অঞ্চল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

* * *

ঘোষ বংশের এই খ্যাতিমান ব্যক্তি, এই ঘটনার পর কাঁটাপুকুরের বাড়ি ত্যাগ করিয়া বর্ধমান গিয়া বাস করেন। ইনি বহুভাষাবিজ্ঞ ছিলেন। ইংরাজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদিগের কুঠিতে কার্য করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পুত্র পরে ফরাসী চন্দননগরে বাস করেন এবং বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।



॥ এক ॥

তখন ইংরাজশাসন ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই ; নবাবী আমলের শেষের দিক। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতন হইয়াছে। দেশে অরাজকতা চলিয়াছে—কেহ কাহারও কথা শোনে না। তখন চলিয়াছে, 'যার লাঠি তার মাটি' এই অবস্থা।

সেই সময়ে কলিকাতার পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে সংগ্রামবিল নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামে অনেক লোকের বাস। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সব জাতিই। সে-সময়ে দেশে চলিতেছিল বিশৃঙ্খলা এবং পূর্ণমাত্রায় অরাজকতা। দস্যুদের ভয়ে লোক সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। দস্যুদের অত্যাচারে কেহই ধন-প্রাণ লইয়া নিরাপদে বাস করিতে পারিত না! ডাকাতেরা আজ কাহারো বাড়িতে, কাল অপরের বাড়িতে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। তাহারা এইরূপ নির্ভীক ছিল যে কাহারও বাড়িতে ডাকাতি করিবে বলিয়া পত্র পাঠাইত বা লোক দিয়া সংবাদ দিত। আবার কাহারও বাড়িতে অতিথির বেশে গিয়া রাত্রিতে সময় ও সুযোগ বুঝিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিরাপদে চলিয়া যাইত। সেই সময়ে পুলিশ, দারোগা, কোতোয়াল ফৌজ থাকিলেও তাহাদের দ্বারা সাহায্য অতি কমই মিলিত। ডাকাতদের সঙ্গে ছিল তাদের যোগসাজশ।

সেই সময়ে সংগ্রামবিল গ্রামে রমাপ্রসাদ বসু নামে একজন অর্থশালী জমিদার বাস করিতেন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা। পাঁচমহল বাড়ি—পূজার দালান, নাটমণ্ডপ, দেউড়ির সম্মুখে কাছারি ঘর। জমিদারী সেরেস্তায় বহু কর্মচারি কাজ করেন। বরকন্দাজ, পাইক প্রভৃতি লোকজনের অভাব নাই। রমাপ্রসাদ বসু মহাশয় প্রৌঢ় ও প্রবীণ ব্যক্তি। দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, খর্বাকৃতি, সুগঠিত দেহ—বড় প্রশান্ত মূর্তি। স্বভাব অতি শান্ত, ধার্মিক এবং পরোপকারী। জমিদার হইলেও তাঁহার আয় খুব বেশি ছিল না—সদর খাজনা ইত্যাদি দিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইত। তিনি দান-ধ্যান, পূজা-পার্বণ, গরীব দুঃখীদের সাহায্য-দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। জমিদারীর আয় কিসে বৃদ্ধি পায় সেদিকে তাঁহার খুবই মনোযোগ ছিল। দুর্ভিক্ষ, মারীভয় ইত্যাদি হইলে এবং অজন্মার বৎসরে যতদূর পারিতেন প্রজাদের সাহায্য করিতেন। প্রজাদের রোগ নিবারণের জন্য একটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, নিজেও চিকিৎসা-বিদ্যা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে গ্রামের লোকজন এবং প্রজারা তাঁহাকে অসাধরণ ভক্তি করিত। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তি হইলেও তাঁহার মনে শান্তি ছিল না—ডাকাতের ভারী ভয়, কখন কি ঘটে তাহা ত বলা যায় না। সর্বদা বাড়িতে থাকাও সম্ভব ছিল না, মাঝে মাঝে রমাপ্রসাদবাবুকে বিভিন্ন মহালে যাতায়াত করিতে হইত। এজন্য তিনি বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকজন পাইক রাখিয়াছিলেন। পাইকদের সর্দার ছিল গোরাচাঁদ।

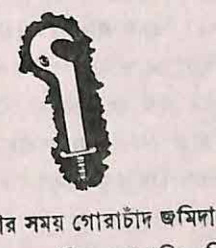
গোরাচাঁদকে বলা চলে লৌহমানব। বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে। তাহার শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায়' প্রশস্ত বক্ষ, স্ফীত পেশী, চক্ষু দুইটি বড়—দেখিলে মনে হয় যেন দুই চক্ষুতে আগুন জ্বলিতেছে। তাহাকে দেখিলেই লোক ভয় পাইত। সে ছিল সেই অঞ্চলের বিখ্যাত সর্দার। লাঠি ও তলোয়ার ধরিতে ছিল অসাধারণ। বসু মহাশয়ের বাড়িতে সে বাল্যকাল হইতেই বাস করিতেছে। সে এ-বাড়ির অতি আপনার লোক—পরিবারভুক্ত বলিলেই হয়। জাতিতে সে বাগ্‌দি। দেউড়ির পাশে একটি ছোট ঘর ছিল, ঐ ঘরেই সে থাকিত। তরবারি চালনায় সে ছিল অদ্বিতীয়। তখন দেশে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাহার ছিল দুইজন সাকরেদ। একজনের নাম ভবানী মল্ল, অপর জনের নাম হাতীরাম। বসু মহাশয়ের বেতনভোগী ইহারা তিনজন একত্র হইলে, কোন ডাকাতের দলকে ভয় পাইত না। তাহাদের সাহস ও পরাক্রম ছিল অদ্ভুত। এজন্য রমাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের বাড়িতে ডাকাতি হওয়া দূরে থাকুক সেই গ্রামে কখনও ডাকাতি হইত না। ডাকাতেরা ইহাদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

এইভাবে দিন চলিতেছিল। ক্রমে বৎসর অতীত হইল, আবার শরৎকাল আসিল—মায়ের আগমনী সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল—মা আসিবেন। বর্ষা শেষে প্রকৃতির রূপ ও শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। এ সময়ে গোরাচাঁদের মনে হইল একবার বাড়ি গিয়া সে তাহার বৃদ্ধা মাতাকে দেখিয়া আসে। বাবুর বাড়ির পূজা আরম্ভ হইলে আর ত তাহা সম্ভব হইবে না।

গোরাচাঁদের বাড়ি ছিল সংগ্রামবিল হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে। একদিন রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট হইতে বিদায় চাহিতে গেলে রমাপ্রাসাদবাবু গোরাচাঁদকে বলিলেন—'সে ত হয় না গোরা' পূজার সময় ডাকাতের উপদ্রব হবে অত্যন্ত বেশি—এখন না গেলেই কি হয় না?

গোরাচাঁদ বলিল—'এক বৎসর মাকে দেখি না। মা বুড়ো হয়েছেন, এখন যদি তাঁকে একবার না দেখে আসি, তবে হয়তো মাকে আর দেখতে পাব না। কর্তা মশাই, শুধু একদিনের জন্য ছুটি দিন।'

রমাপ্রসাদবাবু অবশেষে সব দিক বিবেচনা করিয়া ছুটি দিলেন।



॥ দুই ॥

সন্ধ্যার সময় গোরাচাঁদ জমিদার বাড়ি ছাড়িয়া নিজ বাড়ির দিকে চলিল। সঙ্গে নিল তরবারি—বিপদে আপদে রক্ষাকারী তরবারি। শরৎকালের আকাশ—নির্মল নীল। আকাশে তারার মালা শোভা পাইতেছে। রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় সে বাড়ি পৌছিল।

বাড়িতে তাহার মা ছাড়া কেহ ছিল না। মায়ের বয়স প্রায় আশি বৎসর। বৃদ্ধা মাতা এক বৎসর পরে পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলেন। মা অস্থির হইলেন কি ভাবে পুত্রকে খাবার দিবেন। ঘরে চাউল, ডাল সব আছে। নাই শুধু কাঠ। তাহা দেখিয়া মা পুত্রকে বলিলেন—'ওরে গোরা, ঘরে ত চাল ডাল সবই আছে, নাই শুধু রান্না করবার কাঠ। তুই একটু বিশ্রাম কর, আমি মাঠ থেকে কিছু ঘুঁটে আর কাঠ নিয়ে আসি।'

মা গেলেন মাঠে কাঠ সংগ্রহ করিতে। তখন কয়েকজন লোক সই পথে যাইতেছিল। গোরাচাঁদের মাকে খড় কুটা সংগ্রহ করিতে দেখিয়া তাহাদের একজন কহিল, এত রাত্রিতে খড়কুটো কুড়োচ্ছ কেন গো?

গোরচাঁদের মা বলিলেন—'গোরা বাড়ি এসেছে কিনা, তাই।'

লোকটি বলিল 'ভাল কথা, ও গোরার মা তুমি বাড়ি যাও

আমরাও গোরার সঙ্গে দেখা করে আসব।'

গোরাচাঁদের মা বাড়িতে গিয়া পুত্রের কাছে লোকগুলির কথা বলিলে গোরাচাঁদ একটু ভাবিয়া কহিল—'মা এতদিন পরে বাড়ি এলাম, তুই আমাকে দুটি ভাত রেঁধেও খাওয়াতে পারলি না। মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন রে কি হয়েছে গোরা। ওরা সব গাঁয়ের মানুষ। তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তাতে আর কি অপরাধ হয়েছে বলত ?'

—মা, তুই জানিস না ; ওরা সব ডাকাত। আমার বাবুর বাড়ি ডাকাতি করতে যাবে আজ রাত্রে, নিশ্চয় জানবি। ওরা টের পেয়েছে, আমি বাবুর বাড়ি নেই। আর কি তারা এ-সুযোগ ছাড়তে পারে ?

—না-না, ও তোর মিছে ভয়। তুই ভাত খেয়ে আজ রাত্রিতে এখানে ঘুমিয়ে সকালে জমিদার বাড়ি যাবি, তবেই হবে।

গোরাচাঁদ একটু উত্তেজিত হইয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল—'মা তুই জানিস্ নে। এরা সব জমিদার বাড়ি ডাকাতি করে এসে, শেষটায় আমাকে একাকী পেয়ে খুন করে রেখে যাবে। মা, আমি আর দেরী করতে পারি না। এখুনি চললাম।'

একথা বলিয়া গোরাচাঁদ তাহার হাতের তরবারিখানি লইয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া জমিদার বাড়ির দিকে ছুটিল।

গোরাচাঁদ অতি বেগে ছুটিয়া চলিল। তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে! চারিদিক আঁধারে ঢাকিয়াছে। গ্রামের পথে গোরা চলিয়াছে। দুই দিকে বড় বড় গাছ, বাঁশঝাড়, লতা গুল্ম, বেতবন। সেই আঁধারে ঢাকা সংকীর্ণ পথে গোরা যাইতেছে—কিছু দূর গিয়া সে শুনিতে পাইল কতকগুলি লোক কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে সেই পথ ধরিয়া। তখন সে অনুমানে বুঝিল ইহারাই সেই ডাকাত দল—যাহারা তাহার মায়ের কাছে তাহার খবর লইয়াছিল। গোরাচাঁদ মনে করিল যদি তাহারা তাহাকে পথে দেখিতে পায়, তবে তাহাকে একা পাইয়া নিশ্চয়ই আক্রমণ করিবে। এই ভয়ে সে অন্য এক পথ ধরিয়া সংগ্রামবিলের দিকে চলিল।

পথে ছিল এক ছোট নদী। সংগ্রামবিল যাইতে হইলে সেই নদী পার হইয়া যাইতে হয়। ডাকাতেরা নদীর পারে আসিল। গোরাচাঁদকেও সেই নদী পার হইয়া ওপারে যাইতে হইবে। সে অল্প দূরবর্তী একটি বট গাছের আড়াল হইতে শুনিতে পাইল—ডাকাতের সর্দার পাটনীকে বলিতেছে—দেখ, সাবধান! আজ রাত্রে আর যদি কেউ এসে তোমাকে নদী পার করে দিতে বলে, তোমাকে সাবধান করে বলছি, খবরদার তাকে পার করে দিও না। যদি দাও তবে কাল ফেরারকালে তোমার মাথা কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। তোমার [illegible] নৌকার চিহ্নও থাকবে না।

[illegible] ভয়ে তাহাদের পার করিয়া দিল। ডাকাতদের পার [illegible] আবার নৌকা লইয়া এপারে আসিয়া [illegible] সেইসময়ে সেখানে আসিল [illegible] তাড়াতাড়ি আমাকে পার করে দাও।'

পাটনী কিন্তু তাহার কোন কথা শুনিল না।

সে বলিল—'অনেক রাত হয়েছে আমার এখন বাড়ি ফিরতে হবে।'

একথা বলিয়া সে নৌকাখানি পারের একটি গাব গাছের গোড়ার সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া চলিয়া গেল।

গোরাচাঁদ আর সহজ পথে নদী পার হইতে পারিল না। তখন সে নিরুপায় হইয়া নদীর পারে হাঁটিয়া চলিল। কিছু দূরে একখানি জেলে ডিঙ্গি দেখিতে পাইল। জেলে লোকটি ভাল। এত গভীর রাত্রে গোরাচাঁদকে বিপন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া নদী পার করিয়া দিল। নদী পার হইয়া গোরাচাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে দ্রুতপদে সংগ্রামবিলের দিকে যাইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া সে দেখিতে পাইল একটি বড় আমবাগানের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে এবং অনেকগুলি লোক একসঙ্গে মণ্ডলাকারে বসিয়া চুপি চুপি কথা বলিতেছে। সে বুঝিল, ডাকাতেরা এখানে আসিয়াই আস্তানা গাড়িয়াছে। এখান হইতে পরামর্শ করিয়া জমিদার বাড়ি আক্রমণ করিবে। অতএব সে তাহাদের অজ্ঞাতে অতি দ্রুত চলিল মনিব বাড়ির দিকে।

রাত্রি যখন প্রায় আড়াই প্রহর, তখন গোরাচাঁদ রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ি গিয়া পৌছিল। বাড়িতে কাহারও কোন শব্দ নাই। সকলে নিদ্রিত। শুধু শোনা যাইতেছিল তাহার সাকরেদ ভবানী মল্ল চিৎকার করিয়া পাহারা দিতেছে। গোরাচাঁদ আসিয়া ভবানী মল্ল ও অন্য একজন বরকন্দাজের সহিত বাড়ির চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ির গায়ে একটা খুব বড় বটগাছ ছিল। ঐ গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এবং তাহার একটি শাখা বাড়ির ছাদের উপর গিয়া পড়িয়াছে। সেই শাখা হইতে একটি ঝুরি নামিয়াছে। গোরাচাঁদ সেই ঝুরির সাহায্যে ছাদের উপর নামিল এবং পাছে ডাকাতেরা ঐ ঝুরি ধরিয়া ছাদের উপরে আসে এই ভয়ে তাহার হাত যতদূর পৌছিল, তরবারি দ্বারা ঝুরির মাথাটি ততদূর কাটিয়া দিল।

তারপর সে অতি কৌশলে ছাদের সিঁড়ির দরজা খুলিয়া নিচে নামিল এবং আপন ঘরের দিকে গেল। সেই ঘরের সঙ্গে অন্য কোন ঘরের যোগ ছিল না। গোরাচাঁদ খুব সাবধানে তাহার ঘরের দরজা খুলিল। অতি ক্ষুদ্র একটি কোঠা। ঘরের ভিতরে ছিল একটি ছোট বেতের পেটরা আর, দেয়ালে দুইখানি ঢাল ও দুইখানি তীক্ষ্ণধার অসি। তখনকার দিনে দেশলাইয়ের প্রচলন ছিল না, গোরাচাঁদ চকমকি দ্বারা শোলা জ্বালাইল। তারপর সে পেটরা হইতে ছিন্ন বস্ত্র বাহির করিয়া মস্তকে, হাতে এবং পিঠে বেশ করিয়া জড়াইয়া নীরবে ডাকাতদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।





॥ তিন ॥

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর কাটিয়া গিয়াছে। চন্দ্র ডুবিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ দেখা যায়। কখনও কখনও মেঘে সারা আকাশ ঢাকিয়া ফেলে, আবার দূরে সরিয়া যায়। এমন সময় ডাকাতেরা আসিয়া রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ির দরজায় ঘা মারিতে লাগিল। দরজা খুব প্রকাণ্ড, অত্যন্ত দৃঢ়। ডাকাতেরা ফটক ভাঙ্গিবার জন্য ঢেঁকির দ্বারা ঘন ঘন ঘা দিতে লাগিল। তাহাতে ভয়ানক ভাবে ঝন্ ঝন শব্দ হইতেছিল। সেই ভীষণ আঘাতের শব্দ গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। সেই শব্দে গোরাচাঁদ, ভবানী মল্ল এবং বাড়ির অন্যান্য প্রহরী ও বরকন্দাজেরা সচকিতে ডাকাতদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। ডাকাতেরা বাড়ির রাস্তার দুই ধারে মশাল জ্বালিয়া বাড়ির চারিদিকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আর'হা-রে-রে-রে-রে' ও 'জয় মা কালী' রবে ভীষণ চিৎকার করিতেছিল। তাহাদের উৎসাহের অভাব ছিল না। কেননা তাহারা মনে করিয়াছিল গোরাচাঁদ ত বাড়িতে নাই। আর ভয় কি। কাজেই তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল যে, এইবার তাহারা অতি সহজেই রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ি লুঠ করিতে পারিবে।

ডাকাতের দলে অনেক লোক ছিল। কাজেই গোরাচাঁদ, ভবানী মল্ল ও অন্যান্যের পক্ষে বাড়ি রক্ষা করিতে পারা ছিল অতি অসম্ভব ব্যাপার। তবু গোরাচাঁদ বলিল—'ভাই সব, আমাদের হাতে যতক্ষণ তলোয়ার থাকবে ততক্ষণ প্রাণপণে বাবুর বাড়ি রক্ষা করবো। তারপর যা করেন মা কালী।'

এদিকে ডাকাতেরা বাড়ির চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে হা-রে-রে-রে শব্দে বাড়ি একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। রমাপ্রসাদবাবুর বাড়ির পরিজনবর্গ সকলেই জাগিয়াছে এবং ভয়ে কাঁপিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতেছেন। তাঁহাদের ভয়ের কারণও ছিল! তাঁহারা কর্তার মুখে শুনিয়াছিলেন যে, গোরাচাঁদ বাড়িতে নাই। এজন্যই তাঁহাদের শংকাও অধিক হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া পুত্র-কন্যাদের ও বাড়ির সকলের প্রাণ বাঁচিবে। যখন বাড়ির ভিতরে ও বাহিরে এইরূপ অবস্থা, তখন শোনা গেল গোরাচাঁদ, ভবানী মল্ল এবং তাহাদের সঙ্গী বরকন্দাজ ও সিপাইদের চিৎকার ধ্বনি। গোরাচাঁদ এবং ভবানী ঘর হইতে বাহির হইয়াই এক হাঁক দিল, তারপর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে আসিয়া আর এক হাঁক দিল—সে কি ভীষণ চিৎকার ধ্বনি!

গোরাচাঁদের এইরূপ ভীষণ হুঙ্কারে ডাকাতদল বুঝিল যে গোরাচাঁদ বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন তাঁহারাও সন্ত্রস্ত হইল এবং ভীষণ হল্লা করিয়া ঘন ঘন ঢেকি দিয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিল। গোরাচাঁদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ভবানী মল্ল। সে বলিল—'সর্দার, তুমি দরজা খুলে বেটাদের আসতে বল। দেখা যাক বেটাদের বুকের পাটা কত বড়।'

ঠিক বলেছিস ভবানী—বলিয়া গোরাচাঁদ জোরে চিৎকার করিয়া বলিল—'দেখ, তোরা জমিদার বাড়ির দরজা ভাঙিস না আমরা দরজা খুলে দিচ্ছি। যদি ডাকাতি করতে হয়, আয় বাড়ির ভেতর।

এই বলিয়া তাহারা ফটক খুলিয়া দিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে বন্যার জল যেমন ছুটিয়া আসে, তেমনি দরজা খোলামাত্র ডাকাত দল হা-রে-রে-রে শব্দে চিৎকার করিয়া পঙ্গপালের মতো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল।



আরম্ভ হইল ভীষণ লড়াই। ডাকাতেরা দৃঢ় পণ করিয়াছিল, যেরূপেই পারে রমাপ্রসাদ বসুর বাড়ি লুঠ করিবে। কাজেই আরম্ভ হইল গুরুতর ভাবে হাতাহাতি-মারামারি-কাটাকাটি। অতুল সাহসের সহিত গোরাচাঁদ ও ভবানী মল্ল তাহাদের তলোয়ারের ঘায়ে বহু ডাকাতকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। গোরাচাঁদ ছিল অতি ক্ষিপ্রহস্ত, তলোয়ার চালনায় নিপুণ। তাহার সম্মুখে যে আসিতে লাগিল সেই ছিন্নমুণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল। আবার যে পলাইতে চেষ্টা করিল তাহারও রক্ষা ছিল না, মত্ত হস্তীর মত সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া গিয়া তাহার ঘাড়ে তলোয়ারের কোপ দিতে লাগিল।

অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতদের কাহারও মাথা গেল, কাহারও পা গেল, আবার কেহ প্রাণরক্ষার জন্য ছুটিয়া পলাইল। এইভাবে যে অপূর্ব বীরত্ব সহকারে গোরাচাঁদ ও ভবানী মল্ল ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার তুলনা হয় না। দুইজনে লড়াই করিতে করিতে যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। গোরাচাঁদ পাগলের মতো লাফালাফি করিয়া তলোয়ার ঘুরাইতেছিল। অপূর্ব তাহার প্রভুভক্তি, অপূর্ব তাহার সাহসিকতা। গোরাচাঁদ ও ভবানীর অসাধারণ ধৈর্য ও নিপুণভাবে ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার ফলে অবশিষ্ট ডাকাতেরা সকলেই পলাইয়া গিয়াছিল।

গ্রামের লোকেরা পরদিন প্রভাতে দলে দলে আসিয়া দেখিল কত না মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

জরুরী কার্যবশতঃ সেই রাত্রে রমাপ্রসাদবাবু বাড়ি ছিলেন না। পরদিন ডাকাতির সংবাদ পাইয়াই তিনি ব্যাকুলভাবে ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ির দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। গোরাচাঁদ ও ভবানী মল্ল প্রভুর আগমন সংবাদ পাইয়া বেগে ছুটিয়া আসিল এবং চিৎকার করিয়া সঙ্গীদের বলিতে লাগিল—'ওরে কেটে সাবাড় কর, ওরে কচুকাটা কর।'

রমাপ্রসাদবাবু, গোরাচাঁদ সর্দার ও ভবানী মল্লর সাহসিকতা এবং প্রভুর জন্য এইরূপ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া লড়িবার জন্য আনন্দ অনুভব করিলেন। আশে-পাশের লোকেরা গোরাচাঁদ ও ভবানীকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলে প্রচুর পরিমাণ পারিতোষিক দানে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন।

বাড়ির মহিলারা এক বাক্যে বলিলেন যে, গোরাচাঁদ ও ভবানীর বীরত্বে তাঁহাদের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

রমাপ্রসাদবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার বাড়িতে আর কোনদিন ডাকাতি হয় নাই। সুখে ও শান্তিতে তাঁহার দিন কাটিয়াছিল।

অভিমত

'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল'—এবং মুখে হা-রে-রে-রে ডাক। রবি ঠাকুরের বীরপুরুষ 'খোকা' এমন একটা ছবি এঁকেছে ডাকাতদের। তারা স্রেফ বাঙলার ডাকাত। নবাবী আমল শেষ, ইংরেজ আমল শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হতে শুরু করেছে। তখনকার ডাকাত তারা। রবিনহুডের আদল তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই। আবার বীরত্ব, দয়াধর্ম, মহত্ব, দেবদ্বিজে ভক্তি সবই ছিল তাদের। সব মিলিয়ে একটা পুরানো বাংলার সামাজিক ছবি। অনেক বছর আগে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পুরানো সরকারী দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে ছোটদের জন্য এই কাহিনী লিখেছিলেন। এবং ছোট বড় সবাই হৈ হৈ করে নিয়েছিল।
বাঙলার মাঠ, ঘাট, নদী, বিল, জঙ্গল ও গ্রামে এইসব ডাকাত মানুষদের স্মৃতি এখনো কেউ ভোলেনি। তারা সবাই এক একটি মহাকাব্যের চরিত্র যেন। —অন্তত যোগেন্দ্রনাথ সেইভাবেই এঁকেছেন তাদের। একই সঙ্গে তাদের জব্দ করার মতো কড়াধাতের পুরুষ ও রায় বাঘিনী মেয়েদের ছবিও এঁকেছেন এবং লড়িয়েও দিয়েছেন। সে এক উপভোগ্য দৃশ্য। ডাকাত ছিল, ডাকাত আছে, ডাকাত থাকবে। শুধু সে জন্য নয়, বাংলার মাটির একটা ছাপ এতে আছে বলেই ছোটবড় সবাই বইগুলি পড়তে চাইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা/৭৭

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাস লিখতে লিখতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে রাজসিংহ পড়ে বাংলার ছেলেরা ডাকাত মানিকলালের প্রভাবে মাটি হয়ে যাবে। শিক্ষিত জনেরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু রাজসিংহ উপন্যাসে ডাকাত ও ডাকাতির কাহিনী গল্পখোর পাঠক আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিল। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাঙলার ডাকাতের কাহিনীও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে অত্যন্ত আদরণীয় হয়েছিল। ইংরেজশাসন যখন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত নয় তখন বাংলার নানা অঞ্চলে ডাকাতদের উপদ্রব ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের কার্য-প্রণালীও ছিল বিচিত্র। কেউ কেউ রীতিমতো রবিন হুডের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। এসব ডাকাতির লোমহর্ষক বিবরণের সঙ্গে রয়েছে বাঙালীর বীরত্ব, গৌরবের কাহিনী। কুণ্ডীর জমিদার চৌধুরী মহাশয়, প্রবাসী বাঙালী অম্বিকা বাবু, আশানন্দ ঢেকি ইত্যাদির অসম সাহস, বিপদে অকুতোভয় এবং শত্রুদমনে উৎসাহী বাঙালীর চরিত্র—বাঙালীর বাহুবল ও লাঠির দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অপর দিকে অম্বিকাবাবুর স্ত্রী দুর্গাদেবী (দুর্গাদেবী রণরঙ্গিণী চামুণ্ডার বেশে ডাকাতদের সম্মুখীন হলেন, তুলনীয়—বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে) এবং রামমোহনের স্ত্রী'র বীরাঙ্গনা রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। তথ্য ও সত্যের মিশ্রণে 'বাঙলার ডাকাত' ঘরে ঘরে সমাদর পাবার যোগ্য।

'দেশ' সাপ্তাহিক/৭৬

পৃথিবীর সব দেশেই ডাকাতদের বিস্তর কাহিনী আছে। আমাদের আদিকাল থেকে এ কাল পর্যন্ত অনেক ডাকাতের কাহিনী আছে। এমন কি বৌদ্ধজাতক ঘাঁটলেও ডাকাতের বিস্তর কথা আমরা জানতে পারি। বাংলাদেশে দুর্ধর্ষ ডাকাতদের কোন অভাব ছিল না। এখনও নেই। লেখক শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বাংলার ডাকাত' বইটি খুব সুন্দর ভাষায় বিভিন্ন সময়ের সাড়াজাগানো ডাকাতদের কাহিনীর বর্ণনা করেছেন যা শুধু সত্যনির্ভর নয়। সর্বোপরি সাহিত্য রসপুষ্ট। ডাকাতদের চরিত্রে বিশেষ দুটি দিকই আছে। সাধারণতঃ ডাকাত বলতে গেলে যে ভয়ের ব্যাপার আছে, সেই ভয়ের কোন কিছুমাত্র এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। বরং কিছু কিছু ডাকাত যে উদার মনের ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরনো দলিল হাতড়ে লেখক অত্যন্ত সহজ সরল স্টাইলে বিভিন্ন ডাকাতের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে লেখকের ডাকাত বাবা, রঘু ডাকাত, দেবী রায়ের বজরা, খোকাবাবুর ডাকাত ধরা প্রভৃতি গল্প সকলের মন জয় করতে সমর্থ হবে বলে আশা করি।

যুগান্তর ১৩৮১

বাঙলার ডাকাতের কাহিনীতে সম-সাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিশুসাথী ১৩৩৬

পুরানো ভঙ্গিই শুধু নয়, পুরানো দিনের অম্বুরী তামাকের নেশা ধরানো আছে বইটির পাতায় পাতায়। বাংলার একটি বিশেষ পর্বের ইতিহাস জানার জন্যেও যোগেনবাবুর গল্পকথাময় বইগুলিকে পড়তে হবে।

কৃত্তিবাস/৮৩